থাকে। আমাদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের দানস্বরূপ সেই মহান শাস্ত্র অধ্যয়ন ক'রে তাঁদের মতো জীবনযাপন করবার সেই সুযোগ আমাদের আজ এসেছে। এই উপনিষৎ পাঠ ক'রে আমরা সকলে 'সেই ঋষিদের সান্নিধ্য লাভ করেছি'– এই অভিজ্ঞতা লাভ করব এবং এটাই হচ্ছে উপনিষদের আক্ষরিক অর্থ।

অভীঃ-বাণী

উপনিষৎ স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। উপনিষৎ ঘোষণা করেছে অমরবাণী, তাই সার্থক তার নাম। মন ও ইন্দ্রিয়ের অতীত প্রদেশে উপলব্ধ হয়েছে ঐ মহান সত্য; এ সত্য সাধারণ মনের না হলেও শুদ্ধ মনের গোচর। ঐ সত্যগুলি সর্বজনীন ও শাশ্বত এবং যুগ যুগ ধরে সকল মানবকে অনুপ্রেরণা যুগিয়ে আসছে। আজ এসেছে সেই সুবর্ণ সুযোগ—এই অফুরন্ত অমৃতের ভাণ্ড থেকে আধুনিক পদ্ধতিতে ব্যাপক-ভাবে ছড়িয়ে যাচ্ছে অমৃতের বার্তা। স্বামী বিবেকানন্দের আগমনের পূর্বে খুব কম লোকই জানত বেদান্তের এই মহিমা। তিনি ঐ মহান সত্যগুলি বহন ক'রে নিয়ে ঘুরলেন প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে; দুয়ারে দুয়ারে আর গৃহচূড়া থেকে তারস্বরে ঘোষণা করলেন—"·· আমাদের আবশ্যক শক্তি, শক্তি—কেবল শক্তি। আর উপনিষৎসমূহ শক্তির বৃহৎ আকরস্বরূপ। উপনিষৎ যে শক্তি সঞ্চার করিতে সমর্থ, তাহাতে উহা সমগ্র জগৎকে তেজস্বী করিতে পারে। উহার দ্বারা সমগ্র জগৎকে পুনরুজ্জীবিত এবং শক্তিমান ও বীর্যশালী করিতে পারা যায়। সকল জগতের, সকল মতের, সকল সম্প্রদায়ের দুর্বল, দুঃখী, পদদলিতগণকে উহা উচ্চরবে আহ্বান করিয়া নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইয়া মুক্ত হইতে বলে। মুক্তি বা স্বাধীনতা—দৈহিক স্বাধীনতা, মানসিক স্বাধীনতা, আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা, ইহাই উপনিষদের মূলমন্ত্র।"

ইতিহাসে দেখা যায়, শঙ্করাচার্যই (৭৮৮-৮২০ খৃঃ) প্রথম এদেশে উপনিষৎ জনপ্রিয় ক'রে তোলেন। কিন্তু তাঁর আগে মাত্র কয়েকটি মুষ্টিমেয় সন্ন্যাসী সম্প্রদায় উপনিষদের ঐ মহিমার বিষয় অবগত ছিলেন। শঙ্করাচার্যই প্রথম উহা সর্বসাধারণের জন্য প্রচার করলেন। তিনি বলেছিলেন, 'ইহা সকলের মঙ্গল সাধন করবে', কিন্তু তবুও উপনিষৎ রইলো সীমাবদ্ধ। এলেন স্বামী বিবেকানন্দ, ভেঙ্গে দিলেন সকল সংকীর্ণ সীমা আর উপনিষৎকে ছড়িয়ে দিলেন আপামর সকলের মধ্যে। ভারতের ও ভারতেতর বহু দেশের বিভিন্ন ভাষায় বিবেকানন্দের রচনাবলী অনূদিত হওয়ায় উপনিষদের আলোয় সব দেশের লোকই আলোকিত হবার সুযোগ পাচ্ছে। স্বামী বিবেকানন্দ মৃতপ্রায় ভারতকে জাগাবার জন্য উদাত্তকণ্ঠে বললেন, "তোমাদের সম্মুখে উপ-নিষদের এই সত্যসমূহ রহিয়াছে। ঐ সত্য-সকল অবলম্বন কর, ঐগুলি উপলব্ধি করিয়া কার্যে পরিণত কর—তাহা হইলে নিশ্চয়ই ভারতের উদ্ধার হইবে।"

উপনিষৎ পাঠ করতে হলে চাই জীবনের সঙ্গে তার যোগ, আর শ্রদ্ধা। সংবাদপত্রও এক ধরনের সাহিত্য, কিন্তু উহা অত্যন্ত নিম্নস্তরের, যেহেতু উহার আয়ুষ্কাল সকাল থেকে সন্ধ্যা; উপনিষৎ সেরূপ নহে—উহা আমাদের শ্রদ্ধার সঙ্গে বার বার পড়তে হবে; এবং আমাদের মস্তিষ্ক যত পরিষ্কার হ'তে থাকবে আমরা উহার গভীরে তত অধিক ঢুকতে পারব, কারণ ঐ শব্দ-গুলি অনুভূতির সঙ্গে জড়িয়ে হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে এসেছে। উপনিষদের শব্দ আসে সত্যের গভীর হ'তে। ঋষিরা ঐ সত্যকে অনুভব ক'রে মানুষ ও প্রকৃতির ভিতর দেখেছিলেন এক

নিগূঢ় সত্তা; তারপর ছন্দের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন ঐ দর্শনগুলিকে, অতীত থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত বহু চিন্তাশীল মনীষীর ও কবির হৃদয়কে নাড়া দিয়েছে—উপনিষদের ঐ মহান ভাবময় কবিতাগুলি। উদাহরণ-স্বরূপ মুণ্ডক উপনিষৎ থেকে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করছি—"যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদ্ যস্যৈষ মহিমা ভুবি" —অর্থাৎ যিনি সব জানেন, সব বোঝেন, জগদ্ব্যাপী যাঁর মহিমা। কিন্তু তাঁর এই মহিমা কি স্থানকালব্যাপী প্রকৃতির বাইরে অবস্থিত? ইহার উত্তরে উপনিষৎ দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করছে, না, তাঁর মহিমা মানুষে বিশেষভাবে প্রকাশিত —"দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ ব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ" অর্থাৎ সেই আত্মা, মানুষেরই অন্তরাত্মা; উহা ব্রহ্মের জ্যোতির্ময় পুরে, মানুষের হৃদয়াকাশে অবস্থিত। তিনিই হৃদয়ে অধিষ্ঠিত বলিয়া মন-বুদ্ধিতে তাঁরই প্রকাশ, তিনিই প্রাণাদির নিয়ন্তা —"মনোময়ঃ প্রাণশরীরনেতা প্রতিষ্ঠিতোঽন্নে হৃদয়ং সন্নিধায়।"—হৃদয়াকাশে তিনি আছেন ব'লেই মনুষ্যশরীর সজীব হয়ে উঠে। তারপর ঐ শ্লোক শেষ হয়েছে একটি সুন্দর আশাপূর্ণ বাণী দিয়ে, "তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি"—জ্ঞানীরা সেই আনন্দময় অমৃতস্বরূপ পুরুষকে প্রত্যক্ষ ক'রে থাকেন।

শ্লোকে বর্ণিত 'ধীরাঃ' শব্দটির অর্থ জ্ঞানী ব্যক্তিগণ—উহাতে বুদ্ধিমত্তা ও সাহসিকতা দুই-ই নিরূপিত হয়। উপনিষৎ মানুষের মহত্ত্বকে দ্বিবিধভাবে ঘোষণা করেছে—প্রথমতঃ বুদ্ধি, যার দ্বারা সে বাইরের ও ভিতরের জাগতিক বস্তু বুঝতে পারে; আর দ্বিতীয়তঃ, তেজস্বিতা ও সাহসিকতা, যাদের দ্বারা সে শুধু জেনে ক্ষান্ত হয় না, ঐ মহান সত্যের আঙিনায় পৌঁছায়। শুধু বুদ্ধি নয়, সাহসও দরকার। আর ইহাদের উভয়ের সহযোগে তৈরী হবে মহৎ চরিত্র।

অভিজ্ঞতা ও সত্যানুভূতি আসে বুদ্ধির ভিতর দিয়ে এবং ঐ বুদ্ধির পিছনে থাকে নির্ভীকতার জোয়ার। 'ধীর' ব্যক্তি সেই-ই, যার আত্মানুভূতি হয়েছে। কিন্তু ঐ অনুভূতির কষ্টিপাথর কোথায়? উপনিষৎ তার প্রমাণ-স্বরূপ বলছে: সেই ব্যক্তি তখন ভিতরে-বাইরে, মানুষে প্রকৃতিতে, এককথায় সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন করেন। তখন এই দৃশ্যমান জীবজগৎ তাঁর কাছে আনন্দময় অমর ব্রহ্মের অভিব্যক্তি ব'লে মনে হয়। শঙ্করাচার্য ঐ অনুভূতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন: তখন এই জগৎ আনন্দের বন্যায় ও সৌন্দর্যের তরঙ্গে ভেসে যায়। তখন আত্মা মানুষে, প্রকৃতিতে, সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্রে এমন কি প্রতি ধূলিকণাতে প্রকাশিত হন! উপনিষদের অমর কবিতার ইহা একটি ক্ষুদ্র নমুনা; এইরূপ অসংখ্য আছে।

উপনিষদের এই সুন্দর কবিতাগুলি বহু গভীর তত্ত্ব বহন ক'রে নিয়ে চলেছে। ঐ তত্ত্বকে বোঝা বড় দুরূহ ব্যাপার; শুধু উপর উপর পড়া যথেষ্ট নয়। বারবার শ্রদ্ধার সঙ্গে অধ্যয়ন এবং গভীর তত্ত্বানুসন্ধান দরকার। আমরা আমাদের ব্যক্তিগত প্রকৃতি অনুযায়ী এই বহিঃপ্রকৃতিকে দেখি। আমাদের নিজেদের এই ব্যক্তিত্বের গভীরে এমন একটি জিনিস রয়েছে, যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের উন্নতি, পূর্ণতা ও অনুভূতি। উপনিষদের প্রতি বাক্যের সঙ্গে যোগ রয়েছে আমাদের হৃদয়-সুরের কোন তন্ত্রীর। শঙ্করাচার্য তাঁর ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে বলেছেন: ব্রহ্মসূত্রের মূলতত্ত্ব এবং উপনিষদের প্রাণ যে নির্গুণব্রহ্ম তাহা আমাদের এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবন থেকে স্বতন্ত্র কোন দুরূহ সত্তা নয়, উপরন্তু উহা সকলের অন্তরাত্মানুভূতির স্বীকৃত সত্যের নিদর্শন।

তাই আমাদের এই আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার বুঝতে গেলে মননশীলতার একান্ত প্রয়োজন। যদি উপনিষৎ থেকে এই জ্ঞানের এক কণা আমাদের জীবনে আসে তবে সমস্ত দেশ নব উদ্যমে দৃঢ়সংকল্প ও সুশৃঙ্খলার দ্বারা নবরূপ ধারণ করবে। আমরা গীতাতে পড়েছি "স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ," অর্থাৎ এই ধর্মের (নিষ্কাম কর্মযোগের) অল্পমাত্র অনুষ্ঠানও আমাদের মহাভয় হ'তে রক্ষা করবে। এখানে রয়েছে সেই অভীঃ-বাণী, সেই উদ্দীপনাময়ী অমৃতের বার্তা। মানুষকে ক্রমাগত এগুতে হবে এবং পৌছুতে হবে সেই জ্ঞান ও ভক্তির মিলনক্ষেত্রে অর্থাৎ পূর্ণত্বে। ইহাই উপনিষদের সেই শঙ্খনিনাদিত বাণী—যা মানুষকে গতিশীল ক'রে ঠেলে দিয়েছে সেই চরম সত্যানুভূতির পথে এবং এই বিবর্তনময় জীবনকে আধ্যাত্মিক অনুভূতির ভিতর দিয়ে এগিয়ে যেতে বলেছে পূর্ণত্বে। কত বড় আশার বাণী!

বিশ্বমানব

উপনিষৎ মানুষকে তার শাশ্বত অমর দৈবী প্রকৃতি লাভ করবার জন্য অপ্রতিহত সংগ্রাম চালিয়ে যেতে নির্দেশ দেয়। অপর সব জাতি ও কৃষ্টি মানুষকে ঘোষণা করেছে বহিঃপ্রকৃতির নিয়ামক বা চালক হিসাবে। উদাহরণস্বরূপ আমরা গ্রীক চিন্তাধারায় দেখি যে, মানুষ তার শক্তি দিয়ে বাইরের বাধাবিঘ্ন জয় ক'রে প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার করেছে এবং প্রয়োজন হ'লে শক্তিমান মানব অপর মানুষের উপরেও ক্ষমতা প্রয়োগ করেছে। এই চিন্তাধারার প্রধান ত্রুটি হচ্ছে উহা সকল মানবকে একই সঙ্গে উন্নতির পথে চালিয়ে নিয়ে যায় না। বহিঃপ্রকৃতির নিয়ামক যে মানুষ, তার উপরেই এই দর্শন প্রতিষ্ঠিত। বাইরের পরিবেশের উপর আধিপত্য বিস্তার করার ফলে আসে অহমিকা, আর উহাকে শোধরাবার বা জয় করার কোন উপায় ঐ দর্শন দেখায় না। মানুষ তার পরিবেশের নিয়ামক—এটা জ্যামিতিক স্বতঃসিদ্ধ। এই প্রকার মানবিক উৎকর্ষের চরম সীমায় পাশ্চাত্য উঠেছে; আর আমাদের এই তমসাচ্ছন্ন ভারতের পক্ষে ব্যাপকভাবে এই ধরনের শিক্ষা আজ বড় দরকার। কিন্তু মনুষ্যজীবনে উহাই শেষ স্তর নয় এবং ভারতীয় দর্শন উহাকে মনুষ্যানুভূতির চরম ব'লে স্বীকার করে না। মানুষকে এই ক্ষুদ্র অহমিকার গণ্ডী ভেঙ্গে সেই বিশ্বাত্মৈক্যানুভূতিকে নিজের ভিতর অনুভব করতে হবে। মানুষ যখন এই একাত্মানুভূতি লাভ করে তখন সে দেখে যে এ জগতে কেউ কারোর নিয়ামক নয়, সে সকলের সঙ্গে মিশে রয়েছে এক হয়ে, অভিন্নভাবে।

এক কথায় সে নিজের ভিতর আবিষ্কার করে বিশ্বমানবকে; সে দেখে বাইরের ও ভিতরের সকল বস্তুকে এক এবং সে অনুভব করে জীবজগতের সহিত নিজের হৃদয়তন্ত্রীর যোগসূত্র। আমাদের মতো সাধারণ নরনারীর ভিতর থেকে আসবে সেই বিশ্বমানবের মুক্তি—আর ইহাই হচ্ছে উপনিষদের লক্ষ্য। সেই হেতু আজকের এই বিজ্ঞানমদে মত্ত বিংশ শতাব্দীতেও উপনিষদের প্রতি সকলের রয়েছে একটা আকর্ষণ ও প্রয়োজনবোধ। আজিকার সকল প্রগতিশীল চিন্তার বিষয়বস্তু হচ্ছে বিশ্বমানবিকতা; সেইহেতু এই বর্তমান জগতের সকল প্রগতিশীল চিন্তার পুরোভাগে রয়েছে উপনিষৎ। বর্তমান পৃথিবীর স্বার্থান্ধ মানুষ ডুবে রয়েছে তাদের জাতিগত, সমাজগত, সম্প্রদায়গত প্রভৃতি ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে; তাই ঐগুলি থেকে চাই দ্রুত মুক্তি। স্বামী বিবেকানন্দ আধুনিক যুগের মানুষের সামনে বেদান্তের এই মহামহিমময়ী বাণী তুলে ধরেছেন আর দেখিয়ে দিয়েছেন যে, এই বাণী আধুনিক সমাজকে কল্যাণের স্পর্শে সঞ্জীবিত ক'রে তুলতে পারে। কর্মজীবনে এই দুরূহ দর্শনের বাস্তব প্রয়োগও তিনি শিক্ষা দিয়েছেন। সুতরাং আজিকার দিনে উপনিষৎ ও গীতা প্রভৃতি অমর শাস্ত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ অধ্যয়নের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। একথা সুনিশ্চিত যে, এই প্রাচীন বেদান্ত আজকের মোহগ্রস্ত নরনারীকে কল্যাণের পথে টেনে নিয়ে যাবেই যাবে।

নিবেদিতার সমাজ-চিন্তা

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত

পরিবার, সমাজ ও ভারতীয় নারী

ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থায় সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব-পূর্ণ স্থান অধিকার ক'রে আছে 'পরিবার'-নামক প্রতিষ্ঠানটি। পরিবার এমন একটি প্রতিষ্ঠান যার উপর ভিত্তি ক'রে সব দেশেরই সমাজব্যবস্থা দাঁড়িয়ে থাকে। পরিবারের মূল্য নির্দেশ ক'রে প্রখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ্ Ogburn ও Nimkoff বলেছেন: "...the home is the place where the personal and social virtues are developed." পারিবারিক জীবনে ব্যক্তিগত ও সামাজিক গুণসকলের বিকাশ ঘটে। পরিবার সেদিক দিয়ে একটি শিক্ষালয়স্বরূপ।

একদা ভারতে এই প্রতিষ্ঠানটি অতি সুদৃঢ় ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল। এ তথ্যটি অতি সুন্দররূপে উদ্ঘাটিত করতে গিয়ে নিবেদিতা বলেছেন: "The family life was looked upon as the permanent unit of society and the Hindu life was its most perfect embodiment."[১] অর্থাৎ পারিবারিক জীবন হিন্দু-সমাজের স্থায়ী প্রতিষ্ঠান ব'লে পরিগণিত হ'ত আর হিন্দু-জীবনেই এর সর্বাঙ্গ-সুন্দর বিকাশ ঘটেছিল। ভারতের পরিবার সেদিক দিয়ে সারা পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ উৎকর্ষ লাভ ক'রে জগতের দৃষ্টান্তস্থল হ'তে পেরেছিল।

পূর্বতন ভারতীয় পরিবারের গঠন আজকের মতো সরল ছিল না—অর্থাৎ শুধু স্বামী-স্ত্রী এবং দু-একটি সন্তান নিয়ে গঠিত ছিল না। তার পরিবর্তে ছিল সুবৃহৎ যৌথ পরিবার যা বহু বহু আত্মীয়-গোষ্ঠীর সমবায়ে গঠিত। এইসকল পরিবারে বয়োবৃদ্ধদের স্থান অতি সম্মানের ছিল। ভারতের সমাজবাদী ও সমন্বয়ী সভ্যতার এই বিশেষ গুণটি ভগিনী নিবেদিতার দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল। তাঁর মতে "This is one of the most beautiful features of the communal civilisation."[২] যেখানে পাশ্চাত্য পারিবারিক জীবনে বয়োবৃদ্ধদের কোন স্থান নেই, তাঁদের অসহায় জীবন একাকিত্বের অভিশাপে অভিশপ্ত, সেখানে এদেশে পরিবারে তাঁরা যে শুধু স্থান লাভ করেছেন তা নয়, তাঁদের জীবনের অভিজ্ঞতা পরিবারের বহুমূল্য সম্পদ ব'লে পরিগণিত হ'ত। তাঁরা পরিবারে অপরিহার্য ব'লে বিবেচিত হ'তেন এবং বিপুল সম্মান ও মর্যাদা তাঁদের দেওয়া হ'ত। শুধু বয়োবৃদ্ধগণই নয়, পরিবারে সকলেই স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হ'ত। এমনকি দাসদাসীগণও এ মর্যাদা লাভ করত। দাসদাসীগণ কতটা মর্যাদা লাভ করত তা নিবেদিতার নিম্নলিখিত বর্ণনায় সুপরিস্ফুট: "এসব পুরানো দাসী অনেক সময় পরিবারভুক্ত হ'য়ে ঠাকুরমা-দিদিমার স্থান অধিকার করে এবং জীবনের শেষদিনটি পর্যন্ত বাড়ীর মনিবদের তিরস্কার এবং ছেলে-মেয়েদের আদর দিয়ে নষ্ট করবার দাবী ক'রে থাকে। এরূপ প্রায়ই ঘটে থাকে—অতি

---

১ C. W.—Vol. II, P. 508

২ The Civic and National Ideals—Chapter on 'Indian Unity'.

সাধারণ ব্যাপার। এইসব ক্ষেত্রে পরিবারে দাসীদের হীনাবস্থা অপরিচিতদের চোখে সহজে ধরা পড়ে না। বাড়ীর কর্ত্রী দাসীর আহার্য স্বহস্তে প্রস্তুত ও পরিবেশন ক'রে থাকেন। পরিণত বয়সে এরকম কোন দাসীর মৃত্যু হ'লে যাদের সে আপনার জন ব'লে গ্রহণ করেছিল সেই প্রভু-গৃহের সকলে তার রক্ত-সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজনের মতোই তার জন্য শোক ক'রে থাকে।"[৩]

এরূপ যৌথ পরিবার একটি বহুমুখী প্রতিষ্ঠান, নানাবিধ সামাজিক কর্ম তার দ্বারা সম্পন্ন হয়। পাশ্চাত্য ক্ষুদ্র পরিবারের একটিমাত্র ভূমিকা সন্তানের লালন-পালন। কিন্তু যৌথ পরিবার আরও যেসকল কার্য সম্পাদন ক'রে থাকে তা Ogburn ও Nimkoff-এর ভাষায় নিম্নোক্তরূপ: "*In addition to the functions mentioned* above, the family may provide economic services for its members, it may help to educate them, give them religious guidance, furnish recreation, protect them against dangers of various sorts, and provide affection and social intercourse."[৪] অর্থাৎ পরিবার তার সদস্যদের অর্থনৈতিক সহায়তা করতে পারে, তাদের শিক্ষালয় হিসাবে কাজ করতে পারে, ধর্মীয় নির্দেশনা দিতে পারে, অবসর-বিনোদনের স্থল হিসাবে কাজ করতে পারে, নানাবিধ আপদ-বিপদ হ'তে রক্ষা করতে পারে এবং প্রীতিমূলক সামাজিক আদান-প্রদানের মাধ্যম হ'তে পারে। ভারতে পরিবার যেভাবে গঠিত তাতে আর্থিক, শিক্ষামূলক, সামাজিক, নিরাপত্তাবিষয়ক নানা-ক্ষেত্রে তার বহুল উপযোগিতা সাধিত হয়েছে।

কিন্তু এ-সকল ভূমিকাই সব নয়। ভগিনী নিবেদিতার বিশ্লেষণে দেখা যায় ভারতীয় পরিবারের সর্বশ্রেষ্ঠ ভূমিকা হয়েছিল ভারতে ঋষি-কল্পিত এক অতি উচ্চ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনাদর্শকে বাস্তব ক'রে তোলার ক্ষেত্রে। এ ক্ষেত্রে ভারতীয় পরিবার অতুলনীয় দক্ষতা প্রদর্শন করেছিল। ঠিক এই দৃষ্টিকোণ থেকে অপর কোনও সমাজতত্ত্ববিদ্ পরিবার-প্রথাকে যাচাই ক'রে দেখেননি। ভগিনী নিবেদিতার এদিক থেকে সমাজতত্ত্বে অবদান নূতন পথ-প্রদর্শক এবং সেজন্যই স্মরণীয়। সামাজিক প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা-বিচারের মানদণ্ড নিবেদিতার ক্ষেত্রে তাই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হয়েছে। এই মানদণ্ডটি নিবেদিতার সম্পূর্ণ নিজের সৃষ্টি, এবং যুক্তি-বিচার প্রয়োগ করলে দেখা যাবে এটি একটি অনন্য সৃষ্টি। সেজন্য ভারত সম্বন্ধে তাঁর সমীক্ষান্তে আবিষ্কার মামুলী নয়, মৌলিক। দুঃখের বিষয়, পরবর্তী সমাজতত্ত্ববিদেরা কেউই নিবেদিতাকে অনুসরণ করলেন না। এমনকি ভারতীয় সমাজতত্ত্ববিদেরাও পাশ্চাত্যকে হুবহু নকল করেন। পাশ্চাত্য টেকনিক সমাজ-জীবনের বাহ্য আস্তরণ স্পর্শ করে মাত্র, তাকে ভেদ ক'রে সত্য আবিষ্কার করতে প্রযুক্ত নয়। নিবেদিতা এ বিষয়ে যে নূতন পথের পথিকৃৎ, তা অনুসরণ করলে আর এক জগতের পরিচয় পাওয়া যায়। এ পথ ছেড়ে আমরা যে কেবল নকলনবিশী করছি এ বড়ই পরিতাপের বিষয়।

পরিবার ও গৃহাশ্রম: নিবেদিতা সুস্পষ্ট দেখিয়েছেন যে, এই প্রাচ্য ভূখণ্ডে গৃহ একটি আশ্রম হয়ে উঠেছে, যেখানে পরিবারের প্রতিটি সদস্য আত্মসুখ নয়, অন্যের সুখ ও কল্যাণের জন্য সকল কর্ম অনুষ্ঠান ক'রে থাকে। গার্হস্থ্য

---

৩ Studies from an Eastern Home গ্রন্থ হ'তে 'ভারত-তীর্থে নিবেদিতা' গ্রন্থে সংকলিত অনুবাদ —পৃঃ ১৩৪

৪ Ogburn and Nimkoff—Handbook of Sociology—p. 249

জীবনও সন্ন্যাসেরই মতো একটি তপশ্চরণ বা ধর্মবিধি-পালন এবং পরিবারের জীবনকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হলেন ঈশ্বর। বিষয়টি উদ্ঘাটন ক'রে নিবেদিতা বলছেন, "All the forms and tasks of the Indian home—the rising at dawn, bathing, preparation, and eating of food—were sacramental."[৫] ভারতীয় গৃহের সকল কর্ম, দৈনন্দিন অনুষ্ঠেয় সকল অবশ্যকরণীয়—স্নান, ভোজন, আহার্য-প্রস্তুতি প্রভৃতি সাধারণ ও তুচ্ছ, পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে একান্ত ব্যক্তিগত কর্মও যেন আচাররূপ মনোহর স্তোত্রগান, পরম পুণ্যকর্ম। প্রশ্ন করা যেতে পারে দৈনন্দিন অতি আবশ্যকীয় সাধারণ কর্মগুলিকে পুণ্যকর্মে পরিণত করার তাৎপর্য কি? নিবেদিতার নিম্নলিখিত উক্তির মধ্যে এ তাৎপর্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়—"ভারতের পরিবারমাত্রই আপনাকে সর্বদা আচাররূপ মনোহর স্তোত্রগানে রত বলিয়া মনে করে। তাহার নিকট গৃহস্থালীর প্রত্যেক খুঁটিনাটি ব্যাপার ও দৈহিক শুচিতার অভ্যাসও যেন অনির্বচনীয়, মূল্যবান ও পবিত্র; উহা যেন জাতির একটি চিরন্তন রত্ন, সুদূর অতীত হইতে পুরুষানুক্রমে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে, যেন উহাকে নিখুঁত অবস্থায় ভাবী বংশধরদিগের নিকট সমর্পণ করিয়া যাইতে হইবে।"[৬] ভারতের সভ্যতা প্রধানতঃ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সভ্যতা। তদনুযায়ী ভারতবাসীর বিশ্বাস—কর্মই উপাসনা, গৃহই দেবালয় আর পারিবারিক জীবনও পুণ্যাশ্রম। সেজন্য প্রতিটি তুচ্ছ কর্মকেও পুণ্যকর্মে পরিণত করা হয়েছে। এবং এই সকল কর্মকে নিখুঁত আচারে পরিণত ক'রে উত্তরবংশীয়দের হাতে তুলে দেবার উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। যতটা নিখুঁত-ভাবে এই দৃষ্টিভঙ্গি, আচার-অনুষ্ঠান পরবর্তী-কালের হাতে তুলে দেওয়া যাবে, ঠিক ততটাই এই নৈতিক সভ্যতার কালজয়ী হবার সম্ভাবনা। এ বিষয়ে ভারতের কৃতিত্ব অসাধারণ ব'লে নিবেদিতা দাবি করেছেন।

নারীর ভূমিকা ও পরিবার: বংশ-পরম্পরায় উত্তরবংশীয়দের হাতে এই জাতীয় সংস্কৃতি তুলে দেবার পক্ষে ভারতীয় পরিবার একটি আশ্চর্য শিক্ষালয়ের কাজ ক'রে এসেছে। এদিক দিয়ে ভারতীয় পরিবার জাতীয় জীবনে তার চরম উপযোগিতা প্রদর্শন করেছে। নিবেদিতার মতে এজন্যই—"পাশ্চাত্য জগৎ যে সংহতি ও সামাজিক ঐক্য হারিয়ে ফেলেছে প্রাচ্য আজও তা অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছে।" ভারতে এই সংহতি ও ঐক্য-রক্ষার কাজে প্রধান সহায় হয়েছে এ দেশের নারীগণ। নিবেদিতার মতে "সকল জাতিই তার পবিত্রতা ও শক্তি—এই দুই সম্পদরক্ষার দায়িত্ব নারীর উপর ন্যস্ত ক'রে এসেছে, পুরুষের উপর নয়। পুরুষ হয়তো কোথাও কোথাও আচার্যরূপে পরিগণিত হয়ে এসেছেন, কিন্তু অধিকাংশকেই জীবিকার্জনের জন্য পরিশ্রম ক'রে দিন কাটাতে হয়। গৃহেই তাঁরা অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন, তাঁদের শ্রদ্ধা অন্তর্দৃষ্টি ও মহত্ত্বের উৎস যে গৃহ-পরিবেশ তা নারীর তপস্যারই সৃষ্টি।"[৭] সুতরাং দেখা যাচ্ছে জগতের মহত্তম আচার্যগণও নারীরই সৃষ্টি। খ্রীষ্ট, শঙ্কর, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ প্রভৃতি মহাপুরুষদের জীবনে তাঁদের জননীর প্রভাব অপরিসীম—একথা সুবিদিত। নারী যা

[৫] C. W. Vol. II, P. 508

[৬] "The Master As I Saw Him." গ্রন্থের অংশবিশেষ, অনুবাদ—'ভারত-তীর্থে নিবেদিতা'—পৃঃ ৫২

[৭] Open Letter to Hindu Women—C. W. Vol. II. অনুবাদ লেখিকাকৃত।

হয়ে শুধু সন্তানের দেহমনই গড়ে না, তার হাতে সে তুলে দেয় পূর্বতন সংস্কৃতির দীপশিখা। দীপ হ'তে যেমন দীপ জ্বলে ওঠে, ঠিক তেমনি ক'রেই মায়ের মন হ'তে সন্তানের মনে প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে প্রাণবান সংস্কৃতির আলো। এইভাবেই যুগের পর যুগ ধরে বংশপরম্পরায় অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয় জাতীয় সংস্কৃতি। জাতীয় সংস্কৃতিকে প্রাণবান ও বেগবান রাখা নারী তার অন্যতম পবিত্র দায় হিসাবে বহন ক'রে এসেছে পৃথিবীর সবত্রই। কিন্তু এই দায়-পালনের ক্ষেত্রে ভারতীয় নারী যে দক্ষতা প্রদর্শন ক'রে এসেছে তা সর্বতোভাবে অতুলনীয়। সুমহান ত্যাগ-সাধনায়, অপার কৃচ্ছ্রতায়, তপস্যায় নিজের জীবনে সুপ্রাচীন উচ্চ জাতীয় জীবনাদর্শকে জীবন্ত ক'রে রেখেছে ভারতীয় নারী; সহস্র সহস্র বৎসর ধরে তাকে বেগবান রেখেছে। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে ভারতের সমস্ত অতীত মহিমা ও গরিমা ভারতীয় নারীর তপস্যা ও সাধনার ফলশ্রুতি। এই বিশাল উপমহাদেশের সুপ্রাচীন ও সুমহান জাতীয় জীবনে ভারতীয় নারীগণের এই বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা উদ্ঘাটিত ক'রে নিবেদিতা বলছেন, "সীতা ভারতের নারী ছিলেন। সাবিত্রীও তাই। কঠোর তপস্যার দ্বারা মহাদেবকে লাভ করেছিলেন যে উমা, তিনিই ভারতীয় নারীর যথার্থ প্রতিমূর্তি। ... অসংখ্য নারী তপস্বিনীর মতো শান্ত নীরব জীবন যাপন ক'রে গিয়েছেন। বিশ্বস্ত থাকাই ছিল তাঁদের গৌরব, পূর্ণতা লাভ করাই ছিল তাঁদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা। ঐ সকল নারীর দ্বারাই ধর্মের সংরক্ষণ ও সমৃদ্ধি ঘটেছে, বহির্জগতে সংগ্রামের দ্বারা নয়।"[৮]

ভারতীয় নারীর সামাজিক অধিকার ঃ সমাজ-জীবনে ভারতীয় নারীর স্থান নিয়ে পাশ্চাত্ত্যে ও এ দেশের ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচুর বিভ্রান্তি নিবেদিতার সময়ে ছিল, আজও আছে। এদের বিভ্রান্তির একটি কারণ অবশ্য এই যে, আক্ষরিক শিক্ষাকেই এই সকল শ্রেণী একমাত্র শিক্ষা ব'লে মনে ক'রে থাকেন আর স্বাধীনতার একমাত্র মানদণ্ড মনে করেন আর্থিক স্বাধীনতা। সেজন্য গৃহ-জীবনে আবদ্ধ তথাকথিত শিক্ষা হ'তে বঞ্চিত ভারতীয় নারীর সামাজিক স্থান তাদের চোখে অতি হীন ব'লেই প্রতিভাত। কিন্তু নিবেদিতার মতে ঐরূপ দৃষ্টিভঙ্গী এক্ষেত্রে মোটেই বিচারের মাপকাঠি হ'তে পারে না। তাঁর মতে ভারতীয় নারীর মর্যাদা উপলব্ধি করতে হলে একথা অবশ্য স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, "ভারতীয় নারী নৈতিক সভ্যতার অনিবার্য পরিণাম।" এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলেই তার অপার সহিষ্ণুতা, অসাধারণ আত্মবিলুপ্তি, নিঃস্বার্থ সেবাপরায়ণতা, তার কঠোর কৃচ্ছ্রতা-পালন, কঠিন অবরোধ, তার অত্যাজ্য সতীধর্ম, তার বৈধব্যের নির্মম কঠিন শুচিতার আদর্শ—এ সকলেরই অর্থ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। নিবেদিতা এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, "আদর্শের দিক থেকে ভারতীয় নারীর জীবন ভারতভূমির কাব্যস্বরূপ।" ত্যাগে, তপস্যায়, নিষ্ঠায়, পবিত্রতায় ভারতীয় নারীর মর্যাদা নির্দেশিত; ভোগে নয়, সম্পদে নয়, ঐশ্বর্যে নয়, ক্ষমতায় নয়। স্বামী বিবেকানন্দের সমীক্ষায় ভারতের জাতীয় আদর্শ দু'টি—"Renunciation and Service"—ত্যাগ ও সেবা। এই আদর্শের শ্রেষ্ঠ ও মধুরতম বিকাশ ঘটেছে নারীর জীবনে। পরিবারের চতুঃসীমার মধ্যেই জীবনের এই মহিমা নারীকে

---

৮ ভারত-তীর্থে নিবেদিতা—পৃঃ ৩০৭

অবলম্বন ক'রে উত্তুঙ্গ শিখরে পৌঁছেছে। পারিবারিক জীবন তার ফলে মধুর হয়ে উঠেছে, তার ভিত্তিভূমি লৌহদৃঢ় হয়েছে, পরিবার এক উচ্চতম জীবনাদর্শের অপূর্ব শিক্ষালয়ে পরিণত হ'তে পেরেছে এবং সমগ্র সমাজ-জীবনে ও জন-জীবনে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছে। মানবচরিত্র এরই ফলশ্রুতিতে তার চরম উৎকর্ষের পর্যায়ে পৌঁছুতে পেরেছে। নিবেদিতার সমীক্ষায় তাই: "ভারতবর্ষই সেই দেশ যেখানে অন্তঃপুর সরলতায় ভরা, যেখানে পারিবারিক জীবনের আনন্দ সর্বাধিক, যেখানে নারীগণ নিঃস্বার্থ- ও অনলস-ভাবে বিন্দুমাত্র অভিযোগ না ক'রে প্রতিদিন সূর্যোদয় হ'তে শিশিরস্নিগ্ধ সূর্যাস্তকাল পর্যন্ত প্রিয়জনের সেবায় নিযুক্ত থাকেন। এই দেশেই মাতা ও মাতামহী-পিতামহীগণ পরিবারস্থ সকলের প্রয়োজনের প্রতি পূর্ব হ'তে লক্ষ্য রেখে এবং নিজের সুখের প্রতি দৃষ্টিপাত না ক'রে তাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান ক'রে থাকেন এবং এই আত্মসুখে উদাসীনতা ও নিঃস্বার্থপরতাই ভারতীয় নারীকে সর্বোচ্চ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছে।" এইজন্য ভারতের সমাজের দৃঢ়তম ভিত্তি তার নারীগণ। সেদিক দিয়ে ভারতীয় সমাজ-জীবনে নারীর ভূমিকা পুরুষের চেয়েও বৃহত্তর। স্বার্থসিদ্ধি বা ভোগের অধিকার তার নয়, ত্যাগের অধিকারে, সেবার অধিকারে সমাজে সে অতুলনীয় স্থান ক'রে নিয়েছে। এই কারণেই নিবেদিতার 'ভারতীয় জীবন-ধারা'-আলোচনার অনন্য গ্রন্থ The Web of Indian Life মুখ্যতঃ নারীজীবনের—তার শিক্ষা, তার আচার-আচরণ, কর্ম ও সাধনার আলোচনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভারতীয় নারীর শিক্ষা: ভারতীয় নারী শিক্ষিতা নয় একথা নিবেদিতা তাঁর সমীক্ষায় স্বীকার করেননি, কারণ তাঁর শিক্ষার সংজ্ঞানুসারে আক্ষরিক শিক্ষাই শিক্ষা নয়। যে-শিক্ষার দ্বারা চরিত্রের বিকাশ ঘটে, জ্ঞানের উপলব্ধি হয়, হৃদয়ের উন্মেষ হয়, সর্বব্যাপী সহানুভূতি লাভ হয়, চিত্তের প্রসারতা ঘটে সেই শিক্ষাই শিক্ষা। যে-জ্ঞান সকল জ্ঞানের আকর, যা লাভ করলে হৃদয়ের সব গ্রন্থির মোচন হয়, সব সংশয় দূর হয়, সেই জ্ঞানই জ্ঞান। প্রকৃত শিক্ষা মানুষকে সেই জ্ঞান-অর্জনে সহায়তা করে। সেজন্যই প্রাচীন ভারতে বলা হয়েছিল—"সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে", বলা হয়েছিল "বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতম্"—'যার দ্বারা মুক্তি লাভ হয়, তা-ই বিদ্যা', 'বিদ্যা দ্বারা মানুষের অমৃতত্ব লাভ হয়।' এই সংজ্ঞানুসারে ভারতীয় নারীগণ অশিক্ষিত ছিলেন না। নিবেদিতা ভারতীয় নারীর শিক্ষার মান সম্বন্ধে প্রভূত আলোকপাত করেছেন তাঁর ভারতীয় জীবনধারার সমীক্ষায়। নিম্নোক্ত বিশ্লেষণটি এ বিষয়ে প্রণিধানযোগ্য: "আদমসুমারি-গ্রহণ এবং তালিকা-প্রস্তুতির যুগে মনে করা হয় আক্ষরিক জ্ঞান ব্যতীত কোন শিক্ষা হয় না; যেন ষ্ট্রাণ্ড পত্রিকা পাঠ করা শেক্সপীয়ার-জননী হওয়া অপেক্ষা মহত্তর। এরূপ যুগে হিন্দু রমণীর বর্তমান শিক্ষা (তদানীন্তন প্রচলিত শিক্ষা) সম্বন্ধে আলোচনা করা কঠিন। তথাপি যদি শিক্ষা বলতে অত্যন্ত জটিল কোনও জাতীয় জীবনধারায় সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা বোঝায় তাহলে তার কিছু শিক্ষা আছে, কারণ একজন সাধারণ পত্নী একাধারে পাচিকা অথবা গোশালার কর্তৃত্ব থেকে শুরু ক'রে খাদ্যবিভাগের প্রধানা এবং শতাধিক ব্যক্তির তত্ত্বাবধায়িকা বা প্রশাসনিক-নেত্রীরূপে কাজ করতে পারেন। যদি শিক্ষা বলতে ভাষা কাব্য এবং লোকসাহিত্যের জ্ঞান, তার সঙ্গে যুক্তি ও কল্পনাশক্তির প্রকাশ বোঝায়

তাহলে এই শিক্ষা তাঁর আছে—এমন কি সেই শিক্ষার সাহায্যে তিনি সংস্কৃত গ্রন্থ আবৃত্তি করতে ও বুঝতে পারেন। অধিকন্তু যে সকল স্ত্রীলোক লিখতে বা পড়তে অক্ষম তাঁরাও প্রাচীন সংস্কৃতির মর্ম গভীরভাবে এবং অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে হৃদয়ঙ্গম ক'রে থাকেন। মায়াবাদের দুরূহ তত্ত্ব এমনকি পাশ্চাত্য মনীষীদের নিকটও বিভ্রান্তিকর। কিন্তু তাঁদের (ভারতীয় নারীগণের) নিকট বিষয়টি কঠিন নয়। 'নির্বাণ' কথাটির সূক্ষ্মতম অর্থ তাঁরা বুঝতে পারতেন।"[৯]

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নারীর শিক্ষার লক্ষ্য সম্পূর্ণ পৃথক। পাশ্চাত্য নারীর শিক্ষার লক্ষ্যের ফলশ্রুতি নিবেদিতার ভাষায়—"পাশ্চাত্য নারীর আদর্শ হয়ে উঠেছে ভোগ করা, দখল করা এবং আধিপত্য করা।" ভারতীয় নারীর জীবনেও তাঁর জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য সম্পূর্ণ ফলপ্রদ হয়েছে—"They are the warp of the web of national iife, mind-stuff and thought-stuff of every household routine।" তাঁরা সম্পূর্ণ পৃথক ধাতুতে গড়ে উঠেছেন—"Hindu woman's life seeks objects not within the sphere of things. Gravity, recollectedness, withdrawnness and a stern self-mastery—such qualities as these make up the whole that we know as religious. And for my own part I read in the demeanour of every Indian woman the secret that makes her country the mother of religion."[১০] অর্থাৎ "ভারতীয় নারীজীবন যা কামনা করে তা বস্তুগত নয়। গাম্ভীর্য, ধ্যানমগ্নতা, অন্তর্মুখতা এবং কঠিন আত্মনিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতাই ধর্মপ্রবণতার সব। এদিক দিয়ে ভারতীয় নারীর মুখদর্পণে আমি প্রতিফলিত দেখতে পাই ভারত কি ক'রে ধর্মসমূহের জননীস্বরূপা হ'ল—তারই গোপন রহস্য।" যে শিক্ষার ফলে ভারতীয় নারী এই সকল গুণের অধিকারিণী তা প্রধানতঃ ধর্মশিক্ষা। এই ধর্ম-শিক্ষার ফলেই ভারতীয় নারীর আদর্শ হয়েছে ত্যাগ, রোমান্স (romance) নয়। ভারতীয় নারীর সম্বন্ধে নিবেদিতার সমীক্ষান্তে সিদ্ধান্ত তাই: "ঠিক ঠিক বিচার ক'রে দেখলে দেখা যাবে ভারতের গৃহ একটি ধর্মবিহারতুল্য, আর হিন্দুনারীগণ ত্যাগব্রতধারিণীর তুল্য। ঠিক ঠিক ত্যাগী সন্ন্যাসিনীর মতোই ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে তাঁরা মাতা ও স্ত্রীর কর্তব্যসকল পালন করেন। এ নিষ্ঠা সেই নিষ্ঠা যার দ্বারা পাশ্চাত্যে মঠধারিণী সন্ন্যাসিনীগণ দেবী ম্যাডোনার উপাসনা ক'রে থাকেন।"[১১]

(ক্রমশঃ)

৯ ভারত-তীর্থে নিবেদিতা—The Web of Indian Life-এর অংশবিশেষ অনুবাদ। পৃঃ ১৯৫

১০ C. W.—Vol. II, p. 474

১১ C. W.—Vol. II.—Family Life and Nationality.

মানবের স্বরূপচেতনা ও মূল্যবোধ

স্বামী অমৃতত্বানন্দ

মানুষ জানতে চায়। নিজেকে ও তার পারিপার্শ্বিককে সম্পূর্ণরূপে জানতে চাওয়ার অদম্য স্পৃহাই মানুষকে করেছে মহীয়ান্। জ্ঞান এক প্রচণ্ড শক্তি। না জানলে জয় করা যায় না। তাই যেমনি সে জানছে তার পরিবেশকে, তেমনি সে জয় করছে; নিজের সুবিধায় প্রকৃতিকে চালিত করছে।

না জানলে ভালবাসা যায় না; ভাল না বাসলে আপন করাও যায় না। জানার তাগিদের পাশে পাশে চলে মানবের হৃদয়ের দুষ্পূরণীয় আপন-করার বৃত্তিটা। যেমন তার জ্ঞানের তেমনি তার প্রেমের দিক। জ্ঞান যেমন দুর্বার শক্তি, প্রেম তেমনি অনন্ত শক্তি। মানুষের এই দুই সংকীর্ণতা-বিনাশী মহাশক্তি। এই দুই-এর বিকাশেই মানবতার বিকাশ। এই দুই-এর উপরই নির্ভর করে মানবের মান-বিবেক।

'মান'-চেতনা প্রত্যয়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়। কোন যুগের সভ্যতা, সমাজ-চেতনা, কৃষ্টির বিকাশ ও মূল্যবোধ নির্ভর করে সেই-যুগের মানুষের স্বীয় স্বরূপ ও পরিবেশের জ্ঞানের উপর। গ্রীক দার্শনিক সক্রেতিস প্রশ্ন করেছিলেন: কি জানলে সব জানা হয়? গ্রীকগণ ঠিক করেছিলেন: মানুষকে জানাই সর্ব শ্রেষ্ঠ জানা। কারণ মানুষকে কেন্দ্র ক'রেই রাজনীতি, সমাজনীতি, বিজ্ঞান, শিল্পকলা ইত্যাদি যাবতীয় জ্ঞানের বিকাশ হয়ে থাকে।

হেসে উঠলেন এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। বললেন: তোমরা কি মূর্খ! ঈশ্বরকে না জানলে কি মানুষকে জানা যায়? পূর্ণকে ছেড়ে কি অংশকে জানা যায়? ঈশ্বরকে জানলেই সব জানা যায়।

ঈশ্বর প্রথম অবস্থায় একটু দূরের। কাছের যিনি তিনি মানব। গ্রীকগণ মন্দ বলেনি। কিন্তু মানবের স্বরূপনির্ণয় কি চারটিখানি কথা! তবু তার স্বরূপজ্ঞানের উপরই নির্ভর করে তার সভ্যতার রূপ, সংস্কৃতির কাঠামো, মূল্যমানের অভিজ্ঞান।

যে-যুগের মানুষের স্বরূপ সম্বন্ধে ধারণা যে-ধরনের, সে-ধরনেই মূল্যবোধ হয় মানব-সভ্যতার। জ্ঞানই মানুষের পারস্পরিক ব্যবহারের, তার সমাজধারার বিশিষ্ট রূপরেখার নিয়ামক। জ্ঞান অমূল্য। অর্থ দিয়ে, প্রয়োজনের বিচার দিয়ে জ্ঞানের মূল্যমান হয় না। জ্ঞান-লাভই জ্ঞানের ফল—জ্ঞানেই মানুষের মান।

যখন জানি, মানুষটা এক ধরনের পশু, তখন মনুষ্যেতর প্রাণীর সাথে তার ব্যবধান তুলে নিয়ে ব্যবহারকালে মানবে পশুতে যে পার্থক্য তা তুলেনি। যখন তাকে জ্ঞানময়, চেতনাময় বৈশিষ্ট্যের মহনীয়তায় সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ ব'লে জানি, তখন কাউকে হেলাফেলা করতে পারিনে। তাইত মানুষে মানুষে আমাদের ব্যবহার এত বিচিত্র!

আমাদের জ্ঞান কামনাকে জাগ্রত করে; আমাদের স্বরূপের ধারণাই আবার সে-জাগ্রত কামনাকে তীক্ষ্ণ ক'রে তুলে। কামনা অবশেষে কর্মের আবর্তে আমাদের পুরুষার্থ-সাধনে নিযুক্ত করে। যেমন ভাবে নিজেকে জানি তেমন ধারায় কাম্য পদার্থ চাই। যখন নিজেকে

অখণ্ড পূর্ণ ব'লে জানি, তখন জাগতিক কিছু চাইনে। নিজেকে যখন মন বুদ্ধি ব'লে জানি তখন জ্ঞান-আহরণ-আলোচনায় ছুটি—যখন নিজেকে দেহ ব'লে জানি তখন দেহজাত আনন্দের পিছনে ছুটি।

এ-ভাবে জ্ঞান-ইচ্ছা-ক্রিয়া এই তিনের সাহায্যে মানুষ জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। বেঁচে থাকার পিছনে যদি থাকে পূর্ণতা বা নিজেকে জানার তাগিদ তবেই সার্থক হয় বাঁচা। নতুবা কেবল বাঁচার জন্য সংগ্রামের প্রয়াস নিরর্থক।

কিন্তু দেখা যায় বাঁচার মধ্যে একটা সার্থকতার অজানিত অভীপ্সা কেবলই মানুষকে নাড়া দেয়। সে এগিয়ে চলে। পূর্ণতার একটু ইঙ্গিত, একটা অস্পষ্ট ধারণা তাকে কোথাও কোন অবস্থাতেই থেমে থাকতে দেয় না।

যে-যুগে জগৎকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বিজ্ঞান মানুষের চিরন্তন এই 'হয়ে-ওঠার' তাগিদকে অস্বীকার ক'রে বল্লে: জগতের ক্ষেত্রে কেবল অণুই সত্য। জগৎটা কতকগুলি মৌলিক পদার্থের অণু দিয়ে—তাদের পারস্পরিক মিশ্রণের ফলেই গঠিত; প্রাণিসৃষ্টি বিশ্ব-বিধানের ক্ষেত্রে আকস্মিক ঘটনামাত্র। জীবের ক্ষেত্রে শরীরই সত্য। শরীরাতীত সত্তার ধারণা ভাবালুতা মাত্র। সে-যুগে মানুষের স্বরূপ নির্ধারিত হ'ল জৈব-অজৈব রাসায়নিক জটিল প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতিরূপে। তাই মানুষের জীবন-দর্শনও গেল পাল্টে। ভাবল, জীবনটা তো জড়-বস্তু—চৈতন্যের বিকাশ তো আকস্মিক। এ-জীবনের পশ্চাতে ইন্দ্রিয়াতীত সত্তা কিছু নেই। কি হবে বিনয়ে-প্রীতিতে, স্নেহ-মমতায়! কি হবে আর মানব-জীবনের উচ্চতর জ্ঞানান্বেষণে! জ্ঞান, দর্শন, কাব্য, শিল্প, সবার মূল্য যদি বাঁচার তাগিদে না হ'ল তবে তার যৌক্তিক, বৌদ্ধিক বা অনুভবগত উত্তুঙ্গতা যতই থাক না কেন—আমার কি এল গেল? নৈতিক জীবন, ধর্মালোচনা সবই অর্থহীন।

মানুষনামক জন্তুগুলির তারতম্য থাকবেই বা কেন? যদি বা প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য থাকে তবু ব্যবহারের ক্ষেত্রে, অধিকারের ক্ষেত্রে তা সমপর্যায়ে হ'তেই হবে। মানব-চেষ্টার মূল কথা এ-যুগে এসে দাঁড়াল অর্থে—অর্থ যা ক্ষুধার অন্ন জোগাবে, যা মাথা-গোঁজার বাসস্থানের ব্যবস্থা ক'রে দেবে, যা 'ইন্দ্র দেহসুখ আনবে'। বর্তমানে তাই মানবজীবনের স্বরূপ-ধারণার অনুযায়ী হয়ে উঠেছে আমাদের সভ্যতার মূল্যমান। আমরা এখন হিতবাদী ও জড়বাদী। তাই শ্রেণী-সংগ্রাম আর জান্তব যান্ত্রিক ও আরণ্যক 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন' নীতিতে বিশ্বাস ক'রে মানবত্বকে পশুত্বের সমস্তরে নামিয়ে এনে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমেই ধীরগতি সমাজ-পরিবর্তনকে দ্রুতায়িত করার সঙ্কল্প করছি।

কিন্তু হাল আমলের বৈজ্ঞানিক গবেষণা মানুষকে অনন্ত অনিন্দ্রিয় চেতন সত্তায় নিয়ে গিয়ে হাজির করছে। সপ্তদশ থেকে উনবিংশ শতকের বৈজ্ঞানিক প্রত্যয় আজ শিথিল। বিজ্ঞান বর্তমানে জগৎ ও জীবনের স্বরূপ নির্ধারণ করতে গিয়ে অনেকটা অজ্ঞেয়বাদ আবার অনেকটা অধ্যাত্মবাদের টানাপোড়নে পড়েছে। বলছে: জড়বস্তু কি তা ঠিক বলতে পারি না—বোঝানো যায় না; মানুষ কি তা জানি না, চিন্তারও কোন সংজ্ঞা নেই। এডিংটন বলছেন যে, পদার্থবিজ্ঞান দিয়ে ঠিক জগৎকে ব্যাখ্যা করা যায় না। কেননা যা-কিছু ঘটে তার ত্রিবিধ প্রকৃতি থাকে:

(ক) একটি মানসিক আভাস, যা বাহিরের জগতে নেই, কেবল আমাদের মনেই আছে;

(খ) বাহিরে অবস্থিত কোনরূপ একটি প্রতিরূপ থাকে—যার স্বরূপ দুর্জ্ঞেয়;

(গ) আর কতকগুলি Pointer readings (বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি) যা বিজ্ঞানের বিশ্লেষণের সহায়ক এবং তা দিয়ে বিজ্ঞান অন্য Pointer readings-এর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করতে পারে।[১]

পদার্থবিজ্ঞানের বিষয় ঐ গ-এর ক্ষেত্রে সীমিত। তাই সমগ্র সত্যের এক অংশকেই সে বিষয় করতে পারে। এডিংটন বলছেন: To put the conclusion crudely—the stuff of the world is mind-stuff. ···The mind-stuff of the world is, of course, something more general than our individual conscious minds; but we may think of its nature as not altogether foreign to the feelings in our consciousess.[২] কিন্তু বস্তুর সংজ্ঞার মতোই মনের সংজ্ঞাও অনির্ণেয়স্বরূপ থেকে গেছে। তারপরই 'run into our consciousness' বলতে হয়েছে তাঁকে। কেননা, চেতনা সাক্ষিত্ব না মানলে জগৎবোধের ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। সেই-জন্যই তিনি 'neutral stuff'-কে জগতের মূল উপাদান (basal stuff of the world) ব'লে অভিহিত করার পক্ষপাতী।

যাই হোক, বিজ্ঞানজগতে প্রত্যয়ের পরিবর্তন নিছক জ্ঞানের পরিবর্তন। তা আমাদের দর্শনিক জিজ্ঞাসাকে রূপায়িত করবে সন্দেহ নেই। এই পরিবর্তনের আগেই তৎকালে পাশ্চাত্যমুখাপেক্ষী ভারতের বুকে এক নূতন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা হ'য়ে গেছে মানুষের স্বরূপনির্ণয়ের। নিছক অবৈজ্ঞানিক প্রস্তর-প্রতিমায় এর প্রথম প্রচেষ্টা। পরে জানলেন: 'ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো।'

তাঁর পদপ্রান্তে এসে বসলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্র। এলেন মনীষীরা সব। জানলেন: মানুষ, জীব, জগৎ সব চৈতন্যময়—ঈশ্বরই কেবল আছেন। ঈশ্বরকে জানলে সব জানা যায়; ইত্যাদি।

এই স্বরূপপ্রত্যয়ের উপরই সভ্যতার সর্বদিকের ক্রান্তিপথের লক্ষ্য স্থির ক'রে দিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। মানুষের অভিমুখেই সর্বশাস্ত্র, সকল জ্ঞান, সকল কৃষ্টির গতি। এ কথাই ভেবেছিলেন গ্রীকগণ। আর মানুষের যথার্থ স্বরূপের নির্দেশ দিয়েছিলেন ব্রাহ্মণ। কিন্তু বর্তমানকালের মানব-জ্ঞানচর্চার বিভিন্ন বিষয়গুলির উদ্দেশ্য প্রাচীন ভারতীয় বিদ্যানুশীলনের মতো এক উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র ক'রে গড়ে উঠেনি।

ধর্ম, অধ্যাত্ম-চেতনা যে-সত্য বর্তমানকালে প্রচার করেছে—বিজ্ঞানও সেই সত্যের দ্বারপ্রান্তে এসে হাজির হচ্ছে। এ-শুভলগ্নে ভ্রান্ত জীবনদর্শনের শেষ টানার দিন এসেছে। তাই মানবজীবন জিজ্ঞাসার সর্বস্তরে রূপরেখা ঐ 'ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বং'-এর রঙে রাঙিয়ে এঁকে দিয়েছেন স্বামীজী।

জীবন কি? স্বামীজী তার জবাবে বললেন: প্রতিকূল অবস্থাচক্রের মধ্যে জীবের আত্মস্বরূপপ্রকাশের নামই জীবন।[৩]

শিক্ষার সংজ্ঞায় তাই বললেন: মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণত্বের প্রকাশই শিক্ষা।

ধর্ম? মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের স্ফুরণের নাম ধর্ম।

আদর্শ সমাজের সংজ্ঞায় বলেছেন, 'সেই সমাজই সর্বশ্রেষ্ঠ, যেখানে সর্বোচ্চ সত্য কার্যে

১ The Nature of the Physical world—Eddington—Page 254

২ The Nature of the Physical world—Eddington—Page 276

৩ স্বামী বিবেকানন্দ—প্রমথনাথ বসু—পৃষ্ঠা—২৪৮

পরিণত করা যাইতে পারে—…। আর যদি সমাজ এক্ষণে উচ্চতম সত্যকে স্থান দিতে অপারগ হয়, তবে উহাকে উপযুক্ত করিয়া লও।'

জড়নির্ভর স্বরূপ-প্রত্যয়ে যেমন মূল্যবোধ অর্থের দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে, তেমনি অধ্যাত্ম-সত্তায় মানব-স্বরূপ-প্রত্যয়ে মূল্যবোধ আধ্যাত্মিক অনুভূতির—অনন্তের দিকে প্রগতির যুক্তি-বিচারে হ'তে থাকবে। আর এ-কথাও সত্যি, 'বিভিন্ন জাতির ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পাঠ করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, এরূপ সূক্ষ্মদর্শী লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাতির উন্নতি হয়, এবং অনন্তের অনুসন্ধান বন্ধ হইলে তাহার পতন আরম্ভ হয়, হিতবাদীরা এই অনুসন্ধানকে যতই বৃথা বলুক না কেন। অর্থাৎ প্রত্যেক জাতির শক্তির মূল উৎস হইতেছে তাহার আধ্যাত্মিকতা, এবং যখনই ঐ জাতির ধর্ম ক্ষীণ হয় এবং জড়বাদ আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করে, তখনই সেই জাতির ধ্বংস আরম্ভ হয়।'

'অনন্তের এই অনুসন্ধান, অনন্তকে ধারণা করিবার এই সাধনা, ইন্দ্রিয়ের সীমা অতিক্রম করিয়া যেন জড়ের বাহিরে যাইবার এবং আধ্যাত্মিক মানবের ক্রমবিকাশ-সাধনের এই প্রচেষ্টা—অনন্তকে আমাদের সত্তার সঙ্গে একীভূত করিবার এই নিরন্তর প্রয়াস—এই সংগ্রামই মানুষের সর্বোচ্চ গৌরব ও মহত্ত্বের বিকাশ।'

'নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোকেরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সুখভোগ করে এবং শিক্ষিত ও সংস্কৃতি-সম্পন্ন লোকেরা চিন্তায়, দর্শনে, বিজ্ঞানে ও শিল্পকলায় সেই সুখ পাইয়া থাকে। আধ্যাত্মিকতার রাজ্য আরো উচ্চস্তরের।'

সুতরাং স্বরূপপ্রত্যয়ের সাথে সাথেই মানব-সত্তার আনন্দবৃত্তিও প্রত্যয়-অনুকূল স্তরে সুখান্বেষণে ছোটে। এভাবে মূল্যবোধও তদনুরূপ হ'তে থাকে।

এভাবেই দেখা যায় মানুষের স্বরূপবিজ্ঞান তার সমাজ-সংস্কৃতিকে নব নব পথে পরিচালিত করে। আর তার সাথেই মানবজীবনের মূল্য-বোধ পাল্টায়। পরিবর্তিত জীবনবোধে আমাদের বর্তমানের অর্থঘেঁষা মূল্যবোধও পাল্টাবে। ফলে, অর্থনীতিই যে সমাজ-সংসারের গতিনিয়ামক নয়—তার দৃঢ় প্রত্যয় আমাদের জীবনকে বরং জ্ঞানময় ঈশ্বরময় চৈতন্যসত্তায় মিলিত করবে। সাম্যের জয়গান সেইখানেই সার্থক হবে। তবু বাস্তব জীবনে তার প্রতিফলন আমরা চাইব। সে-চাওয়া অধিকার-তারতম্যহীন সমাজজীবনে সকলের অবাধ উন্নতির সুযোগ আনবে, তবে তা বাস্তবতার বিমূঢ় যান্ত্রিক অনুবর্তনের জৈবিক রক্তক্ষয়িতার মধ্যে নয়। তা চেতনার সংস্কারে, আত্মার সাম্যজ্ঞানে, সমতার প্রশান্তির মাধ্যমে আসবে। পরিবর্তন আসবে ভেতর থেকে বাইরে—জ্ঞান থেকে কর্মে, উল্টো পর্যায়ে নয়।

আর মানবজীবনের আদর্শ থাকবে ব্রাহ্মণত্বে পৌঁছাবার। শিক্ষা ও সমাজ সেই আদর্শের পথ ধরেই তাদের রূপরেখা টানবে। নতুবা আজকের দিনে আমাদের আদর্শ 'বেঁচে থাকা'র পিছনে অনন্তের মুক্তির হাতছানি নেই—তাই, দিকে দিকে কেবল অনৈতিকতা, কেবল অবিশ্বাস আর অনিশ্চয়তা।

ভাবীকালের সমাজ স্বামীজীর জীবন-দর্শনকেই অনুসরণ করবে—এ মহাসত্য আজ সত্য ব'লে মনে না হ'লেও—তা সত্য হ'তেই হবে। কেননা মানুষের স্বরূপ-প্রত্যয় সেই পথনির্দেশই করছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাঙ্গনেঃ প্রসন্নময়ী

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

পূর্বকথা

'কঠোর তপস্যা করি যে ধন না মিলে।
কামারপুকুরবাসী তাই লয়ে খেলে॥'—পুঁথি

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাল্যলীলা-রঙ্গমঞ্চে কামারপুকুরের যে সকল নারী বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, শ্রীমতী প্রসন্নময়ী সেই মহাভাগ্যবতীগণেরই অন্যতমা। শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাবৃত্তান্তে ইনি 'প্রসন্ন' নামে সমধিক প্রসিদ্ধা। বালক শ্রীরামকৃষ্ণের তথা গদাধরের প্রতি ছিল তাঁর অগাধ অপত্য-স্নেহ ও অপার বাৎসল্য-প্রীতি। অথচ তিনি গদাধরের ঐশ্বর্যময় দেব-প্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিতা ছিলেন। এ-জন্য ঐ দেব-বালকের প্রতি তাঁর যথেষ্ট সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা দেখা যায়। তিনি গদাধরকে দেবাংশ-সম্ভূত জ্ঞান করতেন।

পরিচিতি

শ্রীমতী প্রসন্নময়ী ছিলেন কামারপুকুরের স্বনামধন্য জমিদার শ্রীযুক্ত ধর্মদাস লাহার কন্যা। তিনি কামারপুকুরে নিজ পিত্রালয়ে বসবাস করতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত পূত-স্বভাবা, দয়ার্দ্রচিত্তা, ভক্তিপরায়ণা ও নিষ্ঠাবতী। দেব-দ্বিজ ও সাধু-বৈষ্ণবগণের প্রতি ছিল তাঁর অগাধ ভক্তি-শ্রদ্ধা।

মহাত্মা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের পুণ্যকুটীর-সংলগ্ন ছিল তাঁর পিত্রালয়। সেই সূত্রে তিনি ছিলেন উক্ত ব্রাহ্মণপরিবারের নিকটতমা প্রতিবেশিনী। তিনি ক্ষুদিরাম-চন্দ্রমণিকে অশেষ ভক্তিমান্য করতেন। তাঁদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল একান্ত ঘনিষ্ঠ ও সুনিবিড়।

প্রসন্নময়ী স্বীয় স্বভাবগত সুমধুর ও সৎ প্রকৃতির জন্য প্রতিবেশিগণের অতিশয় প্রিয়-পাত্রী ছিলেন। ধৈর্য, বিনয়, নম্রতা, সৎসাহস, স্পষ্টবাদিতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ ছিল তাঁর প্রকৃতিগত। তাঁর ন্যায় তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্না ও বিচক্ষণা মহিলা কমই দেখা যায়।

প্রসন্নময়ীর পিতা এবং মাতা উভয়েই ধর্মপ্রাণ ও সদাত্মা ছিলেন। তাঁর সহোদর গয়াবিষ্ণু ছিলেন বালক শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ সখা বা 'স্যাঙাৎ'। এই লাহাপরিবারের সঙ্গে চাটুয্যেপরিবারের সম্বন্ধ ছিল একান্ত নিবিড় ও মধুরহৃদ্যতাপূর্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাঙ্গনে এই পুণ্যকীর্তি লাহাপরিবারের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও প্রণিধানযোগ্য।

চন্দ্রাদেবীর বয়স্যা

প্রসন্নময়ী ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-জননী শ্রীমতী চন্দ্রমণিদেবীর একান্ত অন্তরঙ্গ বয়স্যা। তাঁর সঙ্গে চন্দ্রাদেবীর প্রগাঢ় হৃদ্যতা দেখা যায়। তাঁর নিকট চন্দ্রমণি স্বীয় হৃদয়ের সমুদয় অনুভব-অনুভূতি ও অন্তরের সকল কথা-বার্তাই নিতান্ত অকপটে ব্যক্ত করতেন। ফলে, তিনি সেই বিশুদ্ধস্বভাবা সরলা ব্রাহ্মণীর বাহির এবং অন্তরের সকল বার্তাই সুবিদিত ছিলেন।

বিষয়জ্ঞানরহিতা বয়স্যা চন্দ্রাকে সাংসারিক ব্যাপারে এবং অন্যান্য নানা বিষয়ে তিনি বুদ্ধি-পরামর্শ দিতেন। বিষয়ীদের সহিত কিরূপ আলাপ-আলোচনা করা কর্তব্য এবং কিভাবে চলাফেরা করা উচিত—সে-সকল বিষয়েও তিনি তাঁকে সর্বদা উপদেশ দিতেন।

গদাধরের লালনপালনে এবং রক্ষণাবেক্ষণেও তিনি চন্দ্রমণিকে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। গদাধরের জন্ম, শৈশব ও বাল্য-লীলাকাণ্ডে এই ভাগ্যবতীকে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িতা দেখা যায়।

*

ক্ষুদিরামের গয়াধামে অবস্থানকালে চন্দ্রমণি একদা কামারপুকুরে রাত্রিকালে যে অদ্ভুত স্বপ্ন দর্শন করেছিলেন (এক জ্যোতির্ময় দেবতা তাঁর শয্যা অধিকার ক'রে তাঁর পার্শ্বে শায়িত রয়েছেন), প্রভাত হ'তে না হ'তেই তিনি প্রসন্নময়ী ও ধনী কামারনীকে ডাকিয়ে তাঁদের নিকট ঐ স্বপ্নের সমস্ত কথা খুলে বলেন। তাঁরা উভয়েই বিশেষ ধৈর্য নিয়ে আগাগোড়া সমস্ত ঘটনা শুনেন এবং তাঁকে নানাভাবে বুঝিয়ে আশ্বস্তা ক'রে বলেন, 'একথা আর কারও নিকট প্রকাশ করবে না।'

*

যোগীদের শিবমন্দিরের সম্মুখে, চন্দ্রমণির গর্ভে শিবজ্যোতি প্রবেশকালে প্রসন্নময়ীকেও তথায় উপস্থিত দেখা যায়। অদ্ভুতজ্যোতিদর্শন ও অপূর্বদিব্যানুভূতিলাভের ফলে চন্দ্রাদেবী সহসা তথায় সংজ্ঞাশূন্য হ'য়ে পড়লে, তাঁকে সুস্থ ক'রে তোলার জন্য প্রসন্নময়ী তাঁকে সময়োচিত শুশ্রূষা করেন।

অতঃপর প্রকৃতিস্থা হ'য়ে তিনি ঐ আশ্চর্য দর্শন ও অনুভবের বৃত্তান্ত প্রসন্নময়ী ও ধনীর নিকট আদ্যোপান্ত ব্যক্ত করেন। তাঁর মুখে অদ্ভুত বৃত্তান্ত শুনে, তাঁকে আশ্বস্ত করার জন্য, তাঁরা তাঁকে বলেন—'বায়ুরোগের ফলে অথবা মনের ভ্রমবশতঃ তোমার ঐরূপ আশ্চর্য দর্শন ও অনুভূতি লাভ হয়েছে।'

তদুত্তরে চন্দ্রমণি বলেন—'আমার কিন্তু সুস্পষ্ট বোধ হচ্ছে, তদবধি কে যেন আমার গর্ভে প্রবেশ ক'রে রয়েছে এবং এখনও আমার উদর ভারি বোধ হচ্ছে!'

যাহোক উক্ত ঘটনার কয়েক মাস পরেই প্রসন্নময়ী প্রমুখ বয়স্যাগণ চন্দ্রাদেবীর ঐ দর্শন ও অনুভবের নিগূঢ় মর্ম হৃদয়ঙ্গম করেন।

*

অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় চন্দ্রমণির প্রতিনিয়ত যে-সকল অলৌকিক দর্শন ও বিচিত্র অনুভূতি লাভ হ'ত, তিনি সেগুলি কখন দারুণ শঙ্কাতুর চিত্তে, কখন বা পরম উল্লসিত হৃদয়ে প্রসন্নময়ী প্রমুখ বিশ্বস্তা বয়স্যাগণের নিকট ব্যক্ত করতেন। তাঁর ঐসকল আশ্চর্য দর্শন ও অনুভবের কথা শুনে তাঁরা তাঁকে নানাভাবে প্রবোধ দিতেন। তাঁদের আন্তরিক উৎসাহপূর্ণ বাক্যে তিনি বিশেষ সান্ত্বনা লাভ করতেন এবং আশ্বস্তা হ'তেন।

চন্দ্রাদেবীর তৎকালীন চাল-চলন, অসাধারণ হাব-ভাব ও বিচিত্র মতি-গতি দেখে প্রতিবেশিনীরা তাঁর সম্বন্ধে নানা জল্পনা-কল্পনা ক'রত। তারা তাঁকে কেউ বায়ুরোগগ্রস্তা, কেউ ভূতাবিষ্টা, কেউ অপ্রকৃতিস্থা, কেউ বা পাগলিনী ভাবত। কিন্তু প্রসন্নময়ী প্রমুখ তাঁর শুদ্ধহৃদয়া বয়স্যাগণ, যাঁরা তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিতা ছিলেন, কখনও ঐসকল কথায় কর্ণপাত করতেন না। তাঁদের দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে, দিব্য গর্ভধারণের ফলে তাঁর ভিতর এক অতীন্দ্রিয় ভাবের প্রবল জোয়ার এসেছে এবং তারই প্রভাবে তিনি ওরূপ বিচিত্র দর্শন-অনুভূতি লাভ করছেন।

লীলা-সমাচার

ক্ষুদিরামের ক্ষুদ্র ঢেঁকিশালে গদাধর যখন ভূমিষ্ঠ হয়, সেই শুভক্ষণে প্রসন্নময়ীকে তথায় উপস্থিত দেখা যায়। প্রসন্নময়ীপ্রমুখ লাহা-

পরিবারের দু'চার জন ভাগ্যবতী মহিলা পূর্ব হ'তেই চাটুয্যে-কুটীরে উপস্থিত ছিলেন। পবিত্র ব্রাহ্মমুহূর্তে ধাত্রী ধনী কামারনী অবতারবরিষ্ঠের আবির্ভাব-বার্তা ঘোষণা করলে, তাঁরাই ঐ দেবশিশুকে সূতিকাগারে সর্বপ্রথম দর্শন করেন।

*

আবির্ভাবের পর হ'তেই শিশু গদাধরের অতি বিচিত্র ও বিস্ময়কর রঙ্গলীলা আরম্ভ হয়। সে কখন 'শিবনেত্র' হয়, কখন তার দেহ জড়বৎ নিথর নিঃস্পন্দ হ'য়ে যায়, কখন অসম্ভব ভারি হ'য়ে ওঠে, কখন বৃহৎ কলেবর ধারণ করে। সে এরূপ আরও কত আশ্চর্য ও অভিনব রঙ্গলীলা প্রতিনিয়ত প্রকাশ করে! যা হোক, শিশুর ঐ সকল অদ্ভুত লীলাখেলা দেখে জননী চন্দ্রমণির উদ্বেগ ও দুর্ভাবনার অবধি থাকে না। বিষম শঙ্কাতুরা ও বিচলিতা হ'য়ে তিনি কখন কখন আকুল ক্রন্দন শুরু করেন। তাঁর ক্রন্দনের রোল শুনে প্রসন্নময়ী প্রমুখ নিকট প্রতিবেশিনীরা ছুটে আসেন। শিশুর আশ্চর্য অবস্থান্তর দেখে তাঁরাও পরম বিস্মিতা হন। তথাপি তাঁরা চন্দ্রাকে আশ্বস্তা করার জন্য নানাভাবে প্রবোধ দেন।

অতঃপর কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই শিশুর সহজ ও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে—তার অধরে মধুর হাসি ফুটে ওঠে। তখন অসীম স্নেহভরে তারা শিশুকে কোলে নিয়ে কত আদর করেন। যাহোক, চন্দ্রাদেবীর ঘনিষ্ঠ সহচরী ও নিকটতমা প্রতিবেশিনীরূপে প্রসন্নময়ী গদাধরের শৈশবে ও বাল্যে তাকে বহুবার কোলেপিঠে ধারণ করেছিলেন। সুতরাং এ-সৌভাগ্য তাঁর অশেষ সুকৃতিরই পরিচায়ক, সন্দেহ নেই।

*

গদাধরের জন্মাবধিই তার প্রতি প্রসন্নময়ীর অগাধ বাৎসল্য-স্নেহ ও মমতা-প্রীতি দেখা যায়। ধীরে ধীরে সে সামান্য বড় হ'য়ে উঠলে, তিনি কোনদিন তাকে কোলে ক'রে, কোনদিন বা তার হাত ধরে নিজ গৃহে নিয়ে যেতেন। তিনি নিজহাতে তাকে ক্ষীর, সর, ননী, নাড়ু প্রভৃতি খাওয়াতেন।

তার আগমনে লাহাভবনে আনন্দের স্রোত বয়ে যেত। অন্তঃপুরবাসিনীরা তাকে নিয়ে মত্ত হ'য়ে উঠতেন। সে মধুর আধআধ স্বরে কত কথা বলত এবং তাঁদের নিকট নানা আবদার রঙ্গ করত।

প্রসন্নময়ী প্রভৃতির স্নেহের টানে সে কোন কোন দিন নিজেই তথায় উপস্থিত হ'ত। প্রসন্নময়ী তার জন্য দুগ্ধজাত সুস্বাদু ভোজ্য-সকল সযত্নে তুলে রাখতেন এবং সে এলে তাকে ঐগুলি উপহার দান ক'রে পরম আহ্লাদিতা হ'তেন।

গদাধরের আগমনের নির্দিষ্ট সময় কোন-দিন উত্তীর্ণ হ'য়ে গেলে প্রসন্নময়ী অত্যন্ত উতলা হ'য়ে উঠতেন। অবশেষে তিনি তার জন্য রক্ষিত মিষ্টান্ন প্রভৃতি নিয়ে ব্যস্তভাবে চাটুয্যে-কুটীরে উপস্থিত হ'তেন। সদানন্দময় বালক তাঁকে দেখে আহ্লাদে অধীর হ'য়ে উঠত, লম্ফদান ক'রে ক'রে তাঁর হাত হ'তে ঐসকল মিষ্টান্ন-ভোজ্য গ্রহণ ক'রত এবং মধুর নৃত্য ক'রে সেগুলি ভোজন ক'রে বেড়াত।

ভক্তিমতী প্রসন্নময়ী বালক গদাধরের মধ্যে নিজ অভীষ্টদেব বালগোপালের মূর্ত প্রকাশ প্রত্যক্ষ করতেন। বস্তুতঃ তাকে তিনি সর্বদা সেই চক্ষেই দেখতেন এবং পুত্রাধিক স্নেহ-যত্ন করতেন।

*

গদাধরের বয়স যখন আট-নয় বৎসর, সে-সময় একদিন প্রসন্নময়ী প্রমুখ পল্লীর কতিপয় ভক্তিমতী রমণী ৺বিশালাক্ষী দেবীর দর্শন ও পূজাদির জন্য আনুরগ্রামে গমনের সঙ্কল্প করেন। আনুর কামারপুকুর হ'তে প্রায় দু'মাইল উত্তরে অবস্থিত। যাহোক, উক্ত রমণীগণের ঐ অভিপ্রায় জানতে পেরে গদাধর তাঁদের সঙ্গে তথায় গমনের জন্য বিষম জেদ আরম্ভ করে। অগত্যা তাঁরা নিরুপায় হ'য়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে যথাসময়ে তথায় যাত্রা করেন।

'সঙ্গে শিশু গদাধর যান দরশনে।
দেবী-আবির্ভাব গায় মাঠমধ্যস্থানে॥
অঙ্গ জড়বৎ বাহ্যজ্ঞান নাই আর।
আধমরা রমণীরা হেরিয়া ব্যাপার॥'—পুঁথি

পথিমধ্যে গদাধর সহসা বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে একেবারে অচৈতন্য হ'য়ে পড়ে। ফলে, তার কোমলাঙ্গ ভূলুণ্ঠিত হয় এবং সমস্ত দেহ নিথর নিস্পন্দ জড়বৎ হ'য়ে যায়। হঠাৎ তার ঐরূপ আশ্চর্য অবস্থান্তর দেখে উপস্থিত সঙ্গিনীরা ভয়ানক চিন্তান্বিতা শঙ্কাতুরা ও বিচলিতা হন। বিষম দুর্ভাবনায় তাঁদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। তখন নিতান্তই দিশেহারা হ'য়ে তাঁরা তাকে ঘিরে মহাকোলাহল ও কাতর ক্রন্দন শুরু করেন।

শ্রীমতী প্রসন্নময়ী কোনও কারণবশতঃ কিছুটা পশ্চাদ্‌বর্তিনী হ'য়ে পড়েছিলেন। স্বল্পকাল মধ্যে তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। যাহোক, বালকের ঐরূপ অদ্ভুত অবস্থান্তর লক্ষ্য ক'রে তিনি উহার গূঢ় মর্ম বুঝতে পারেন।—'বুঝিল বিশেষ মহাতত্ত্ব তাঁয় হেরে।'

গদাধরের প্রকৃতির সহিত প্রসন্নময়ী সুপরিচিতা ছিলেন। সুতরাং তাকে দেখে তিনি বুঝতে পারেন যে, ৺বিশালাক্ষী দেবী তার মধ্যে স্বয়ং আবির্ভূতা হয়েছেন।

যাহোক, তিনি তখন বিপন্না সঙ্গিনীদের আশ্বস্তা ক'রে বলেন, 'কোনও ভয় নেই। আমরা যে বিশালাক্ষী মাতাকে দর্শন করতে যাচ্ছি, সেই আদ্যাশক্তি মহাদেবীই এসেছেন এই সুলক্ষণ বালকের ভিতরে।'

অতঃপর তিনি গদাধরকে প্রকৃতিস্থ ক'রে তোলার জন্য তথায় উপস্থিত সকল সঙ্গিনীকে ভক্তিভরে ৺বিশালাক্ষীর নাম সংকীর্তন করতে বলেন এবং তিনি নিজে তার কর্ণমূলে অবিরাম ঐ নাম উচ্চারণ করতে থাকেন। কিছুক্ষণ ঐরূপ করার পর সে ধীরে ধীরে সহজ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তখন প্রসন্নময়ী-প্রমুখ ঐ ভাগ্যবতী রমণীরা ৺দেবীর পূজার সিঁদুর, চন্দন, পুষ্প, বিল্বপত্র, মিষ্টান্ন, পানীয় প্রভৃতি উপচার সাক্ষাৎ ৺বিশালাক্ষীজ্ঞানে ভক্তিভরে গদাধরকে নিবেদন করেন। রমণীগণের প্রদত্ত ঐ সকল উপহার সে হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করে।

উপসংহার

শ্রীরামকৃষ্ণের আদ্যলীলায় প্রসন্নময়ী ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িতা থাকলেও, সে-সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণী-উদ্ধারের কোনও উপায় নেই। মহাজীবনের বিচিত্র মহিমা ও অমিয় লীলাকথা বর্ণনা-প্রসঙ্গে সেই পুণ্যশ্লোকা মহীয়সী সম্পর্কিত যে কয়েকটি খণ্ড ঘটনা 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ' ও 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি' গ্রন্থে ইতস্ততঃ লিপিবদ্ধ দেখা যায় সেগুলিই এই প্রবন্ধে একত্র সংগ্রথিত করা হ'ল। সংখ্যায় বা পরিমাণে এই তথ্যগুলি যতই সামান্য হোক না কেন, লীলা-তত্ত্বে এগুলির গুরুত্ব অপরিমেয়, সন্দেহ নেই।

ধর্ম ও রাজনীতি

অধ্যাপক সুজয়গোপাল রায় পোদ্দার

পৃথিবীর ইতিহাস ও মানবজীবনের ক্রম-বিকাশের ধারা পর্যালোচনা করলে একটা সত্য স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে, যুগ যুগ ধরে মানুষ তথা মনুষ্যসমাজ তার জীবনে কোন না কোন নীতি, ভাব বা আদর্শ অর্থাৎ একটা জীবন-দর্শনকে অনুসরণ ক'রে আসছে, সে জীবনাদর্শ আমাদের মনোমত হোক বা না হোক। এর কারণ মানুষের প্রকৃতিতেই লুক্কায়িত। যে শুভক্ষণে প্রাণি-শ্রেষ্ঠ মানুষ 'মানুষ' নামে পরিচিত হলো সেই মুহূর্তেই সে তার সামাজিকতা-বৈশিষ্ট্য নিয়ে আবির্ভূত হলো প্রকৃতির রঙ্গমঞ্চে। অর্থাৎ 'সামাজিকতা' ও 'মানুষতা' একটা আন্তর সম্পর্কে আবদ্ধ—ওরা একে অন্যের পরিচায়ক। আর 'সামাজিকতা' একটা জীবনাদর্শেরই দ্যোতক। প্রসঙ্গতঃ মনে পড়ে বিখ্যাত চিন্তাবিদ্ অ্যালডোয়াস্ হাক্স্লির উক্তি : "Men live in accordance with their philosophy of life, their conception of the world. This is true even of the most thoughtless. It is impossible to live without a metaphysics. The choice that is given us is not between some kind of metaphysics and no metaphysics; it is always between a good metaphysics and a bad metaphysics.". (Ends and Means. p. 252)

বিচিত্রমুখী এই জীবনের প্রকাশ। তাই তো দেখি একই জীবনকে কেন্দ্র ক'রে হরেক নীতির আবির্ভাব। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, প্রভৃতি দৃষ্টিকোণ থেকে আজ জীবনের আলোচনা করছেন বিভিন্ন সমাজবিদ্‌রা। তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা বিভিন্ন নামে আদর্শের আলোকে চিরচঞ্চল জীবনের বহুমুখী অভিব্যক্তির ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন করছেন। একের ভিতর বহুর সমাবেশ এমনি ভাবেই সংগঠিত হচ্ছে। ধর্ম ও রাজনীতি এমনি ভাবেই এক জীবননীতিরই দ্বিবিধ রূপ। আজ বিংশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আমরা লক্ষ্য করছি এই দুয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব। ইহা আজ গোটা জীবনটাকে এক কথায় বিষিয়ে তুলেছে বলা চলে। আত্মঘাতী এই বিবাদ জীবনের যে ছবি এঁকে চলেছে তা দেখে মনে হয় জীবন বুঝি অর্থহীন, গ্লানিভরা, দিনগত পাপক্ষয়ের শুধুমাত্র একটা নিষ্ফল ও নীরস অবসরমাত্র। এটা খুবই পীড়াদায়ক—নিতান্তই মর্মান্তিক। রূপ-রস-গন্ধে ভরা যে পৃথিবীকে দেখে একদিন কবি আবেগকম্পিত কণ্ঠে গেয়ে উঠেছিলেন—'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে'—সেই শ্যামলা সুন্দরী পৃথিবীই আজ অনেকের কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে। জীবনাদর্শের আপাত বিরোধকে যথার্থ মনে করা এবং মানুষের দৃষ্টিবিভ্রম ও বুদ্ধিনাশই এই ট্র্যাজেডির মূল কারণ।

সম্প্রতি অনেক প্রতিষ্ঠিত চিন্তাশীল ব্যক্তিদেরও বলতে শোনা যায় যে, ধর্ম ও রাজ-নীতি হচ্ছে পরস্পরবিরোধী দুটো ভিন্ন প্রত্যয়। এই বিরোধী ধারণাকে কখনই একসুরে বাঁধা যায় না। রাজনীতির খেলাঘরে নীতিশাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্রের অনুশাসন সব সময় মেনে চলা

যায় না। ধর্ম হচ্ছে একান্তই একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার, যার সাধনা সম্ভব নির্জনে, নিরালায়, আপন মনের গোপন কোণে, যেখানে মানুষের আনাগোনা, সমাজের কোলাহল কোন প্রবেশাধিকার পায় না। এটা কিন্তু ধর্মে অবিশ্বাসী, নাস্তিকের দৃষ্টিভঙ্গী নয়। যাঁরা ধর্মকে মানেন কিন্তু ধর্মের আসন আর রাজনীতির আসন সম্পূর্ণ ভিন্ন মনে করেন—এ দৃষ্টিভঙ্গী হলো তাঁদেরই। এটা মানবমনের একটা কঠিন দুরারোগ্য ব্যাধি। পৃথিবীর ভবিষ্যৎ-গঠনের দায়িত্ব যাঁদের হাতে ন্যস্ত সেই শিক্ষক-সমাজের অনেকেই ধর্ম ও রাজনীতির এই পার্থক্যকে শাশ্বত সনাতন ব'লে ঘোষণা করছেন; এর অনিবার্য ফলস্বরূপ অপাপবিদ্ধ সবুজ মন ধীরে ধীরে আদর্শের বিকৃতিকেই আদর্শ ব'লে শিখতে শুরু করেছে। একটা বিপরীত ধর্মে যেন দীক্ষিত হ'তে যাচ্ছে গোটা মনুষ্যসমাজ। মানুষের জীবনে এটাই বোধ হয় সবচেয়ে বড় বিপদ, কারণ এখানে তার অস্তিত্ব সমূহ সংকটের সম্মুখীন—যে কোন দিন প্রাণিশ্রেষ্ঠ মানুষ মনুষ্যেতর প্রাণীর পর্যায়ে নেমে আসতে পারে। ভগবান করুন, এই বিপদের ঘন কালোমেঘ যেন মানুষেরই শুভবুদ্ধির দমকা হাওয়ায় উড়ে চলে যায় সেখানে, যেখান থেকে মানুষ থাকবে অনেক দূরে।

এবার একটু বিশ্লেষণ ক'রে দেখা যাক ধর্ম ও রাজনীতির ঐক্য-সুর কোথায়। পূর্বালোচনার সূত্র ধরে বলা চলে যে, মানব-জীবনের বা সমাজজীবনের সব নীতিই একটা বড় নীতির অন্তর্গত—সেটা হলো জীবননীতি, জীবনধর্ম বা জীবনাদর্শ। রাজনীতি যদি মানুষের জীবনের কোন একটা দিকের সূচক হয় এবং ধর্মও যদি ঐ মনুষ্যজীবনেরই আরেকটা অবস্থা বুঝায় তাহলে একথা খুবই স্পষ্ট যে, রাজনীতির ও ধর্মের আসল উদ্দেশ্য হলো মূল জীবননীতির বাস্তবায়ন; অর্থাৎ এ দুটো হচ্ছে উপায় যার লক্ষ্য হলো জীবনাদর্শের আস্বাদন বা বাস্তব রূপায়ণ। এই যুক্তি যদি গ্রাহ্য হয় তবে আমাদের মেনে নিতেই হবে যে, দুটো পরস্পরবিরোধী পথ কখনই এক উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সহায়ক হ'তে পারে না। সুতরাং, হয় আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, রাজনীতি ও ধর্ম এই দুই-এর কোন একটি অথবা দুইটি জীবনের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন, নতুবা ভাবতে হবে যে উভয়ের এই পারস্পরিক বিরোধিতা আসলে মিথ্যা।

রাজনীতি ও ধর্ম—এই শব্দদ্বয়ের সাধারণ অর্থ-বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, এই দুই আসলে দুই নয়, এক। সহজ কথায় রাজনীতি হলো রাজার নীতি অর্থাৎ যিনি রাজা তাঁর প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হলো প্রজাপালন; প্রজার জীবনের সামগ্রিক উৎকর্ষ সাধন করা, প্রজা তার জীবনকে ফুলেফলে ভরিয়ে তুলে জীবনের যে পরমপুরুষার্থ তা যাতে লাভ করতে পারে, সেই পরিবেশ সৃষ্টি করাই রাজার কর্তব্য—এরই অন্য নাম রাজ্যশাসন। বর্তমান কালেও যিনি বা যাঁরা সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্ণধার ব'লে বিবেচিত তাঁদেরও উদ্দেশ্য হলো (অন্ততঃ সংবিধানের অনুশাসন তাই) জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠা করা। এবার আসা যাক ধর্মের কথায়। পৃথিবীর সব কটি প্রতিষ্ঠিত ধর্মেরই মূল সুর হলো জীবনাদর্শের উপলব্ধি; অর্থাৎ সবকিছুর অন্তরালে যে সত্য বর্তমান, যার নিয়মে সবকিছু নিয়ন্ত্রিত, যার আলোকে সবকিছু উদ্ভাসিত—তার দর্শন ও উপলব্ধিই হলো ধর্মের প্রথম ও শেষ কথা। এই কথাই স্থানকালপাত্রভেদে বিচিত্র রূপ পেয়ে বহু ধর্মে নিজেকে প্রচার করেছে। তাহলে এটা স্পষ্ট হলো যে, রাজনীতির ক্ষেত্রে জীবনের যা অর্থ ও উদ্দেশ্য,

ধর্মের জগতেও জীবনের তাৎপর্য তাই। এখানে একটা প্রশ্ন হ'তে পারে—যদি এই ছুই মূলতঃ ছুই নয়,এক—তাহলে এমন ভিন্ন নামে এরা অভিহিত কেন? প্রশ্নটি খুবই প্রাসঙ্গিক; তাই, এবার এই প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করা যাক। জীবনের যে অবস্থায় তার বাহিরের দিকটাই বড় হয়ে ফুটে উঠে সেটাকে রাজনৈতিক অবস্থা বলা চলে, আর জীবনের যে দিকটা ভিতরে থেকে বাহিরকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে চলে তাকে ধর্ম আখ্যা দেওয়া যায়। সুতরাং দেখা গেল এ ছুটো যেন এক বৃন্তে ছুটি ফুল; শুধুমাত্র উপস্থিতি বা উপস্থাপনের বিভিন্নতার জন্ম এদের ভিন্ন ব'লে মনে হয়। জ্ঞানীর কাছে এরা একদিকে যেমন ভিন্ন, অন্যদিকে তেমনি অভিন্ন—ভেদাভেদের রহস্য তাঁদের জানা, তাই তাঁরা ভুল করেন না। অজ্ঞান যারা তারাই কেবল আসলকে নকল ভেবে, নকলকে আসল মনে ক'রে চিন্তার রাজ্যে এক পরম বিপর্যয় ডেকে আনেন, যে বিপর্যয় জীবনের হাটে নিয়ে আসে হিংসা-দ্বেষ, কলহ-বিবাদ, অন্যায়-অপরাধ, অনাচার ও আরও অনেককিছু যা মানুষের অস্তিত্বের মূলে অবিশ্রাম কুঠারাঘাত হেনে চলে।

উপসংহারে তাই বলি, এখন আমাদের সামনে ছুটো পথ খোলা আছে। হয় মানুষ হ'য়ে মানুষের মতোই বেঁচে থাকা, মানবজাতি অন্তর্জগতে এতদিন ধরে যতখানি এগিয়ে এসেছে সেখান থেকে পিছিয়ে না এসে এবং তাকে এই পথে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবার ইচ্ছা নিয়ে চলা, আর নয়তো সেখান থেকে পিছু হেঁটে, অমানুষ হ'য়ে ইতরপ্রাণীর দলে মিলে যাওয়া। এই ছুটোর মধ্যে একটিকে বেছে নিতেই হবে—এর মাঝামাঝি কোন আপসের অবকাশ নেই। আর কালবিলম্ব না ক'রে আমাদের একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসার সময় উপস্থিত।

যদি প্রথম পথই আমাদের কাম্য হয় তাহলে কর্তব্য হবে ইস্পাতদৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে সত্যের অন্বেষণে আত্মনিয়োগ করা। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে প্রবাহিত হচ্ছে যে 'বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা' যা জীবনের গভীরতর সত্তার জয়গান, যা তার অগভীর সত্তার মতোই সমভাবে বাস্তব, তারই সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে আমাদের সর্ববিধ চিন্তাকে, সর্ববিধ জীবনাদর্শকে, সর্ববিধ কর্মকে। এইটাই 'মানুষ' হয়ে বেঁচে থাকার একমাত্র পথ, মানবজাতির বেঁচে থাকারই পথ—"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"

সীতা-চরিত্রের একটি দিক

স্বামী তথাগতানন্দ

সীতা মূর্তিমতী পবিত্রতা, তাঁকে শুধুমাত্র পবিত্র বললে মহা অপরাধ হবে। তিনি ছিলেন জনম-দুখিনী। তিনি যেন বেদনার ও সহশক্তির জীবন্ত বিগ্রহস্বরূপিণী। শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে তাঁর অপূর্ব সাধনাবস্থায় ভাবনেত্রে সীতাকে দর্শন করেছিলেন—যেন করুণায় ভরা একটি প্রতিমা। স্বামী বিবেকানন্দ সীতা-চরিত্রের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। সীতার মতো উন্নত চরিত্র পৃথিবীতে আর দেখা যায় না। ভারতের মানুষ সীতার জীবনে দেখে ত্রিবেণীর সঙ্গম। যা কিছু মঙ্গলময়, পুণ্যময় ও পবিত্র তাই যেন সীতা নামে অভিহিত; স্বামীজী আরও বলেছেন, সীতা-চরিত্র-অনুধ্যানে ভক্তের চরম সার্থকতা। সমস্ত ব্যথা-বেদনার মধ্যেও সীতা শুধুমাত্র রামের চিন্তাতেই মগ্ন ছিলেন, প্রকৃত ভক্ত সেইরূপ ইষ্টচিন্তায় বিভোর থাকবেন।

সীতা প্রধানতঃ ক্ষত্রিয় রমণী, তাঁর চরিত্রের সেই ক্ষত্রিয়সুলভ দৃঢ়তার কয়েকটি ঘটনা এখানে আমরা আলোচনা করব। আমরা রাজপুত-রমণীর বীরত্বের কথা জানি। সীতার চরিত্রেও আমরা দেখি মাধুর্যের সঙ্গে দৃঢ়তার সংযোগ।

বাল্মীকি-রামায়ণে বনবাসের প্রাক্কালে রামের সহিত কথোপকথনে রামচন্দ্র সীতাকে অযোধ্যায় রেখে যেতে চান। সীতা বারংবার জিদ করছেন দেখে রাম বনবাসের ভয়াবহ চিত্র এঁকেছেন ১৮টি শ্লোকে। প্রত্যেকটি শ্লোকের শেষ 'তস্মাৎ দুঃখতরং বনম্।' সীতা বীরজায়া। তাঁর আত্মমর্যাদা-বোধ ছিল। বীরশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রের জায়া তিনি। তিনি সর্বাংশে তাঁর উপযুক্ত সহধর্মিণী, দুঃখকে ভয় করেন না। হনুমানের উক্তিটি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়:

"তুল্যশীলবয়োবৃত্তাং তুল্যাভিজনলক্ষণাম্।
রাঘবো অর্হতি বৈদেহীং তং চেয়মসিতেক্ষণা॥"

(সুন্দরকাণ্ড, ১৬।৫

সীতা শাস্ত্র-উক্তি দ্বারা প্রমাণ করেছেন স্ত্রীর একমাত্র ধর্ম স্বামিসেবা। বিবাহের পর থেকেই স্বামী-স্ত্রী অভিন্ন। মৃত্যুতেও তাঁরা বিচ্ছিন্ন হন না। এর পরে সীতা প্রাণত্যাগের ভয় দেখিয়ে বলছেন তাঁকে সঙ্গে নেবার জন্য:

"যদি মাং দুঃখিতামেবং বনং নেতুং ন চেচ্ছসি।
বিষমগ্নিং জলং বাহমাস্থাস্যে মৃত্যুকারণাৎ॥"

অযোধ্যাকাণ্ড, ২৯।২১

"আমাকে এরূপ দুঃখিত দেখেও যদি বনে সঙ্গে না নিতে চাও তাহলে বিষপান বা অগ্নিপ্রবেশ ক'রে বা জলে ডুবে প্রাণত্যাগ করব।" সীতার সনির্বন্ধ কাতর মিনতি, যুক্তি-তর্ক, ভীতিপ্রদর্শনেও যখন রাম নিজ সিদ্ধান্তে অটল তখন সীতা রামচন্দ্রের পরাক্রমকে বিদ্রূপ করেন: যে রামকে বীরশ্রেষ্ঠ হিসেবে আমার বাবা বরণ করেছিলেন, আসলে সেই রাম পুরুষের ছদ্মবেশে এক ভয়াতুরা নারীমাত্র—

"কিং ত্বামন্যত বৈদেহঃ পিতা মে মিথিলাধিপঃ।
রাম জামাতরং প্রাপ্য স্ত্রিয়ং পুরুষবিগ্রহম্॥"

—অযোধ্যাকাণ্ড, ৩০।৩

আসন্ন বিপদের মুখে সীতা তখন দৃঢ়তার সঙ্গে বাক্-যুদ্ধে প্রবৃত্ত ছিলেন। রামচন্দ্র তাঁর

বীরজায়ার প্রশংসা করেছিলেন। বলেছিলেন :

"সর্বথা সদৃশং সীতে মম স্বস্য কুলস্য চ।
ব্যবসায়মনুক্রান্তা কান্তে ত্বমতিশোভনম্॥"
অযোধ্যাকাণ্ড, ৩০(৪১)

"সীতা, তুমি যে আমার সঙ্গে বনে যেতে চাইছ, তোমার এ সিদ্ধান্ত তোমার ও আমার উভয়েরই বংশমর্যাদার যোগ্য হয়েছে।"

অরণ্যকাণ্ডে রাক্ষস বিরাধ যখন রাম ও লক্ষ্মণকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল তখন সীতা নিজের জীবনের বিনিময়ে রাম ও লক্ষ্মণের জীবন বাঁচাবার জন্য বিরাধকে অনুরোধ করেন : "মাং হরোৎসৃজ কাকুৎস্থৌ নমস্তে রাক্ষসোত্তম"—অরণ্যকাণ্ড, ৪ (৩)। শরভঙ্গ ও সুতীক্ষ্ণ ঋষিদের আশ্রম থেকে বিদায় নিয়ে রাম-লক্ষ্মণ ও সীতা চলেছেন। রাক্ষসের অত্যাচারে দণ্ডকবনের আশ্রমবাসীরা অত্যন্ত কাতর, তাঁরা রামকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছেন যাতে রাম রাক্ষসদের অত্যাচার থেকে তাঁদের বাঁচান। রাম ও লক্ষ্মণ সর্বদা ধনুর্বাণ ও অস্ত্রাদি সঙ্গে রাখতেন। সীতা বীর রমণী। নিঃসঙ্কোচে অথচ পরিপূর্ণ শ্রদ্ধার সঙ্গে সীতা দণ্ডকবনের নিরীহ রাক্ষসদের হত্যা করার বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন ক'রে বলেন, বোধহয় রাম অধর্ম করতে চলেছেন, 'আমাদের ক্ষতিকারক রাক্ষস ভিন্ন অন্যদের হত্যা করা ক্ষত্রিয়ধর্মবিরুদ্ধ।' অবশ্য রামকে শিক্ষা দেবার জন্য তিনি বলেননি, শুধু তাঁকে মনে করিয়ে দিয়েছেন। সীতার এইরূপ ব্যবহারেও রাম তাঁকে ভুল বোঝেননি; বুঝেছেন, অত্যধিক ভালবাসার জন্যই সীতা তাঁর কাজে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, সহধর্মিণীর উপযুক্ত কাজই করেছেন তিনি।

"মম স্নেহাচ্চ সৌহার্দ্যাদিদমুক্তং ত্বয়া বচঃ।
পরিতুষ্টোঽস্ম্যহং সীতে ন হ্যনিষ্টোঽনুশাস্যতে॥"
অরণ্যকাণ্ড, ১০ (২০)

রাক্ষসবধের কারণ দেখিয়ে রাম যে উত্তর দিয়েছিলেন তা বাস্তবিকই তাঁর উন্নত হৃদয়বত্তারই পরিচায়ক। তিনি বলেছিলেন, ব্রাহ্মণদের কাছে তিনি যে প্রতিজ্ঞা করেছেন তা তিনি রক্ষা করবেন; এর জন্য সীতা, লক্ষ্মণ এমনকি নিজের জীবনের বিনিময়েও—

"অপ্যহং জীবিতং জহ্যাং ত্বাং বা সীতে সলক্ষ্মণাম্।
ন তু প্রতিজ্ঞাং সংশ্রুত্য ব্রাহ্মণেভ্যো বিশেষতঃ॥"
—অরণ্যকাণ্ড, ১০ (১৯)

লঙ্কায় রাবণবধের পর সীতার সঙ্গে রামের যখন প্রথম সাক্ষাৎকার হয়, সেই শুভলগ্নেও, সুদীর্ঘ দিনের দুঃখকষ্ট ও বেদনার অবসান-কালেও সীতার জীবনে শান্তি আসেনি; তাঁর পবিত্রতার প্রতি রামের সন্দেহই তখন সীতার জীবনে চরমতম বেদনা এনেছে। এখানেও সীতা বীর রমণীর মতো তাঁর বক্তব্য রেখেছেন রামের কাছে, তাঁর আত্মমর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কোন মানসিক দুর্বলতা দেখাননি। যুক্তিগ্রাহ্য কথা দিয়ে রামের অশালীন ও অযৌক্তিক অভিযোগকে খণ্ডন করেছেন। বলেছেন, "রাম সাধারণ মানুষের মতো আমাকে সাধারণ নারী হিসেবে গণ্য করেছেন,"—"প্রাকৃতঃ প্রাকৃতামিব" (যুদ্ধকাণ্ড, ১১৬, ৬ শ্লোক)। তবুও রামচন্দ্র বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি। সেজন্য আদর্শ ক্ষত্রিয়রমণীর মতো মর্যাদা রক্ষা করার জন্য অগ্নিকুণ্ডে জীবনাহুতি দেবার সংকল্প ক'রে লক্ষ্মণকে চিতা সাজাবার জন্য আদেশ দিয়েছেন —"চিতাং মে কুরু সৌমিত্রে ব্যসনস্যাস্য ভেষজম্", ঐ ১১৬ (১৮)।

অযোধ্যাবাসের শেষ অধ্যায়ে লক্ষ্মণের মুখে সীতা যখন বনবাসের কথা শুনেছেন তখনও তিনি আত্মহারা হননি। চরম দুর্ভাগ্যের দিনেও স্বীয় মর্যাদাবোধ অক্ষুণ্ণ রেখেছেন;

এমনকি রামচন্দ্রকে তাঁর দুর্ভাগ্যের জন্য বিন্দুমাত্র দোষীও করেননি; বরং জন্মান্তরে রামকেই স্বামী হিসেবে পেতে চেয়েছেন।

করুণতম শেষ দৃশ্যেও বীর রমণীর আত্মমর্যাদাবোধ অত্যন্ত প্রখর। পুনরায় পবিত্রতার শপথগ্রহণের জন্য অনুরোধ করেছেন রামচন্দ্র। সীতা নির্বিকার। স্বর্গীয় ঔদাসীন্যে তাঁর অন্তর ভরপুর। অযোধ্যার সমবেত উৎসুক জনমণ্ডলীর সামনে দাঁড়িয়েছেন তেজস্বিনী, তপস্বিনী সীতা। শেষ কয়েকটি বাক্যের মাধ্যমে তাঁর অপরাজেয় বীরত্বই প্রদীপ্ত হ'য়ে রয়েছে। *আমরা তাঁর যে মানসের পরিচয়* পাই সে মানস ত্যাগে, প্রেমে, বীর্যে ও সত্যে সমুজ্জল। সত্যসাধনার সঙ্গে বীরত্বের সাধনা ও মনুষ্যত্বের সাধনার জন্যই তাঁর জীবন মহিমান্বিত। ধরিত্রীকে উদ্দেশ ক'রে সীতা যা বলেছিলেন তা উদ্ধৃত ক'রে বক্তব্য শেষ করছি :

"যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে।
তথা মে মাধবীদেবী বিবরং দাতুমর্হতি ॥
মনসা কর্মণা বাচা যথা রামং সমর্চয়ে।
তথা মে মাধবীদেবী বিবরং দাতুমর্হতি ॥
যথৈতৎ সত্যমুক্তং মে বেদ্মি রামাৎ পরং ন চ।
তথা মে মাধবীদেবী বিবরং দাতুমর্হতি ॥"

—উত্তরকাণ্ড, ৯৭ (১৪-১৬)

"রাম ভিন্ন অপর কারো চিন্তা পর্যন্ত আমি করি নাই, ইহা যদি সত্য হয় তবে মা ধরিত্রী! তুমি (দ্বিধা হ'য়ে) আমাকে প্রবেশপথ দাও। *যদি আমি কায়মনোবাক্যে সর্বদা কেবল রামের* অর্চনা ক'রে থাকি, 'রাম ভিন্ন আমি অন্য কাকেও জানি না'—একথা যদি সত্য ব'লে থাকি, তাহ'লে মা ধরিত্রী, আমাকে তোমার গর্ভে প্রবেশের জন্য গহ্বর ক'রে দাও।"

নিবেদন

শ্রীশঙ্কর রায়চৌধুরী

এখন আমার মন উন্মুক্ত গগন
রয়েছে একান্ত শান্ত, মগ্ন কিছুক্ষণ।
যারা এলো, যারা যায় মাটির ধরায়
বলুক সবাই যত কাল বয়ে যায়,
রহস্য আপনি থাক রহস্যে লুকায়ে,
তারারা থাকুক লেগে অনন্তের গায়ে।
ধরার অমৃত বিষ মেখেছে যে হিয়া
আমি আজ একমনে একা তারে নিয়া

দেখাব আত্মারে মোর ; কব কেন বল—
এতদিন ফাঁকি দিলি, কাড়িলি সকল।
আমার স্বরূপ দেখ, দেখ নিজে চেয়ে,
এতেও রহিলি ওরে আড়ালেতে যেয়ে।
আয়, আয়, ফিরে যাব আলোকের ঘরে,
আনন্দ অমৃত প্রেমে শান্তি যেথা ঝরে ॥

আধুনিকতার অগ্রদূত রাজা রামমোহন

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ

"রামমোহন রায়···জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ হ'লেও জীবনের আদিপর্বেই শুধুমাত্র প্রতিমাপূজার আদর্শই বর্জন করেননি, আরবী ও ফারসী ভাষায় এজাতীয় উপাসনাপদ্ধতির বিরুদ্ধে একটি প্রবন্ধও লিখেছিলেন; আর যেই মোটামুটি ইংরেজী জ্ঞান অর্জন করেছেন সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজীর মাধ্যমে তাঁর এই প্রতিমাপূজা-বর্জনের কথা খৃষ্টান জগৎকেও জানিয়ে দেন। আমি ঐকথা জানাতে দুঃখিত যে, এর ফলে তাঁকে বিশেষ অসুবিধায় পড়তে হয়"··· [খৃষ্টধর্মী জনসাধারণের প্রতি আবেদন] বলা বাহুল্য, ভূমিকাটি আত্মগোপন ক'রে লেখা।

এই ভূমিকায় উল্লেখিত রামমোহনের প্রবন্ধ 'তুহ্ফাৎ-উল-মুয়াহ্হিদীন' (১৮০৩-৪ খ্রী:) ত্রিশ বৎসর বয়সের সময় প্রকাশিত। ঐ ১৮০৩-এই তিনি মায়ের সঙ্গে দ্বিমতের ফলে কলকাতায় স্বতন্ত্রভাবে পিতৃশ্রাদ্ধ করেন। পরবর্তীকালে রংপুরে থাকার সময়ে তান্ত্রিক অবধূত হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর কাছে রামমোহন হিন্দুশাস্ত্র ও দর্শনের রীতিমত চর্চা করেছিলেন। মহানির্বাণতন্ত্রের সন্ধান ইনিই রামমোহনকে দিয়েছিলেন। শাক্তাদ্বৈত-বাদের চিন্তাধারার প্রভাব পরবর্তীকালেও রামমোহনের অন্তরে জাগ্রত ছিল বলেই মনে হয়। কারণ বৈষ্ণবধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে কটাক্ষ থাকলেও তন্ত্র সম্বন্ধে রামমোহনের বিরুদ্ধাচরণের কথা কিছু শুনতে পাওয়া যায় না। হরিহরানন্দের কোনো সম-আশ্রমী যে রামমোহকে তান্ত্রিক ব্রাহ্ম মনে করতেন, সে সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়েছেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

'বেদান্তদর্শন'-প্রকাশের পর রামমোহনের সঙ্গে তাঁর পরিজনবর্গের মতান্তরের কাহিনীটি তাঁর ধর্মচিন্তার ক্রমবিকাশের দিক থেকেও লক্ষণীয়। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'Translation of An Abridgment of the Vedant' গ্রন্থের ভূমিকায় রামমোহন লিখেছেন—"By taking the path which conscience and sincerity direct, I, born a Brahman, have exposed myself to the complainings and reproaches even of some of my relations, whose prejudices are strong, and whose temporal advantage depends upon present system."

এর পরের বৎসর ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দপ্রসাদের সঙ্গে মামলার সময় রামমোহনের পক্ষ থেকে তারিণীদেবীকে জেরা করার জন্য যে প্রশ্নাবলী তৈরি করা হয়, তাতে মাতা-পুত্রের বিরোধী মতামতের মাধ্যমে রামমোহনের চিন্তার স্বাতন্ত্র্য ফুটে উঠেছে—"আপনার পুত্র রামমোহনের ধর্মমতের জন্য তাহার সহিত আপনার কি বিবাদ ও মনান্তর হয় নাই, এবং আপনি যে-ভাবে হিন্দুধর্মের পূজা-অর্চনা করিতে ইচ্ছা করেন সেইসকল করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় প্রতিশোধস্বরূপ কি আপনি আপনার পৌত্রকে মোকদ্দমা করিতে প্ররোচিত করেন নাই? আপনি, বাদী, এবং আপনার অন্য পরিজনেরা কি রামমোহনের রচনাবলী ও ধর্মমতের জন্য তাঁহার সহিত সকল সম্পর্ক ত্যাগ করেন নাই? আপনি কি বারবার বলেন নাই যে, আপনি রামমোহনের সর্বনাশ সাধন করিতে চান, এবং

ইহাও কি আপনি বলেন নাই যে, ইহাতে পাপ হওয়া দূরে থাকুক, রামমোহন পূর্বপুরুষের আচার পুনরায় অবলম্বন না করিলে তাঁহার সর্বনাশসাধন করিলে পুণ্যই হইবে? আপনি কি সর্বসমক্ষে বলেন নাই, যে-হিন্দু প্রতিমাপূজা ত্যাগ করে তাহার প্রাণ লইলেও পাপ নাই? হিন্দুধর্মের প্রতিমাপূজা-সংক্রান্ত অনুষ্ঠানাদি করিতে কি রামমোহন প্রকৃতপক্ষে অস্বীকার করেন নাই?…এই মকদ্দমা আরম্ভ হইবার পর আপনি নিজে বিবাদীর কলিকাতাস্থ সিমলার বাড়ীতে আসিয়া কি বিগ্রহের সেবার জন্য কিছু জমি চান নাই? বিবাদী কি উহার পরিবর্তে দরিদ্রের সাহায্যের জন্য অনেক টাকা দিতে চাহেন নাই, এবং প্রতিমাপূজার জন্য কোনরূপ সাহায্য করিতে অস্বীকার করেন নাই? তখন কি আপনি বিবাদীর উপর অসন্তুষ্ট হইয়া আপনার অনুরোধ অগ্রাহ্য করাতে বিবাদীর উপর বিরক্তি প্রকাশ করেন নাই?"[৪]

শেষ অবধি অবশ্য তারিণীদেবীকে আদালতে যেতে হয়নি। কিন্তু রামমোহনের সঙ্গে তার মায়ের মতবিরোধের মধ্যে দুই পক্ষেরই আদর্শনিষ্ঠা লক্ষণীয়। পরবর্তীকালের ইতিহাসে কোনো একটিমাত্র আদর্শই একাধিপত্য লাভ করেনি।

"আমি হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টানাদি নানা সম্প্রদায়ের ধর্মমত ও ধর্মশাস্ত্রের গূঢ় আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি যে, ঈশ্বর একমাত্র, অদ্বিতীয় ও তিনিই উপাস্য, এই মূল মতে সকলেরই ঐক্য আছে, কেবল অবান্তর ভেদ লইয়া বিবাদ-বিসংবাদ।"[৫] 'তুহ্‌-ফাৎ-উল্‌-মুয়াহ্‌হিদীনে'র এই মন্তব্য থেকে তুলনামূলক ধর্মচিন্তায় রামমোহনের মূলসূত্রটির সন্ধান মেলে।

কিন্তু প্রতীক, প্রতিমা বা অবতারতত্ত্ব সম্বন্ধে রামমোহন সব ধর্মমতের পৌরাণিক অংশকে অস্বীকার করেছেন। মুণ্ডকোপনিষদের ইংরেজী অনুবাদের ভূমিকায় এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য—"An attentive perusal of this (Mundakopanishad) as well as the *remaining* books of the Vedanta will, I trust, convince every unprejudiced mind, that they, with great consistency inculcate the unity of God, instructing men, at the same time, in the pure mode of adoring Him in spirit. It will also appear evident that the Vedas, although they tolerate idolatry for those who are totally incapable of raising their minds to the contemplation of the invisible God of nature, yet repeatedly urge the relinquishment of the rites of idol-worship, and the adaptation of a pure system of religion on the express ground that the observance of idclatrous rites can never be productive of eternal beautitude."*—এ যেমন তাঁর বৈদিক ধর্ম সম্বন্ধে বক্তব্য, তেমনি ইস্‌লাম বা খৃষ্টধর্ম সম্বন্ধেও অন্যভাবে প্রযোজ্য।

সমস্ত সাম্প্রদায়িক মত-পার্থক্যের ঊর্ধ্বে রামমোহন ধর্মচেতনার দুটি মৌলসত্যকে

৪ রামমোহন রায়: ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৫ অনুবাদ: নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়: জীবনী দ্র.

* "আমার মনে হয়, মুণ্ডকোপনিষদ এবং বেদান্তের অপরাপর গ্রন্থরাশি নিবিষ্টভাবে অনুধাবন করলে প্রত্যেক নিরপেক্ষদৃষ্টি সুধীই এই নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন যে, এইসব শাস্ত্রই সর্বত্র সমভাবে এক ঈশ্বরের কথা প্রচারে রত এবং ঈশ্বরকে তাঁর মূল সত্তায় উপাসনার শিক্ষাই দিয়ে এসেছে। সেই সঙ্গে এও লক্ষণীয় যে, নিরাকার ভগবৎসত্তার ধ্যানে উন্নীত হ'তে যারা অক্ষম, তাদের জন্য বেদসমূহ প্রতিমাপূজায় স্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেও, বার বার এই প্রতিমাপূজা-পদ্ধতি পরিহার ক'রে বিশুদ্ধ আদর্শ গ্রহণের কথা এইজন্য বলেছে যে, প্রতিমাপূজা কখনো অনন্ত সৌন্দর্য ও কল্যাণের সন্ধান দিতে পারে না।"

আশ্রয় করেছিলেন—'মনুষ্যের যাবৎ ধর্ম দুই মূলকে আশ্রয় করিয়া থাকেন: এক এই যে সকলের নিয়ন্তা পরমেশ্বরেতে নিষ্ঠা রাখা, দ্বিতীয় এই যে পরস্পর সৌজন্যেতে এবং সাধু ব্যবহারে কালহরণ করা।'[৬] একথাও রামমোহন স্বীকার করতেন যে, 'প্রত্যেক দেবতার উপাসকেরা সেই ২ দেবতাকে জগৎ-কারণ ও জগতের নির্বাহকর্তা এই বিশ্বাস-পূর্বক উপাসনা করেন...।'[৭] তবু প্রতিমা-পূজা-বিরোধী মনোভাবই তাঁর রচনায় উদ্দিষ্ট। 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার' গ্রন্থে রামমোহনের বক্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়: "যাবৎ নামরূপময় মিথ্যা জগৎ সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া সত্যের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। যেমন, মিথ্যা সর্প, সত্য রজ্জুকে অবলম্বন করিয়া সত্যরূপে প্রকাশ পায়; বস্তুতঃ সে রজ্জু সর্প হয়, এমত নহে। সেইরূপ সত্যস্বরূপ যে ব্রহ্ম তিনি মিথ্যারূপ জগৎ বাস্তবিক হয়েন না! এই হেতু, বেদান্তে পুনঃ পুনঃ কহেন যে, ব্রহ্ম বিবর্তে, অর্থাৎ আপন স্বরূপের ধ্বংস না করিয়া প্রপঞ্চস্বরূপ দেবাদি স্থাবর পর্য্যন্ত জগদাকারে আত্মমায়ার দ্বারা প্রকাশ পায়েন। কিরূপে পণ্ডিতেরা লৌকিক কিঞ্চিৎ লাভের নিমিত্তে, তাঁহাকে পরিচ্ছিন্ন, বিনাশযোগ্য, মূর্ত্তিমান কহিতে সাহস করিয়া ব্রহ্মস্বরূপে আঘাৎ করিতে উদ্যত হয়েন? ইহা হইতে অধিক আশ্চর্য্য অন্য আর কি আছে যে, ইন্দ্রিয় হইতে পর যে মনঃ, মনঃ হইতে পর যে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে পর যে পরমাত্মা, তাঁহাকে বুদ্ধির অধীন যে মনঃ, সেই মনের অধীন যে পঞ্চেন্দ্রিয়, তাহার মধ্যে একেন্দ্রিয় যে চক্ষুঃ, সেই চক্ষুর গোচরযোগ্য করিয়া কহেন।"[৮]

সগুণ ব্রহ্মের নিরাকার-উপাসনা যে এই ভারতবর্ষেই বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত এবং খ্রীষ্টীয় ও ইসলাম ধর্মের অনুগামীরা যে অর্ধেক জগৎ জুড়ে এই উপাসনায় রত—একথা মনে করিয়ে দিয়ে রামমোহন বারংবার প্রতিমাপূজার বিরোধিতা করেছেন। শাস্ত্রোক্ত প্রমাণ সংগ্রহ ক'রে প্রতিমা- বা প্রতীক-উপাসনাকে দুর্বল অধিকারীর কর্তব্যরূপে নির্ধারণ করেছেন। তবু সব বিতর্কের অবসানে একটি প্রশ্ন থেকেই যায়—রাম- বা কৃষ্ণ-মূর্তিতে ঈশ্বরোপসনা ক'রে এ দেশের অগণিত সাধু সন্ত মহাপুরুষেরা জীবন্মুক্ত হয়েছেন। খ্রীষ্ট বা ক্রশ, মহম্মদ বা মসজিদ—এ সব ভগবৎ-প্রেরিত আধিকারিক পুরুষ বা প্রতীকচিহ্নের অবলম্বনে পৃথিবীময় মহৎ সত্যের উপলব্ধিমান সাধকশ্রেণী দেখা দিয়েছেন। এঁদের কাউকে দুর্বল অধিকারী মনে করলে ইতিহাসকেই অস্বীকার করা হয়। সেন্ট ফ্রান্সিস অফ আসিসি, সাধিকা রাবেয়া, কৃষ্ণপ্রাণা মীরাবাঈ, চৈতন্য বা রামকৃষ্ণ—বিভিন্ন পন্থায় পরমসত্যকে অন্তরে অনুভব ও প্রকাশ করেছেন। রামমোহনের যুক্তির মধ্যে তাই কোথাও ফাঁক আছে—একথা মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

আসলে মানবমানসের বিভিন্ন স্তর-অনুযায়ী সত্যের বিচিত্র প্রকাশ দেখা দেয়, এই কথাটি মনে না থাকলে প্রত্যেকটি মতবাদই স্বয়ং-সম্পূর্ণতার দাবী ক'রে বসতে পারে। সেক্ষেত্রে সাকারবাদীদের গোঁড়ামির মতোই নিরাকার-বাদের গোঁড়ামিও একান্ত স্বাভাবিক।

৬ ব্রহ্মোপাসনা—রামমোহন-গ্রন্থাবলী (৪) সা. প. স. পৃঃ ৫১

৭ অনুষ্ঠান—তদেব, পৃঃ ৬৮

৮ রামমোহন গ্রন্থাবলী—১ সাহিত্য পরিষৎ সং, পৃঃ ১৬৪

তাছাড়া সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা আর অদ্বৈত-বাদ ঠিক এক জিনিস নয়। রামমোহনের নিরাকার-উপাসনাও অদ্বৈততত্ত্বের চরম শিখরে এসে উপাস্য-উপাসকের ভেদ সব সময় মুছে ফেলতে পারে না। বিভিন্ন ধর্মে এক ঈশ্বরের উপাসনার কথা প্রমাণ করতে তিনি যতটা উৎসাহী, অদ্বৈত-বেদান্ত-প্রচারে ততটা নন।

স্বয়ং ব্রহ্মজ্ঞানের প্রচারক হ'লেও রাম-মোহনের জীবন ও কর্মপদ্ধতিতে সব সময় তার সঙ্গতি দেখতে না পেয়ে যাঁরা প্রশ্ন করেছিলেন, তাঁদের দু'-একটি বক্তব্য ও রামমোহনের উত্তর এখানে উদ্ধৃতি-যোগ্য—(১) "শুনিতে পাই যে কোনো ২ ব্যক্তি কহিয়া থাকেন যে তোমরা ব্রহ্মোপাসক তবে শাস্ত্রপ্রমাণ সকল বস্তুকে ব্রহ্ম বোধ করিয়া পঙ্ক চন্দন শীত উষ্ণ আর চোর সাধু এ সকলকে সমান জ্ঞান কেন না কর। ইহার উত্তর এক-প্রকার বেদান্তসূত্রের ভাষাবিবরণের ভূমিকাতে ···লেখা গিয়াছে যে বশিষ্ঠ পরাশর সনৎকুমার ব্যাস জনক ইত্যাদি ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ হইয়াও লৌকিক জ্ঞানে তৎপর ছিলেন আর রাজনীতি এবং গৃহস্থব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা যোগ-বাশিষ্ঠ মহাভারতাদি গ্রন্থে স্পষ্টই আছে। ভগবান কৃষ্ণ অর্জ্জুন যে গৃহস্থ তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপ গীতার দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান দিয়াছিলেন এবং অর্জ্জুনো ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া লৌকিক জ্ঞানশূন্য না হইয়া বরঞ্চ তাহাতে পটু হইয়া রাজ্যাদি সম্পন্ন করিয়া-ছিলেন। বশিষ্ঠদেব ভগবান্ রামচন্দ্রকে উপদেশ করিয়াছেন। বহির্ব্যাপারসংরম্ভো হৃদি সঙ্কল্প-বর্জ্জিতঃ। কর্ত্তা বহিরকর্ত্তান্তরেবং বিহর রাঘব॥ বাহ্যেতে ব্যাপারবিশিষ্ট হইয়া কিন্তু মনেতে সঙ্কল্পবর্জ্জিত হইয়া আর বাহ্যেতে আপনাকে কর্ত্তা দেখাইয়া আর অন্তঃকরণে আপনাকে অকর্ত্তা জানিয়া হে রাম লোকযাত্রা নির্ব্বাহ কর। রামচন্দ্রো ঐ সকল উপদেশের অনুসারে আচরণ সর্ব্বদা করিয়াছেন।"[১]

(২) ১৮২২-এর ৬ই এপ্রিল 'সমাচার-দর্পণ' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি পত্রে রামমোহনের উদ্দেশে চারটি প্রশ্ন দেখা দেয়, মূল প্রশ্নটি এই—"যাহারা বেদস্মৃতি পুরাণাদ্যুক্ত স্ব স্ব জাতীয় সদাচার সদ্ব্যবহার বিরুদ্ধ কর্ম্ম করেন অথচ ভ্রমাত্মক বুদ্ধিতে আপনাকে আপনিই ব্রহ্মজ্ঞানী করিয়া মানেন তাহারদিগের তবে অনাদর-পুরঃসর যজ্ঞসূত্রবহন কেবল বৃদ্ধব্যাঘ্র মার্জ্জার-তপস্বীর ন্যায় বিশ্বাসকারণ অতএব এতাদৃশাচার-বন্ত ব্যক্তিদিগের···কি বক্তব্য।"

উত্তরে রামমোহন তাঁর যুক্তিনিষ্ঠ শাণিত ভঙ্গীতে লিখেছেন—"বস্তুত আপন ২ উপাসনানুসারে শাস্ত্রে যাহাকে সদাচার কহিয়াছেন তাহা শাস্ত্রের অবহেলাপূর্ব্বক পরিত্যাগ যে করে অথবা বাধকপ্রযুক্ত তাহার সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানে ত্রুটি হইলে মনস্তাপ ও তত্তৎ-শাস্ত্রবিহিত প্রায়শ্চিত্ত যে না করে তাহার যজ্ঞোপবীত ব্যর্থ হয় এবং যে আপনি স্বধর্ম্মহীন হইয়া অন্য স্বধর্ম্মহীনকে বৃথা যজ্ঞোপবীতধারী বলে এমতরূপ নিন্দকের এবং স্বদোষদর্শনে অন্ধের যজ্ঞসূত্রধারণ বৃথাও হইতে পারে। ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী বৃদ্ধব্যাঘ্র বিড়ালতপস্বীর যে দৃষ্টান্ত লিখিয়াছেন তাহা কাহার প্রতি শোভা পায় ইহা বিজ্ঞ ব্যক্তিসকলে বিবেচনা করুন। নাসিকাতে সবিন্দু তিলক যাহার সেবাতে প্রায় অর্দ্ধ দণ্ড ব্যয় হয় ও ভূরিকাল হস্তে মালা যাহাতে যবনাদির স্পর্শাস্পর্শবিচার নাই এবং লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে অত্যন্ত বিনয় পরোক্ষে আপন জ্ঞাতিবর্গ পর্য্যন্তেরও

---

১ ঈশোপনিষৎ (ভূমিকা): সা. প. স. রামমোহন-গ্রন্থাবলী—১ (১৮১৬), পৃঃ ২০১

নিন্দা এবং সর্ব্বদা এই ভাব দেখান যেন এইক্ষণে পূজা সাঙ্গ করিয়া উত্থান করিলাম ও বাহেতে কেবল দয়া ও অহিংসা এই সকল শব্দ সর্ব্বদা মুখে নির্গত হয় কিন্তু গৃহমধ্যে মৎস্যমুণ্ড বিনা আহার হয় না। আর এক ব্যক্তি মহানির্ব্বাণের এই বচনে নির্ভর করেন। 'যেনোপায়েন দেবেশি লোকঃ শ্রেয়ঃ সমশ্নুতে। তদেব কার্য্যং ব্রহ্মজ্ঞেরেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥' অর্থাৎ যে ২ উপায় দ্বারা লোকের শ্রেয়ঃপ্রাপ্তি হয় তাহাই কেবল ব্রহ্মনিষ্ঠের কর্ত্তব্য এই ধর্ম্ম সনাতন হয়। এবং তদনুসারে বাহে কোন প্রতারকতা কি বেশে কি আলাপে কি ব্যবহারে যাহাতে হঠাৎ লোকে ধার্ম্মিক ও সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব জ্ঞান করিয়া থাকে তাহা না করিয়া অন্যের বিরুদ্ধে চেষ্টা না করে এবং তন্ত্রাদিবিহিত মৎস্যমাংসাদি ভোজন যাহা দেখিলে অনেকের অশ্রদ্ধা হয় তাহাও স্পষ্টরূপে করিয়া থাকে এই দুইয়ের মধ্যে কে বিড়ালতপস্বী হয় ইহা কিঞ্চিৎ প্রণিধান করিলেই সুবোধ লোকেরা জানিবেন।"[১০]

উদ্ধৃত রচনাংশগুলি রামমোহনের মনন-যুদ্ধের সামান্য নমুনামাত্র। কিন্তু সমসাময়িক কালের বাংলাসাহিত্যে এই বুদ্ধিদীপ্তির যে কতো প্রয়োজন ছিল তা রামমোহনের প্রতিপক্ষদের অধীর উত্তেজনা দেখেই অনেকটা অনুমান করা যায়। রামমোহনের কাল থেকে যতই দূরে থাকি না কেন, একথা বেশ বোঝা যায় যে, সমকালীন বাঙালীমানসের বহু ঊর্ধ্বে তাঁর উত্তুঙ্গ অবস্থান। তবু রামমোহনের ব্রহ্মজ্ঞানী সত্তা সম্বন্ধে অধ্যাত্ম-আদর্শের বিচারে দু'-একটি প্রশ্ন থেকে যায়। রামমোহন অবশ্য নিজেই 'সম্যগনুষ্ঠানাক্ষম তজ্জন্যমনস্তাপ-বিশিষ্ট'।[১১] এ মনস্তাপ আন্তরিক, সন্দেহ নেই। একথাও স্বীকার্য যে নানা আপাত-অসঙ্গতি সত্ত্বেও রামমোহনের চিত্তবীণার মূলসুরটি আন্তরিক ব্রহ্মজিজ্ঞাসার। তাঁর রচিত ব্রহ্মসঙ্গীতগুলিও তার অন্যতম প্রমাণ।

রামমোহনের অধ্যাত্ম-আদর্শের মানদণ্ডে তাঁর বাস্তব জীবনযাত্রা ও পরিপূর্ণ ব্রহ্মোপলব্ধির মাঝে যে অনেকটা ব্যবধান একথা প্রকারান্তরে তিনিও স্বীকার করেছেন। তাঁর জীবনাদর্শ মূলতঃ ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের আদর্শ। ঈশোপনিষদের ভূমিকায় তিনি নিজেই সেকথা স্পষ্ট করেছেন—"যদি কহ আত্মার উপাসনা শাস্ত্রবিহিত বটে এবং দেবতাদের উপাসনাও শাস্ত্রসম্মত হয় কিন্তু আত্মার উপাসনা সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য আর দেবতার উপাসনা গৃহস্থেরো কর্ত্তব্য হয়। তাহার উত্তর। এইরূপ আশঙ্কা কদাপি করিতে পারিবে না। যেহেতু বেদে এবং বেদান্তশাস্ত্রে গৃহস্থেরো আত্মোপাসনা কর্ত্তব্য এরূপ অনেক প্রমাণ আছে…। সৎপ্রতিগ্রহাদি দ্বারা যে গৃহস্থে ধনের উপার্জ্জন করেন আর অতিথিসেবাতে তৎপর হয়েন নিত্যনৈমিত্তিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে রত হয়েন আর সর্ব্বদা সত্য বাক্য কহেন আত্মতত্ত্ব ধ্যানেতে আসক্ত হয়েন এমৎ ব্যক্তি গৃহস্থ হইয়াও মুক্ত হয়েন অর্থাৎ কেবল সন্ন্যাসী হইলেই মুক্ত হয়েন এমৎ নহে কিন্তু এরূপ গৃহস্থেরো মুক্তি হয়।[১২]

এই আদর্শের মানদণ্ডেই প্রশ্ন করা চলে যে, যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ জাগতিক বিষয়কর্মে কতদিন লিপ্ত থাকতে পারেন? সমগ্র জগৎকে ব্রহ্মময় উপলব্ধি ক'রে বাইরের সব কর্মপ্রচেষ্টাই তো সংহৃত হয়ে তাঁর অদ্বৈতসত্তায় আসীন হবার

---

১০ চারি প্রশ্নের উত্তর: সা. প. স, রামমোহন-গ্রন্থাবলী—৬, পৃঃ ১৫

১১ তদেব, পৃঃ ৬

১২ ঈশোপনিষৎ, পৃঃ ১৯৮-১৯৯

কথা। অদ্বৈতসিদ্ধির পরে লোককল্যাণের জন্য কর্মপ্রচেষ্টা আর বহির্মুখী নানা কাজে লিপ্ত থেকে অদ্বৈত বা একব্রহ্মবাদের পথে অগ্রসর হওয়া—এ দুয়ের পার্থক্য অনেক। দ্বিতীয় আদর্শটি সাধারণ মানবজীবনের চেয়ে অনেক শ্রেয় আদর্শ। তবু জনক যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির সঙ্গে এই দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের তুলনা চলে না। রামমোহন অবশ্য এমন কোনো দাবী নিজে করেননি, এঁদের উদাহরণ দিয়েছেন মাত্র। কিন্তু যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানীর আদর্শ যে তাঁর জীবনে দেখা যায় না, সে কথাটিও স্মরণীয়। অনেক সময় অতিস্তুতির দ্বারা যে কোনো ব্যক্তি বা মতাদর্শের যথার্থ পরিপ্রেক্ষিত আমরা হারিয়ে ফেলি। রামমোহনের মতো অনন্য-সাধারণ ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জনের সম্ভাবনা আরো বেশী। (ক্রমশঃ)

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ

স্বামী জীবানন্দ

রামকৃষ্ণানন্দ নামে তব পরিচিতি—
যোগ্যতম আখ্যা ইহা জানে সর্বজন,
কাশীপুরে ঠাকুরের সেবা অতুলন—
আত্মবৎসেবা করি আত্ম-অবলুপ্তি।

শরণাগতিতে হয় ভক্তিভাবে স্থিতি,
তাহার চূড়ান্ত রূপ তোমার জীবন।
প্রেম-ভরে সর্বকর্ম করিয়া সাধন
রামকৃষ্ণ-যুগযজ্ঞে দিলে আত্মাহুতি!

অতি আপনার জন ভাবি ভগবানে
পূর্ণ হবে সবে তব পদানুসরণে।

স্বামী বিবেকানন্দ ও আধ্যাত্মিক সংহতি*

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামী নির্বেদানন্দ

বিবেকানন্দ মীরাট থেকে দিল্লী গেলেন। সেখান থেকে বেরিয়ে অধিকাংশ রাস্তা পায়ে হেঁটে রাজপুতানা, কাটিহার, বোম্বাই, মহীশূর, কোচিন, মালাবার, ত্রিবাঙ্কুর এবং মাদ্রাজ হয়ে ৮৯২ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে ভারতের সর্বদক্ষিণ-প্রান্তে রামেশ্বরে ও কন্যাকুমারীর পবিত্র মন্দিরে এসে পৌছুলেন। সঙ্ঘরূপ সোনার খাঁচা থেকে বেরিয়ে মুক্ত সিংহের মতো তিনি স্বাধীনভাবে তেজোদৃপ্তপদে দেশের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিচরণ করেছেন। পথে বহুবার তাঁকে অনাহারের ও সমূহ জীবনসংশয়ের সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল, কিন্তু তাতে তাঁর শান্ত, স্থির মানস-সায়রে চাঞ্চল্যের তরঙ্গ কখনো ওঠেনি। মরু-ভূমিতে ও অরণ্যপথে তিনি একাকী ভ্রমণ করেছেন, ধর্মোন্মাদ তান্ত্রিকদের কবলে পড়ে অল্পের জন্য বেঁচে গেছেন, কোথাও কখনো বা অনাহারে প্রায় মরণের দ্বারে গিয়ে পৌছেছেন, কত হৃদয়হীন অপরিচিতের বিদ্রূপ এবং নিন্দা-বাদও তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। তবু দুঃসাহসিক পরিব্রাজক-জীবনের এই বিপদসঙ্কুল পথের ওপর দিয়ে তিনি সব বাধা পায়ে দলে নির্ভয়ে এগিয়ে গেছেন। ধনী ব্যক্তিদের গৃহে তিনি যখন অতিথিরূপে বাস করেছেন, তখন তাঁদের সহৃদয়তায় কখনো আনন্দ-উদ্বেল হয়ে ওঠেননি, গুণমুগ্ধ অভ্যাগতদের শ্রদ্ধায় ত্যাগের কঠোর পথ থেকে বিন্দুমাত্র বিচলিতও হননি। দণ্ড- ও ভিক্ষাপাত্র-ধারী, মুণ্ডিতমস্তক, গৈরিক-বসন এই সন্ন্যাসী সামন্ত রাজাদের আতিথেয়তা যতখানি প্রসন্নতা ও পরিতৃপ্তি নিয়ে গ্রহণ করেছেন, দীন পারিয়ার আতিথ্যও গ্রহণ করেছেন ঠিক ততখানি তৃপ্তি ও আনন্দের সঙ্গে। আবার যাঁরা তাঁকে প্রত্যাখান করেছেন, তাঁদের দ্বার থেকেও ফিরে এসেছেন সমপরিমাণ মানসিক স্থৈর্য নিয়েই। প্রায় তিন বছর পরে 'সন্ন্যাসীর গীতি'[১] নামক যে কবিতাটি তিনি লিখেছিলেন, তাতে এই মানসিক স্থৈর্যের আভাস কিছুটা পাওয়া যায়:

"ভেবো না দেহের হয় কিবা গতি,
থাকে কিম্বা যায়—অনন্ত নিয়তি—
কার্য অবশেষ হয়েছে উহার,
এবে ওতে প্রারব্ধের অধিকার;
কেহ বা উহারে মালা পড়াইবে,
কেহ বা উহারে পদ-প্রহারিবে,
চিত্তের প্রশান্তি ভেঙো না কখন,
সদাই আনন্দে রহিবে মগন;
কোথা অপযশ কোথা বা সুখ্যাতি?
স্তাবক-স্তাব্যের একত্ব-প্রতীতি:
অথবা নিন্দুক-নিন্দ্যের যেমতি,
জানি এ একত্ব-আনন্দ অন্তরে
গাও হে সন্ন্যাসী নির্ভীক অন্তরে—
ওঁ তৎ সৎ ওঁ॥"

তিনি ছিলেন দুর্বলতার ঠিক বিপরীত পর্যায়ের ধাতুতে গড়া। মুক্তাত্মা মহাশক্তিমান প্রকৃতিবিজয়ী পুরুষের ভূমিকায়, মানবজাতির আচার্যের ভূমিকায় তাঁর শির সর্বদা সমুন্নত থাকত। পৃথিবীর কারো কাছে কখনো তিনি

১ মূল কবিতাটি, "The Song of the Sannyasin", ইংরেজীতে লিখিত।

* লেখকের মূলগ্রন্থ Sri Ramakrishna & Spiritual Renaissance হ'তে অনূদিত—সঃ

নতজানু হননি। রাজা-মহারাজাদের সামনেও তিনি যথেচ্ছ আচরণ করতেন, নির্মম সমালোচনা করতেন তাঁদের জীবনযাত্রা-প্রণালীর। কোন পূর্ব-সংস্কার, কোন প্রথা, জাতি বা সংস্কারগত বিভেদের কোন চিন্তাই এই মুক্ত সিংহের নিঃশঙ্ক বিহারে বাধা সৃষ্টি করতে পারত না। কি ধর্মান্ধতা, কি উৎকট পাশ্চাত্য ভাবানুপ্রাণনা—কোনটাই তাঁকে সীমাবদ্ধ ক'রে রাখতে পারত না; যে-কোন প্রচলিত রীতি বা উদ্ভট চিন্তার বন্ধন হ'তে সম্পূর্ণ মুক্ত থেকে তিনি নিজের আধ্যাত্মিক উপলব্ধির ও অন্তর্ভেদী যুক্তির আলোক-সম্পাতে নিজের পথ নিজেই খুঁজে বের ক'রে নিয়েছিলেন। এমনকি শাস্ত্রের উদ্ধৃতি সম্বন্ধেও তাঁর নিজস্ব মতামত ছিল, এবং প্রসিদ্ধ ভাষ্যকারদের বক্তব্যের ওপরও তিনি পুরোপুরি নির্ভর ক'রে থাকতে চাইতেন না। তবু অসাধারণ ব্যক্তিত্ববলে তিনি সমীপাগত সকলেরই কাছে স্বমত প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন। তাঁর অকপট ভালবাসা ও সকলের প্রতি সহানুভূতি, তাঁর পবিত্রতা ও চারিত্রিক দৃঢ়তা, তাঁর গাম্ভীর্য ও স্থৈর্য এবং সর্বোপরি তাঁর তেজোদ্দীপ্ত আধ্যাত্মিকতা দেখে লোকে মুগ্ধ হয়ে যেত। বাইরে থেকে কখনো কখনো তাঁকে বজ্রের মতো কঠোর, ভয়ঙ্কর ব'লে মনে হ'লেও অন্তরে তিনি সব সময় নয়নাভিরাম কুসুমের মতোই মনোরম ও কোমল ছিলেন। আত্মার পরিপূর্ণ স্বাধীনতাসঞ্জাত তাঁর দৃপ্ত নির্ভীক আচরণকে কখনো কখনো অযথা দাম্ভিকতা ব'লে মনে হ'লেও একটু ঘনিষ্ঠভাবে দেখলেই চোখে পড়ত তাঁর অন্তরে প্রবাহিত সর্বানুস্যূত প্রেম ও বিনয়ের চিরন্তন ফল্গুধারা। মানবপ্রেম ও আধ্যাত্মিক ভাবাবেগে তাঁর হৃদয় কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে থাকত। ক্ষুরধার বুদ্ধির সঙ্গে হৃদয়ের এই সংযোগই বহু ভাগ্যবানের অন্তরে, এমনকি মহীশূর ও আলোয়ারের মহারাজার মতো ভারতের সর্বোচ্চ শ্রেণীর লোকের অন্তরেও একটা আজীবনস্থায়ী ছাপ রেখে গিয়েছিল।

ঈশ্বর ও নররূপী ঈশ্বরের জন্য তাঁর সর্বগ্রাসী প্রেম ছাড়াও তাঁর হৃদয়ে ছিল জ্ঞানের সীমাহীন বিস্তারের জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা। তাঁর কাছে ঐহিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের পার্থক্য চিরতরে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। জ্ঞানের প্রত্যেকটি বিভাগই তো মানুষের সঙ্গে জড়িত, আর মানুষ তো স্বরূপতঃ ভগবান! মানুষ বলতে কয়েকটা আবরণের সমষ্টি বোঝায়—দৈহিক আবরণ, বৌদ্ধিক আবরণ ও আধ্যাত্মিক আবরণ। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিষয়বস্তুর মূলাগ্রভাগগুলি মানুষের অভ্যন্তরস্থ ভগবানের ওপর আরোপিত এই আবরণগুলির যে-কোন একটিকে স্পর্শ ক'রে রয়েছে। রাজনীতি ও অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান ও নৃতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব ও প্রাণিতত্ত্ব ইতিহাস ও জীবনী, জড়বিজ্ঞান ও যুক্তিমূলক দর্শন—এ সবের ভেতর দিয়ে লেখক মানুষের এক একটা আংশিক ধারণা, জ্ঞানের এক একটা বিশেষ দিক ফুটিয়ে তোলেন। বিবেকানন্দ কিন্তু উঠে-পড়ে লেগেছিলেন এগুলির ভেতর একটা সামঞ্জস্য বিধান করতে, মানুষের ঈশ্বরস্বরূপতারূপ বৈদান্তিক জ্ঞানের সঙ্গে এগুলিকে মিলিয়ে দিতে; আর এভাবে মানুষের ব্যক্তিত্ব নামে পরিচিত জটিল হেঁয়ালিটির একটা ব্যাপক, নিখুঁত সর্বাঙ্গীণ ছবি জগতের সামনে তুলে ধরতে। এজন্যই দেখা যেত হিন্দু দর্শনশাস্ত্র তিনি যতখানি মনোযোগ দিয়ে পড়েছেন ততখানি মনোযোগ দিয়েই পড়েছেন ফরাসী উপন্যাস। রাজপুতানার অন্তর্গত খেতড়িতে একজন প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ

পণ্ডিতের কাছে কিছুদিন তিনি ব্যাকরণ পড়েছিলেন, আবার আমেদাবাদে থাকার সময় মনোনিবেশ করেছিলেন জৈন- ও মুসলমান-সংস্কৃতিবিষয়ক পুস্তকপাঠে; কাঠিয়াওয়ারের পোরবন্দরে থাকার সময় প্রায় নয় মাস ব্যাপৃত ছিলেন হিন্দুশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করতে, আবার আলোয়ারে এসে উদ্বেগভরা চিন্তায় মগ্ন হয়েছিলেন পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক নির্ভুল নিশ্চয়তায় নিষ্ঠাবান ভারতীয় ঐতিহাসিকগণের একটা সংস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবে।

তবে জ্ঞান আহরণের জন্য নিজেকে তিনি শুধু গ্রন্থের সীমাতেই আবদ্ধ রাখতেন না। গ্রন্থ থেকে জ্ঞান-আহরণে তাঁর যতটা ঔৎসুক্য ছিল, ততটা ঔৎসুক্য নিয়েই তিনি চারপাশের জীবন্ত মানুষের নিকট হ'তে জ্ঞান আহরণ করতেন। তাঁর জ্ঞান-গ্রহণেচ্ছু উন্মুক্ত হৃদয় দীনতম লোকের কাছ থেকেও জ্ঞান আহরণ করতে দ্বিধা করত না। হিমাচলবাসী নিরক্ষর পার্বত্য জাতির মধ্যে স্ত্রীলোকদের এককালে বহু স্বামী গ্রহণের প্রথা প্রচলিত আছে; একই পত্নীর উপর অনেকের সাধারণ অধিকারের মধ্যে প্রকট স্বার্থশূন্যতার যুক্তি দেখিয়ে কিভাবে এই অসঙ্গত প্রথাকে সমর্থন করা যায় তা তিনি তাদের কাছে শিখেছিলেন। রাজপুতানার মরু-অঞ্চলে এক সামন্ত রাজার প্রাসাদে একজন সাধারণ নর্তকীর গাওয়া আবেগময় সঙ্গীতের মাধ্যমে সমদর্শিতা সম্বন্ধে সজাগকারী জ্ঞানালোক পেয়ে তিনি অতিমাত্রায় বিস্মিত হয়েছিলেন। তাঁর চিন্তার মধ্যে যা কিছু কঠিন ও কেলাসিত হয়ে সংস্কার-রূপে ছিল, এভাবে নানাস্থানে নানাজনের কাছে থেকে বিভিন্ন শিক্ষালাভ করার ফলে তা সবই দ্রবীভূত হয়ে যাওয়ায় এমন একটি অবস্থা তাঁর হয়েছিল যে, হীনতম পাপীর অন্তরেও তিনি সাধুবৃত্তির স্পন্দন অনুভব করতে পারতেন। মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের কথা তিনি গুরুর মুখে শুনেছিলেন, আধ্যাত্মিক স্বজ্ঞা সহায়ে ইতঃপূর্বে নিজ শুদ্ধ হৃদয়ে তা উপলব্ধিও করেছিলেন। এখন সে-সত্য তাঁর দৃষ্টিপথে দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠল, এমনকি দুর্বৃত্ত ও দুরাচারদের ভেতরেও এই দেবত্বকে তিনি স্পষ্ট দেখতে পেতেন, তাদের বহিরাচরণ এই দৃষ্টিকে অবরোধ করতে পারত না।

তাছাড়া ভারতের জনগণের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন সম্বন্ধে নিজের প্রত্যক্ষলব্ধ মূল্যবান জ্ঞানও তাঁর কিছু কম হয়নি। বিভিন্ন প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্যে এবং সম্পূর্ণ বিভিন্ন চিন্তায় ও জীবনযাত্রায় বৈচিত্র্যময় ভারতের বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন জাতির ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনগণকে তিনি গভীর অভিনিবেশ নিয়ে পর্যবেক্ষণ ক'রে এসেছেন। তাঁর দক্ষিণভারত-পর্যটন যখন শেষ হ'ল, ততক্ষণে তাঁর সন্ধানী দৃষ্টি হিন্দুভারতের সাংস্কৃতিক কাঠামোর পুরোটাই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ ক'রে ফেলেছে। ততদিনে তিনি উপলব্ধি করেছেন যে, যে-সব অসংখ্য বহু-বিচিত্র সমাজাদর্শ দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে তার সবগুলিই হ'ল কয়েকটি মূলনীতিরই বিভিন্নভাবে বিন্যস্ত বিবিধ আকারমাত্র, আর সেই মূল নীতিগুলিও ভারতের প্রাচীন সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একই আধ্যাত্মিক ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলে এই সত্যটি তাঁর কাছে প্রকট হয়ে উঠল যে, কোন কেন্দ্রগত একত্ব শত-সহস্র বৈচিত্র্যকেও বুকে ঠাঁই দিতে পারে। তিনি বুঝলেন, বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্বরূপ সত্যটি শুধু যে বিভিন্ন ধর্মমত সম্বন্ধেই প্রযোজ্য (যা তাঁর গুরু

প্রত্যক্ষ ক'রে প্রমাণিত ক'রে গেছেন,) তা নয়, সমগ্র প্রকৃতিই এই নিয়মে পরিচালিত হচ্ছে ; মানুষের সামাজিক প্রথাগুলিকেও নিয়ন্ত্রণ করছে এই একই নিয়ম।

সমাজবিজ্ঞানের একজন উদাসীন ছাত্র, সৌখীন তথ্যান্বেষী বা সমাজতত্ত্বের কাল্পনিক আদর্শ নিয়ে ব্যস্ত একজন অনাসক্ত বৈজ্ঞানিক মাত্র ছিলেন না তিনি ; উদাসীন দর্শকের মতো পর্যটনকারী তো নয়ই। তাঁর বুদ্ধি যখন তথ্যরাজি সংগ্রহ ক'রে সেগুলি বিশ্লেষণ করতে ব্যস্ত, তাঁর হৃদয় তখন জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছিল পর্যটন-পথের চারপাশে দেখা দুঃখকষ্ট-জর্জরিত লোকগুলির প্রতি প্রবল সহানুভূতির বেদনায়। সামাজিক অন্যায়ের বীভৎস প্রথার পায়ে বলি-প্রদত্ত এই সব অসহায় পদদলিত জনগণের মর্মন্তুদ দুঃখের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ে তাঁর সারা দেহমনে আগুন জ্বলে উঠল। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস তিনি দরিদ্র, অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন মাতৃভূমির দিকে দিকে ঘুরে বেড়িয়েছেন, বিশ্রামের বা নিদ্রার অবসর প্রায়ই জোটেনি, আর সব সময় গভীরভাবে চিন্তা করেছেন কিভাবে এই দৈন্য-জর্জরিত পতিত জনগণের উন্নতি-বিধান করা যায়। বিক্ষুব্ধ হৃদয়ের মধ্যে এই দাবদাহ পুরে রেখে তিনি ভারতের সর্বদক্ষিণ প্রান্তে গিয়ে পৌছুলেন। সেখানে কুমারিকা অন্তরীপে দেবী কন্যাকুমারীর পায়ে ভক্তি-শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন, তারপর সাঁতার দিয়ে গিয়ে উঠলেন ভারতের মূল ভূভাগ হ'তে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন সমীপবর্তী একটি শিলাখণ্ডে। অতি নির্জন এই শিলাখণ্ডের ওপর চারিদিকের সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে বেষ্টিত হয়ে ব'সে মাতৃ-ভূমির দিকে ফিরে চাইলেন তিনি ; তাঁর মানসপটে ভেসে উঠল কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ের বেদনায় ভরা গোটা ভারতের চিত্র। গভীর প্রেম, অসীম সহানুভূতি ও অনন্ত হতাশার তীব্র আবেগ একই সঙ্গে তাঁর হৃদয়ে উদ্বেলিত হয়ে উঠল ; তারপর সহসা সে হৃদয় নিস্পন্দ হয়ে গেল। সেই নিষ্কম্প নিস্তব্ধতায় আধ্যাত্মিক স্বজ্ঞার আলোকোদ্ভাসে ঝলমল ক'রে উঠল তাঁর চিত্ত, আর সে-আলোকে স্পষ্টরূপে নির্ভুলভাবে তিনি দেখতে পেলেন তাঁর চলার পথ। একটা যবনিকা সরে গেল, চোখের সামনে ভারতের সত্যস্বরূপ ফুটে উঠল ; তার যুগ-যুগ-আগত সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত শক্তি যে কতখানি, তার বর্তমান অবনতির কারণ যে কি, তা সবই পরিষ্কারভাবে তিনি দেখতে পেলেন। দেখলেন, গোটা জাতটা যেন একটা বিশালকায় দৈত্যের মতো নিদ্রামগ্ন হয়ে পড়ে রয়েছে ; নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার জন্য তার প্রয়োজন শুধু আধ্যাত্মিক জাগরণ। আর জাতির এই মোহনিদ্রা কাটিয়ে দিয়ে কিভাবে তাকে জাগাতে হবে, তাও তিনি স্পষ্ট দেখতে পেলেন। হৃদয় ভরে গেল। বছরের পর বছর নিষ্ফল অনুসন্ধানের পর এতদিনে তিনি তাঁর বহু-আকাঙ্ক্ষিত নির্জন একটি সাধন-পীঠ খুঁজে পেয়েছিলেন ; তবু নিজ পরিকল্পনাকে কাযে পরিণত করার জন্য কালবিলম্ব না ক'রে তিনি সে-পীঠ ছেড়ে উঠে পড়লেন, সেখান থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে এসে রামনাদ ও পণ্ডিচেরী হয়ে নিকটতম প্রদেশের রাজধানী মাদ্রাজের দিকে অগ্রসর হ'লেন।

এখানে একদল নিঃস্বার্থহৃদয় উৎসাহী যুবক আকৃষ্ট হয়ে তাঁর কাছে সমবেত হলেন। স্বামীজী তাঁদের হৃদয়ে মাতৃভূমির সেবার পরিপূর্ণ আত্মোৎসর্গরূপ আদর্শের আগুন জ্বালিয়ে দিলেন। এই উৎসাহী শিষ্যদল অসীম শ্রদ্ধাভরে সেই মহদুদ্দেশ্যসাধনে ব্রতী হয়ে স্বামীজীর নির্দেশাধীনে কাজ আরম্ভ করলেন ;

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এঁরা স্বামীজীর অনুগত ছিলেন। বহু শিক্ষিত ও উৎসাহী লোকের আবাসভূমি দাক্ষিণাত্যের এই মহানগরীতে স্বামীজী তাঁর প্রচারোদ্দেশ্যে আমেরিকাগমনের সঙ্কল্প প্রকাশ করলেন।

বিশ্বপ্রদর্শনী উপলক্ষে আমেরিকার চিকাগো শহরে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ধর্মমহাসভার অধিবেশন হবার কথা স্বামীজী মাদ্রাজেই আগে শুনেছিলেন। বিভিন্ন ধর্মের বাছা বাছা প্রতিনিধিদের এই বিরাট সম্মেলনে তিনি নিজেকে উজাড় ক'রে দেবার সঙ্কল্প করেছিলেন। তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস ছিল, হিন্দুরা আবার যদি গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে উঠতে চায়, তাহলে প্রাচীন ঋষিদের ধর্মবিশ্বাসকে গতিশীল ক'রে তোলা একান্ত প্রয়োজন; হিন্দুধর্মকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রচারশীল হ'তেই হবে। তাঁর মনে হ'ল, বৌদ্ধ- ও হিন্দু-ধর্মপ্রচারের যুগ হ'তে হিন্দু ভারতের যে আধ্যাত্মিক সম্পদ এতকাল ধরে গুহায় ও অরণ্যে, মন্দিরে ও চতুষ্পাঠীতে লুকানো রয়েছে, জগতের সকলকেই তার সন্ধান দেওয়া তাঁর অবশ্য-কর্তব্য। হিন্দুদের ঈর্ষা-উদ্দীপক বর্জনশীলতা থেকে সৃষ্ট হয়েছে 'ম্লেচ্ছ' ও 'যবন' শব্দ, যা খৃষ্টানদের 'হিদেন' ও মুসলমানদের 'কাফের' শব্দের অনুরূপ; এই ভাব মৌলিক হিন্দুশাস্ত্রগত উদার ভাবের সম্পূর্ণ বিরোধী। পাছে বিদেশীর নিশ্বাস লেগে হিন্দুধর্ম কলুষিত হয়ে যায়, সেই ভয়ে তার চারিদিকে প্রাচীর তুলে দেবার এই উন্মত্ত আগ্রহ বা গোঁড়ামি তাঁর কাছে একটা মস্তবড় ভুল ব'লে মনে হ'ল; মনে হ'ল, উপনিষদের ঋষিদের সর্বজনীন শিক্ষার নিদারুণ বিকৃতির ফলেই এ ভ্রান্তির উদ্ভব হয়েছে। হিন্দুদের এই নিন্দনীয় অস্পৃশ্যতার ভাবই এতদিন দম্ভ- ও ঘৃণা-ভরে বিড়ম্বিত ক'রে এসেছে অন্যান্য জাতি ও সম্প্রদায়কে এবং হিন্দুধর্মের বিভিন্ন স্তরকেও। তাঁর বিশ্বাস, আদি পাপের মতো এই অস্পৃশ্যতা জাতির মাথায় এক অবর্ণনীয় দুঃখের বোঝা তুলে দিয়েছে। এই পাপের কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য তিনি চিরাচরিত নিষেধ না মেনে হিন্দুভারতের বাণী সমুদ্রপারে বহন ক'রে নিয়ে যেতে মনস্থ করলেন। তাঁর বদ্ধমূল ধারণা জন্মেছিল যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে স্বাধীনভাবে সসম্মানে ভাব- ও আদর্শ-বিনিময়ই যুগ-প্রয়োজন, এর ফলে উভয় দেশেরই কল্যাণ হবে নিশ্চিত। পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলিতে ভারতীয় আধ্যাত্মিক ভাব ও আদর্শের প্রচারের ফলে ভারতের প্রতি বহির্জগতের সম্ভ্রমও বাড়বে, আর বিশ্বজুড়ে নবজীবন এবং নবভাবের উজ্জীবনও ত্বরান্বিত হ'য়ে উঠবে। তাঁর গুরুর সর্বজনীন ধর্মের বাণী শোনবার ও অনুধাবন করবার সময় জগতের এসেছে; কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন, ধর্মে অবিশ্বাস ও সম্প্রদায়গত কলহের জলাভূমি থেকে মানবজাতিকে টেনে তোলার কাজে এই বাণী প্রভূত সহায়তা করবে। তাছাড়া ভারতীয় জাতিরও কল্যাণ হবে এতে। হিন্দুরা তখন একদিকে অবশকারী গোঁড়ামি আর অপরদিকে পাশ্চাত্যের উন্মত্ত অনুকরণ—এ দুয়ের মধ্যে দোদুল্যমান; পাশ্চাত্যে অনুকূল ভাবের সাড়া জাগলে হিন্দুজাতি আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবে। প্রাচীনপন্থী জনগণের গতিশক্তিহীনতারূপ মোহ কেটে যাবে তাতে, এবং আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক সম্মোহনও তিরোহিত হবে। তখন সকলেরই আগ্রহ আসবে দেশকে পরিপূর্ণরূপে পুনরুজ্জীবিত ক'রে তুলতে। কাজেই সমগ্র মানবজাতিকে বর্তমান সাংস্কৃতিক আদর্শের পঙ্ক থেকে উঠে আসতে সহায়তা করার জন্য যে-পথে চলবেন ব'লে তিনি স্থির করেছিলেন,

সে-পথের সঙ্গে মিশে এক হয়ে গিয়েছিল ভারতকে পুনরুজ্জীবিত ক'রে হিন্দু-পুনর্জাগরণের এক যুগান্তর নিয়ে আসার পথও। এই পথই তাঁকে চিকাগো ধর্মমহাসভায় নিয়ে গিয়েছিল; হিন্দু ঋষিদের প্রাচীন আদর্শগুলির সঙ্গে জগতের পরিচয় ঘটাবার জন্য দৈবনির্দিষ্ট এই মহা-সভাটিকেই তিনি যোগ্যতম ক্ষেত্র ব'লে মনে করেছিলেন।

বিবেকানন্দের বিরাট ব্যক্তিত্ব, বিচিত্র জ্ঞানের বিপুল বিস্তৃতি, ইংরেজী ও সংস্কৃত সাহিত্যে উচ্চাঙ্গের অধিকার, সরস প্রত্যুত্তর-দানের অসাধারণ ক্ষমতা, তীক্ষ্ণ উপস্থিতবুদ্ধি এবং সর্বোপরি তাঁর গভীর স্বদেশপ্রেম ও জ্বলন্ত আধ্যাত্মিকতা মাদ্রাজ- ও হায়দরাবাদ-বাসীদের মনে স্থায়িভাবে গভীর রেখাপাত করেছিল। তাঁর জ্ঞানগর্ভ বাক্যালাপ শোনার জন্য দলে দলে সর্বশ্রেণীর লোক তাঁর কাছে সমবেত হ'তে লাগলেন এবং স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তাঁর পাশ্চাত্য অভিযানের কাজে সহায়তা করতে ব্রতী হ'লেন। তরুণ উৎসাহী শিষ্যগণ শহরে শহরে ঘুরে স্বামীজীর বিদেশ-যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করতে লেগে গেলেন। ইতোমধ্যে একটি অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির ফলে স্বামীজী বুঝলেন, যেভাবে তিনি কাজ করতে মনস্থ করেছেন তা দৈবানুমোদিত; স্বজ্ঞার এই অনুকূল ইঙ্গিতে তিনি খুশী হ'লেন। আমেরিকা যাবার সিদ্ধান্ত পাকা করার আগে তিনি শ্রীশ্রীমায়ের কাছে আশীর্বাদ ভিক্ষা ক'রে পত্র লিখেছিলেন, তাঁর আশীর্বাদ পেয়েও গিয়েছিলেন। স্থির হয়েছিল মাদ্রাজ থেকে যাত্রা করবেন, কিন্তু খেতড়ির মহারাজা বিশেষ প্রয়োজনে নিজ ভবনে তাঁর উপস্থিতি প্রার্থনা করায় পূর্ব-ব্যবস্থা বাতিল ক'রে তাঁকে রাজপুতানায় যেতে হয়। সেখান থেকে তিনি বোম্বাই অভিমুখে রওনা হ'লেন; ওখান থেকেই আমেরিকাগামী জাহাজে উঠবেন।

বোম্বাই যাবার পথে বিবেকানন্দ আবু রোড স্টেশনে নেমে সেখানে কয়েকদিন ছিলেন। সেখানে দুজন গুরুভাই, ব্রহ্মানন্দ ও তুরীয়ানন্দের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। স্বামীজীর কথায় ও মনোভাবে তাঁরা বুঝতে পারলেন, তাঁর হৃদয়-সাগর তুমুল তুফানে উচ্ছলিত হচ্ছে, যা অনতিবিলম্বে উদ্বেল হয়ে প্রবলপ্রবাহে বেরিয়ে এসে জগৎ ভাসিয়ে দেবে। তুরীয়ানন্দকে তিনি বলেছিলেন, "হরি ভাই, তোমাদের তথাকথিত ধর্ম যে কি, তা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না! কিন্তু আমার হৃদয়টা খুব বেড়ে গিয়েছে, অপরের প্রতি দরদী হ'তে শিখেছি। বিশ্বাস কর, আমি এটা খুব তীব্রভাবে অনুভব করছি।" এগুলি ফাঁকা কথা নয়, তাঁর অন্তরের গভীর প্রদেশ থেকে কথাগুলি বেরিয়ে এসেছিল। কথাগুলি বলার সময় তাঁর সমগ্র সত্তা জুড়ে বেদনা ও তীব্র আবেগ গভীরভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল। আর্ত মানবের জন্য তাঁর হৃদয়ে দৃঢ়মূল সমবেদনার সামান্য অংশমাত্র এই কয়েকটি কথার মাধ্যমে প্রকাশ ক'রে কিছুক্ষণ তিনি নির্বাক হয়ে বসে রইলেন, তাঁর গণ্ড বেয়ে অশ্রুধারা ঝরতে লাগল। এর বহু পরে কয়েকজন উৎসুক শ্রোতার কাছে তুরীয়ানন্দ এ-প্রসঙ্গে বলে-ছিলেন, "স্বামীজীর মুখে এই করুণামাখা কথা যখন শুনলাম, তাঁর এই মহিমান্বিত বিষাদের রূপ যখন চোখে পড়ল, তখন আমার মনের ভেতর যে কী হচ্ছিল, তা একবার কল্পনা কর দেখি! ভাবলাম, 'এ তো বুদ্ধদেবেরই ভাষা, এ তো বুদ্ধেরই

হৃদয়!' মনে পড়ল, বহুদিন আগে তিনি যখন বোধগয়ায় গিয়েছিলেন, বোধিদ্রুমতলে বসে ধ্যান করছিলেন, সেই সময় বুদ্ধদেব তাঁকে দেখা দিয়ে তাঁর দেহে প্রবেশ করেছিলেন।...আমি পরিষ্কার দেখতে পেলাম, মানবজাতির সমুদয় দুঃখকষ্ট এসে তাঁর স্পন্দিত হৃদয় বিদীর্ণ ক'রে দিচ্ছিল। অপরের জন্য সহানুভূতির ঝড় বয়ে যেতো তাঁর হৃদয়ে; সে হৃদয়াবেগের অন্ততঃ আংশিক পরিচয় না পেলে বিবেকানন্দকে ঠিকমত বোঝা কারো পক্ষেই সম্ভব ছিল না।... এই বুকফাটা সমবেদনাতেই তাঁর চোখ দিয়ে রক্ত-অশ্রু ঝরে পড়ত। তোমরা কি মনে কর এই রক্তাশ্রুপাত বিফল হয়েছে? নিশ্চয়ই না! দেশের জন্য পাতিত তাঁর অশ্রুর প্রতিটি বিন্দু থেকে, তাঁর অমিতশক্তি হৃদয় হ'তে ধীর-ভাবে উত্থিত প্রতিটি অগ্নিময়ী বাণী থেকে দলে দলে মহাবীরেরা জন্মলাভ করবে, চিন্তায় ও কর্মে তারা সমগ্র জগৎটাকে কাঁপিয়ে দেবে।"

বিবেকানন্দ

শ্রীননীগোপাল ঘোষাল

হে যুগনায়ক, অমৃত, নিত্যানন্দ!
হে দেব, বিবেকানন্দ!
নরনারায়ণ, নর-রূপে তুমি এলে,
জীবকল্যাণে জীবন সঁপিয়া গেলে।
কঠোর সাধনে আপনারে করি রিক্ত
পূর্ণের সাথে মিলনে হইয়া তৃপ্ত
সেই পূর্ণেরে দেখিলে যে সব ঠাঁই—
মানুষ বলিয়া পৃথক কিছুই নাই
জীব-রূপী শিব, নর-রূপী নারায়ণ;
তাঁহারি সেবায় সঁপিলে জীবন-মন,
তাঁহারি সেবায় যুগধর্মের করিলে প্রবর্তন।

এই জীব-শিব-বোধের সীমায় মহাসাম্যের পথে
সব ভেদজ্ঞান-বিজয়ী বিজয়রথে
উঠিয়া মানুষ মহামিলনের তীরে
ভুলিয়া হিংসা, ভুলি বিদ্বেষ আবার আসুক ফিরে।
শান্তির ধারা সকল হৃদয় ভরিয়া
অলকানন্দা-ছন্দে চলুক বহিয়া।
ইহা ছাড়া আর নাহি কোন পথ ঘুচাতে যুগের দ্বন্দ্ব,
হে যুগনায়ক, হে দেব, বিবেকানন্দ!

শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য-কৃত 'বেদান্তকেশরী'

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপক বটুকনাথ ভট্টাচার্য

সৃজি হস্তী ব্যাঘ্র দস্যু শত্রু সর্প কপি,
কোথাও বা প্রিয়জন সাথে স্বপ্নভোগ,
করে ক্রীড়া, হাসে বা বিহরে কল্পনায়,
কোথাও সুচারু অন্ন করে উপযোগ,
কোথাও হয়েছি ম্লেচ্ছে পরিণত ভাবি
সঙ্কোচেতে চলি যায় ছাড়ি সঙ্গিজন,
অথবা ব্যাঘ্রের ভয়ে করে পলায়ন
কিংবা তার গ্রাসে পড়ি করে সে রোদন ॥ ৮০

যেইকালে যাহা হয় প্রত্যক্ষ বিষয়
তাহে স্ব-স্বরূপে মজি অজ্ঞান-বিলাস
উৎপাদন করে, যথা শুক্তির অজ্ঞানে
রৌপ্য স্ফুরে, সেই মত হয় প্রতিভাস,
মিথ্যা যথা রৌপ্যের দর্শন, আলোকের
ভ্রমে মৃগজল হেরে, কিংবা বিষধর
রজ্জুর অজ্ঞানে, ক্ষণতরে সুখ জন্মে
কিংবা ভয়, তথা দৃষ্টি সৃষ্ট চরাচর ॥ ৮১

মায়ার আরোপ-বলে হয়েছে বিছান
এ সংসার আমা হতে, সকলি আমায়,
আমি নহি সে সবায় ; শুক্তিতে যেমন
রৌপ্য, কিন্তু শুক্তি কভু রজতে না ভায়।
এই হেতু ভগবান কৃষ্ণ বলেছেন—
'ভূত হয়ে আমি, তারা আমাতে না রহে'
গীতার শ্লোকেতে ; তাই এ বিশ্ব নিচয়
ইন্দ্রজাল সম মিথ্যা জানিবে নিশ্চয় ॥ ৮২

কর্মই জগতে সুখ-দুঃখ-হেতু হয়—
না বুঝিয়া অজ্ঞজন করে নিরন্তর
বৃথাই সুহৃৎ কিংবা শত্রু ব্যবহার ;
আর্তভাগ যাজ্ঞবল্ক্য দুই মনিবর
রাজর্ষি জনক গৃহে প্রশংসামুখর
পুরাকালে করিলেন কর্ম আলোচন,
'এ জগতে কর্মহীন কেহ না সম্ভবে'
বলেছেন তাই যদুকুল-বিভূষণ ॥ ৮৩

বৃক্ষচ্ছেদে কুঠার-ই সমর্থ যদ্যপি
প্রাণি-চেষ্টা তবু তাহে হয় অপেক্ষিত ;
অন্ন হয় তৃপ্তি-হেতু ইহা সত্য বটে,
ভোক্তার প্রযত্ন তাহে কারণ কথিত।
সেই মত পূর্বকৃত কর্ম শুভাশুভ
ফল দেয় যদ্যপিও, তবু সুবিদিত
বিনশ্বর সেই কর্মে স্বাতন্ত্র্য না রহে—
অন্তরাত্মা তার হয় প্রেরক নিশ্চিত ॥ ৮৪

স্মৃতিশাস্ত্রে লোকতরে বর্ণাশ্রম-মত
নিত্য কাম্য আদি কর্ম হয়েছে বিহিত,
শ্রুতিবাক্যে মনোরম তাই উপদেশ—
ব্রহ্মার উদ্দেশে সব কর সমর্পিত।
নয়ন রসনা নাসা কর্ণ পদ শির
প্রভৃতি ইন্দ্রিয় যত করিলে তর্পিত
দেহী আত্মা তৃপ্ত হয়—মূলে জল সেকে
সমুদয় তরু যথা হয় সঞ্জীবিত ॥ ৮৫

আত্মজ্ঞানহীন কর্মরত বেদজ্ঞানী,
শাস্ত্র কহে, মর্ত্য হতে করিলে প্রয়াণ,
কর্ম তার অল্প ভোগে নাশ পায় তবু
জন্ম লভি পুনঃ তার দুঃখ সুমহান্ ;
আত্মজ্ঞানী-চিত্তে যদি ভোগ ইচ্ছা রহে
তবু তার সিদ্ধি হয় আর নিত্য যোগ,
অতএব আত্মা এক উপাস্য সতত,
আত্মলাভে নিষ্কামের সর্ব সুখভোগ ॥ ৮৬

সমালোচনা

পরমহংসদেব ; গীতা-সার-সংগ্রহঃ ; চারিধামঃ স্বামী প্রেমেশানন্দ। প্রকাশক : স্বামী অজজানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ, বেলুড় মঠ, হাওড়া। পৃষ্ঠা ২৪ ; ষোল + ১৭৩ ; নয় + ৩১। মূল্য পঞ্চাশ পয়সা : দুই টাকা : এক টাকা।

ফুলের মতো এই রচনাগুলি হাতে নিয়ে একথা মনে এলো, যে বৃক্ষে এরা ফুটেছে তার নাম অধ্যাত্ম-জীবন। যে মাটিতে সেই বৃক্ষের দৃঢ়মূল প্রতিষ্ঠা তা হ'ল তপশ্চর্যা। এদের মূল অসীম, আবেদন অপ্রতিরোধ্য।

'পরমহংসদেব' ছোট্ট একটি বই। প্রধানত ছোটদের জন্য। পড়লে মনে হয়, লেখক যেন শিশু ভোলানাথদের নিয়ে ঠাকুরের গল্প শোনাবার আসর জমিয়েছেন। আর আমরা বয়স্করা পা-টিপে-টিপে, চুপিসাড়ে এক পাশে বসে পড়েছি। আর মজে গিয়েছি নিজেরাও। গল্পের নিজস্ব আকর্ষণ তো আছেই। কথকের কৃতিত্বও কম নয়। পরিবেশের সরসতা ও সরলতায় মুগ্ধ হই সহজেই। অনেক পরে বুঝি, কী গভীর প্রজ্ঞা ও বিষয়ের উপর কী পরিমাণ অধিকার থাকলে তবে ওই দুটি গুণ অত সহজে আসে!

একটু নমুনা: "ভগবান নিজেই বৈদিক ধর্মের পুনঃপ্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য 'রামকৃষ্ণ'-রূপ একটি কল তৈরি করেছিলেন।···তিনি যা ব'লে গেছেন, তা ভগবানেরই কথা; তিনি যা ক'রে গেছেন, তা ভগবানেরই কাজ। 'রামকৃষ্ণ'নামক শরীরের ভিতর ভগবান বই আর কিছুই ছিল না। কাজেকাজেই যাঁরা তাঁকে সাক্ষাৎ ভগবান ব'লে ভেবেছেন, তাঁরা ঠিকই ধরেছেন।" (পৃঃ ১৫)

পুনশ্চ: "বিবেকানন্দ ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের হাতের যন্ত্র। যদি শ্রীরামকৃষ্ণকে ভগবানের অবতার বল, তবে বিবেকানন্দকে শ্রীরামকৃষ্ণের অবতার বলতে হয়। বিবেকানন্দ যা ক'রে গেছেন, যা ব'লে গেছেন, সবই শ্রীরামকৃষ্ণের।"

অতঃপর কথকের ছোট্ট একটি পরামর্শ: "তাঁদের [পরমহংসদেবের শিষ্যদের] ভাব-চরিত্র বুঝবার চেষ্টা কর। তাঁদের কথা ভাবলে তোমরাও··· মহৎ হয়ে উঠবে।" (পৃঃ ১৮)

অধ্যাত্মজীবনে আবেগ ও বিচার দুয়ের সুসমঞ্জ গঠন ও প্রয়োগ একটি বড় কথা। দ্বিতীয়টি ঠিকভাবে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন স্বাধ্যায়। শাস্ত্রচর্চা। এ বিষয়ে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌-গীতার উপযোগিতা সর্বসম্প্রদায়স্বীকৃত। এক্ষেত্রে নবীন প্রয়াসীর প্রাথমিক প্রয়োজন দ্বিবিধ। এক: গীতার রূপরেখা সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা গড়ে তোলা। দুই: ব্যাখ্যার আতিশয্যের মধ্যে গিয়ে বিভ্রান্ত না হয়ে গীতার বাণীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়-স্থাপন। 'গীতা-সার-সংগ্রহঃ' গ্রন্থে এই প্রয়োজন মেটানোর কাজটিই সুন্দর-ভাবে সম্পাদন করেছেন প্রেমেশানন্দজী।

গীতা-সমুদ্রের তীরে নিয়ে গিয়েছেন তিনি কিশোর-শিক্ষার্থীদের। স্বামী বিবেকানন্দের কথা সংকলন ক'রে গীতার গভীরতা ও সৌন্দর্যের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কিন্তু 'জলে না নামিলে কেহ শেখে না সাঁতার'। তাই সেই সাগরের তীরে শিক্ষার্থীদের নামিয়েছেন

তিনি সযত্ন সতর্কতার সঙ্গে। বেছে নিয়েছেন একশ শ্লোক। সাজিয়েছেন দশটি অধ্যায়ে। সংযোজন করেছেন ছোট্ট একটি প্রস্তাবনা ও পরিশিষ্ট। জোর দিয়েছেন ব্যাকরণের উপর। অন্বয়, বঙ্গার্থ ও প্রয়োজনীয় টিপ্পনি আছে। মোট কথা, শিক্ষার্থীরা সেই সমুদ্রের ঢেউয়ের দোলা, হাওয়ার ঝাপটা ও জলের সঙ্গে উত্তমরূপে পরিচিত হবে। একটু একটু ক'রে ভয় ভেঙে যাবে। আনন্দ জাগবে। স্বাস্থ্য লাভ হবে। সাহস ও বল পাবে—আরও দূরে, আরও গভীরে সানন্দ ও সাগ্রহ অভিযানের। আর সারা জীবন তারা কৃতজ্ঞ থাকবে সেই শিক্ষকটির কাছে যিনি তাদের শাস্ত্রচর্চায় নিপুণ ও বাস্তব-নিষ্ঠ দীক্ষা দিয়েছিলেন।

গ্রন্থের আবরণে কৃষ্ণার্জুনের চিত্রটি চমৎকার।

'চারিধাম' পাঁচটি কবিতা ও একটি গানের সংগ্রহ। ভূমিকা ও কবিতাগুলির অনুচিন্তন রচনা করেছেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দজী। রচনাগুলি মূল গ্রন্থের ভাবগ্রহণের পরম সহায়ক এবং আপন মূল্যেও মূল্যবান। এই কাব্যগ্রন্থের বহিরঙ্গ-সৌন্দর্য অর্থাৎ সাহিত্যিক মহিমা অসাধারণ। কবিতার কারুকর্মে সিদ্ধহস্ত এর লেখক। ছন্দের উপর তাঁর দখল তর্কাতীত। নাম-কবিতায় একাধিক ছন্দের প্রয়োগ প্রশংসনীয়।

একটি উদাহরণ। কী আশ্চর্য সহজভাবে, মুমুক্ষুর পরমপ্রিয় অবতারবাদের সার কথা পরিবেশন করেছেন প্রেমেশানন্দজী! অতলতার কী স্ফটিকস্বচ্ছ রূপায়ণ! শব্দ-দর্পণে অনন্তের প্রতিবিম্ব!

"যারে খুঁজ লীলাস্থলে, তীর্থে তীর্থে, পুণ্যজলে
সে তোমারে খুঁজে সদা অন্তরে বাহিরে
মানবের প্রেম-আশে মানুষ সাজিয়া আসে
পরশি চরণে পূত করে ধরণীরে," (পৃঃ ২)

একই বাণী—আরও নিবিড়-গম্ভীর উচ্চারণে। মন্দ্রস্বরে। মন্দ্রস্বরে।

"অরূপ-সায়রে লীলা-লহরী
উঠিল মৃদুল করুণা-বায়,
আদি-অন্তহীন, অখণ্ডে বিলীন,
মায়ায় ধরিলে মানব-কায়॥"
(পৃঃ ২৮)

পরমপুরুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা-প্রকাশটিও কী রমণীয়! কী ভাবগর্ভ! একটি ছোট্ট প্রাণের কথায় নিখুঁত প্রণতি সংহত—

"শত জন্ম হেরিলাম কত দুঃস্বপন
তুমি ভেঙে দিলে ঘুম ঘোর।"
(পৃঃ ১৬)

স্বীকারে যার শুরু, শরণাগতিতে তার শেষ। সেই শরণাগতির ভাষা—

"যা কিছু চেয়েছি যবে অন্তরে বাহিরে
ছিল — আছে যত প্রয়োজন
বুঝিনি, আমি যে শুধু চেয়েছি তোমারে
শতকল্প সাধনার ধন।
আজ হ'ল নিরন্তর নিবিড় মিলন
মনে মনে নয়নে নয়নে
জীবন-মরণ ব্রত হ'ল উদ্‌যাপন
আমারে নিঃশেষে বিতরণে।" (পৃঃ ১৭)

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণকে ধরে যাঁরা জীবন-গঠনের প্রয়াসে ব্রতী এই ছোট্ট বইটিকে যেন তাঁরা সঙ্গী ক'রে নেন। বইটি ছোট কিন্তু হীরকের মতো উজ্জ্বল এবং মূল্যবান। ধ্রুব-তারার মতো দিশারী।

প্রকাশক এই প্রকাশকর্মগুলিতে প্রশংসনীয় কল্পনা, রুচি ও শ্রদ্ধার পরিচয় দিয়েছেন। শ্রীবিশ্বরঞ্জন চক্রবর্তীর অঙ্কিত প্রচ্ছদ ও স্কেচগুলি অনবদ্য। নিছক প্রকাশনার মানদণ্ডেও বই তিনটি শিল্পসম্পদের মর্যাদাসম্পন্ন।

—অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

কার্যবিবরণী

কাঁথি (মেদিনীপুর) : শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের ১৯৬৫-৬৬ ও ১৯৬৬-৬৭ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এই আশ্রমের কার্যাবলী তিনভাগে বিভক্ত : (১) ধর্মপ্রচার, (২) শিক্ষা, (৩) সেবা।

আলোচ্য সময়ে আশ্রমে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে ছাত্রছাত্রীদিগের মধ্যে প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথিতে বিশেষ পূজা, জীবনী-পাঠ ও আলোচনা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। অন্যান্য পুণ্যতিথিও যথাযথভাবে উদ্‌যাপিত হয়।

বিবেকানন্দ ছাত্রাবাসে ১৯৬৬-৬৭ খৃষ্টাব্দে বিনা-খরচে ৯ জন বিদ্যার্থী থাকিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে ৪ জন উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয় এবং সকলেই উত্তীর্ণ হয়।

কাঁথি শহর হইতে প্রায় ৪ মাইল দূরবর্তী বেলদা গ্রামে আশ্রম-পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আলোচ্য বর্ষদ্বয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১৩৫ (বালক—৭২, বালিকা—৬৩) ও ১২১ (বালক—৬২, বালিকা—৫৯)।

সেবাশ্রমে একটি গ্রন্থাগার ও পাঠাগার আছে। আলোচ্য সময়ে মফঃস্বলে ৬টি গ্রাম্য গ্রন্থাগার পরিচালিত হয়। ১৯৬৬-৬৭ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থাগারের মোট পুস্তক-সংখ্যা ৫,২৬৯ এবং পঠিত পুস্তক-সংখ্যা ৩,৮৭৩।

হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়ে ৩১,৫৮১ ও ৩৪,৫৯৮ জন রোগী চিকিৎসা লাভ করে।

১৯৬৫-৬৬ খৃষ্টাব্দে ৭ জন দুঃস্থকে ২০৯৲ টাকা ও ৩৮ জন ছাত্রছাত্রীকে ২৩০৲ টাকা দান করা হয়।

উত্তর ক্যালিফর্নিয়া বেদান্ত সোসাইটি : স্যাক্রামেণ্টো কেন্দ্র : অধ্যক্ষ—স্বামী অশোকানন্দ, সহকারী—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ ও এপ্রিল মাসে প্রতি রবিবার প্রাতঃকালে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবলম্বনে বক্তৃতা দেওয়া হয় : আত্মজ্ঞানদাতা শ্রীরামকৃষ্ণ, মনের সম্বন্ধে নিগূঢ় ধারণা, মানবের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান উত্তরাধিকার, জীবনে ঈশ্বরকে বাস্তবায়িত করা, যোগ—ইহার নির্দেশপথ ও গুপ্তবিপদ, জীবনে উন্নতিলাভের পথে ধর্ম অন্তরায় নয়, মৃত্যু হইতে আত্মার পুনরুজ্জীবন, ধ্যানের মাধ্যমে ঐকানুভূতি, ঈশ্বরের সম্মুখে পরিক্রমণ।

এতদ্ব্যতীত প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ধ্যান-শিক্ষার পর ছান্দোগ্যোপনিষৎ আলোচিত হয়।

চিকাগো বিবেকানন্দ বেদান্ত সোসাইটি : কেন্দ্রাধ্যক্ষ স্বামী ভাষ্যানন্দ। মার্চ, ১৯৬৮ প্রতি রবিবার নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবলম্বনে বক্তৃতা হইয়াছিল :

আত্মজ্ঞানদাতা শ্রীরামকৃষ্ণ, প্রার্থনার প্রণালী ও শক্তি, ঐশ্বরিক প্রেমের সাধন, ধর্মে যুক্তির স্থান, মনের শক্তি।

এতদ্ব্যতীত ধ্যানশিক্ষার সঙ্গে প্রতি মঙ্গলবার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও প্রতি শুক্রবার নারদীয় ভক্তিসূত্র আলোচিত হয়।

স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর সিঙ্গাপুর, মালয় ও সিংহল সফর

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ গত ২১শে এপ্রিল হইতে ১৫ই মে তারিখের মধ্যে সিঙ্গাপুর, মালয় ও সিংহল ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন।

গত ২১শে এপ্রিল তিনি কলিকাতা হইতে বিমানযোগে যাত্রা করিয়া সিঙ্গাপুর পৌছান। সেখান হইতে বিমানযোগে কোয়ালালামপুর যান ২২শে এপ্রিল সন্ধ্যায়। ২৪শে এপ্রিল সন্ধ্যায় তিনি সীরেমবান যাত্রা করেন। সীরেমবানে তিনি দুইদিন ছিলেন। ২৬শে এপ্রিল কোয়ালালামপুরে ফিরিয়া তিনি কোয়ালালামপুরের সন্নিকটস্থ 'রিন্‌চিং এস্টেট'-এর 'সারদা সঙ্ঘ গার্লস অরফেনেজ'-এর ভিত্তিস্থাপন করেন; বর্তমানে শহরের সীমানার ঠিক বাহিরে একটি বাটীতে এই অনাথাশ্রমটি রহিয়াছে। এখান হইতে যাত্রা করিয়া ২৯শে তারিখ তিনি ইপো এবং সেখান হইতে পরদিন বিকালে পেনাং পৌছান। ১লা মে তারিখ তিনি পেনাং-এর নবনির্মিত মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মর্মর-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

পেনাং হইতে তিনি ৩রা মে সিঙ্গাপুরে ফিরিয়া আসেন এবং সেখান হইতে ৯ই মে বিমানযোগে কলম্বো আসেন। কলম্বো হইতে ১১ই মে সকালে বিমানযোগে বাটিকালোয়া পৌছান এবং এইদিন বিকালে সেখানে মিশনের অনাথাশ্রমের ভিত্তিস্থাপন করেন। ঐ রাত্রেই বাটিকালোয়া হইতে তিনি ট্রেন-যোগে কলম্বো যাত্রা করেন।

কলম্বো হইতে তিনি ১৫ই মে মাদ্রাজ অভিমুখে যাত্রা করেন এবং মাদ্রাজ হইতে ২০শে মে বিমানযোগে বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসেন।

সর্বত্রই তিনি স্থানীয় জনগণ কর্তৃক বিশেষ-ভাবে সংবর্ধিত হইয়াছেন, সর্বত্রই তাঁহার নিকট সমাগত জনগণের সহিত তিনি ভগবৎ-প্রসঙ্গ করিয়াছেন। কয়েকটি বক্তৃতাও করিয়াছেন। ২৩শে এপ্রিল সিঙ্গাপুরে 'শ্রীশ্রীমা' সম্বন্ধে, ১লা মে পেনাং-এ জনসভায় সংবর্ধনার উত্তরে এবং ৫ই মে সিঙ্গাপুর আশ্রমে জনসভায় ভাষণ দিয়াছেন। ১১ই মে বাটিকালোয়ায় স্থানীয় পৌরপ্রতিষ্ঠানের মেয়র ও সদস্যগণ কর্তৃক টাউনহলে আয়োজিত সংবর্ধনা-সভাতেও বক্তৃতা করেন। কলম্বোতে ভগবান বুদ্ধের জন্মোৎসব উপলক্ষে আয়োজিত সভায় তাঁহাকে দুইটি বক্তৃতা করিতে হয়—একটি 'শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের আদর্শ' এবং অপরটি 'ভগবান বুদ্ধ' সম্বন্ধে। ১৯শে মে মাদ্রাজ আশ্রমেও একটি সাধারণ সভায় তিনি ভাষণ দেন।

উৎসব-সংবাদ

মনসাদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের উদ্যোগে গত ৩রা মে হইতে ৬ই মে '৬৮ পর্যন্ত চারিদিনব্যাপী সাগরদ্বীপের বিভিন্ন স্থানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩৩তম জন্মোৎসব পালিত হইয়াছে।

৩রা মে আশ্রম-প্রাঙ্গণে আশ্রম বিদ্যালয়গুলির পারিতোষিক-বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন স্বামী মহানন্দজী। এইদিন ছাত্রগণ কর্তৃক ক্রীড়া-কৌশল, ব্রতচারী নৃত্য, আবৃত্তি প্রভৃতি এবং সভান্তে একটি নাটক অভিনীত হয়।

৪ঠা মে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজাদির ব্যবস্থা ছিল। বিকালে আশ্রম-প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত ধর্ম-সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী ক্ষমানন্দজী এবং আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন স্বামী মহানন্দজী, স্বামী জয়ানন্দজী এবং শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাস। আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী সিদ্ধিদানন্দজী আশ্রমের

কার্যবিবরণী পাঠ করেন। সভান্তে আশ্রম-প্রাঙ্গণে প্রায় পাঁচহাজার ভক্ত বসিয়া খিচুড়ি-প্রসাদ গ্রহণ করেন। রাত্রে যাত্রাভিনয় হয়।

৫ই মে দক্ষিণ সাগর অঞ্চলে নটেন্দ্রপুর নটেন্দ্রনাথ উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন স্বামী জয়ানন্দজী। পরে উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়-লিখিত শ্রীরামকৃষ্ণগীতি-আলেখ্য পরিবেশিত হয়।

৬ই মে উত্তরসাগর অঞ্চলে বামুনখালি এম. পি. পি. উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে আরও একটি ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মালোচনায় অংশ গ্রহণ করেন স্বামী মহানন্দজী, স্বামী ক্ষমানন্দজী এবং স্বামী জয়ানন্দজী। উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজী-বিষয়ক আবৃত্তি, প্রবন্ধপাঠ ও ভজনগান পরিবেশন করে। সভান্তে বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে যাত্রাভিনয় হয়।

রাঁচি (মোরাবাদী) রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের উদ্যোগে গত ২রা জুন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব রাঁচি শহরের সন্নিকট চাগরা নামক আদিবাসীদের গ্রামে সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মঙ্গলারতি, শোভাযাত্রা, পূজা, ভজন, কীর্তন, বারাণসীর ব্যাস ছোটেজী কর্তৃক 'রামচরিতমানস'-আবৃত্তি, প্রায় ৩,০০০ আদিবাসী ও শহরবাসীদের মধ্যে প্রসাদবিতরণ, ধর্মসভা প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। আয়োজিত সভায় স্বামী বেদান্তানন্দজী পৌরোহিত্য করেন; বক্তাদের মধ্যে স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী বাংলায়, শ্রীদুর্গা কাচাপ মুণ্ডারী ভাষায়, এড উইন এক্কা ছোটনাগপুরীতে এবং স্বামী মুক্তানন্দজী ও ব্রহ্মচারী শ্যামল হিন্দীতে বক্তৃতা দেন। উৎসব কমিটির সভাপতি শ্রীতারিণীপ্রসাদ পাণ্ডে শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট বক্তাদের পরিচয় প্রদান করেন এবং শেষে সমবেত সকলকে ধন্যবাদ দেন। সভাটিতে বেশ জনসমাগম হইয়াছিল। সভান্তে 'ছৌ' নৃত্য কয়েক সহস্র দর্শককে আনন্দ দান করে। রাঁচিতে আদিবাসীদের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব এই প্রথম অনুষ্ঠিত হইল বলা যাইতে পারে; উৎসবটিতে আদিবাসীদের মধ্যে প্রভূত উদ্দীপনা এবং তাহাদের সংগঠন-শক্তিরও পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল।

উল্লেখযোগ্য যে, গত সরস্বতীপূজার সময় অন্য একটি আদিবাসী গ্রামে প্রতিমায় সরস্বতী-পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবে সমাজের সর্বশ্রেণীর ছাত্রগণের যোগদান বড়ই আনন্দদায়ক হইয়াছিল।

মালদহ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের বার্ষিক উৎসব এই বৎসর ৭ই জুন হইতে ৯ই জুন পর্যন্ত তিন দিন মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। ৭ই জুন শুক্রবার আলোচনা-সভার বিষয়বস্তু ছিল 'মা সারদাদেবী ও নারী-সমাজ'। এই সভায় স্বামী জীবানন্দজী ও অধ্যক্ষ শ্রীঅমূল্যচন্দ্র গুহ বক্তৃতা করেন। সভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দজী। ৮ই জুন শনিবার আলোচনা-সভার বিষয়বস্তু ছিল—'স্বামী বিবেকানন্দ ও বর্তমান যুগ'; সভাপতি স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দজী, স্বামী জীবানন্দজী ও অধ্যক্ষ গুহ বক্তৃতা করেন। ৯ই জুন রবিবার মঙ্গলারতি ও ভজনের মাধ্যমে দিনের কার্যসূচী আরম্ভ হয়। তারপর নগরকীর্তনসহ শোভাযাত্রা মালদহ শহর পরিক্রমা করে। এই দিন শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ ও ও 'কথামৃত'পাঠের ব্যবস্থা ছিল। হোমের পর দরিদ্রনারায়ণসেবা ও হাতে হাতে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। বিকালে অনুষ্ঠিত আলোচনা-সভার বিষয়বস্তু ছিল—'শ্রীরামকৃষ্ণ ও যুগধর্ম'। এই সভায় মালদহ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের

অধ্যক্ষ স্বামী পরশিবানন্দজী মিশনের বার্ষিক বিবরণী-পাঠের মাধ্যমে মিশনের কার্যধারা বিশ্লেষণ করেন। অধ্যক্ষ গুহ ও স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দজী মনোজ্ঞ ভাষণ দেন, পৌরোহিত্য করেন স্বামী অনুপমানন্দজী। প্রতিদিন বক্তৃতাসভার পর রামায়ণগানেরও ব্যবস্থা ছিল। রামায়ণগান পরিবেশন করেন বেতারশিল্পী শ্রীবিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। এই উৎসব উপলক্ষে মালদহ ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলির বহু সাধু ও ভক্তের সমাগম হয়। তিনদিন আশ্রমটি আনন্দমুখর হইয়াছিল।

সেবাকার্য

ওড়িশা খরাত্রাণকার্য ঃ ওড়িশায় হিন্দোল, রাসোল ও খিজুরিয়াকান্তে বিতরণ-কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। হিন্দোলকে প্রধান কেন্দ্র করা হইয়াছে। ১৭.৬.৬৮ তারিখে প্রথম দফায় ১৮৬টি গ্রামের ৭৮৭টি পরিবারের ১,৪৪৭ ব্যক্তিকে ৪,৪৩৫ কেজি চাল বিতরণ করা হইয়াছে।

ছাত্রের কৃতিত্ব

কাটিহার রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলের দুইটি ছাত্র ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দে গৃহীত পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় ৭ম ও ১০ম স্থান অধিকার করিয়াছে।

স্বামী বলদেবানন্দজীর দেহত্যাগ

আমরা অতি দুঃখের সহিত জানাইতেছি, গত ৩১.৫.৬৮ তারিখ সন্ধ্যা ৬টা ৪০ মিনিটে স্বামী বলদেবানন্দজী (নিতাই মহারাজ) ৭৬ বৎসর বয়সে কিষেণপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে হৃদ্‌রোগে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার দেহ কনখলে লইয়া গিয়া নীলধারায় পবিত্র গঙ্গায় সলিল-সমাধি দেওয়া হয়।

তিনি শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে যোগদান করেন এবং ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ করেন। বেলুড় মঠে কিছুকাল থাকিবার পর তিনি ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে কিষেণপুর আশ্রমে প্রেরিত হন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন। অনাড়ম্বর জীবন ও মধুর ব্যবহারের জন্য তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন।

তাঁহার আত্মা ভগবচ্চরণে শাশ্বত শান্তি লাভ করিয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

কার্যবিবরণী

রামকৃষ্ণ সারদা মিশন আশ্রম (পি. ২২, সি. আই. টি. রোড, ইন্টালি কলিকাতা১৪)-এর ১৯৬৫-১৯৬৭ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। নারীসমাজে, বিশেষ করিয়া ছাত্রীগণের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর ভাবপ্রচারের উদ্দেশ্যে আশ্রমটি ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়।

এই আশ্রমে নিম্নলিখিত কার্যধারা অনুসৃত হইয়া থাকে :

১। ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে এবং সমাজ-কল্যাণকর বিষয়ে আলোচনা ও বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়।

২। দরিদ্র বয়স্কা নারী ও বালিকাদিগকে বাংলা, ইতিহাস, ভূগোল ও অঙ্ক শিখানো হয়।

৩। একটি সাধারণ গ্রন্থাগার ও পাঠাগার পরিচালিত হয়।

৪। প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় এবং ডিগ্রী-কোর্সের বিজ্ঞান ও সাহিত্য-বিভাগের ছাত্রীদিগকে ফ্রি-কোচিং দেওয়া হয়। ছাত্রীদের জন্য একটি টেক্স্টবুক লাইব্রেরীও আছে।

৫। পাঠচক্রে মহাপুরুষগণের জীবনী-আলোচনা, বিতর্কসভা, শিক্ষামূলক ছায়াচিত্র-প্রদর্শন প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়।

৬। মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রীদের জন্য একটি ছাত্রীনিবাস পরিচালিত হয়।

আলোচ্য বর্ষদ্বয়ে ধর্মবিষয়ে মোট ৭৭ (৩৭ + ৪০) টি ক্লাস করা হইয়াছিল।

গ্রন্থাগারে সুনির্বাচিত ২,১২০ খানি পুস্তক রাখা হইয়াছে, পুস্তকগুলির যথোপযুক্ত সদ্ব্যবহার হইতেছে। টেক্স্টবুক লাইব্রেরীতে ৭০ জন ছাত্রী পড়াশুনা করিয়াছে। তাহাদিগকে বিনামূল্যে টিফিন দেওয়া হইয়াছিল।

শিশুদের জন্য একটি রবিবাসরীয় বিদ্যালয় সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে।

উৎসব-সংবাদ

সারদা সঙ্ঘের (কলিকাতা) উদ্যোগে গত ২৪শে হইতে ২৮শে এপ্রিল শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসব পালিত হইয়াছে। ১০১ ঘণ্টাব্যাপী অখণ্ড 'কথামৃত'-পাঠ, গীতা-ও চণ্ডীপাঠ, পূজা, ভজন প্রভৃতিতে পাঁচদিন উৎসব-গৃহ মুখরিত ছিল। শেষ দিনে চার শতাধিক মহিলা হাতে হাতে খিচুড়ি-প্রসাদ গ্রহণ করেন।

আরিট গ্রামে (মেদিনীপুর) গত ১০ই ও ১২ই মে শনি ও রবিবার শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের উদ্যোগে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের নব-নির্মিত ঠাকুরঘরে ১১ই মে সন্ধ্যায় শ্রীমৎ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী উপস্থিত ভক্তবৃন্দের নিকট সপার্ষদ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে ভাষণ দেন। পরদিন সকালে পূজাদির পর ১২০০ নর-নারীর মধ্যে প্রসাদবিতরণ করা হয়। বিকালে বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরে পারিতোষিক-বিতরণ-সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী সভাপতিত্ব করেন। স্বামী বিশোকাত্মানন্দজী এবং স্বামী সুশান্তানন্দজী এই সভায় ভাষণ দেন। রাত্রে বিদ্যামন্দিরের ছাত্রীগণ কর্তৃক 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' নাটিকা মঞ্চস্থ হয়।

কল্যাচক শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতিতে বিগত ১২ই মে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩৩তম জন্মোৎসব শোভাযাত্রা, পূজার্চনা, ভোগরাগ, খেলাধুলা, ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা, প্রসাদ- ও

পুরস্কার-বিতরণ, সঙ্গীত ও ধর্মসভার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। ইহা ছাড়া সুভাষ পল্লীর নিম্ন ও প্রাক্-বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বিচিত্রানুষ্ঠান এবং কল্যাচক আর্য-তনয়াশ্রম উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণের শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, নিবেদিতা ও বুদ্ধ-বিষয়ক কবিতা-পাঠ ও আবৃত্তি বিশেষ আকর্ষণীয় ছিল। ধর্ম-সভায় স্বামী ভাবাতীতানন্দজী বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে ঠাকুর-স্বামীজীর বাণী ও ভাবধারা পরিবেশন করেন।

চেতলা (কলি-২৭) শ্রীরামকৃষ্ণ মণ্ডপ সমিতির উদ্যোগে গত ১২ই এপ্রিল হইতে পাঁচ-দিনব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব উপলক্ষে পূজা, পাঠ, প্রসাদবিতরণ, ধর্মসভাদি অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীচণ্ডীলীলা এবং দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় 'ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ' নাট্যাভিনয় অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় আয়োজিত ধর্মসভায় অধ্যাপক পাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় 'বর্তমান যুগ ও শ্রীরামকৃষ্ণ' সম্বন্ধে তথ্য-সমৃদ্ধ বক্তৃতা দেন। সভাপতি স্বামী জীবানন্দ মহারাজ তাঁহার হৃদয়গ্রাহী ভাষণে যুগসমস্যার সমাধানে দেশবাসীকে শ্রীশ্রীঠাকুরের উদার ধর্মভাবে জীবন গঠন করিতে উপদেশ দেন। চতুর্থ দিন সন্ধ্যায় ধর্মসভায় অধ্যাপক হরিপদ ভারতী 'ভগিনী নিবেদিতা' সম্বন্ধে তাঁহার মনোজ্ঞ ভাষণে বলেন যে, স্বামী বিবেকানন্দের মানস-কন্যা মহাপ্রাণা নিবেদিতার ভক্তি ও ভারত-প্রেমের আদর্শ চিরকাল ভারতবাসীকে অনু-প্রাণিত করিবে। বিভিন্ন দিনে শ্রীমদ্ভাগবত-কথা-কীর্তন, রামায়ণগান এবং গীতাতত্ত্ব-ব্যাখ্যার ব্যবস্থা ছিল।

খুলনা—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ কর্তৃক গত ১২ই মে বুদ্ধপূর্ণিমা তিথিতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পূজাদির পর দ্বিপ্রহরে প্রায় চারিশতাধিক নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। সারাদিন ভজন করা হয়। বিকাল ৫টায় যশোহর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামী সুধানন্দ ভগবান তথাগতের এবং পরে বাগেরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের ব্রহ্মচারী সুকুমার ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণী আলোচনা করেন।

দোমড়া (বর্ধমান)— শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গত ১২ই মে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মন্দির-প্রতিষ্ঠা এবং ১৩ই মে তাঁহার জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। স্বামী গৌরীশ্বরানন্দজী প্রতিষ্ঠাকার্য সুসম্পন্ন করেন এবং ধর্মসভায় দুই দিনই সভাপতিত্ব করেন। দুই দিনে ৪,৫০০ নরনারায়ণ বসিয়া প্রসাদ পান।

শ্যামপুকুর শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা মণ্ডপ, ৭এ তেলিপাড়া লেন—গত ৯ই জুন হইতে ১৩ই জুন পর্যন্ত ছয় দিন দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসব বিশেষ পূজা-পাঠাদি, ধর্মসভা, প্রসাদবিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পন্ন হইয়াছে। দ্বিতীয় দিন স্বামী বিশ্বাশ্রয়া-নন্দজীর পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় সভাপতি মহারাজ ও স্বামী অমলানন্দজী শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের জীবন আলোচনা করেন এবং মণ্ডপের সম্পাদক শ্রীপূর্ণচন্দ্র পাল বার্ষিক কার্যবিবরণী পাঠ করেন। তৃতীয় দিন শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী শ্রীরামকৃষ্ণ এবং চতুর্থ দিবস শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত শ্রীসারদাদেবী সম্বন্ধে ভাষণ দেন। পঞ্চম দিবস ডাঃ শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতি মহাশয়, শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র এবং শ্রীবিমলানন্দ তর্কতীর্থ শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা-প্রসঙ্গ আলোচনা করেন। বিভিন্ন দিনে সভান্তে সঙ্গীত ও লীলাকীর্তনাদি অনুষ্ঠিত হয়।

উদ্বোধন

দিব্য বাণী

যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥ ১৮।১৭

—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

(দেহ-মন-বুদ্ধি হ'তে—করমের যন্ত্র হ'তে
'আমি' যার সম্পূর্ণ পৃথক্ হ'য়ে রয়)—
'আমি কর্তা' এ-চিন্তার ঠাঁই নাই হৃদে যার
বুদ্ধি যার কর্ম-সনে লিপ্ত নাহি হয়,
এই সব-লোককেই হত্যা করিয়াও সেই
হত্যা করে নাকো (কভু ভাবে না নিজেরে
'আমি কর্তা এ হত্যার'; দেহ হত হলে তার)
'হত হইলাম'-বোধও স্পর্শে না তাহারে॥

সর্বকর্মাণ্যপি সদা কুর্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্॥ ১৮।৫৬

আমার শরণ ল'য়ে (মোর পদে সঁপে দিয়ে
দেহমন-আদি) যেই কাজ ক'রে যায়
সব কাজ ক'রেও সে আমার কৃপায় শেষে
অব্যয় শাশ্বত পদ, ব্রহ্মপদ পায়
(দেহ-মন-বুদ্ধিচয়ে অভিমানমুক্ত হ'য়ে
মোর স্বরূপের সাথে মিশিয়া সে যায়)॥

কথাপ্রসঙ্গে

'মামেকং শরণং ব্রজ'

গীতায় অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের শেষ উপদেশ, 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥'—'সব ধর্ম ত্যাগ করিয়া তুমি একমাত্র আমার শরণ লও; শোক করিও না, আমি তোমাকে সবপাপ হইতে মুক্ত করিব।'

গীতার পটভূমি অপূর্ব। পাণ্ডব ও কৌরবগণ কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গণে যুদ্ধ করিতে সমবেত হইয়াছেন। এই যুদ্ধ করা ধর্ম না অধর্ম তাহা লইয়া অর্জুন এবং অন্যান্য পাণ্ডবগণের মনে যুদ্ধ ঘটিবার সম্ভাবনার সময় হইতেই বহুবার সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। কারণ এ যুদ্ধ করিলে আত্মীয়হত্যা করিতে হইবে; আবার না করিলে রাজার কর্তব্য পালন করা হইবে না, দুর্যোধনের অন্যায়ের প্রতিকার করা হইবে না। সংশয়ের নিরসনের জন্য—তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন—শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিবেন, তাহাই শুনিবেন। যতবার এই সংশয় আসিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, এ যুদ্ধ করাটাই ক্ষত্রিয়রাজকুমার পাণ্ডবগণের পক্ষে ধর্মসম্মত; অর্জুন অন্যান্য সকলের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সে-কথা মানিয়াও লইয়াছিলেন। মানিয়া লইয়াছিলেন বলিয়াই রণবেশে সজ্জিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়াছেন। আসিবার পর কিন্তু আত্মীয়গণকে এবং ভীষ্ম-দ্রোণকে চাক্ষুষ করিয়া অর্জুনের হৃদয় মমতাবিষ্ট হইয়াছে। এই হৃদয়-দৌর্বল্যের বশবর্তী হওয়ায়, এ যুদ্ধ যে ধর্মযুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণের এই সিদ্ধান্ত না মানিয়া তিনি নিজ মনবুদ্ধির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে চাহিলেন, অহংবুদ্ধির বশবর্তী হইয়া বলিয়া বসিলেন, 'এ যুদ্ধ করা মহা অধর্মের কাজ, মহাপাপ। কি দুর্ভাগ্য, রাজ্যলোভে আমরা এই মহাপাপকর্ম করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি! আত্মীয়-স্বজনকে, পিতামহ ভীষ্ম এবং আচার্য দ্রোণকেও হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছি!' অর্জুন নানা যুক্তিতর্ক উত্থাপন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে একথা বুঝাইতে চাহিতেছেন!

শ্রীকৃষ্ণ ইহা শুনিয়া অর্জুনকে ধমকাইয়া উঠিলেন, 'অর্জুন, ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হইও না; (তোমার এ সিদ্ধান্ত ধর্মবুদ্ধি-সঞ্জাত নয়, হৃদয়ের দুর্বলতা-সঞ্জাত;) এ হৃদয় দৌর্বল্য পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াও।' যুদ্ধ কর।

ইহাতেই অর্জুনের মোহ কিছুটা কাটিয়া গেল। পূর্বের মতো জোর দিয়া নিশ্চিত করিয়া 'ইহা অধর্ম, ইহা মহাপাপ' না বলিয়া, নিজের সিদ্ধান্তকে অভ্রান্ত না ভাবিয়া তিনি স্বর নামাইলেন, শিষ্যের মনোভাব লইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, 'আমার বুদ্ধি গুলাইয়া যাইতেছে, কি করা উচিত, কি করা অনুচিত, স্থির করিতে পারিতেছি না। যাহা শ্রেয়, যাহা আমার পক্ষে কল্যাণকর, তুমি তাহা বলিয়া দাও।'

এখানেই অহংকার মাথা নত করিতেছে, শরণাগতি হৃদয়দ্বারে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

ইহাই গীতার আরম্ভ। ইহার পর শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের কাছে সমগ্র গীতা বলিয়াছেন। ধর্ম বলিতে কি বুঝায়, তাহা তিনি অর্জুনকে বিশদভাবে বুঝাইয়াছেন। ভগবানলাভের জন্য জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি, যোগ প্রভৃতি যত পথ আছে, যতপ্রকার সাধনা আছে তাহার কথাও বিস্তৃতভাবে বলিয়াছেন। বিশেষ করিয়া বহুবার বলিয়াছেন, অনহংকার অনাসক্ত ও সমত্ব-বুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া ভগবানের পূজাজ্ঞানে কাজ

করিলে সব কাজই, যুদ্ধও ভগবানলাভের সাধনায় রূপান্বিত হয়। সব পথেরই লক্ষ্য যে এক তাহাও বলিয়াছেন। ভগবান যে স্বরূপতঃ অব্যয় অক্ষর ব্রহ্ম, এবং আমাদেরও স্বরূপ যে তাই, ইহাও বলিয়াছেন। নিজের এই স্বরূপ-উপলব্ধিই যে ভগবানলাভ, এই উপলব্ধি-লাভের দিকে অগ্রসর হওয়াই যে সাধনা, এবং ইহাই যে জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি, যোগ প্রভৃতি সর্ববিধ সাধনার লক্ষ্য তাহাও বলিয়াছেন; একবার নয়, বারে বারে বলিয়াছেন, গীতার প্রায় সব অধ্যায়েই নানাভাবে এই সত্যটি তিনি অর্জুনের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছেন।

আর, তিনি নিজে যে কে, তাহাও বহুবার বলিয়াছেন; যিনি মানুষের মূর্তি ধরিয়া বাসুদেবরূপে অর্জুনের সঙ্গে কথা বলিতেছেন, তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে উপদেশ দিতেছেন, বলিতেছেন, 'আমাকে স্মরণ কর এবং যুদ্ধও কর, আমার ভক্ত হও, আমার আরাধনা কর, আমাকে নমস্কার কর, সব ধর্মাধর্ম ছাড়িয়া আমার শরণ লও,'—তিনি যে কে, সেকথাও স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন। বলিয়াছেন :

বিশ্বে যাহা কিছু আছে সে সবকিছুকে মোটামুটি দুটি ভাগে ভাগ করা যায়; একটি হইল বিশ্বের যাবতীয় চেতনাহীন বস্তু, আর একটি এই বস্তুগুলি যাহাদের নিকট প্রতিভাত হয় সেই সমষ্টি- ও ব্যষ্টি-মনবুদ্ধিসীমিত চৈতন্য বা জীব। আমি এসকল সৃষ্টি করিয়াছি, আমিই এসকল হইয়া রহিয়াছি, কিন্তু আমার স্বরূপ এ দুয়েরই অতীত। স্বরূপতঃ অবিকারী অব্যয় ব্রহ্ম, নিরুপাধি শুদ্ধ চৈতন্য আমি। সেই আমিই আবার ঈশ্বর, নিজ মায়াশক্তিবলে জগতের সৃষ্টিবিনাশাদি করি; সেই আমিই বাসুদেবরূপে অবতীর্ণ হইয়াছি। আমার স্থূল বা সূক্ষ্ম কোনওরূপ দেহ না থাকা সত্ত্বেও জ্ঞানহীন মানুষ আমাকে স্থূল- বা সূক্ষ্ম- দেহবিশিষ্ট, ব্যক্তি বলিয়া (অবতার বা সাকার ঈশ্বর বলিয়া) মনে করে—অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ। কেন করে? এরূপ মনে না করিয়া তাহারা পারে না, কারণ আমাকে স্বরূপতঃ দেখিবার শক্তিই তাহাদের নাই, তাহাদের জ্ঞান মায়ার দ্বারা, অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত। এই আবরণ যাহার খসিয়া যায়, সে আমার স্বরূপ দেখিতে পায়। তখন আমাকেই সর্বত্র, এবং সবকিছুকেই আমার ভিতর দেখে; আবার নিজেকেই সবকিছুর ভিতর এবং সবকিছুকেই নিজের ভিতর দেখে। নিজের পৃথক্ সত্তা তাহার আর থাকে না তখন —আমারও যা স্বরূপ, তাহারও তাহাই স্বরূপ ইহা সে প্রত্যক্ষ করে। অবশ্য আমাকে এভাবে প্রত্যক্ষ করার লোকের সংখ্যা খুবই কম—বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ।

গীতায় সবশেষে তিনি শ্রীঅর্জুনকে বলিতেছেন, 'ভক্তি-বলে মানুষ আমার স্বরূপ জানিয়া আমার সহিত অভেদত্ব উপলব্ধি করে। যে আমার শরণাগত থাকিয়া কাজ করে, সে সর্বদা সর্ববিধ কর্ম করিয়াও আমার কৃপায় শাশ্বতপদ, ব্রহ্মপদ লাভ করে।'

'তুমি যদি (আমার কথা না শুনিয়া পূর্বের মতো এখনো অহংকারবশে) যুদ্ধ করিতে না-ও চাও, তথাপি তোমাকে যুদ্ধ করিতেই হইবে, তোমার প্রকৃতিই, সংস্কারই তোমাকে দিয়া যুদ্ধ করাইয়া লইবে।'

'সব কথাই তো তোমাকে বলিলাম, এখন তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই কর। (সন্ন্যাসীর ধর্মপালনে তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে, না ক্ষত্রিয়ের ধর্মপালনে হইবে, এ যুদ্ধ করা ধর্ম না মহাপাপ, এসব বিষয়ে নিজে সিদ্ধান্তগ্রহণের চেষ্টা ছাড়িয়া দাও, আমি যাহা

বলিতেছি তাহাই কর,) সব ধর্মাধর্ম ছাড়িয়া আমার শরণ লও, শোক করিও না, আমি তোমাকে সর্ব পাপ হইতে মুক্ত করিব।'

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের শরণাগতই হইয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, 'আমার মোহ কাটিয়া গিয়াছে, আমি তোমার কথামতই চলিব।'

গীতার এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখিলে বোঝা যায়, সর্ব ধর্মাধর্ম ত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানের শরণ লওয়ার অর্থ আশ্রমধর্ম বা অন্যান্য ধর্ম ত্যাগ করিয়া বসিয়া থাকা নহে, দেহ-মন-বুদ্ধিতে অহংবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া এই 'অহং'-এর পরিবর্তে শ্রীভগবানকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করা। বলা বাহুল্য, এরূপ করিবার চেষ্টা না করিয়া সব ধর্ম ত্যাগ করিয়া কিংবা দুর্বলতা বা অহংকারের বশবর্তী হইয়া অধর্মাচরণ করিয়া শুধু মুখে 'তিনি যেমন করাইতেছেন তেমনি করিতেছি' বলা শরণাগতি নহে। আন্তরিক না হইলে ইহা সর্বনাশা ভাব হইতে পারে, লক্ষ্যের বিপরীত দিকেই আমাদের টানিয়া লইয়া যাইতে পারে—জড়তায়, মোহে আমাদের আচ্ছন্ন করিতে পারে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বারে বারে বলিয়াছেন, শ্রীভগবানের যাহা স্বরূপ, যাহা আমাদেরও স্বরূপ, সেই দেহমনাতীত স্বরূপ-বোধের দিকে অগ্রগতিই সব সাধনার লক্ষ্য। শরণাগতিরূপ সাধনাও আমাদের এই লক্ষ্যেই পৌঁছাইয়া দেয়। দেহমনবুদ্ধিতে 'আমি'-বোধ থাকিলে যথার্থ শরণাগতি আসিতেই পারে না—বারে বারে 'আমার দেহসুখ', 'আমার ভাললাগা', 'আমার যুক্তিবিচার', 'আমার মতামত' ইত্যাদি তাহার পথ অবরোধ করে।

●

আত্মজ্ঞানলাভের সাধনাও যাহা, শরণাগতির সাধনাও মূলতঃ তাহাই—দেহমনবুদ্ধি হইতে 'আমি'কে আলাদা করিয়া লওয়া। একই কাজ, তফাত শুধু ভাবে ও ভাষায়। নিজের দেহমনাতীত সত্তার কথা বা ভগবানের শাশ্বত স্বরূপের কথা প্রথম হইতেই ধারণা করার শক্তি আমাদের কয়জনের থাকে? নিজের বা শ্রীভগবানের সত্তায় কেন, অপর কোথাও শুদ্ধ চেতনার অস্তিত্বের কথাই আমরা ধারণা করিতে পারি না; চেতনার কথা ভাবিতে যাইলেই স্থূল-সূক্ষ্ম কোন-না-কোন দেহমনাশ্রিত চেতন প্রাণী-সত্তাই আমাদের মনে ভাসিয়া উঠে। কিন্তু ভগবানকে আমা হইতে পৃথক্ কোন মূর্তিতে আমরা সকলেই চিন্তা করিতে পারি; উহা আমাদের মনবুদ্ধির এলাকারই অন্তর্গত। তিনি সবকিছু সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই আমাদের নিজ শক্তিবলে চালাইতেছেন, এরূপ চিন্তা করাও আমাদের সকলেরই পক্ষে সম্ভব। আমাদের 'আমি'-বোধকেও তিনি চালাইতেছেন ভাবিয়া এবং তাঁহার রূপে, তাঁহার চিন্তায় মন একাগ্র করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া ক্রমে ভক্ত প্রত্যক্ষ করে যে, যাঁহাকে মন্দিরে আমা হইতে পৃথক্ বিগ্রহরূপে দেখিতেছিলাম, তিনি আমার অন্তরেই রহিয়াছেন। আরও অগ্রসর হইয়া দেখে তিনি শুধু আমার অন্তরে নয় বাহিরেও সর্বত্র রহিয়াছেন। সবশেষে দেখে তিনি ছাড়া অন্য কোন কিছুরই, এমনকি ভক্তের নিজেরও পৃথক্ কোন সত্তাই নাই। ইহাই শেষকথা।

জ্ঞানপথে এই শেষ উপলব্ধিকেই প্রথম হইতে ধারণা করিবার চেষ্টা করিতে হয়। প্রথম হইতেই স্বরূপের এই চিন্তায় মন একাগ্র করিয়া মনের পারে যাইবার প্রচেষ্টাই জ্ঞানপথের সাধনা।

একপথে ঈশ্বরীয় প্রেমের বলে সমস্ত দেহাত্মবোধ শ্রীভগবচ্চরণে সমর্পণ করিয়া অহংকারের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার এবং অন্য

পথে জ্ঞানের আগুনে সেই অহংকে ভস্মাবশেষ করিয়া ফেলিয়া তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার প্রচেষ্টা।

এ প্রভেদটুকু সাধনপদ্ধতির প্রভেদ, সাধ্য বিষয় একই, সাধনার লক্ষ্যও এক; শুধু জ্ঞান ও ভক্তির নহে, ভগবানের কাছে পৌছাইবার জন্য যত প্রকার পথ আছে সব পথেরই এক।

যে-কোন কর্ম আমাদিগকে এই দেহমন-বুদ্ধিতে অহংবোধ কমাইয়া আনিতে সহায়তা করে, তাহাই ধর্ম। ধর্মপথে আমরা কতদুর অগ্রসর হইয়াছি তাহারও একমাত্র মাপকাঠি দেহাদিতে আমাদের অহংবোধ কতখানি কমিল তাহাই, আমরা কতক্ষণ উপাসনা করিতেছি বা কি কর্ম করিতেছি তাহা নহে।

●

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার প্রধান লীলা-সহচর স্বামী বিবেকানন্দকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে লোকশিক্ষা দিতে হইবে। বিবেকানন্দ অর্জুনের মতোই প্রথমে পারিব না বলিয়াছিলেন। পরে তিনিই বলিয়াছেন, 'দাস তব প্রস্তুত সতত সাধিতে তোমার কাজ!'—করিষ্যে বচনং তব। যুক্তির একনিষ্ঠ পূজারী বিবেকানন্দ প্রথম প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণের কথা সব মানিয়া লইতেন না; পরে তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণের শরণাগত হইয়াছিলেন। তাঁহার শরণাগতির পরের সাধনকালই নরেন্দ্রনাথকে বিবেকানন্দে রূপায়িত করে। এই সব উচ্চ অধিকারীর কথা ছাড়িয়া দিলেও শরণাগতি কিভাবে আমাদের লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর করাইয়া দেয়, শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহস্থ ভক্ত গিরিশ-চন্দ্র ঘোষের একটি কথাতেই তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। যাহাকে আমরা পাপ বলি, গিরিশ-চন্দ্র যৌবনে তাহা অনেক করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসিবার পর গিরিশচন্দ্র ভগবানলাভের জন্য একদিন তাঁহার শরণাগত হইলেন, তাঁহার চরণে সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিলেন। এখন তাঁহাকে কি করিতে হইবে? শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, 'যা করচ করে যাও। ...তবে সকালবিকালে তাঁর স্মরণ-মননটা রেখো।' এটুকুও গিরিশচন্দ্র নিয়মিত করিতে পারিবেন না বুঝিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা, তা যদি না পার তো খাবার শোবার আগে তাঁহার একবার স্মরণ করে নিও।' ইহাও পারিবেন কি না, গিরিশচন্দ্র নীরবে তাহা ভাবিতেছেন দেখিয়া শেষে বলিলেন, তুই বলবি, তাও যদি না পারি—আচ্ছা, তবে আমায় বকল্‌মা দে।'

ইহা গিরিশচন্দ্রের মনঃপূত হইল, তিনি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন—ভগবানলাভের জন্য তাঁহাকে কিছুই করিতে হইবে না, তাঁহার হইয়া শ্রীরাম-কৃষ্ণ করিবেন! ইহা তিনি 'পাঁচ সিকে পাঁচ আনা' বিশ্বাস লইয়াই ভাবিলেন; তাঁহার 'ভাবের ঘরে চুরি' ছিল না। তাই ইহা যথার্থ শরণাগতিই হইল। সেজন্য শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে 'মন্মনা ভব' না বলিলেও এই শরণাগতিই গিরিশচন্দ্রকে তাহা করিয়া তুলিয়াছিল —'খাইতে-শুইতে-বসিতে ঐ এক চিন্তা—শ্রীরামকৃষ্ণ আমার সম্পূর্ণ ভার লইয়াছেন।' আর দেহমনবুদ্ধি হইতে অহং-কে সরাইয়া লওয়ার সাধনা? পরবর্তীকালে গিরিশচন্দ্রেরই উক্তি, 'সাধন-ভজন-জপ-তপরূপ কাজের একটা সময়ে অন্ত আছে, কিন্তু যে বকল্‌মা দিয়েছে তার কাজের অন্ত নাই—তাকে প্রতি পদে, প্রতি নিশ্বাসে দেখতে হয় তাঁর ওপর ভার রেখে তাঁর জোরে পা-টি, নিশ্বাসটি ফেললে, না এই হতচ্ছাড়া আমিটার জোরে তা করলে!'

শরণাগত গিরিশচন্দ্রকে সর্বপাপমুক্ত করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব পরম ভক্তে রূপায়িত করিয়াছিলেন।

স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র

শ্রীমতী মার্গারেট ই. নোবল্
রাস্কিন স্কুল
ব্রান্টউড্ উর্পল্, উইম্বল্ডন
লণ্ডন [দ. প.]

মঠ
পোঃ বরানগর, কলিকাতা
৪.৮.৯৭

প্রিয় মহাশয়া,

সাধারণ সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশানুযায়ী আমি আপনার অবগতির জন্য ১৮৯৭-এর জুন মাসে ভারতবর্ষে আমাদের কার্যধারার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী পাঠাইতেছি।

বর্তমানে যেভাবে আমাদের কার্যপদ্ধতি পরিচালিত হইতেছে তাহার বিবরণ দিবার পূর্বে আপনাকে একথা জানাইয়া রাখি যে, এ পর্যন্ত ব্যক্তিগত ভাবে অধ্যাত্ম-সত্য প্রচারের মধ্যেই আমাদের প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ ছিল। সঙ্ঘের শক্তিকে সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে প্রয়োগ করিবার এবং যে-সব কর্ম আমরা ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছি সেগুলি চালাইয়া যাইবার জন্য আমাদের সঙ্ঘকে একটি প্রতিষ্ঠানের রূপদান করা প্রয়োজন ছিল। শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ য়ূরোপ হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার পর হইতেই সঙ্ঘকে সেভাবে গড়িয়া তুলিতে এবং ইহার কর্মধারা নিয়ন্ত্রণ করিতে ব্যাপৃত আছেন।

(১) সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের (যাহারা সন্ন্যাসী হইবার জন্য শিক্ষা লাভ করিতেছে) মিলিত মূল সঙ্ঘটি এখন একদল অধ্যাত্মবিষয়ের শিক্ষাদাতা গড়িয়া তোলার প্রধান কেন্দ্রস্বরূপ—উহা মঠ নামে অভিহিত হইতেছে। স্বামী ব্রহ্মানন্দ এই মঠের নির্বাচিত সভাপতি এবং স্বামী তুরীয়ানন্দ ও স্বামী যোগানন্দ মঠের উপ-সভাপতি। মঠের সকল সভ্যই ইহার নির্দিষ্ট নিয়মাবলী মানিয়া চলিতে বাধ্য এবং সভাপতির কর্তব্য এই নিয়মাবলী যাহাতে যথাযথ অনুসৃত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা। নিম্নে মঠের দৈনন্দিন কর্মতালিকায় সঙ্ঘের সভ্যগণ কিভাবে জীবনযাপন করিতেছেন তাহা প্রকাশ পাইতেছে—

সকাল ৬টা	প্রাতরুত্থানের সময়।
৭টা	ধ্যানাভ্যাস।
৮টা	সহজ শারীরচর্চা।
৯টা	প্রাতরাশ। পরে স্নান, প্রভাতী সেবা, পূজা ও আরাধনা।
১২টা	আহার। দুই ঘণ্টা বিশ্রাম।
২টা	অধ্যয়নকাল। সাধারণতঃ পড়া হয়—উপনিষদ্, ভগবদ্গীতা, স্বামীজীর বক্তৃতাবলী, ঈশানুসরণ প্রভৃতি।
বিকাল ৫টা	শিক্ষণ-বিষয়ক ক্লাস: ইহা চারিটি ভাগে বিভক্ত, বিশেষভাবে আলোচ্য বিষয় জ্ঞান, যোগ, কর্ম, ভক্তি। স্বামী তুরীয়ানন্দ, নির্মলানন্দ এবং

ব্রহ্মানন্দ এই সকল বিভাগের শিক্ষক। নিম্নলিখিত গ্রন্থাদি নিয়মিত পাঠ ও ব্যাখ্যা করা হয়—অধ্যাত্মরামায়ণ, বেদান্ত, গীতা, ভাগবত, উপনিষদ্ প্রভৃতি।

৬টা　সহজ শারীরচর্চা।

সন্ধ্যা　সান্ধ্য আরতি, পূজা, উপাসনা।

৭টা　ধ্যান।

৮টা　প্রশ্নোত্তর-ক্লাস ও আলোচনা—প্রতি শনিবার বিকালে এক বক্তৃতা-সভায় প্রত্যেক সভ্যকে পূর্ব হইতে প্রস্তুত না হইয়া বক্তৃতা দিতে হয়। বক্তৃতার বিষয়নির্বাচন করেন সভাপতি। জুন মাসে বুদ্ধদেবের জীবন ও উপদেশ এবং সন্ন্যাস সম্বন্ধে বক্তৃতা হইয়াছিল—প্রথমটি দেন স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, দ্বিতীয়টি স্বামী সুবোধানন্দ।

(২) মঠের সভ্যগণের উদ্যোগে "রামকৃষ্ণ মিশন" নামে একটি সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। সমিতির উদ্দেশ্য—"শ্রীরামকৃষ্ণ-আদর্শ, যাহা মানবজাতির কল্যাণকল্পে তাঁহার জীবনে প্রতিফলিত—তাহার প্রচার এবং মানবজাতির আত্মিক, বৌদ্ধিক ও দৈহিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সেই আদর্শ-সমূহের বাস্তব-প্রয়োগে সহায়তা।" মিশনের কর্মপদ্ধতি—"বিভিন্ন স্থানে নূতন নূতন কেন্দ্র স্থাপন করিয়া কলাবিদ্যা ও শিল্পবিদ্যার শিক্ষাদানের মাধ্যমে এবং শ্রীরামকৃষ্ণজীবনালোকে ব্যাখ্যাত বেদান্ত ও অন্যান্য অধ্যাত্মবিদ্যার চর্চাকে জনপ্রিয় করার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক ও লৌকিক শিক্ষাদানের যোগ্য একদল শিক্ষক তৈরি করা।" স্বামী বিবেকানন্দ এই মিশনের সাধারণ সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন।

কলিকাতা এবং মাদ্রাজে কেন্দ্র স্থাপন করিয়া ভারতবর্ষের কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে।

(৩) কলিকাতা কেন্দ্রটি শ্রীরামকৃষ্ণের সব শিষ্যদের (সন্ন্যাসী ও গৃহী) লইয়া গঠিত। স্বামী ব্রহ্মানন্দ ইহারও সভাপতি। "যে কেহ শ্রীরামকৃষ্ণ-আদর্শে বিশ্বাসী, যিনি এই আদর্শ-প্রচারে সহায়তা করিবেন এবং নৈতিক জীবনযাপনে প্রয়াসী হইবেন, তিনিই ইহার সভ্য হইতে পারিবেন।" প্রতি রবিবারে অনুষ্ঠিত সভায় বেদান্ত, গীতা বা ভাগবত হইতে আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা শোনানো হয় এবং সভাপতিকর্তৃক নির্বাচিত বিষয়ে নির্বাচিত বক্তাগণ লিখিত বক্তৃতা পাঠ করেন। জুন মাসে নিম্নলিখিত বিষয়ে আলোচনাসমূহ পঠিত হইয়াছে—১। স্বামী বিবেকানন্দের কর্মপদ্ধতি—বাবু জি. সি. ঘোষ। ২। জ্ঞান ও ভক্তি—বাবু বি. কে. বোস, এম.এ., বি. এল্.। ৩। শুকদেবের জীবনী—বাবু এস. বি. ঘোষ। ৪। শ্রীরামকৃষ্ণদেব—বাবু এম. কে. গুপ্ত, বি.এ.।

(৪) মাদ্রাজ কেন্দ্রটি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের সভাপতিত্বে পরিচালিত। এই কেন্দ্রটির কর্মপদ্ধতি নিম্নরূপ—

১। প্রতিদিন প্রভাতে মঠে রামায়ণ-আবৃত্তি।

২। প্রতি সপ্তাহে মঠে তিনদিন গীতা ও উপনিষদ্ সম্বন্ধে বক্তৃতা।

৩। Youngmen's Hindu Association (তরুণহিন্দু সঙ্ঘ) কেন্দ্রে প্রতি শনিবারে বক্তৃতা।

৪। প্রতি শুক্রবারে মঠে সাপ্তাহিক ভজন।

৫। এ সময়গুলি বাদে অন্য যে-কোন সময় স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মঠে তাঁহার নিকট আগত যে-কোন জিজ্ঞাসুর সঙ্গে আলাপ করিয়া থাকেন।

(৫) সম্প্রতি স্বামী শিবানন্দকে সিংহলে কেন্দ্রস্থাপনের জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে। তিনি কলম্বোতে তদ্দেশীয় প্রভাবশালী কয়েকজন ব্যক্তির সহিত আলাপ করিয়াছেন এবং তাঁহারা সাগ্রহে তাঁহাকে বরণ করিয়া লইয়াছেন। সিংহলের আইনসভার সদস্য মাননীয় কুমারস্বামীর উদ্যোগে আহূত একটি সভায় স্বামী শিবানন্দকে সহায়তাদানের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। তাঁহার কর্মপ্রচেষ্টার ক্রমোন্নতির বিবরণ আপনাকে যথাকালে পাঠানো হইবে।

(৬) যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ সমগ্র ভারতবর্ষে সংহারমূর্তি ধারণ করিয়াছে তাহার প্রভাব বাংলাদেশেও অল্পবিস্তর অনুভূত হইতেছে; মঠের সন্ন্যাসী স্বামী অখণ্ডানন্দ মুর্শিদাবাদ জেলায় ধর্ম-প্রচারকালে জনসাধারণের দুঃখদারিদ্র্যের যে চিত্রের সম্মুখীন হন, তাহার ফলে নিরন্ন ব্যক্তিদের অবিলম্বে সাহায্যদান করার জন্য তিনি আবেদন জানান। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন সমব্যথী বন্ধু সহায়তা করায় আমরা তাঁহাকে সেবাকার্য আরম্ভ করিবার জন্য একশত টাকা পাঠাইতে সমর্থ হইয়াছি। মহাবোধি সোসাইটি করুণাপরবশ হইয়া দেড়শত টাকা সময়োচিত সাহায্য প্রেরণ করিয়াছেন, এবং অন্যান্য সহৃদয় ব্যক্তিগণ অর্থ বস্ত্রাদি দ্বারা সেবা-তহবিলে প্রচুর সহায়তা করিয়াছেন, যাহার ফলে স্বামী অখণ্ডানন্দ প্রত্যহ প্রায় পাঁচশত শিশু ও নরনারীকে সাহায্য করিতেছেন। সম্প্রতি এই সেবাকার্যে তাঁহাকে সহায়তা করিবার জন্য স্বামী ত্রিগুণাতীতকে পাঠানো হইয়াছে।

(৭) স্বামী অভেদানন্দ ও স্বামী সারদানন্দের নেতৃত্বে ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় মিশনের যে-সকল কার্য হইতেছে, সে সম্বন্ধে আমার আর কিছু বলার বিশেষ প্রয়োজন নাই, কারণ আমার অপেক্ষা আপনিই সে সম্বন্ধে অনেক বেশী জানেন।

আশা করি, এই সংক্ষিপ্ত বিবরণে আপনি আমাদের বর্তমান কর্মধারার মোটামুটি পরিচয় পাইবেন। আশা করি, ভবিষ্যতে আপনাকে ভারতবর্ষের মিশন কেন্দ্রগুলির মাসিক কার্যবিবরণী পাঠাইতে পারিব।

ভবদীয় একান্ত বিশ্বস্ত

স্বামী ব্রহ্মানন্দ

জাগো নর-নারায়ণ

শ্রীভবতোষ শতপথী

যুগ-চেতনায় জাগো নর-নারায়ণ !
দুষ্ট-দমন, শিষ্ট-পালনকারী !
দুর্নীতি-মদমত্ত দুর্যোধন—
পাঞ্চজন্য বাজাও চক্রধারী !

রূঢ় বঞ্চনা, পাশবিক উপহাস,
অজ্ঞাতবাসে জীর্ণশীর্ণ বেশ,
ভোগ-লালসার পঙ্কিল অভিলাষ
পাপের প্রতাপে ত্রাহি ত্রাহি ডাকে দেশ !

আষ্টেপৃষ্ঠে নিষ্ঠুর নাগপাশ !
অন্ধ কারায় বিষাক্ত বন্ধন !
সৃষ্টির বুকে ভীষণ সর্বনাশ !
পতিপরায়ণা সতীর নির্যাতন !

ব্যূহরচনায় ব্যস্ত সপ্তরথী,
অন্যায় রণে পৃথ্বী কলঙ্কিতা !
বারণাবতের বর্বরোচিত স্মৃতি !
জাগো অর্জুন, অভিমন্যুর পিতা !

সারথির বেশে জাগো পাণ্ডব-সখা,
বিজয়ের রথ সাজাও রণাঙ্গণে !
'মানুষে'র ভালে উজ্জ্বল জয়টিকা
ফুটিয়া উঠুক জগতের সবখানে।

যুগ-চেতনায় জাগো নর-নারায়ণ,
ন্যায়ের নিশান উড়াও বিজয়গর্বে !
নব জীবন হউক উদ্বোধন,
মহা-ভারতের মহান শান্তি-পর্বে।

স্বামী সুবোধানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণো জয়তি

Ramkrishna Math
Belur P. O., Howrah Dist.
বৃহস্পতিবার, ১১ই ভাদ্র
1925

কল্যাণীয়া শ্রীমতী প্রতিভাসুন্দরী দেবী,

মায়ী—তোমার ও তোমার দিদির পত্র পাইয়াছি। সকলে শারীরিক ভাল আছ জানিয়া সুখী হইলাম।

আজকাল মঠের কারোর জ্বর নাই। আমি ভাল আছি। সব সাধুদের শুভাশীর্ব্বাদ তোমরা সকলে জানিবে। খুকী মায়ীর পত্র পাইয়াছি, ২১ নং আরমানী-টোলা হইতে লিখেছে। তারা ভাল আছে। সেখানে খুকী মায়ীকেও পত্র আলাদা লিখিব।

মায়ী, তুমি মায়ার সম্বন্ধে লিখেছ। যাহাতে ভগবানকে ভুলাইয়া দেয় সেই মায়া ; যে (মায়ায়) মানুষ অন্য কোনো বিষয় চিন্তা করিয়া ভগবানকে ভুলিয়া যায়, সে অবিদ্যা মায়া। যে (মায়াতে) মানুষ অন্য কোনো বিষয় চিন্তা করিয়া ভগবানকে লাভ করে, তাঁতে মন তন্ময় হয়, নিজেকে ভুলিয়া যায়, তাকে বলে বিদ্যামায়া। যাহাতে ভগবানের দিকে মন যায়, সেইজন্য লোকে পূজা, পাঠ, ধ্যান, জপ, সৎচিন্তা, সৎচর্চ্চা এই সব করে, যাহাতে সেই বিষয় অনুভূতি হয়। মহাত্মা তুলসীদাস এক সময় বলিয়াছিলেন, "জপ, তপ, পূজিয়ে সব গড়িয়া কি খেল ; যব্ সরোবর হোই তো রাখ্ পেটারী মেল।"

জপ, তপ, পূজা সমস্তই কি রকম যেমন ছোট ছোট বালিকারা পুতুল লয়ে খেলা করে, বিবাহের পরে খেলনা পুতুল পেটরায় (বাক্স) তুলে রেখে দেয়।

মায়ী, তুমি একাদশ স্কন্ধ শ্রীমদ্‌ভাগবত পড়িবে। উদ্ধব ও শ্রীকৃষ্ণের কথাবার্ত্তা। অনেক ঐ বিষয় জানিতে পারিবে।

আন্তরিক ভালবাসা শুভেচ্ছা জানিবে, তোমার পিতামাতা ও সকলকে জানাবে। সুবিধা যখন হইবে, সকলের ও নিজের কুশল সংবাদে সুখী করিবে।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
তোমাদের
শ্রীসুবোধানন্দ

নিবেদিতার সমাজ-চিন্তা

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত

মাতা ও স্ত্রীঃ নিবেদিতার বিশ্লেষণে ভারতীয় মাতার ভূমিকা তার অন্তর্নিহিত সমস্ত তাৎপর্য নিয়ে উদ্ঘাটিত। ভারতীয় সমাজে নারীর সকল প্রকার ভূমিকার মধ্যে মাতার ভূমিকা সর্বপ্রধান। মাতা পরিবারে সর্বজন-মান্যা সর্বজনপূজ্যা। কিন্তু এই ভূমিকাটির এক অপূর্ব রূপায়ণ ঘটেছে এ দেশে। "জননী সকলের মধ্যে প্রধান হ'লেও সকলের সেবায় নিযুক্ত। পরিবারের ছোট বড়, এমনকি পরিচারকবর্গেরও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানই তাঁর পরম ধর্ম।" বস্তুতঃ তাঁর সারাজীবন অবিচ্ছিন্ন সেবানুষ্ঠান-প্রবাহ ছাড়া কিছু নয়। নিত্য অতিথিসেবাকে তিনি পরমপুণ্যধর্ম ব'লে মনে করেন। পাশ্চাত্যে ধর্মমন্দিরের নির্দেশনায় যে-সকল সদাব্রত কল্যাণকর্ম অনুষ্ঠিত হয়, ভারতে তা জননী ও নারীগণের কর্তব্য ব'লে স্বাভাবিক-ভাবে অনুষ্ঠিত। এই সেবানুষ্ঠানের ভিত্তি ত্যাগ। তাঁর নিজের কোন চাওয়া-পাওয়া নেই, অন্যের সুখে, পরিবারের যৌথ সুখে তাঁর সুখ। ভারতের জাতীয় আদর্শ ত্যাগ ও সেবার মূর্ত প্রতীক এই ভারতীয় জননী। মাতাহিসাবে ভারতীয় নারীর চরিত্রের চরম বিকাশ ঘটেছে। অপরিসীম সহিষ্ণুতা, অনন্ত ধৈর্য, সর্বব্যাপী সহানুভূতি, অপার স্নেহ-মমতা, অবিরাম শ্রম ও সেবানুষ্ঠান—এই তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তিনি মাধুর্যের প্রতিমূর্তি। অনন্ত করুণাময়ী জগজ্জননীর প্রতিচ্ছবি।[১]

ভারতে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে মায়ের তুলনায় স্ত্রীর ভূমিকা অপ্রধান। এটি পাশ্চাত্যে একটি বিশেষ সমালোচনার বিষয়। সেজন্য নিবেদিতা বিশেষ যত্নসহকারে স্ত্রীর ভূমিকা বিশ্লেষণ ক'রে তার প্রকৃত স্থান-নির্ণয়ের প্রচেষ্টা করেছেন।[২] বধূজীবন মাতার মহিমান্বিত জীবনের প্রস্তুতি, কালে পরিবারে মাননীয়া ও সর্বজনপূজনীয়ার পদ অলঙ্কৃত করবার জন্য এ এক কঠিন সাধনার কাল। সুতরাং একথা মনে করবার কারণ নেই যে, স্ত্রীর স্থান এখানে অমর্যাদার। বিষয়টি বুঝতে হ'লে একথাও প্রণিধান করা প্রয়োজন যে, ভারতীয় নারীর নিকট সর্বাবস্থায় "ক্ষমতা- ও প্রণয় লাভ অপেক্ষা জ্ঞান, সেবা ও ত্যাগই যথার্থ কীর্তি।" এই কীর্তি অর্জনের জন্যই তার জীবন নিয়ন্ত্রিত। এই কীর্তির মানদণ্ডেই তার সামাজিক মর্যাদা যে-কোন ভূমিকায়ই নির্দেশিত। এই ভিন্নতর মানদণ্ডের বিচার সম্পূর্ণ পৃথক। নিবেদিতা এই মানদণ্ড প্রয়োগ ক'রে দেখিয়েছেন যে, "ভারতীয় নারীর বিবাহের পর পতিগৃহে-আগমন পাশ্চাত্য নারীর ধর্মমন্দিরে প্রবেশের সঙ্গে তুলনীয়।" কারণ এখানে "বিবাহ পতি-পত্নীর সুখের জন্য নয়, বিবাহের উদ্দেশ্য ধর্মাচরণ"—বিবাহ গার্হস্থ্যাশ্রমে অনুপ্রবেশ। স্ত্রী-পুরুষ কেবল পরস্পরের জন্য নয়, তাদের উভয়ের জীবন সমগ্র পরিবারের অঙ্গ, আত্মসুখ নয়, পরিবারের যৌথকল্যাণ তাদের লক্ষ্য, সকলের সুখের জন্য নিরবচ্ছিন্ন শ্রম ও কর্মানুষ্ঠান তাদের একমাত্র কর্তব্য। পতি-পত্নীর সম্পর্কের

---

১ The Web of Indian Life—The Eastern Mother অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

২ The Web of Indian Life—The Woman as Wife.

ভিত্তিই এই যৌথকল্যাণ-ব্রত-পালন। এইজন্য পতি-পত্নীর জীবনে পাওয়ার প্রশ্ন বড় নয়, দেওয়ার প্রশ্ন বড়; দেওয়াতেই পত্নীর কৃতিত্ব, ত্যাগেই তার গৌরব—"Wifehood is thought great in proportion to its giving, not to its receiving." দাম্পত্য-সম্পর্কের ভিত্তিতেও সেজন্য সমানাধিকারের স্থান নেই। একপক্ষে থাকবে একনিষ্ঠ ভক্তি, অপরপক্ষে থাকবে সীমাহীন মর্যাদা রাখার দায়িত্ব। এখানে মনে রাখতে হবে, প্রাচ্য দেশে নারীর মর্যাদা-রক্ষার প্রশ্ন সামাজিক জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার ক'রে আছে। নিবেদিতার ভাষায়—"As to the skies their centre is the Polar Star, so to the Eastern home the immovable honour of its womanhood." এ বিষয়ে মনুস্মৃতি উদ্ধার ক'রে দেখিয়েছেন যে, ভারতীয় দৃষ্টিতে—"যে গৃহে নারী সম্মানিত, তার উপর দেবগণের আশিস্ বর্ষিত হয়, যে গৃহে নারীর সম্মান নেই, সেখানে ধর্মাচরণ বিফল হয়।" এখানে নিবেদিতা স্মৃতিশাস্ত্রের তাৎপর্য অতি সুন্দরভাবে নির্দেশ করেছেন—"... The laws of Manu are rather the unconscious expression of the spirit of the people than a declaration of the ideals towards which they strive."—অর্থাৎ স্মৃতিশাস্ত্র শুধু মনগড়া অনুশাসন-সমষ্টি নয়, বাস্তব সামাজিক জীবনের চিত্র। সুতরাং নিঃসন্দেহে ভারতীয় সমাজে বাস্তবতঃ নারীর মর্যাদা অনেক উচ্চে। এবং সেজন্য স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে সমানাধিকারের প্রশ্ন অবান্তর। স্ত্রী স্বামীর সহধর্মিণী, সেই হিসাবে একের অধিকারেই অপরের অধিকার, একের সম্মানে অপরের সম্মান, একের সুখ-দুঃখই অপরের সুখ-দুঃখ। নিবেদিতার মতে এরূপ ক্ষেত্রে সমানাধিকারের প্রশ্ন শুধু অবান্তরই নয়, 'হীন' দোকানদারি-সুলভ যা ভারতীয় জাতির দৃষ্টিভঙ্গীতে অত্যন্ত হেয়—"And this is in full accordance with the national sentiment, which stigmatises affection that asks for equal return as 'shopkeeping".

সমাজতাত্ত্বিক বিচারে সমানাধিকার: এ প্রসঙ্গে স্ত্রী-পুরুষের সমানাধিকারের ধারণা সম্পর্কে নিবেদিতা একটি সমাজতাত্ত্বিক বিচার উপস্থাপিত ক'রে বিষয়টির উপর প্রভূত আলোকসম্পাত করেছেন।[৩] তৎকালীন পুরাতত্ত্ববিদদের অনুসরণ ক'রে তিনি অভিমত প্রদান করেছেন যে, স্ত্রী-পুরুষের সমানাধিকারের উৎস হ'ল আদিম ধীবর-জীবন। বিষয়টির বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান ক'রে তিনি বলছেন—"যেখানে কোন জাতিকে নিয়ত প্রকৃতির সঙ্গে কষ্টকর সংগ্রামে লিপ্ত থাকতে হয়, সেখানেই স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের মধ্যে পূর্ণসহযোগিতা, আচার-ব্যবহারে সাদৃশ্য এবং সমানাধিকারের প্রবণতা দেখা যায়। আর জীবনযাত্রা যেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত, উদ্বেগ অনেকাংশে তিরোহিত, সেখানে স্ত্রীপুরুষের বিপরীতমুখী কর্মধারার দিকে ক্রমবর্ধমান ঝোঁক দেখা যায়।" প্রথম আর্যযুগে ভারতে নারীগণের মধ্যে অবাধ স্বাধীনতা ছিল। এ স্বাধীনতা ভূমি ও অরণ্যের সঙ্গে অবিরাম সংগ্রামের ফল। তখন মুহূর্তমধ্যে যে-কোন বিপর্যয়ের জন্য প্রস্তুত হ'তে হয়েছে নারীকে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, সাহস ও আত্মনির্ভরতার সঙ্গে। এরূপ ক্ষেত্রে স্ত্রীপুরুষের সমান আচরণ স্বাভাবিক। কিন্তু অরণ্যসঙ্কুল

---

৩ The Web of Indian Life—Chapter on 'The Place of Woman in the National Life.'

দেশ পরিষ্কৃত হ'লে এবং উন্নতধরনের কৃষিকার্য সুপ্রতিষ্ঠিত হ'লে অবস্থার পরিবর্তন ঘটল, সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গীরও। তখন মানসিক ও আত্মিক উন্নতির প্রচেষ্টা,—অর্থাৎ সাংস্কৃতিক বিষয়ে উন্নতি, তার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের উচ্চতর সমস্যায় জাতির উদ্যম একাগ্র হ'ল। এই পরিবর্তিত পটভূমিকায় নারীজীবনের ভূমিকাও পরিবর্তিত হ'ল। পুরুষের রক্ষণাবেক্ষণ-শক্তির নিকট আত্মসমর্পণ ক'রে নারী তখন ধর্ম ও নীতির ক্ষেত্রেই নিজ ব্যক্তিত্ব প্রকাশের প্রয়াস পেল। পূর্বেই বলা হয়েছে, নৈতিক সভ্যতায় সংস্কৃতির দূত হিসাবে নারীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, নারী এ সভ্যতার ধারক বাহক ও প্রচারক। সেজন্য তার সমস্ত সামাজিক অধিকার এই পটভূমিকায় রচিত। শুচিতার আদর্শের সহায়ক ব'লে কোন বিশেষ সময়ে অবরোধ-প্রথার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে।

ভারতে অবরোধপ্রথা ঃ কিন্তু তা ব'লে এ কথা ঠিক নয় যে, ভারতে অবরোধপ্রথা ভারতীয় নারীজীবনের ক্ষেত্রে একমাত্র সত্য। ভারতে অবরোধপ্রথা চিরন্তন তো নয়ই, সর্বজনীনও নয়। কোন দিনও সারা ভারতের সকল অঞ্চলে বা সকল শ্রেণীর মধ্যে এর প্রচলন ছিল না—দাক্ষিণাত্যের মাতৃশাসিত সমাজেও নয়, মহারাষ্ট্রেও নয়। সেজন্য কেবলমাত্র অবরোধপ্রথাকে চিরন্তন ও সর্বজনীন ধরে নিয়ে ভারতে নারীর সামাজিক অধিকার বিচার করলে চলবে না। এ বিষয়ে উত্তর-পূর্ব, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বৈচিত্র্য পর্যালোচনা ক'রে নিবেদিতা সিদ্ধান্ত দিয়েছেন—"বাস্তবপক্ষে নারীর অধিকার ও সামাজিক স্থান সম্পর্কে এমন কোন মতবাদ নেই যার দৃষ্টান্ত ভারতের সীমানার মধ্যে কোথাও না কোথাও পাওয়া যাবে না।" ধর্মপরায়ণা, অবগুণ্ঠনবতী অন্তঃপুরচারিণীর পাশেপাশেই পাওয়া যায় চাঁদবিবি ও লক্ষ্মীবাঈ-এর মতো বীরাঙ্গনাদের যাঁদের মধ্যে অবরোধপ্রথা ছিল না। যাঁরা যোদ্ধবেশ পরিধান ক'রে এমনকি যুদ্ধক্ষেত্রেও নেতৃত্ব প্রদান করেছেন। অবরোধপ্রথার উৎপত্তি শাসকশ্রেণীর নির্যাতন থেকে, আত্মরক্ষার প্রয়োজন থেকে। কালিদাসের নাটকে এবং সাধারণভাবে প্রাচীন সংস্কৃত-সাহিত্যে ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে যে, বৈদিক বৌদ্ধ এবং পৌরাণিক যুগে এই প্রথা বর্তমান আকারে অনুসৃত হয়নি।

অচ্ছেদ্য বিবাহ-বন্ধন ঃ ভারতীয় সমাজে প্রচলিত অচ্ছেদ্য বিবাহবন্ধন-ব্যবস্থা নিয়ে মতভেদ বর্তমান। নিবেদিতার বিচারে আত্ম-সংযম এর লক্ষ্য। মাতৃত্বের আদর্শের ভিত্তি পবিত্রতার উপর। একান্ত পবিত্রতার জন্যই এই ব্যবস্থা পরিকল্পিত হয়েছিল। কিন্তু আজন্ম বন্ধনপাশই তার লক্ষ্য ছিল না। এ আদর্শের যথার্থ ও ন্যায়সঙ্গত পরিণতি ব্রহ্মচর্যে। নিবেদিতার মতে এই ব্রহ্মচর্যের আদর্শে সন্তানকে দীক্ষিত করবার জন্য এর প্রয়োজনীয়তা। তাঁর নিজের অনবদ্য ব্যাখ্যানুসারে "জননী এইরূপে আত্মোৎসর্গরূপ মধুর কারাগারে প্রবেশ করেন, যাতে তাঁর সন্তানের কাছে জীবনের সেই সমুচ্চ আদর্শ মূর্ত ক'রে তুলতে পারেন, যাতে তাঁর নিষ্কলুষ ভক্তিপূত জীবনের মধ্য দিয়ে সন্তানের দৃষ্টির সম্মুখে সেই জীবনকে পরিস্ফুট করতে পারেন যা সুদূর নক্ষত্রলোক পর্যন্ত প্রসারিত।"[৪]

---

৪ ভারততীর্থে নিবেদিতা—'The Eastern Mother'-এর অনুবাদ, পৃঃ ১৩৩

জীবনের পরমার্থ ও নারীজীবন: সেই মহাজীবন সকলেরই লক্ষ্য। সেজন্য ব্যক্তি-জীবন এমনভাবে পরিকল্পিত যাতে সেই নৈর্ব্যক্তিক পরম জীবনে তার পরিসমাপ্তি ঘটে। নারী-জীবনও সেইভাবে পরিকল্পিত। জীবনের অন্তে স্বামী, সন্তান, সংসারের নিকট হ'তে বিদায় নিয়ে পরমদেবতার চরণে মিলিত হওয়াই ভারতীয় নারীজীবনের চরম লক্ষ্য। তার সারাজীবনব্যাপী ত্যাগ ও সেবাব্রত-পালন, পরার্থসাধন-ব্রতের উদ্‌যাপনের মধ্যে থাকে তার প্রস্তুতি। সেজন্য স্বামীর মৃত্যু ঘটলে সংসার হ'তে বিদায় নিয়ে ঈশ্বর-অর্চনাই নারীর পক্ষে লক্ষ্য-সাধক ব'লে বিবেচিত হয়েছে। বৈধব্য সন্ন্যাসেরই নামান্তর। ভারতে জীবনের আরম্ভ যেখানেই হোক না কেন তার পরিসমাপ্তি ঈশ্বরেই। সংসারের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিধবাদের পরার্থসাধন-ব্রত অনেক সময়ই বৃহত্তর ক্ষেত্রে ধাবিত হয় নিষ্কাম কর্মযোগ-পালন হিসাবে। রোগে শোকে এঁরা শুধু গৃহপরিজনদেরই নয়, প্রতিবেশী ও অনেক সময় সমগ্র পল্লীরই সেবিকা। মৃত্যুকে তুচ্ছ ক'রে এঁদের নির্ভীক সেবাতৎপরতা নিবেদিতাকে স্তম্ভিত করেছিল। তিনি দেখেছিলেন এরকমই একজনকে কলেরারোগাক্রান্ত রোগীর নিকটে, দেখেছিলেন পল্লীর হিতাকাঙ্ক্ষায় সর্বাগ্রে নিজ হাতে সমস্ত পরিষ্কার করতে। দেখেছিলেন যে, এমন ভয়ঙ্কর রোগ নাই, এমন ঘৃণ্য ব্যাধি নাই, যার কাছে অকুতোভয়ে এঁরা না এগিয়ে গিয়েছেন, লোকের রোগে শোকে যন্ত্রণায় এঁরা অশ্রুসজল নয়নে সাহায্যের হাত প্রসারিত করেছেন সর্বদা। এ বিষয়ে আপন-পর বিচার তাঁরা করেননি। সমগ্র পল্লীবাসীর আহার সম্পন্ন হবার সংবাদ না পাওয়া পর্যন্ত এঁদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত আহারে বসতেন না। তারই ফলশ্রুতিতে সামাজিক বিধান তাঁদের অনেক উচ্চস্থান নির্দেশ করেছে। পুণ্যবতী এরকম নারীর সম্মান কিরূপে সর্বোচ্চ ছিল তার পরিচয় দিতে গিয়ে নিবেদিতা বলেছেন, "In any case, they produce the saints, and the position of a woman saint in India is such that no man in her neighbourhood will venture on a journey without first presenting himself before her veiled form, taking the dust of her feet, and receiving her whispered blessing." এই সকল পুণ্যশীলা নারীদের চরণ-বন্দনা না ক'রে কেউ কোথাও যাত্রা করতেন না।

শ্রমের মর্যাদা ও নারী: ভারতীয় নারীর জাতীয় জীবনে অপর একটি মহামূল্য অবদান নিবেদিতা আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। ভারতে সর্বত্র সরল অথচ জ্ঞানদীপ্ত উচ্চ জীবনই আদর্শ ব'লে বিবেচিত হয়েছে। সেজন্য এখানে জীবনযাত্রা অভিজাত ও ধনীদের ক্ষেত্রেও বিলাসভোগবহুল নয়। সমগ্র জনসমাজের সামনে সরল অনাড়ম্বর জীবনযাত্রাকে আদর্শ হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে যুগ যুগ ধরে। সেজন্য ভারতবর্ষে শ্রমের মর্যাদা অপরিসীম। শ্রম ব্যক্তিজীবনে—বিশেষ ক'রে জাতীয় জীবনের আদর্শ-রক্ষয়িত্রী নারী-জীবনে—অনুশাসনের পর্যায়ে উন্নীত। ভারতীয় নারীজীবনে শ্রমকে পুণ্যব্রত-অনুষ্ঠানের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। শ্রম ও মাতৃত্ব সংযুক্ত হয়েছে। মাতৃস্থানীয়া প্রধানাদের তত্ত্বাবধানে রাখা হোত গোশালা, রন্ধনশালা, শস্যভাণ্ডার, উপাসনালয় প্রভৃতি। সেজন্য তাঁদের অধীন নারীগণকে এবং তাঁদের নিজেদের এই সকল কর্মনির্বাহে প্রভূত শ্রম করতে হোত। নিবেদিতা দেখিয়েছেন

"সকল প্রকার সূক্ষ্মতা, কোমলতা এবং আত্মমর্যাদা দ্বারা শ্রমকেও মহীয়ান ক'রে তোলা হয়েছে।" মাতৃহৃদয়ের মমতার স্পর্শ দিয়ে শ্রমকে মর্যাদায় উন্নীত করার ফলে এরূপ শ্রম করা ধনী অভিজাত কুলের নারী-গণের পক্ষেও নিন্দার্হ না হয়ে প্রশংসার্হ হয়েছে।

ক্রীতদাস-প্রথা ও ভারত: পরিণামে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফল লাভ হয়েছে। পৃথিবীর সর্বত্র ধনী ও অভিজাত পরিবারের সঙ্গে ক্রীতদাস অপরিহার্য ছিল। ভারতে ধর্মীয় অনুশাসনেও এই প্রথার সমর্থন নেই। শ্রম মর্যাদায় ভূষিত হওয়ায় এবং বহুল শ্রমের কাজ নারীগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত হওয়ায় কখনও ক্রীতদাস আভিজাত্যের ও ধনের অপরিহার্য অঙ্গ ব'লে বিবেচিত হয়নি। নিবেদিতা তাই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন—"জগতে একমাত্র রক্ষণশীল হিন্দু পরিবারেই উচ্চস্তরের সভ্যতার সঙ্গে সর্বপ্রকার পারিবারিক দাসত্বের অবলুপ্তি ঘটিয়েছে।"[৫] ভারতে যেসকল ক্ষেত্রে ক্রীতদাস প্রথা ছিল, যেখানেও দেখা গেছে এরা সাধারণতঃ 'পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালক, পরিবারের অন্যান্য বালকবালিকাদের সঙ্গেই তাদের লালন পালন করা হয়েছে, যদিও তাদের নিম্ন কাজে নিযুক্ত করা হোত। অর্থ-উপার্জনের সময় এলে পূর্বতন কর্তা বা কর্ত্রীর মনে কখনও একথা উদিত হয়নি যে, তাঁদের পোষ্যদের বেতনের উপর কোনরূপ দাবিদাওয়া তাঁদের নিজেদের আছে। যদিও যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের বিবাহ দিয়ে যথাযথরূপে জীবনে প্রতিষ্ঠিত ক'রে দিতে না পেরেছেন ততক্ষণ তাদের কর্তব্য শেষ হয়েছে ব'লে মনে করা হোত না।" নিবেদিতার মতে "এই মনুষ্যত্ববোধের একটি অপূর্ব ফল এই যে 'ক্রীতদাস' শব্দটি য়ুরোপীয়দিগের ন্যায় এশিয়াবাসীর মনে ততখানি অপমানের জ্বালা সৃষ্টি করে না।"

প্রাচ্য নারীগণ সম্বন্ধে নিবেদিতার উপর্যুক্ত সমীক্ষান্তে সিদ্ধান্ত নিম্নোক্তরূপ ··· "কঠোর পরিশ্রমী ও ধর্মপরায়ণা স্ত্রীলোকগণ ক্ষুধার্তকে অন্নদান, নিরাশ্রয়কে আশ্রয়দান প্রভৃতি কর্তব্যের দৈনন্দিন গৃহকাজগুলি ক'রে চলেছেন। সত্যসত্যই প্রাচ্যদেশ সকল ধর্মের চিরন্তন জননী, কারণ যেসকল কর্তব্য পাশ্চাত্য সরকারী ব'লে মনে করে অথবা গীর্জার অনুশাসন ব'লে গ্রহণ করে, প্রাচ্য রমণী সেগুলি সাধারণ সামাজিক কর্তব্য ব'লে নির্ণয় করেছেন।"[৬] পুনরায়, "নারীর এই সহনশীলতাই —সহনশক্তিই সৃষ্টি করে সভ্যতার। ভারতীয় নারীর এই সহনশীলতা এবং অপার কল্পনা-শক্তির সংমিশ্রণেই অতীতে ও বর্তমানে ভারতের জাতীয় জীবনে বিশিষ্ট ধারার উদ্ভব।" উপসং-হারের মন্তব্যটি অমূল্য, সেজন্য পুনরুল্লেখযোগ্য —"আদর্শের দিক দিয়ে একজন ভারতীয় নারীর জীবন ভারতভূমির কাব্যস্বরূপ।"

মনে হোতে পারে নিবেদিতার এই দেখা ঠিক নয়, কারণ তিনি আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার গুণের দিকেই দৃষ্টিপাত করেছেন, দোষের দিকে নয়। তাঁর Web of Indian Life গ্রন্থের কোন সমালোচক সেকথা উল্লেখ করেছেন। এরূপ একটি মন্তব্য: It is all pure undiluted optimism··· It is the suppression of the other side of the picture that we deprecate in the interest, not only of the truth, but of the cause of Indian women themselves, whose lot will

৫ ভারততীর্থে নিবেদিতা—পৃঃ ১২৪

৬ Ibid—পৃ ১৪০

never be improved if this sort of sentimental idealism about them is allowed to obtain credence."[৭] অর্থাৎ 'ভগিনী নিবেদিতা কেবল বিশুদ্ধ অবিমিশ্র আশাবাদের কথা বলেছেন। চিত্রটির অপর-দিককে এখানে উদ্‌ঘাটিত করা হয়নি, তা করা না হ'লে ভারতীয় নারীদের উন্নতির কোন সম্ভাবনা নেই' ইত্যাদি। চিত্রের অপরদিকটি স্বামী বিবেকানন্দ নিজে উদ্‌ঘাটিত ক'রে বলেছেন 'শতশতযুগব্যাপী মানসিক, নৈতিক ও দৈহিক অত্যাচারে ভারতের প্রতিমাস্বরূপ নারীকে সন্তান উৎপাদন করিবার যন্ত্রস্বরূপ করিয়া ফেলিয়াছে এবং জীবন বিষময় করিয়া তুলিয়াছে।" চিত্রটির অপরদিক সম্বন্ধে বিবেকানন্দ কি লিখেছেন তাও দেখতে হবে—"এ সীতা সাবিত্রীর দেশ, পুণ্য-ক্ষেত্র ভারতে মেয়েদের যেমন চরিত্র, সেবাভাব, স্নেহ, দয়া, তুষ্টি ও ভক্তি দেখা যায়, পৃথিবীর কোথাও তেমন দেখলাম না।" এই সকল নৈতিকগুণ ভারতীয় রমণীর মধ্যে জীবন্ত ছিল, আজও অনেকাংশে আছে। কিন্তু অন্যান্য বিদ্যা আয়ত্তের প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয়ই রয়েছে। অন্তঃপুরসীমার মধ্যে আবদ্ধ সাধারণ নারীর জীবন নিশ্চয়ই সঙ্কীর্ণ। এ বিষয়ে অসম্পূর্ণতার কথা নিবেদিতাও অস্বীকার করেননি। এ বিষয়ে নিবেদিতার দৃঢ়মতের 'পরিবর্তন হবেই'।[৮] সেই অসম্পূর্ণতা দূরীকরণের জন্য, সেই পরিবর্তন আনার ব্যাপারে সহায়তার জন্য পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা নিয়ে নিবেদিতা এদেশের নারীশিক্ষাব্রত গ্রহণ ক'রে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের বিদ্যা প্রাচীন সংপ্রাপ্তির সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। প্রাচীন সম্পদকে মুছে দিয়ে নূতনের দিকে হাত বাড়ালে আমরা লাভবান হবো না। এরকম একটা প্রবণতা পাশ্চাত্য শিক্ষিত মহলে ছিল ব'লেই নিবেদিতা প্রধানতঃ প্রাচীন শিক্ষা ও সংস্কৃতির মূল্যগুলিকে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরবার প্রয়াস করেছেন। চিত্রের অপরদিকে সেজন্য দৃষ্টি নিক্ষেপ করবার প্রয়োজন বোধ করেননি। এ বিষয়ে তাঁর প্রকৃত অভিমত নিম্নোক্ত উক্তির মধ্যে পাওয়া যায়—"যে পরিবর্তন হবেই তা না ঘটালে অতীত কীর্তির ভারে ভারত ভরাডুবি লাভ করবে। কিন্তু তা ব'লে কি ভারতীয় পদ্মিনী অবনমিত হয়ে গ্রীসীয় হেলেনে পরিণত হবে? ভারতীয় নারীর পুরাতন সৌম্য গাম্ভীর্য, সুগভীর জ্ঞানের সঙ্গে প্রাচীন যুগের পুণ্যশীলতাকে নষ্ট না ক'রে নূতনতর বিদ্যাকে যুক্ত করতে হবে। বৃহত্তর দায়িত্ব পবিত্রকে পবিত্রতর ক'রে তুলবে। গভীরতর জ্ঞান নূতন ও অধিকতর মাধুর্যের উৎস হবে।... আধুনিক যুগের সে মহিমময় সংপ্রাপ্তির তুলনায় প্রাচীন মহিমার কল্পনা মৃদু দীপশিখার ন্যায় মনে হবে।"

নিবেদিতার এ বিষয়ে চিন্তাধারা কত বস্তু-নিষ্ঠ ছিল তা আজকের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে বোঝা যায়। এ বিষয়ে ভবিষ্যৎকে কি তিনি স্পষ্ট দেখে শঙ্কিত ও ব্যথিত হয়ে আমাদের সাবধান করতে চেয়েছিলেন? ভারতীয় নারী প্রায় শতাব্দীকালব্যাপী ইংরেজী শিক্ষার ফলে তাদের অতীতে প্রাপ্ত মহান আদর্শ রক্ষা করতে পেরেছে কিনা আজ সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ হয়। অন্ততঃপক্ষে অভিজাত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর মধ্যে মনে হয় বিজাতীয় ভাবধারার নিকট যেন জাতীয় ভাবধারার

---

৭ C. W.—Vol. II : ntroduction

৮ জাতীয়তার রূপায়ণে চারুকলা—ভারততীর্থে নিবেদিতা, পৃঃ ২৯০

পরাজয় ঘটেছে। সে ঘৃণ্য পরানুবাদ পরানুকরণকে সর্বথা পরিহার করবার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ অগ্নিময়ী ভাষায় আবেদন জানিয়েছিলেন, তা আজ আমাদের উপর বিপুল আধিপত্য বিস্তার করছে। আজ বেশে বাসে, আচারে আচরণে, চিন্তায় কর্মে, জীবনদৃষ্টিতে আমরা পাশ্চাত্যকে অন্ধের মতো অনুকরণ করছি। এই অনুকরণকে আমরা কি ক'রে অগ্রগতি বলে অভিহিত করতে পারি? অনুকরণ কি অগ্রগতি? পাশ্চাত্য জীবনবাদ বা জীবনবোধ কি অভ্রান্ত? তা যদি হোত রোমাঁ রোলাঁ, হুইটম্যান, ঈশারউড, আল্ডুস হাক্সলে প্রভৃতির মতো পাশ্চাত্য মনীষিবৃন্দ ভারতের কাছে তার জীবনবোধ গ্রহণ করবার জন্য প্রার্থী হ'তেন না। ভারতের নারীগণকে আজ অপ্রমত্ত চিত্তে বিষয়টি বিচার ক'রে দেখতে হবে। সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্য ধরনের শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয় নারীগণ আজ পুরোপুরি জাতীয় ঐতিহ্যচ্যুত, সন্তানগণকে জাতীয়তাবোধে দীক্ষিত করতে তাঁরা আর পারছেন না। ফলে আজকের তরুণ-সম্প্রদায়ের একাংশের পায়ের তলায় মাটি নেই। তারা এক অতি বিপুল ঐশ্বর্য হারিয়ে ফেলেছে। তারা শ্রদ্ধাহীন, নীতিহীন, অস্থিরচিত্ত। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে তারা বিবেকহীন এবং মানবতাবোধহীন। আজ সেজন্য শ্রেয়োবোধ সর্বাংশে বিঘ্নিত। আদর্শের শূন্যতা তো সম্ভব নয়। সেজন্য তারা যে-সকল মতবাদ আজ গ্রহণ করছে তা তাদের পূর্বতন অতি বেগবান প্রাণবান মানবতাবোধের ছায়ামাত্র। কিন্তু যেহেতু অতীত ঐতিহ্য তাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, এই ছায়াকেই তারা আঁকড়ে ধরছে প্রাণপণে। সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করছে আশ্চর্যরকম সঙ্কীর্ণতা, কারণ মতবাদমাত্রই অন্ধ, সঙ্কীর্ণ। সেজন্য ভারতের জাতীয় চরিত্রে সে সঙ্কীর্ণতা, সে অসহিষ্ণুতা, সে নৃশংসতা এসে পড়েছে। ধর্মান্ধ নরনারীর মতো অন্ধ আদর্শবাদে দীক্ষিত এই সকল তরুণ-তরুণী এগুলিকে পরমধর্ম ব'লে জ্ঞান করছে। মানবচরিত্রের এর চেয়ে অধঃপতন আর কি হ'তে পারে? সমগ্র বিশ্বেই আমরা আজ বিবেকহীন, বিশ্বাসহীন, শ্রদ্ধাহীন একদল তরুণ-সম্প্রদায়ের অস্থিরতা লক্ষ্য করছি। তা ধর্মহীন শিক্ষার পরিণাম—এ কথাটি খুব অল্প লোকই ভেবে দেখছেন। না হ'লে আজকের দিনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিদ্যার শিক্ষার সমবায়ে মানুষ অনেক কুসংস্কার হ'তে যে মুক্তি লাভ করেছিল, সেই মুক্তি-সচেতন মানুষ অনেক বড় মানুষ হ'তে পারতো। ভগিনী নিবেদিতা আধুনিক যুগের মর্ম গ্রহণ ক'রে এই সম্ভাবনা সুস্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন। সেজন্যই আমাদের বারবার সাবধান ক'রে বলেছেন, 'অতীতে লব্ধ তোমাদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিকতা-ভিত্তিক জীবনাদর্শকে তোমরা হারিয়ে ফেলো না।' প্রাচীন জ্ঞান ও পুণ্যের সঙ্গে নূতনতর বিদ্যাকে সংযুক্ত ক'রে আরও মহিমান্বিত জীবন লাভের জন্য ভারতীয় নারীসমাজের কাছে তিনি আবেদন জানিয়েছিলেন। এই আবেদনে তিনি বলেছিলেন—"আজ আমাদের দেশ ও ধর্ম দারুণ দুর্দশায় উপনীত। স্বামী বিবেকানন্দ এই মুহূর্তে তাঁর কন্যাদের বিশেষভাবে আহ্বান করেছেন—তাঁরা যেন প্রাচীনকালের মতো শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে তাঁকে সাহায্য করতে অগ্রসর হন।···

"প্রথমতঃ হিন্দুমাতা তাঁর ছেলেদের মধ্যে ব্রহ্মচর্যের তৃষ্ণা পুনরায় জাগিয়ে তুলুন। এ-ছাড়া জাতির পক্ষে তার প্রাচীন বীর্যলাভ সম্ভব নয়। ভারত ব্যতীত পৃথিবীতে আর কোথাও ছাত্রজীবনের এমন মহান আদর্শ নেই। যদি এখানেই তা নষ্ট হয়ে যায়, তবে আর

কোথায় তাকে রক্ষা করবার আশা করা যেতে পারে ?…

"দ্বিতীয়তঃ, আমরা কি নিজেদের এবং সন্তান-সন্ততির মধ্যে পরদুঃখকাতরতা ফুটিয়ে তুলতে পারি না ? এই পরদুঃখকাতরতা সকল মানুষের দুঃখ, দেশের দুরবস্থা এবং বর্তমানে ধর্ম কত বিপন্ন তা জানতে আগ্রহ জাগাবে। এই জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশে বহু শক্তিশালী কর্মীর আবির্ভাব হবে, যারা কর্মের জন্যই কর্ম করবে এবং স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর সেবার জন্য মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করতে প্রস্তুত থাকবে। আসুন আমরা সকলে উপলব্ধি করি স্বদেশ আমাদের জন্য কি করেছে। এই স্বদেশের জন্য আমরা সব পেয়েছি—জীবন, আহার, পরিজন, বন্ধু ও সম্মান। এই দেশই কি আমাদের প্রকৃত জননী নয় ? আবার কি তাঁকে মহাভারতরূপে দেখবার আকাঙ্ক্ষা আমরা পোষণ করব না ?"[১]

হয়ত আজও দেরি হয়ে যায়নি। এখনও যদি আমরা অবহিত হই, নিবেদিতা আমাদের যে আত্মপরিচয় দিয়েছিলেন, সেই আত্মপরিচয় আজও আমরা চিনে নিতে পারি, তা হ'লে আজও হয়ত ভারতবর্ষে ঘনিয়ে-আসা পৃথিবীর এক আসন্ন সভ্যতার সঙ্কটের হাত হ'তে এখনও আমরা পরিত্রাণ লাভ করতে পারি।

(ক্রমশঃ)

১ An Open Letter to The Hindu Women—C. W.—Vol. II. অনুবাদ : ভারততীর্থে নিবেদিতা, পৃঃ ৩৩৪-৩৩৫

"জননীগণ উন্নত হইলে তাঁহাদের কৃতী সন্তানবর্গের মহৎ কীর্তি দেশের মুখ উজ্জ্বল করিতে পারিবে এবং তখনই ঘটিবে দেশে সংস্কৃতি, পরাক্রম, জ্ঞান ও ভক্তির পুনরুজ্জীবন।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

'সম্ভবামি যুগে যুগে'

শ্রীগুরুদাস দাশ

প্রস্থানত্রয়ের অন্যতম সর্বশাস্ত্রসার গীতায় ভগবান বাসুদেব বলেছেন :

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥"

—'সাধুগণের (ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণের) পরিত্রাণ, পাপকারিগণের বিনাশ ও ধর্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করি।'

আচার্য শংকর তাঁর গীতার উপক্রমণিকা-ভাষ্যের প্রথমেই ঈশ্বরতত্ত্বের অবতারণা-প্রসঙ্গে "ওঁ নারায়ণঃ পরোঽব্যক্তাদণ্ডমব্যক্তসম্ভবম্"—এই পৌরাণিক শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছেন। 'ওঁ নারায়ণঃ'—এই 'নারায়ণ'ই পরমেশ্বর। টীকাকার আনন্দগিরি এই 'নারায়ণ' শব্দের অর্থ করেছেন : "নরশব্দেন চরাচরাত্মকং শরীরজাতমুচ্যতে। তত্র নিত্যসন্নিহিতাঃ চিদাভাসা জীবা নারা ইতি নিরুচ্যন্তে তেষাম্ অয়নম্ আশ্রয়ো নিয়ামকোঽন্তর্যামী নারায়ণ ইতি।"

—'বিশ্বচরাচরে দ্বিবিধ দেহ বিদ্যমান—স্থাবর ও জঙ্গম। স্থাবর-জঙ্গমরূপ এই দ্বিবিধ শরীর-সমূহই 'নর' শব্দের অর্থ। এবম্প্রকার শরীর-সমূহে নিত্যসন্নিহিত যে সমস্ত চিদাভাস অর্থাৎ জীবনিচয়, তাহাই 'নার'। এই 'নার'গণের যিনি 'অয়ন' অর্থাৎ আশ্রয়, নিয়ামক ও অন্তর্যামী, তিনিই নারায়ণ।'

অবতার-তত্ত্বের অবতারণা-প্রসঙ্গে উপক্রম-ণিকা-ভাষ্যে আচার্য শংকর বলেছেন :

"স চ ভগবান্ জ্ঞানৈশ্বর্য-শক্তি-বল-বীর্যতেজোভিঃ সদা সম্পন্নস্ত্রিগুণাত্মিকাং বৈষ্ণবীং স্বাং মায়াং মূলপ্রকৃতিং বশীকৃত্য অজোঽব্যয়ো ভূতানামীশ্বরো নিত্যশুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাবোঽপি সন্ স্বমায়য়া দেহবান্ ইব জাত ইব চ লোকানুগ্রহং কুর্বন্নিব লক্ষ্যতে।"

—'আর সেই ভগবান সর্বদা জ্ঞানবান্, ঐশ্বর্যশালী এবং শক্তি-বল-বীর্য- ও তেজঃ-সম্পন্ন ব'লে ত্রিগুণাত্মিকা বৈষ্ণবী স্বীয় মায়া মূল-প্রকৃতিকে বশীকৃত ক'রে, জন্মরহিত অবিনশ্বর-স্বভাব এবং (ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্যন্ত) ভূতগণের ঈশ্বর (কর্মের অনধীন) হয়েও স্বীয় ত্রিগুণময়ী মায়াকে বশীভূত ক'রে স্বীয় মায়াবশতঃ দেহবানের ন্যায় যেন জন্মগ্রহণ ক'রে লোকানুগ্রহ করছেন ব'লে পরিলক্ষিত হন।' স্বয়ং শ্রীভগবানও বলেছেন :

"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥"

—'জন্মরহিত, নিত্য অবিকারী, সমস্তভূতের ঈশ্বর হইয়াও আমি নিজ প্রকৃতিকে, মায়াকে অবলম্বন করিয়া যুগে যুগে অবতীর্ণ হই—দেহাভিমানী জীবের ন্যায় ব্যবহার ক'রে থাকি।'

শংকরাচার্য গীতাভাষ্যের উপক্রমণিকায় আরও একটি কথা বলেছেন :

"ভৌমস্য ব্রহ্মণো ব্রাহ্মণত্বস্য রক্ষণার্থং..."

—'ব্রাহ্মণত্বকে রক্ষা করবার জন্য (তাঁর আবির্ভাব)।'

"ব্রাহ্মণত্বস্য রক্ষণেন রক্ষিতঃ স্যাদ্ বৈদিকো ধর্মঃ, তদধীনত্বাদ্ বর্ণাশ্রমভেদানাম্।"

—'ব্রাহ্মণত্বের রক্ষা দ্বারাই বৈদিক ধর্ম রক্ষিত হয়, কারণ বর্ণাশ্রমভেদ তারই অধীন।'

ব্রাহ্মণত্বকে রক্ষা করবার জন্যই শ্রীভগবান কৌশল্যার গর্ভে রামচন্দ্র, দেবকীর গর্ভে বাসুদেব, মেরীর গর্ভে যিশু, চন্দ্রমণির গর্ভে

শ্রীরামকৃষ্ণ ইত্যাদি মনুষ্যমূর্তিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ঈশ্বরের এবম্প্রকার জন্মপরিগ্রহ অপরাপর জীবের জন্মগ্রহণের ন্যায় নয়; জীব মায়াধীন, তিনি মায়াধীশ। অথচ তিনি যেন বাস্তবিকই জন্মেছেন, মায়াপ্রভাবে আমাদের এইপ্রকার প্রতীতিই হয়ে থাকে।

জীব-জগৎ তিনিই সৃষ্টি করেছেন। তাঁর মায়া, প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিনটি গুণ যখন সাম্যাবস্থায় থাকে, তখন জগৎ অব্যক্ত; এই গুণত্রয়ের তারতম্য ঘটিলেই জগৎ ব্যক্ত হয়, তারই ফলে জীবের মন সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এইসব গুণের দ্বারাই কম বেশী প্রভাবান্বিত হয়। জীবের মন যেন এক যুদ্ধক্ষেত্র। দুই পক্ষে যুদ্ধ চলেছে। এক পক্ষে সাত্ত্বিক ভাবের অপর পক্ষে রাজস ও তামস ভাবের। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাত্ত্বিকবৃত্তির বিকাশের চেয়ে রাজস ও তামস বৃত্তির বিকাশই বেশী। মানুষ অর্থাৎ 'মান্ হুঁশ'। মানুষের মধ্যে সাত্ত্বিকভাবের প্রাচুর্যই দেয় তাকে 'হুঁশ'—প্রকৃত মনুষ্যত্ব—প্রকৃত ব্রাহ্মণত্ব।

ব্রাহ্মণত্ব মানবতার উচ্চতম বিকাশের অবস্থা। মহাভারতে আছে ব্রাহ্মণের গুণরহিত হয়ে ব্রাহ্মণবংশে জন্মালে ব্রাহ্মণ হয় না—"যার ভেতর সত্য, দান, ক্ষমা, তপস্যা প্রভৃতি গুণ দেখা যায়, তিনিই ব্রাহ্মণ।" "যে বংশেই জন্ম হোক না কেন, যিনি বেদের নির্দেশ মেনে চলেন তিনিই ব্রাহ্মণ। আর যিনি তা না করেন, ব্রাহ্মণবংশে জন্মালেও তাঁকে কখনো ব্রাহ্মণ বলা যায় না।"

বৃহদারণ্যকোপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীকে বলছেন: "য এতদক্ষরং গার্গী বিদিত্বা অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ।" —'হে গার্গী, যিনি এই অক্ষর পুরুষকে জেনে ইহলোক থেকে প্রস্থান করেন, তিনিই ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মবিৎ)।'

সেই অক্ষর পরব্রহ্মকে জানতে হবে, সেই স্ব-স্বরূপকে অবগত হ'তে হবে। তবেই ব্রাহ্মণ—তবেই তার ব্রাহ্মণত্ব; আর এরই জন্যে চাই সাত্ত্বিকবৃত্তির সম্যগ্‌বিকাশ। তবেই পশুশক্তি পরাভূত হবে—মানুষ হবে 'মান্ হুঁশ'। অন্যথায় সাত্ত্বিকবৃত্তির প্রাচুর্যের অভাবে ব্রাহ্মণত্ব হ্রাস পাবে, মনুষ্যগণের মধ্যে স্বার্থপরতা, নীতিহীনতা প্রভৃতি পশুভাব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে।

যিনি সৃষ্টিকর্তা, তিনিই তার রক্ষাকর্তা। তিনি যখন দেখেন মানুষের মধ্যে রাজস ও তামস বৃত্তিগুলি অধিকতর বিকশিত হয়ে ব্রাহ্মণ্যধর্মকে বিপর্যস্ত করছে এবং কোনো কোনো সময়ে অত্যন্ত প্রবল হয়ে ব্রাহ্মণ্যধর্মকে একেবারে বিলুপ্ত করতে উদ্যত হচ্ছে, তখনই দেখা যায় এমন এক একজন মহাপুরুষ আসেন যিনি শক্তির দ্বারা, উপদেশের দ্বারা এবং সর্বোপরি নিজে জীবনের দৃষ্টান্তের দ্বারা সমাজের মধ্যে ক্রিয়াশীল সেই প্রবলপরাক্রম রাজস ও তামস বৃত্তিগুলিকে প্রশমিত ক'রে সাত্ত্বিকবৃত্তির প্রাচুর্য এনে দেবার দ্বার উন্মুক্ত ক'রে দিয়ে যান।

প্রকৃতির নিয়মে যেমন গ্রীষ্মের পর বর্ষা, রাত্রির পর দিন; বিশ্বসৃষ্টির অখণ্ডনীয় নিয়মেও তেমনই আধ্যাত্মিক রাজ্যে রাজস ও তামস বৃত্তির প্রাবল্যের পরে সাত্ত্বিকবৃত্তির পুনঃসংস্থাপনের দ্বারা বর্ণাশ্রমধর্মের রক্ষার নিমিত্ত পরমকারুণিক পরমেশ্বর মায়িক বিগ্রহ ধারণপূর্বক ধরিত্রীর বুকে অবতরণ করেন। শ্রীভগবান গীতায় সেই কথাই বলেছেন: 'যে যে সময়ে ধর্মের গ্লানি হয়, এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, হে ভারত, তখনই আমি নিজেকে সৃষ্টি করি—দেহধারণপূর্বক অবতীর্ণ হই।'

—"যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥"

ঈশ্বরকোটি

শ্রীশিবশম্ভু সরকার

তাহারেই করি নমস্কার
যে হেরেছে খণ্ডেতেও
অখণ্ডের আনন্দবিহার।

শত লক্ষ ছিন্নতারে
যে গেঁথেছে একহারে
সমগ্রের সমাহারে
এনেছে যে শান্তি অমরার—
তাহারেই করি নমস্কার!

সান্ত মাঝে অন্তহীন
যার করে বাজে বীণ
ধরা হয় মেঘে লীন
নেমে আসে অমিয়-আসার—
তাহারেই করি নমস্কার!

রিক্ত তিক্ত এ' সংসার
স্বর্গায়িত স্পর্শে যার
উল্লসিত স্তব্ধতার
মাঝে নিত্য লীলার ঝঙ্কার—
তাহারেই করি নমস্কার!

হৃদয়েতে নিরঞ্জন
নয়নেতে প্রেমাঞ্জন
শ্যাম হয় দগ্ধ মন
মুক্তি ফলে পরশে যাহার—
তাহারেই করি নমস্কার!

দ্বৈতের লীলার ফুলে
অদ্বৈত ভ্রমর বুলে
সমুদ্র সে আসে কূলে
আভাসিত অনন্ত বিথার—
তাহারেই করি নমস্কার!

আধুনিকতার অগ্রদূত রাজা রামমোহন

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ

প্রচলিত লোকাচার ও দেশাচারের গড্ডলিকাপ্রবাহে গা ভাসিয়ে না দিয়ে রামমোহন যে জিজ্ঞাসা ও সংশয় ঘোষণা করতে পেরেছিলেন এইখানেই তাঁর আধুনিকতা। রামমোহন ও তাঁর অনুবর্তীদের জীবনে ও মননে অনেক সময় স্ব-বিরোধ দেখা দিয়েছে। প্রাচীন ও নবীনের সংঘাতের মুহূর্তে অনেক সময় এই স্ব-বিরোধই আন্তরিকতার প্রমাণ।

বেদান্তধর্মপ্রচারে যে রামমোহনের এত আগ্রহ তিনিই যখন লর্ড আমহার্স্ট'কে আধুনিক যুগের উপযোগী বিজ্ঞানভিত্তিক ইংরেজীবাহিনী শিক্ষার জন্য ব্যাকুল হয়ে চিঠি লেখেন, তখন বেদান্তদর্শনের কয়েকটি প্রচলিত সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন—"যে বেদান্তধর্ম এই শিক্ষা দেয় যে দৃশ্যমান বস্তুনিচয়ের কোনো যথার্থ অস্তিত্ব নেই, পিতা ভ্রাতা প্রভৃতির যখন নিশ্চিত সত্তাই নেই তখন তাদের প্রতি প্রীতি-ভালোবাসাও অবান্তর, সুতরাং যত তাড়াতাড়ি তাদের হাত থেকে মুক্ত হয়ে আমরা সংসার ত্যাগ করতে পারি ততই কল্যাণ"[১]—সে বেদান্তধর্ম শিক্ষা দেওয়ার অর্থ তিনি বুঝতে পারেন না। তাঁর ধারণায় এ শিক্ষার দ্বারা তরুণেরা সমাজের উন্নততর সভ্য হতে পারবে না।

অথচ এই রামমোহনই ঈশোপনিষদের ভূমিকায় যে-সব ঋষিরা ব্রহ্মজ্ঞানী হয়েও 'লৌকিকজ্ঞানে তৎপর ছিলেন' তাঁদের উদাহরণ দিয়েছেন, নিজের জীবনেও তাঁদেরই অনুসরণ করেছেন। বাস্তবিক, বেদান্তের ব্যবহারিক প্রয়োগ, স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় 'বনের বেদান্তকে ঘরে আনা'-জাতীয় আদর্শের জন্য আমাদের আরো কিছুকাল অপেক্ষা করতে হয়েছে।

লৌকিক জ্ঞান ও অধ্যাত্ম-জ্ঞানের দ্বন্দ্বের দিক থেকে ১৮২৮-এ জন ডিগবীকে লেখা রামমোহনের একটি পত্রাংশ—"I regret to say that the present system of religion adhered to by the Hindus is not well calculated to promote their political interest. The distinction of castes, introducing innumerable divisions among them, has entirely deprived them of political feeling, and the multitude of religious rites and ceremonies and the laws of purification have totally disqualified them from undertaking any difficult enterprise. It is, I think, necessary that some changes should take place in their religion at least for the sake of their political advantage and social comfort." "আমি দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, বর্তমানে হিন্দুরা যে ধর্মাচরণে রত, তা তাদের রাজনৈতিক উন্নতির পক্ষে সুচিন্তিত নয়। জাতিভেদ-প্রথা তাদের নানাভাগে বিভক্ত ক'রে রাজনৈতিক চেতনার

১ "Nor will youths be fitted to be better members of society by the Vedantic doctrines which teach them to believe that all visible things have no real existence, that as father brother etc. have no actual entity, they consequently deserve no real affection, and therefore the sooner we escape from them and leave the world the better..."

উন্মেষ ঘটতে দেয়নি, আর বহুবিধ ধর্মীয় আচার উৎসব এবং শুদ্ধির নিয়মাবলী তাদের কোনো-রকম দুরূহ দায়িত্ব পালনের অনুপযোগী ক'রে তুলেছে। আমার ধারণা, রাজনৈতিক ও সামাজিক সুযোগসুবিধার জন্যই তাদের ধর্মের কিছু পরিবর্তন নিতান্ত প্রয়োজনীয়।"

রাজনৈতিক ও সামাজিক সুযোগ-সুবিধার মানদণ্ডে অধ্যাত্ম-আদর্শের বিচার কখনোই হয় না, কিন্তু আধ্যাত্মিকতা যখন সমাজের বিভিন্ন আচারবিচারের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায় তখন এই বিচারমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন অবশ্য স্বীকার্য।

ধর্ম ও রাজনীতিকে রামমোহন একেবারে আলাদামহলের বস্তু ব'লে মনে করতেন না। বরং ধর্মের উদার ও মহৎ আদর্শের দ্বারা রাজ-নীতির শুদ্ধিই তাঁর কাম্য ছিল।—সেদিক থেকে ১৮৩৩-এ রবার্ট ডেল ওয়েন-কে লেখা রামমোহনের পত্রাংশ[২] আমরা স্মরণ করতে পারি—'It is not necessary either in England or in America to oppose religion in promoting the social, domestic and political welfare of their inhabitants, particularly a system of Religion which inculcates doctrine of Universal love and charity. Did such philanthropists as Locke or Newton oppose Religion ? No ! They rather tried to remove the perversions gradually introduced in Religion. Admitting for a moment that the truth of the Divinity of Religion cannot be established to the satisfaction of a free thinker, but from an impartial enquiry, I presume we may feel persuaded to believe that a system of Religion (Christianity) which consists in love and charity is capable of furthering our happiness, facilitating our reciprocal transactions and curbing our obnoxious suspicions and feelings. I grieve to observe that by opposing Religion your most benevolent father has hitherto impeded his success. He, I seriously believe, is a follower of Christianity in the above sense though he is not aware of being so. Allow me to send Hamilton's East Indies (1st. Vol.) in which you will find page 34 line 36, that more than two thousand years ago wise and pious Brahmans of India entertained almost the same opinions which your father offers though they by no means were destitute of religion.' "ইংল্যাণ্ডে বা আমেরিকায় কোনোখানেই দেশবাসীর সামাজিক, পারিবারিক ও রাজনৈতিক উন্নতির জন্য ধর্মের বিরোধিতা করার প্রয়োজন নেই—বিশেষতঃ এমন এক ধর্মের, সর্বজনীন প্রীতি ও করুণাই যার আচরণীয় আদর্শ। লক বা নিউটনের মতো মানব-হিতৈষীরা কি ধর্মের বিরোধিতা করেছিলেন? না! ধীরে ধীরে ধর্মের জগতে যে জঞ্জাল গড়ে উঠেছিল, তাই তাঁরা দূর করতে চেয়েছিলেন। আমরা যদি আপাততঃ এ যুক্তি মেনেও নিই যে, একজন স্বাধীন চিন্তাশীল ব্যক্তির কাছে ধর্মের অন্তর্নিহিত অধ্যাত্মসত্যের কথা প্রমাণ করা খুবই কঠিন, তবু নিরপেক্ষ বিচারে আমরা একথা মেনে নিতে বাধ্য হব যে, যে ধর্ম (খ্রীষ্টধর্ম) প্রীতি ও করুণায় পরিপূর্ণ, তার দ্বারা আমাদের সুখের বৃদ্ধি হবে,

২ Appendix VII : The Life and Letters of Raja Rammohan Roy—S. D. Collet. Ed. by Dilip Kumar Biswas & Prabhat Chandra Ganguli, p. 494

পারস্পরিক বিনিময় আরো সহজ হয়ে উঠবে, আমাদের অন্তর্নিহিত হীন সন্দেহ ও প্রবৃত্তিগুলির দমন সম্ভব হবে। দুঃখের সঙ্গে আমি এই মন্তব্য করতে বাধ্য হচ্ছি যে, তোমার উদার-হৃদয় পিতৃদেব ধর্মের বিরুদ্ধতা করতে গিয়ে পরিপূর্ণ সাফল্যের পথে অগ্রসর হ'তে পারেননি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পূর্বোক্ত আদর্শানুযায়ী তিনি খ্রীষ্টীয় আদর্শের অনুগামী যদিচ সে সম্বন্ধে নিজে তিনি সজাগ নন! হ্যামিলটনের ঈস্ট ইণ্ডিজ (১ম খণ্ড) তোমাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, যার ৩৫ পৃষ্ঠার ৩৮ পঙ্‌ক্তিতে তুমি দেখতে পাবে যে, দু'হাজার বছর আগে ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণেরা ধর্মবর্জন না ক'রেও ঠিক তোমার বাবার মতই পোষণ করতেন।"

ভারতবর্ষের সমকালীন ধর্মচেতনার রূপান্তরের প্রয়োজন স্বীকার ক'রে রামমোহন যে ইংল্যাণ্ড বা আমেরিকায় ধর্মচেতনার রূপান্তরের প্রয়োজন অনুভব করেননি, তার কারণ খ্রীষ্টীয় নৈতিক আদর্শের প্রতি তাঁর অটল বিশ্বাস। এদিক থেকে হিন্দুধর্মের চেয়ে খ্রীষ্ট-প্রচারিত ধর্মাদর্শকে তিনি বড়ো মনে করতেন। অথচ হিন্দুশাস্ত্র মন্থন ক'রে কিছুকাল পরে রামমোহন-অনুগামী রাজনারায়ণ বসু তাঁর 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' বক্তৃতায় প্রচলিত খ্রীষ্টীয় নীতিবাদের অনুরূপ বা তার চেয়েও গভীরতর নৈতিক আদর্শ যে ভারতবর্ষে বর্তমান, সেকথা ভালোভাবেই প্রমাণ করেছিলেন। পাশ্চাত্য প্রগতির মানদণ্ডে খ্রীষ্টপ্রচারিত জীবনাদর্শ বাস্তবে কতটুকু স্থান পেয়েছে, সে প্রশ্ন ছেড়ে দিলেও প্রতীচ্য সভ্যতার অন্তর্নিহিত অসারতার দিকটি তখন অবধি আমাদের কাছে ধরা দেয়নি—একথা রামমোহনের ইংরেজ-শাসন সম্বন্ধে মতামত থেকেই অনেকটা বোঝা যায়।

ব্যক্তিগতভাবে রামমোহনের ধারণা ছিল যে, ইংরেজ ভারতবর্ষে চল্লিশ বছরের বেশী রাজত্ব করবে না।[৩] তাঁর মতে ভারতে ইংরেজের ভূমিকা ছিল অনেকটা civilising agency বা সভ্যতার মাধ্যমের মতো। য়ুরোপীয়দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মেলামেশার দ্বারা আমাদের সাহিত্য, সমাজ ও রাজনৈতিক সমুন্নয়ন তাঁর আকাঙ্ক্ষিত ছিল। এদিক থেকে ভারতবর্ষে ইংরেজের উপনিবেশ-স্থাপন, নীল-করদের আগমন—এ সবই তিনি সমর্থন ক'রে গেছেন। শিক্ষা-দীক্ষায় ভারতবাসীদের য়ুরোপীয়দের সমকক্ষ ক'রে তুলে একদিন ইংরেজ এদেশ ছেড়ে চলে যাবে—এমন এক শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা-হস্তান্তরের স্বপ্ন রামমোহনের ছিল। পরাধীনতার বেদনাবোধসত্ত্বেও ইংরেজের মহত্ত্বের দিকটিই রামমোহন বড় ক'রে দেখতে চেয়েছিলেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার স্বপক্ষে সংগ্রামে 'মীরাৎ-উল-আখবার' পত্রিকাটি বন্ধ করার সময় সুপ্রীম কোর্ট ও তদানীন্তন ইংরেজরাজের কাছে রামমোহনের আবেদনকে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার সঙ্গতভাবেই মিল্টনের 'অ্যারিওপেজিটিকা'র সঙ্গে তুলনা করেছেন।[৪] তবে এ আবেদনেও 'মহৎ' ইংরেজের প্রতি রামমোহনের বিশ্বাস অটুট। অপরপক্ষে ধর্ম-চিন্তার ক্ষেত্রে রামমোহনের মানসমুক্তির আদর্শ তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞাকেও স্বাভাবিক-ভাবেই প্রভাবিত করেছে। পৃথিবীর যে কোন প্রান্তেই স্বাধীনতার সংগ্রাম ঘোষিত হোক না কেন, রামমোহন সবসময় পরাধীনের বিজয়কামনা করেছেন। নেপ্‌লসে গণতান্ত্রিক সরকারের পরাজয় স্মরণ করে তিনি যে কথা

৩ নবযুগের বাংলা—বিপিনচন্দ্র পাল পৃঃ ৩০

৪ History of Indian Social and Political Ideas : Dr. Biman Behari Mazumdar : p 39

লিখেছিলেন তা চিরকালের স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রেরণামন্ত্র হয়ে থাকবে—"Enemies to liberty and friends of despotism have never been and never will be ultimately successful."[৫] 'স্বাধীনতার শত্রু আর স্বৈরাচারের বন্ধুর দল শেষ পর্যন্ত কোনদিন সফল হয়নি, কখনো হবে না।'

* * *

ধর্ম ও রাজনীতির ক্ষেত্রে রামমোহনের যুক্তিবাদী মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীরই আর এক প্রকাশ তাঁর সমাজ-সংস্কারমূলক আন্দোলনে ও চিন্তাধারায়। এ ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে তাঁর অনূদিত মৃত্যুঞ্জয়াচার্যের 'বজ্রসূচী' নামে জাতিভেদ-বিরোধী রচনাটি স্মরণীয়। উনিশ শতকের সর্বাঙ্গীণ প্রগতিমূলক আন্দোলনের ক্ষেত্রে জাতিভেদের বিরুদ্ধে তেমন প্রবল আন্দোলন কেন হয়নি—একথা ভাববার মতো। সে যাই হোক, রামমোহন স্বয়ং ব্রাহ্মণ্য আচার-আচরণ অল্প-বিস্তর মানলেও জাতিভেদের বিষময় ফল সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন এবং মানবতা-বিরোধী এই প্রথার বিরুদ্ধে সংস্কৃতশাস্ত্র থেকে প্রমাণ আহরণ করতে চেয়েছিলেন—সেকথা তাঁর নিঃসংশয় অগ্রগামিতার অন্যতম নিদর্শন।

এর পরেই আসে সহমরণ-বিষয়ে তাঁর রচনাবলী—বাংলা গদ্যের সূচনাপর্বে যাদের বিশেষ ভূমিকা। ধর্মচিন্তার ক্ষেত্রে যেমন তিনি ভারতবর্ষের বেদান্ত-সাধনার দিকে নবযুগের বাঙালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, সমাজ-চেতনার ক্ষেত্রেও তেমনি নারীজাতির মহিমা সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করেছেন।

৫ Calcutta Journal-এর সম্পাদক শ্রীবাকিংহামকে লেখা পত্রাংশ।

আঙ্গিরসমুনির নামে প্রচলিত সহমরণের সমর্থনে শ্লোকটি এই রকম—

"মৃতে ভর্তরি যা নারী সমারোহেদ্ধুতাশনম্।
সারুন্ধতী সমাচারা স্বর্গলোকে মহীয়তে॥
তিস্রঃ কোট্যর্ধকোটী চ যানি লোমানি মানবে।
তাবন্ত্যব্দানি সা স্বর্গে ভর্তারং যানুগচ্ছতি॥

* * *

ব্রহ্মঘ্নো বা কৃতঘ্নো বা মিত্রঘ্নো বাপি মানবঃ।
তং বৈ পুনাতি সা নারী ইত্যাঙ্গিরসভাষিতম্॥"[৬]

স্বামীর মৃত্যুর পর যে নারী জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করে, সে (বশিষ্ঠপত্নী) অরুন্ধতীর সমান হয়ে স্বর্গে যায়। মানুষের শরীরে যে সাড়ে তিন কোটি লোম আছে, সেই সাড়ে তিন কোটি বৎসর সে স্বর্গে বাস করে। স্বামী যদি ব্রহ্মহত্যা করেন, কৃতঘ্ন হন বা মিত্রহত্যা করেন তবু সেই স্বামীকে এই নারী সর্বপাপমুক্ত করেন—এ কথা বলেছেন আঙ্গিরস ঋষি।

ঋষিবাক্যের নামে দেশাচারকে এ দেশের লোকে সবচেয়ে বড় ধর্ম ব'লে মনে করত—এখনও যে করে না তা নয়। তবে 'সহমরণ'-রূপ দেশাচারের আগুনে কত অবলা নারীর মৃত্যু হয়েছে তার সংখ্যা নেই।

রামমোহন এই অন্যায় দেশাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ক'রে দুটি বই লেখেন—(১) সহমরণ-বিষয়ক প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ (নভেম্বর ১৮১৮) (২) সহমরণবিষয়ক প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ (নভেম্বর ১৮১৯)। এই দুটি বইয়ের সমকালীন দুটি সহমরণের খবর তখনকার সংবাদপত্র থেকে তুলে দিই।

"১১ই জুলাই, ১৮১৮—কএক দিবস হইল দুইজন ইংগ্রণ্ডীয় কলিকাতা হইতে পশ্চিমে যাইতেছিল। কোন্নগর পর্যন্ত আসিয়া সেইখানে

৬ সহমরণবিষয়ক প্রবর্তক ও নিবর্তকের সংবাদ—রামমোহন গ্রন্থাবলী (সা. প. স.) ৩য় খণ্ড পৃঃ ১

অনেক লোক একত্র দেখিয়া নৌকা হইতে নামিয়া দেখিল যে, একজন যোগীর স্ত্রী সহমরণে যাইবে তাহার উদ্যোগ করিতেছে। পরে দেখিল একটা গর্ত করিয়া তাহার মধ্যে মৃত পুরুষকে রাখিল। পরে ঐ স্ত্রী সেই গর্তমধ্যে দাঁড়াইল। তাহার উনিশ বৎসরবয়স্ক পুত্র সেই গর্তে তিনবার মৃত্তিকা দিল। পরে অন্য লোকে মৃত্তিকা দিয়া ডুবাইল। পরে সেই বালক পিতৃমাতৃবিয়োগে কাতর না হইয়া কুটুম্বেরদিগের সহিত ঐ সাহেবেরদিগের নিকট আসিয়া আপন বিবরণ কহিল ও কুটুম্বেরদিগের পরিচয় দিল।'[৭] এই খবরটিতে 'কবর' দেওয়ার যে উল্লেখ আছে, সেটি 'যোগী'দের রীতি। কিন্তু 'সহমরণ' তখন এত সাধারণ ব্যাপার যে, জীবন্ত মাকে কবর দিয়েও ছেলেটি দুঃখিত হয়নি, এইটিই দেখবার মতো।

"২৭শে মার্চ, ১৮১৯—শহর কলিকাতার এক ব্রাহ্মণ মরিয়াছেন অল্পবয়স্কা তাহার স্ত্রী সহগমন করিয়াছে আমরা শুনিয়াছি যে দুই দিন পর্যন্ত আপন মৃত স্বামীকে রাখিয়া তৃতীয় দিন সহগমন করিয়াছে এত বিলম্বে সহগমন করিতে পূর্বে শুনি নাই। তাহার কারণ এই স্ত্রীর বয়স বিবেচনা করাতে এতকাল বিলম্ব হইল।"[৮]

১৮১৭ খৃষ্টাব্দে সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান বিচারপতি পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের কাছে 'সহমরণ' সম্বন্ধে শাস্ত্রের বিধান চেয়ে পাঠান। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার শাস্ত্রচর্চা ক'রে এ সম্বন্ধে এই বিধান লিখে পাঠালেন যে—"চিতারোহণ অপরিহার্য নয়—ইচ্ছাধীন বিষয় মাত্র। অনুগমন এবং ধর্মজীবনযাপন—এই উভয়ের মধ্যে শেষটিই শ্রেয়তর। যে স্ত্রী অনুমৃতা না হয় অথবা অনুগমনের সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত হয় তাহার কোন দোষ বর্তে না।"

রামমোহন সহমরণ বন্ধ করার জন্য যে সব যুক্তি দেখিয়েছিলেন, সেই সব যুক্তির কিছু অংশ—

১। সহমরণের বিরুদ্ধে দার্শনিক বা আধ্যাত্মিক যুক্তি—"যে অবধি সংস্কৃত ভাষাতে শাস্ত্ররচনার আরম্ভ হইয়াছে, তদবধি কোন গ্রন্থকারেরা, কি পণ্ডিতেরা আপনকার ন্যায় বাক্য প্রয়োগ কদাপি করেন নাই, যে স্বর্গ কামনা করিয়া কাম্য কর্ম করিতে অসমর্থ যে ব্যক্তি হইবেক তাহার মোক্ষ সাধনে অধিকার হয়, বরঞ্চ শাস্ত্রে সর্বত্র কহিয়াছেন, যে মোক্ষ সাধনে অসমর্থ যাহারা হয় তাহারা নিষ্কাম কর্ম করিবেক; অত্যন্ত মন্দমতি ব্যক্তিরা যদি মোক্ষের লালসা না রাখে, তবে কামনাপূর্বকও কর্ম করিবেন।

···অতএব মোক্ষ সাধনের সম্ভাবনা আছে, যে ব্রহ্মচর্যধর্মে তাহা হইতে কামনা করিয়া আপনার শরীর দাহ করাকে অথবা অন্য শরীরের হিংসা করাকে শ্রেষ্ঠরূপে স্বীকার করা, সে কেবল বেদ ও বেদান্তাদি শাস্ত্র ও ভগবদ্‌গীতা প্রভৃতি গ্রন্থকে তুচ্ছ করা।"[৯] (প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ পৃঃ ২৮)

আমাদের দেশের সেরাশাস্ত্র গীতায় নিষ্কাম কর্মকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলা হয়েছে। বিধবা যদি নিষ্কামভাবে সংযত জীবন যাপন করেন, তাহলেই তাঁর ধর্মাচরণ করা হয়। তা না ক'রে স্বামীর

---

৭ সংবাদপত্রে সেকালের কথা (১ম খণ্ড)—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ২৮০

৮ সংবাদপত্রে সেকালের কথা (১ম খণ্ড)—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ২৮১

৯ সহমরণের স্বপক্ষে প্রবর্তকের যুক্তির উত্তরে নিবর্তক রামমোহনের যুক্তি। সহমরণবিষয়ক প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ: রামমোহন-গ্রন্থাবলী (সা. প. স.) ৩য় খণ্ড

সঙ্গে স্বর্গবাসের জন্য সহমরণে যাওয়ার অর্থ সকাম কাজ করা। সকাম ধর্ম সবসময়েই নিষ্কাম ধর্মের চেয়ে নীচুস্তরের। সুতরাং বিধবার পক্ষে ব্রহ্মচর্যপালনই সহমরণের চেয়ে প্রশস্ত।

২। বিধবাকে তার ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় সহমরণে যেতে দেওয়ার অর্থ নারীহত্যায় সম্মতি দেওয়া। দেশাচারের দোহাই দিয়ে নারীহত্যা ঘটতে দেওয়া যায় না—"স্ত্রীবধ, ব্রহ্মবধ, মাতৃহত্যা ইত্যাদি দারুণ পাতকসকল দেশাচারবলেতে ধর্মরূপে গণ্য হইতে পারে না। বরঞ্চ এরূপ আচার যে দেশে হয়, সে দেশই পতিত হয়।" (প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ, পৃঃ ৩৯)

৩। প্রবর্তক।—স্ত্রীলোককে স্বামীর সহিত মরণে প্রবৃত্তি দিবার যথার্থ কারণ এবং এরূপ বন্ধন করিয়া দাহ করিবারে আগ্রহের কারণ …লিখিয়াছি, যে স্ত্রীলোক স্বভাবত অল্পবুদ্ধি, অস্থিরান্তঃকরণ, বিশ্বাসের অপাত্র, সানুরাগা এবং ধর্মশূন্যা হয়।

নিবর্তক।…স্ত্রীলোককে যে পর্যন্ত দোষান্বিত আপনি কহিলেন, তাহা স্বভাবসিদ্ধ নহে। অতএব কেবল সন্দেহের নিমিত্তে বধ পর্যন্ত করা লোকত ধর্মত বিরুদ্ধ হয়…প্রথমত বুদ্ধির বিষয়, স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন কালে লইয়াছেন, যে অনায়াসেই তাহারদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন? কারণ বিদ্যাশিক্ষা এবং জ্ঞানশিক্ষা দিলে পরে ব্যক্তি যদি অনুভব ও গ্রহণ করিতে না পারে, তখন তাহাকে অল্পবুদ্ধি কহা সম্ভব হয়; আপনারা বিদ্যাশিক্ষা জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয় কিরূপে নিশ্চয় করেন? বরঞ্চ লীলাবতী, ভানুমতী, কর্ণাট রাজার পত্নী, প্রভৃতি যাহাকে যাহাকে বিদ্যাভ্যাস করাইয়াছিলেন তাহারা সর্বশাস্ত্রে পারগরূপে বিখ্যাতা আছে, বিশেষত বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব্যক্তই প্রমাণ আছে, যে অত্যন্ত দুরূহ ব্রহ্মজ্ঞান তাহা যাজ্ঞবল্ক্য আপন স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে উপদেশ করিয়াছেন, মৈত্রেয়ীও তাহা গ্রহণপূর্বক কৃতার্থ হয়েন।

দ্বিতীয়ত। তাহারদিগকে অস্থিরান্তঃকরণ কহিয়া থাকেন, ইহাতে আশ্চর্যজ্ঞান করি, কারণ যে দেশের পুরুষ মৃত্যুর নাম শুনিলে মৃতপ্রায় হয়, তথাকার স্ত্রীলোক অন্তঃকরণের স্থৈর্যদ্বারা স্বামীর উদ্দেশে অগ্নি প্রবেশ করিতে উদ্যত হয়, ইহা প্রত্যক্ষ দেখেন, তথাচ কহেন, যে তাহাদের অন্তঃকরণের স্থৈর্য নাই।

তৃতীয়ত। বিশ্বাসঘাতকতার বিষয়। এ দোষ পুরুষে অধিক কি স্ত্রীতে অধিক উভয়ের চরিত্র দৃষ্টি করিলে বিদিত হইবেক। প্রতি নগরে প্রতি গ্রামে বিবেচনা কর, যে কত স্ত্রী পুরুষ হইতে প্রতারিতা হইয়াছে, আর কত পুরুষ স্ত্রী হইতে প্রতারণা প্রাপ্ত হইয়াছে, আমরা অনুভব করি যে প্রতারিত স্ত্রীসংখ্যা দশগুণ হইবেক…

চতুর্থত। যে সানুরাগা কহিলেন, তাহা উভয়ের বিবাহ গণনাতেই ব্যক্ত আছে; অর্থাৎ এক এক পুরুষের প্রায় দুই তিন দশ বরঞ্চ অধিক পত্নী দেখিয়াছি, আর স্ত্রীলোকের এক পতি সে ব্যক্তি মরিলে কেহ তাবৎ সুখ পরিত্যাগ করিয়া সঙ্গে মরিতে বাসনা করে, কেহ বা যাবজ্জীবন অতিকষ্ট যে ব্রহ্মচর্য তাহার অনুষ্ঠান করে।

পঞ্চমত। তাহারদের ধর্মভয় অল্প, এ অতি অধর্মের কথা, দেখ কি পর্যন্ত দুঃখ, অপমান, তিরস্কার, যাতনা, তাহারা কেবল ধর্মভয়ে সহিষ্ণুতা করে।…বিবাহের সময় স্ত্রীকে অর্ধ অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু ব্যবহারের

সময় পশু হইতে নীচ জানিয়া ব্যবহার করেন…। দুঃখ এই, যে এই পর্যন্ত অধীন ও নানা দুঃখে দুঃখিনী, তাহারদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কিঞ্চিৎ দয়া আপনকারদের উপস্থিত হয় না, যাহাতে বন্ধনপূর্বক দাহ করা হইতে রক্ষা পায়।" (প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ, পৃঃ ৪৫-৪৮)

সহমরণের স্বপক্ষে প্রবর্তক ও বিপক্ষে নিবর্তকের এই বিতর্কের মধ্য দিয়ে নারীজাতির প্রতি রামমোহনের অন্তরের শ্রদ্ধা অতি সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। বাস্তবিক, এই শ্রদ্ধাই সব সামাজিক আন্দোলনের ভিত্তি।

রামমোহন নারীকে তার মনুষ্যত্বের অধিকার ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন—এইটিই তাঁর সহমরণ-নিবারণ-প্রচেষ্টার মূল কথা।

কিন্তু বেন্টিঙ্কের আমলের আগে রামমোহনের এই প্রচেষ্টা সফল হয়নি। হিন্দুসমাজের মুখপাত্রেরা ভুল ধারণার বশে রামমোহনকে এই জন্য নানাভাবে উৎপীড়িত করবার চেষ্টা করেছেন। তেমনি আর একদল উদারচেতা হিন্দু এ বিষয়ে তাঁকে সাহায্যও করেছেন। ইংরেজ সরকার ধীরে ধীরে দেখলেন যে, এ দেশের শিক্ষিত জনমত সতীদাহের বিরুদ্ধে পত্র-পত্রিকায়, সভাসমিতিতে নানাভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। সেই সময়ে জনকল্যাণব্রতী বেন্টিঙ্ক উদ্যোগী হয়ে ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর সতীদাহপ্রথা আইন ক'রে বন্ধ ক'রে দিলেন।

গোঁড়া হিন্দুরা এর প্রতিবাদে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জানুআরি রাজা রাধাকান্ত দেবকে সভাপতি ক'রে সতীদাহ প্রচলিত রাখার জন্য 'ধর্মসভা'র প্রতিষ্ঠা করলেন। বেন্টিঙ্কের আইনের বিরুদ্ধে বিলাতে আপীল করা হল। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই জুলাই বিলাতের প্রিভি কাউন্সিল ধর্মসভার আবেদন অগ্রাহ্য করে। তার ফলে সতীদাহ এদেশে বন্ধ হয়ে যায়। সতীদাহ বন্ধ করার জন্য বেন্টিঙ্ককে সে-যুগের শিক্ষিতসমাজ সঙ্গতকারণেই অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। উন্নততর বিচারবুদ্ধিকে প্রচলিত সংস্কারের ঊর্ধ্বে জয়ী করাতে হলে কখনো কখনো আইনের সাহায্য নিতে হয়। বিদ্যাসাগরের 'বিধবাবিবাহ'-আন্দোলন অথবা আধুনিককালে জাতিভেদ নিরসনের জন্য আইনের সাহায্য নিতে হয়েছে। কিন্তু প্রথমে যখন এই বিষয়ে আন্দোলন দেখা দিয়েছিল তখন রামমোহন বা বিদ্যাসাগরকে স্বদেশীয় এবং স্বসমাজের মূঢ়তার সঙ্গে অনবরত সংগ্রাম ক'রে যেতে হয়েছে। সে সংগ্রাম থেকে তাঁরা কোনো লাভের আশায় বা ক্ষতির ভয়ে পিছিয়ে আসেন নি। সতীদাহ-নিবারণের প্রচেষ্টায় যোদ্ধা রামমোহনের সেই আদর্শ ই চিরকালের সমাজ-হিতৈষীর আদর্শ।

* * *

বাংলা গদ্যের সূচনাপর্বে রামমোহনের দান সম্বন্ধে আজ আর কোনো তর্কের অবকাশ নেই। বাংলা গদ্যের কোনো একজন মাত্র স্রষ্টার কল্পনা হাস্যকর। কিন্তু আদিযুগের গদ্য-লেখকদের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ছাড়া আর কোনো গদ্যলেখকের নাম গদ্যশিল্পিরূপে রামমোহনের পাশাপাশি রাখা চলে না। কিন্তু রামমোহনের কাছেই বাংলা গদ্য মহত্তম মনন-সাহিত্যের উত্তরাধিকার লাভ করেছে—এ বিষয়ে সকলেই একমত হবেন। তাঁর স্বচ্ছ চিন্তা, উদ্যত যুক্তিবাণ এবং সত্যসন্ধানী একাগ্রতা বাংলা গদ্যে যে ভাবসম্পদ সঞ্চার করেছে, তা আজও আমাদের সশ্রদ্ধ অনুধাবন-যোগ্য। বলা বাহুল্য এ জাতীয় মননপ্রধান রচনাপাঠে সহজে পাঠকসমাজের পক্ষে আকৃষ্ট হওয়া কঠিন। তবু যাঁরা একটু ধৈর্য ধরে

রামমোহনের তর্ক-যুক্তির অরণ্যে প্রবেশ করবেন তাঁরা প্রাচীন ভারতীয় মনীষার ধ্যানলব্ধ অনুভূতির সঙ্গে যুক্তি-বিশ্লেষণের নৈপুণ্যের এমন এক সার্থক সম্মেলন দেখতে পাবেন, যার পুনরালোচনা বর্তমান যুগের মননচর্চার ক্ষেত্রেও নতুন পথের ইংগিত দেবে।

শোনা যায়, রামমোহন কবি হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ভারতচন্দ্রের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার দুরাশা করেননি বলেই কবিতা লেখার দিকে হাত বাড়াননি। বাংলায় ধ্রুপদীসংগীতের প্রচলনে রামমোহনের ব্রহ্মসংগীতগুলির বিশেষ ভূমিকা মনে রেখেও বলা চলে রামমোহনের তত্ত্বাশ্রিত সংগীতে তত্ত্বই বেশী, কাব্য কম। কিন্তু রামমোহন-মানসের পরিচয় হিসাবে এ গানগুলির মূল্য যথেষ্ট। এমন কি পরবর্তীকালে ঈশ্বরগুপ্তের তত্ত্বাশ্রিত কবিতায় এবং সমগ্রভাবে ব্রাহ্মসমাজের অন্যান্য কবিদের গানে ও কবিতায় এ গানগুলির উত্তরাধিকার বাংলা কবিতাকে অসংখ্য ভাবপুষ্পের অপর্যাপ্ত সৌন্দর্যে ভরে তুলেছে। উদাহরণস্বরূপ রামমোহনের দুটি গান উদ্ধৃত করছি—

মন একি ভ্রান্তি তোমার।
আবাহন বিসর্জন বল কর কার।
যে বিভু সর্বত্র থাকে, ইহাগচ্ছ বল তাকে,
তুমি কেবা আন কাকে, একি চমৎকার॥
অনন্ত জগদাধারে, আসন প্রদান করো।
ইহ তিষ্ঠ বল তারে, এ কি অবিচার॥
এ কি দেখি অসম্ভব, বিবিধ নৈবেদ্য সব
তারে দিয়া কর স্তব, এ বিশ্ব যাহার॥

এর পরের গানটি ১৮৩২-এর ২২শে সেপ্টেম্বর বিলাত থেকে পুত্র রাধাপ্রসাদ রায়কে লিখে পাঠিয়েছিলেন—

কি স্বদেশে কি বিদেশে যথায় তথায় থাকি।
তোমার রচনা মধ্যে তোমারে দেখিয়া ডাকি॥
দেশভেদে কালভেদে রচনা অসীমা,
প্রতিক্ষণে সাক্ষ্য দেয় তোমার মহিমা,
তোমার প্রভাব দেখি না থাকি একাকী॥

যে বিদেশী অনুরাগীর[১০] সাক্ষ্যে আমরা জানতে পেরেছি যে, রামমোহনের শেষ উচ্চারিত ধ্বনি 'ওঁ'—তিনি রামমোহনের ব্যক্তিত্বের বহুবিচিত্র প্রকাশের অন্তরালে পরম ঐক্যের চিরন্তন মন্ত্রধ্বনি শুনতে পেয়েছিলেন। ভারতবর্ষের নবযুগ সেদিন ব্রিষ্টলে স্বদেশ ও বিদেশের সব ব্যবধান মুছে দিয়ে এক মানব ও এক আত্মার সত্যই ঘোষণা করেছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা, ইংরেজীভাষা-বাহিনী শিক্ষার বিস্তার ও আধুনিক মননের পরিচিতি, মানবিক উদারতা এবং সহজাত স্বচ্ছ-বুদ্ধি—এ সব কিছুর সমন্বয়ে আধুনিকতার অগ্রদূত রামমোহন ভারতীয় সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত। তাঁর বিশ্ববোধ ওই ভারতীয়তার মৃণালবৃন্তে ভর করেই মানবজাতির উদ্দেশে সহস্রদলে বিকশিত। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দ্বৈতসত্তার অনুধাবনের দ্বারা আধুনিক ভারত-সংস্কৃতির নবরূপায়ণে রামমোহনের প্রয়াস আজ অবধি বাঙালীর মননে ও সাহিত্যে প্রধান দিশারী।

আক্ষরিক অর্থে বৈজ্ঞানিক না হ'লেও রামমোহনের দৃষ্টিভঙ্গী যুক্তিবাদী বিজ্ঞানের আলোক-দীপ্ত। তাই প্রাচীনপন্থী শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিবাদে লর্ড আমহার্স্টকে লেখা তাঁর চির-স্মরণীয় পত্রটিতে তিনি এদেশে আধুনিক বিজ্ঞান-শিক্ষা-প্রসারের উপরই জোর দিয়েছেন বেশী। আবার প্রাচ্যপন্থীরা যখন সংস্কৃত ও আরবী ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করতে চেয়েছেন, তখন

---

১০ Life of Raja Rammohan Roy : Collett, p 361

এদেশী শিক্ষানুরাগীদের মুখপাত্ররূপে তিনি ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষা-প্রসারকেই সমকালীন দেশ ও জাতির পক্ষে একান্ত কল্যাণকর রূপে গ্রহণ করতে চেয়েছেন।

আজকের দিনে বিজ্ঞান ও কারিগরীশিক্ষার বহুলপ্রচারে যখন মানবতাবোধ আচ্ছন্ন হ'তে চলেছে, তখন এ দুয়ের শুভমিলন সম্বন্ধে নতুন ধরনের শিক্ষা-পরিকল্পনা প্রয়োজন। তাছাড়া দীর্ঘদিন ইংরেজী-মাধ্যম শিক্ষার ফলেও এদেশে শিক্ষার অগ্রগতির নমুনা দেখে মাতৃভাষায় উচ্চ-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আজ স্বতঃপ্রমাণিত। কিন্তু উনিশ শতকের সূচনাপর্বে রামমোহন যেভাবে শিক্ষার আমূল রূপান্তর চেয়েছিলেন, তার দ্বারাই আমরা স্বল্পতম সময়ে প্রগতিশীল বিশ্বচিন্তার সমান অংশীদার হ'তে পেরেছি—একথাও বিশেষভাবে স্মরণীয়।

উনিশ শতকের শেষপর্বে অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে রামমোহনের তিনটি দান সবচেয়ে স্মরণীয়—'...his acceptance of the Vedanta, his preaching of patriotism, and the love that embraced the Musalman equally with the Hindu.'[১১]—বেদান্তস্বীকৃতি, স্বদেশ-প্রেম-প্রচার এবং হিন্দুমুসলমানে সমদৃষ্টি। এই তিন দিক থেকেই রামমোহন ও বিবেকানন্দের ভাবগত সাধর্ম্য স্বীকার ক'রেও বলা যায়, বেদান্তভিত্তিক যে আধুনিক জীবনবোধের সর্বময় প্রকাশ বিবেকানন্দের রচনাবলীতে পাই, রামমোহনের চিন্তাধারায় সে সম্বন্ধে অনিশ্চিত দ্বিধা সহজেই চোখে পড়ে। রামমোহনের অনুগামী ব্রাহ্মসমাজ তাঁর জ্ঞানযোগের আদর্শের চেয়ে ভক্তিযোগের ভাবাবেশকেই প্রধান ক'রে তুলেছিল।

পরবর্তী ভারতবর্ষের ইতিহাস রাজা রামমোহনের আদর্শ ও পন্থা নির্বিচারে গ্রহণ করেনি। তবু অভ্যাসের বশে একান্ত গতানুগতিক নিশ্চেষ্ট জড়তার বিরুদ্ধে নবযুগের মননযুদ্ধের সেনাপতি রামমোহন আধুনিকতার ইতিহাসে চিরপ্রেরণাময় ব্যক্তিত্ব। তাঁর সঙ্গে একমত হওয়া এবং না হওয়া—দুই-ই আমাদের পক্ষে সমান প্রয়োজন।*

---

১১ Notes on Some Wanderings with the Swami Vivekananda : Sister Nivedita ; Ch. II.

* 'উনবিংশ শতকে বাঙ্গালীর মনন ও সাহিত্য' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি হইতে।

অল্লা-উপনিষৎ

ব্রহ্মচারী জ্ঞানচৈতন্য

ভারতীয় সংস্কৃতির যবনিকা উত্তোলন করিলে দেখা যাইবে উহার মঞ্চ বা বেদী হইতেছে বেদ। সুতরাং ভারতীয় সংস্কৃতি ও বৈদিক সংস্কৃতি একই কথা। বেদের জ্ঞান-কাণ্ডকে উপনিষৎ বলে। বেদের অন্তে অবস্থিত বলিয়া ইহার অপর নাম বেদান্ত। বেদে আমরা রুদ্র, বরুণ, ইন্দ্র, মিত্র, বক্রতুণ্ড, চক্রতুণ্ড, কন্য-কুমারী প্রভৃতি অসংখ্য দেবদেবীর পরিচয় পাই। শুধু কি তাহাতেই শেষ—বেদে মুসলমানোপাসিত আল্লাও বাদ যান নাই (অথর্ববেদে অল্লাল্লেত্যাদিখ্যাতো যবনোপাস্যঃ পরমেশ্বরঃ। —শব্দকল্পদ্রুমঃ)।

রঙ্গমঞ্চে যেমন বহু দৃশ্য থাকে তেমনি বৈদিক-সংস্কৃতিরূপ মঞ্চের উপর বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংস্কৃতি এবং বিভিন্ন ভাবধারায় পুষ্ট বহু শাখা-প্রশাখার উদ্ভব হইয়াছে। রঙ্গমঞ্চে যেমন শত শত অভিনেতা অভিনয় করিয়া চলিয়া যান তেমনি এই বৈদিক সংস্কৃতিতে কত শত মনীষী, আচার্য ও বক্তা নিজেদের দর্শন ও অনুভূতিরাশি নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়া ছায়ামূর্তির ন্যায় রঙ্গমঞ্চের পশ্চাৎভাগে রহিয়া গিয়াছেন—কে তাঁহাদের ইয়ত্তা রাখে?

'ভারতবর্ষের ইতিহাস'[১] প্রবন্ধে প্রশ্ন উঠিয়াছে—'ভারতবর্ষের প্রধান সার্থকতা কী?—এ কথার স্পষ্ট উত্তর যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন সে উত্তর আছে। ভারতবর্ষের ইতিহাস সেই উত্তরকেই সমর্থন করিবে। ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখী করিয়া দেওয়া এবং বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয়ে অন্তরতররূপে উপলব্ধি করা—বাহিরে যে-সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয় তাহাদিগকে নষ্ট না করিয়া তাহাদের ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে অধিকার করা।'

যদিও সংস্কৃতির ব্যাপক অর্থে ধর্মও উহার অন্তর্ভুক্ত তথাপি আমরা একটু পৃথক করিয়া দেখিলে দেখিতে পাই—ইহলোক লইয়া সাধনার নাম সংস্কৃতি ও অনন্তলোক লইয়া সাধনার নাম ধর্ম। ভারতের সনাতনধর্মের মূল পরিচয়: মানুষের স্বরূপ কি, আত্মার স্বরূপ, ঈশ্বরের সহিত মানবাত্মার সম্বন্ধ, ঈশ্বরের স্বরূপ, পূর্ণত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, সৃষ্টির অনন্তত্ব ইত্যাদি। ভারতীয় ধর্মের আর একটি গৌণ দিক আছে—উহা প্রাত্যহিক জীবনের কার্যে নিয়মিত।

এখন প্রশ্ন উঠিবে, যে দার্শনিক প্রবন্ধের অবতারণা করা হইতেছে উহার জন্য ভারতের সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ধর্ম প্রভৃতির এত ভূমিকার প্রয়োজন কি? তাহাতে উত্তর এই যে, 'ভূমি' অর্থাৎ উৎপত্তিক্ষেত্র, তাহা 'কা' অর্থাৎ কিদৃশী—ইহা বিশদভাবে বলা প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ ভারতের সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ধর্মের মূল তত্ত্বটি না লিখিলে সর্বজনীন উপনিষদের একদেশী ভাব গৃহীত হইবার সম্ভাবনা; তৃতীয়তঃ প্রবন্ধের বিষয়টি অপ্রচলিত অথচ উহার নাম লোকমুখে বহুল প্রচারিত।

এইবার আমরা উপনিষৎখানির ভিতরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিব। উপনিষৎখানির নাম অল্লোপনিষৎ (আল্লোপনিষৎ নহে)। এই নামকরণটি সত্যই অদ্ভুত। প্রসিদ্ধ উপনিষৎ-গুলির নামকরণের একটি বৈশিষ্ট্য আছে।

---

১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যেমন—কোন উপনিষদের প্রথম শব্দটি হইতে ঐ উপনিষদের নাম হইয়াছে—'ঈশাবাস্যং' হইতে ঈশোপনিষৎ; 'কেনেষিতং' হইতে কেনোপনিষৎ। আবার কৃষ্ণযজুর্বেদের কঠ শাখার সহিত সম্বন্ধ থাকায় কঠোপনিষৎ, প্রশ্নের সমাধান হইয়াছে বলিয়া প্রশ্নোপনিষৎ। মুণ্ডকোপনিষদের শেষের দিকে আছে 'শিরোব্রতং বিধিবদ্ যৈস্তু চীর্ণম্'—ইহা হইতে অনুমিত হয় শির বা মুণ্ডের সহিত সম্বন্ধ থাকায় মুণ্ডকোপনিষৎ; মধ্বাচার্যের মতে মণ্ডুক ঋষির নাম হইতে মাণ্ডূক্যোপনিষৎ। ইতরার পুত্র (ব্রাহ্মণের শূদ্র পত্নীর গর্ভজাত সন্তান) ঐতরেয়—এই ঐতরেয় ঋষির নাম হইতে ঐতরেয় উপনিষৎ। যাজ্ঞবল্ক্য কর্তৃক উদ্গীর্ণ বেদরাশি রক্ষার জন্য কতিপয় ঋষি তিত্তিরি পক্ষী হইয়া উহা রক্ষা করেন—সেই তিত্তিরি পক্ষীর নাম হইতে তৈত্তিরীয় উপনিষৎ। আকারে বৃহৎ এবং মূলতঃ আরণ্যক বলিয়া বৃহদারণ্যক উপনিষৎ, সামবেদের ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণের অন্তর্গত বলিয়া ছান্দোগ্যোপনিষৎ। অবশ্য উপরোক্ত এইসব নামকরণের ব্যাপারে বহু মতান্তর আছে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে এই অল্লা-উপনিষদের নাম কিভাবে হইল? শুধু তাহাই নয়, এই উপনিষৎখানি অথর্ববেদের মধ্যে কি ভাবে স্থান পাইল? আবার আড্যিয়ার লাইব্রেরী কর্তৃক প্রকাশিত 'অপ্রকাশিতা উপনিষদঃ' (Un-published Upanishads) গ্রন্থে উপনিষদগুলির বিভাগ করা হইয়াছে—যোগ উপনিষৎ, সামান্য-বেদান্ত, বৈষ্ণব উপনিষৎ, শৈব উপনিষৎ, শাক্ত উপনিষৎ ইত্যাদি ক্রমানুসারে। উক্ত গ্রন্থে এই অল্লা উপনিষৎখানি আবার শাক্ত উপনিষদের প্রথম উপনিষৎ বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে। উপরন্তু 'আড্যিয়ার লাইব্রেরী'-প্রকাশিত এবং 'শাস্ত্রপ্রকাশ কার্যালয়'-প্রকাশিত অল্লোপনিষদের মধ্যে বিস্তর পাঠান্তর রহিয়াছে। শব্দকল্পদ্রুমঃ আবার ইহাকে উপনিষৎ না বলিয়া 'আথর্বণসূক্তম্' বলিয়াছেন। প্রসিদ্ধ উপনিষৎগুলির যেমন প্রারম্ভে ও শেষে মঙ্গলাচরণ আছে—ইহাতে সেরূপ নাই। নির্ণয়সাগর মুদ্রণালয়-প্রকাশিত 'ঈশাদিবিংশোত্তরশতোপনিষদঃ' গ্রন্থে অল্লোপনিষদের উল্লেখই নাই। সব কিছু মিলিয়া উপনিষৎখানির ইতিহাস বড়ই রহস্যময়।

এইসব রহস্যের একটা সন্তোষজনক সমাধানের জন্য আমরা অতীতের ইতিহাস আবার পর্যালোচনা করিব। সকল মানবই এক ভগবানের সন্তান অথচ এই মানুষে মানুষে কত ভেদ। আর এই ভেদের চরম উৎকর্ষ দেখা গিয়াছে এই ভারতবর্ষে। এখানে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং বিদেশ হইতে আসিয়াছে কত জাতি ও উপজাতি। আবার এই বৈচিত্র্যময় ভারত হইতে উত্থিত হইয়াছে মহাসাম্যের, অভেদের বাণী। বৈদিক ঋষিই উদাত্ত কণ্ঠে গাহিয়াছেন—'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।' কিন্তু বৈদিক যুগের পরবর্তী কালের ঋষিরা স্ব স্ব সাম্প্রদায়িক মত প্রচলিত করিবার জন্য শ্রুতির আবরণ দিয়া কতকগুলি উপনিষৎ বিভিন্ন সমাজে প্রচার করিলেন। যেমন শৈব উপনিষৎ—ইহাতে ঈশান, মহেশ বা মহাদেবকে পরমাত্মারূপে বর্ণনা করা হইয়াছে; বৈষ্ণব উপনিষদে বিষ্ণু হইয়াছেন পরমাত্মা; শাক্ত উপনিষদে দেবী ভগবতী পরমাত্ম-স্বরূপিণীরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। আবার নৃসিংহ-তাপনীয় উপনিষদে নৃসিংহাবতারের, রামতাপনীয় উপনিষদে রামাবতারের, এবং গোপাল-তাপনীয় উপনিষদে কৃষ্ণতত্ত্বের—এই বিভিন্ন

সুন্দর সুন্দর আখ্যায়িকার দ্বারা উপনিষৎগুলি অতি আশ্চর্যভাবে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল। এইভাবে পরবর্তীকালে 'অল্লা' নামক সাম্প্রদায়িক উপনিষৎখানি এই বৈচিত্র্যময় বিরাট ভারতের সমাজে ভারতীয় সংস্কৃতির মঞ্চরূপী অপরূপ সম্মোহক শব্দ যে উপনিষৎ তাহার সহিত যুক্ত হইয়া প্রবেশ করিল। ফলে কাহারও কিছু বলিবার থাকিল না।

স্বামী বিবেকানন্দ এই উপনিষৎখানির মর্মোদ্ঘাটন করিতে গিয়া বলিয়াছেন: "ইহা স্পষ্টতঃই আধুনিক। ইহাতে আল্লার স্তুতি আছে এবং মহম্মদকে রজস্বল্লা বলা হইয়াছে। শুনিয়াছি, ইহা নাকি আকবরের রাজত্বকালে হিন্দু-মুসলমানদের মিলন-সাধনের জন্য রচিত হইয়াছিল। সংহিতাভাগে আল্লা বা ইল্লা বা এরূপ কোন শব্দ পাইয়া তদবলম্বনে এইরূপ উপনিষৎসমূহ রচিত হইয়াছে। এইরূপে এই অল্লোপনিষদে মহম্মদ রজস্বল্লা হইয়াছেন। ইহার তাৎপর্য যাহাই হউক, এই জাতীয় আরও অনেকগুলি সাম্প্রদায়িক উপনিষৎ আছে।···আমি নিশ্চিতরূপে জানি ভারতের কোন কোন প্রদেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনও এরূপে নূতন উপনিষৎ রচিত হইতেছে।"

যাহাহউক, উপনিষৎখানির ভাষা দেখিবার জন্য আমরা উহার কিঞ্চিৎ মূল 'শব্দকল্পদ্রুমঃ' হইতে উদ্ধৃত করিতেছি: "ওঁ অস্মল্লাং ইল্লে মিত্রাবরুণো দিব্যানি ধত্তে।···ইল্লাকবর ইল্লল্লেতি ইল্লাল্লাঃ ইল্লা ইল্লল্লা অনাদিস্বরূপা অথর্বণীশাখাং হ্রূং হ্রীঁ জনান্ পশূন্ সিদ্ধান্ জলচরান্ অদৃষ্টং কুরু কুরু ফট্। অসুরসংহারিণীং হ্রূঁ অল্লো অসুরমহমদরকং বরস্য অল্লো অল্লাং ইল্লল্লেতি ইল্লল্লঃ।"

সুতরাং ভাষা দেখিয়া পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে ইহার ভাষার সহিত অন্য কোন উপনিষদের ভাষার মিল নাই; উপরন্তু ইহার শব্দগুলির প্রয়োগও সংস্কৃত ভাষায় কদাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। ব্যাকরণ-দৃষ্টে দেখা যায়—অল্লা, স্ত্রী, (অল্+ক, স্ত্রিয়াং টাপ্) [অল্যতে ইতি অল্, ক্বিপ্; অলে ভূষায়ৈ লাতি গৃহ্লাতি]। ইহা হইতে অনুমিত হয় কোন সংস্কৃতজ্ঞ মুসলমান পারস্য ভাষায় অথর্ববেদের অনুবাদ করিয়াছিলেন। উপরোক্ত মন্ত্রের মধ্যে আকবরের নাম থাকায়—মনে হয় উহা তাঁহার সময়েই সংকলিত ও অনূদিত হইয়াছিল। আরও জানা যায় ইব্রাহিম নামক এক ব্যক্তি আকবরের আদেশানুসারে ঐ কার্য করেন।

এই সম্বন্ধে একটি প্রচলিত কাহিনী আছে। আকবরের সময় একজন শিক্ষিত দক্ষিণ-দেশীয় ব্রাহ্মণ মুসলমানধর্ম গ্রহণ করেন এবং তাঁহার নূতন নাম হয় শেখ ভাবন। আকবরের আদেশে শিক্ষিত ও সংস্কৃতজ্ঞ শেখ ভাবন পারস্য ভাষায় অথর্ববেদের অনুবাদ শুরু করেন; কিন্তু ঐ মৌলিক গ্রন্থের অনুবাদ করিতে গিয়া তিনি কতকগুলি স্থানে প্রমাদ গণিলেন। শেখ ভাবন মহা ভাবনায় পড়িলেন এবং ভাব ও ভাষার অভাব অনুভব করিতে লাগিলেন। সম্রাট দেখিলেন সুবিধা হইল না—কারণ গায়ের জোরে রাজ্যজয় চলে, ভাবের জয় হয় না। সুতরাং অনুবাদে বিবাদ-বিতর্ক দেখা দিল। তখন সম্রাট ফৈজী ও হাজী ইব্রাহিমকে আদেশ দিলেন।

আরও শুনা যায় অথর্ববেদের এই অংশটি লইয়া শেখ ভাবন ব্রাহ্মণদিগকে তর্কে পরাজিত করিয়া অনেককে মুসলমানধর্মে দীক্ষিত করাইয়াছিলেন। 'মুণ্ড খবুৎ ত্ববারিক' নামক

পারস্য গ্রন্থে এই জাতীয় বহু ঘটনার উল্লেখ আছে। প্রবন্ধের প্রারম্ভেই আমরা ভারতীয় ঐতিহ্যের বৈশিষ্ট্যের কথা বলিয়া আসিয়াছি। মুসলমান সংস্কৃতির উপর ভারতীয় উপনিষদের প্রভাব বিষয়ে আর একটি ঐতিহাসিক তথ্য পরিবেশন করিতেছি; মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের জ্যেষ্ঠভ্রাতা দারাসেকো পারসী-ভাষায় উপনিষদের অনুবাদ করান। ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এই অনুবাদ-কার্য সমাপ্ত হয়। সুজাউদ্দৌল্লার রাজসভাস্থ ফরাসী রেসিডেণ্ট জেণ্টিল সাহেব বর্নিয়ার সাহেবের দ্বারা এই পারসী অনুবাদ আকেতিল দুপেরোঁ নামক বিখ্যাত পর্যটক ও জেন্দাবেস্তার আবিষ্কর্তাকে পাঠাইয়া দেন। তিনি উহার লাটিন অনুবাদ করেন। বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক শোপেন-হাউয়ার এই লাটিন অনুবাদ পাঠ করিয়া বিশেষরূপে আকৃষ্ট হন। শোপেনহাউয়ারের দর্শন এই উপনিষদের দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত। এইরূপে ইউরোপে উপনিষদের ভাব প্রথম প্রবেশ করে। (ভারতে বিবেকানন্দ, পাদটীকা, পৃঃ ১৪)

যাহা হউক, দার্শনিক প্রবন্ধের উপর বার-বার ইতিহাসের দর্পণ ফেলিলে দর্শনে বিঘ্ন হইতে পারে এবং ধৈর্যচ্যুতিও ঘটিতে পারে। সেই হেতু আমরা এই রহস্যময় দর্শন-শাস্ত্রখানি সম্পূর্ণভাবে খোলাখুলি তুলিয়া ধরিতেছি। শাস্ত্রপ্রকাশ কার্যালয় হইতে প্রকাশিত এবং পণ্ডিত দাশরথি স্মৃতিতীর্থ মহাশয় কর্তৃক বঙ্গভাষায় অনূদিত হইয়াছে এই অল্লোপনিষদখানি (অধুনালুপ্ত)। উহা নিম্নরূপ :

"অথর্বাঋষি সম্প্রতি লীলাময় অচিন্ত্য-রূপচরিত ওঁকারস্বরূপ সর্বজ্ঞ মহাপুরুষকে জানিতে বাসনা করিয়া বরুণদেবকে বলিতেছেন, হে বরুণ, আপনি আমার এই অনন্তশক্তির অনন্তত্ব পর্যালোচনে সহায়তা করুন।

"হে বরুণ, আপনি মাদৃশ জীবপুঞ্জের নিকট হইতে পুনর্জন্মের হেতুভূত পাপপুণ্যরূপ কর্ম-সংস্কারের বীজমালা গ্রহণ করিয়া স্ব-স্বরূপ ব্রহ্মে অবস্থিত হন এবং পরব্রহ্মের সহিত একীভূত হইয়া অনুগ্রহপূর্বক স্ব-স্বভাবের বিকাশ ও আকাশ প্রভৃতি ভূতগ্রাম সৃষ্টিকরতঃ তাহাদের পরিপোষণ করিয়া থাকেন। হে বরুণ, আপনি ব্রহ্মতুল্য হইয়া ব্রহ্মে বিরাজমান। সুধীগণ ইহা অবগত হইয়া যদিও জগতীতলে পুনর্বার প্রত্যাবর্তন করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও সেই তোমাতেই তাঁহাদের আত্মা সমর্পিত হয়। হে বরুণ, আপনি যেমন ব্যাপ্তিশীল ও অনুগ্রহ-প্রদর্শক, আমিও সেইরূপ। অতএব আমি আপনার সখা। তাই অধুনা তেজস্কাম হইয়া আপনাকে আহ্বান করিতেছি। কেন না, ব্রহ্মের সহিত আপনার ভেদ নাই, সুতরাং আমার সহিতও আপনি অভিন্ন। কিন্তু তাহা হইলেও আপনি আমার পালনকর্তা এবং আমি আপনার প্রতিপাল্য।

"পরমাত্মরূপী ইন্দ্র নিখিল জগৎপ্রপঞ্চের হবন-কর্তৃত্বে ঈশ্বরকে গ্রহণ করিয়া স্বীয় মহিমায় আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন। আবার তিনিই মায়ায় অভিরমণ করিয়া তাহাতে মুগ্ধ হন এবং অসংখ্য ইন্দ্ররূপে পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকেন। অতএব এই পরমাত্মরূপী ইন্দ্র (অল্ল) ঈশ্বর অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ এবং ঐ অল্লকে গ্রহণ করা ঈশ্বরকে গ্রহণ করা অপেক্ষা মঙ্গলকর। যেহেতু ঈশ্বর অল্লসকাশে পরিমাণে ক্ষুদ্র এবং পরমাত্মা অল্ল নিত্যপূর্ণ, এই হেতু তিনি ঈশ্বরেরও জননী। এই কথা সমস্ত ঋকই বর্ণনা করিয়া থাকেন। পরব্রহ্ম অল্লই মায়াবশ হইয়া বহুবিধ

হইয়াছিলেন, অতএব তিনি দেববিগর্হিত অসুরভাবও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহাতে অভিমান পরিস্ফুট হইয়াছিল, কিন্তু কোন প্রধান জীবের আশঙ্কা হয় নাই; তিনি যে পরমাত্মা তিনি তাহাই ছিলেন। তিনি সেই উৎপন্ন অভিমানকে ধর্মসেতুর বিনাশক সহায় ও জগদ্‌ব্যাপারে প্রোত অর্থাৎ খচিত জানিয়া 'দেবগণের পশুভক্ষণের ন্যায়' তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

"আকাশাদি পঞ্চভূতে পঞ্চভূত আহুতি প্রদান করিয়া অর্থাৎ পঞ্চীকরণ করিয়া বিবিধ বিচিত্রাঙ্গ সূর্যচন্দ্রনক্ষত্রপুঞ্জকে স্বকীয়রূপে প্রকাশ করিলেও সেই অল্ল-পরমাত্মা প্রথমজাত সনকাদি ঋষিবৃন্দের নিকটে অভেদাত্মিকা জ্ঞানরূপিণী পরা বিদ্যারূপেই বিরাজমান ছিলেন। ঈশ্বর যে বিশ্বসৃষ্টি-ব্যাপারে প্রেরিত হন, তাহার কারণ মায়া; যেহেতু মায়া সেই ঈশ্বরের অন্তরে সঙ্কল্পরূপে বিরাজমানা। কিন্তু তাহা হইলেও মহাপ্রলয়-সময়ে সকলেই কারণে লয়প্রাপ্ত হইবে এবং তিনিই কেবল একমাত্র কারণস্বরূপে অবস্থিত থাকিবেন।

"ক্ষিতি হইতে আকাশাদি পর্যন্ত নিখিল দ্যোতমান বস্তু অল্লকর্তৃক সৃষ্ট হইয়াও তাহারা নিজ নিজ স্বরূপ হইতে বিচ্যুত হয় নাই; অর্থাৎ অল্ল তাহাদের স্বরূপ বিনষ্ট করেন না। যেহেতু বরুণরাজ ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইয়া ব্যাপকরূপে শোভা পাইয়াছিলেন, এইজন্য ঐ নিখিল দিব্যবস্তু তাঁহাকে আসক্ত করিতেও সমর্থ হয় নাই। পরন্তু হিরণ্যগর্ভ যাহাতে অনায়াসে অল্লের স্বরূপ-দর্শনে সমর্থ হন, সেইরূপ অবসরও দত্ত হইয়াছিল; এবং তিনিও তাঁহার যথার্থ স্বরূপ সন্দর্শন করিয়াছিলেন। যাঁহারা যাঁহারা পরমাত্মস্তুতি পাঠ করিয়া থাকেন, পরমাত্মা সেই সেই ব্যক্তিবৃন্দকে উপাসনোচিত শক্তিও প্রদান করিয়া থাকেন। যেমন সেই অল্ল হৃদয়ে বিরাজমান বলিয়াই সেই হৃদয়কেও তিনি আপন করিয়া লইয়া থাকেন, সেইরূপ যে সাধক তাঁহাকে এক দেখেন, তিনিও তাঁহার সহিত অভিন্ন হইয়া যান।

"কামনাই ফলদানের হেতু—এই দুষ্টবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মরূপে বিরাজমান ছিলেন। সুতরাং সেই সমস্ত দিব্যবস্তুও হিরণ্যগর্ভকে চিন্তা করিয়াছিল যে, কি প্রকারে ইহাকে আমরা লাভ করিব। হে চিত্ত, আমি তোমাকে আহ্বান করিতেছি, আমি তোমাকে অত্যন্ত ভালবাসি এবং আমি তোমার মিত্র, সুতরাং আমার কথা অবধান কর, তুমি নিয়ত চিন্তা কর, আনন্দময় পুরুষই তোমার কামনা পূরণ করিবেন, তুমি লব্ধকাম হইয়াছ। ইহা ধারণা করিয়া অহংকার পরমেশ্বরেরই বস্তু বলিয়া আসক্তিক্ষয়ের জন্য শ্রেষ্ঠের নিকট প্রার্থনা কর, এই প্রার্থনা চরম অবস্থায় উপনীত হইলে অর্থাৎ নিরুদ্ধচিত্তবৃত্তি হইলে তুমিও পরেশ হইবে আর ঐ সমস্ত দ্যোতমান বস্তুপুঞ্জ আবার তোমাকেই চিন্তা করিবে। ইহাই আমি ভাবিতেছি।

"সংসারের বীজভূতা মায়ার প্রসবিত্রী অল্লা মানববৃন্দের নিত্যসিদ্ধ স্বরূপ আবির্ভাব করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে অথর্বা ঋষিকে ব্রহ্মবিদ্যার রহস্য-প্রতিপাদিনী এই উপনিষৎ দেখাইয়া দিয়াছিলেন। ইহা অথর্বা ঋষির দৃষ্টবেদ-শাখার একদেশে নিহিত ছিল। সেই আমি অথর্বা ঋষি অল্লা-প্রদর্শিত উপনিষৎ দেখিয়া প্রার্থনা করিতেছি—হে অল্ল, তুমি মানবগণকে সমস্ত বিষয়ের নিকট এমন কি জলে স্থলে ও শূন্যে স্বাধীনতা প্রদান কর। হে অল্ল, তুমি সমস্ত মানববৃন্দকে স্বাধীনতা প্রদান কর। হে

অথর্বণি, তুমি অসদ্বৃত্তি-বিধ্বংসিনী বলিয়া তাই প্রার্থনা করি; অল্প যদিও শ্রেষ্ঠের নিকট হইতে প্রগল্‌ভতা-জ্ঞাপক অসদ্বৃত্তিরূপ অহংকার লাভ করিয়া জীবভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, তথাপি তোমার প্রসন্নতায় আমি অল্পকে লাভ করিয়া সেই অল্পই অর্থাৎ পরমাত্মাই হইয়াছি। আমি অধুনা নিখিল কামের কামনীয়, সুতরাং যাবতীয় কামের কামনীয় হইতেছি।"

কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য এবং প্রকৃত বিষয়বস্তু জানিবার জন্য দীর্ঘ উদ্ধৃতি করিতে হইল।

উপসংহারে আমরা বলিব, বিধাতা ঐক্যমূলক সভ্যতার সঙ্গমস্থল এই ভারতবর্ষে এবং সর্বধর্মের প্রসূতিস্বরূপ যে সনাতন হিন্দুধর্ম, তাহার উৎপত্তি-ক্ষেত্রে উপস্থিত করাইয়াছেন বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন সংস্কৃতি এবং বহুবিধ ধর্ম। এইভাবে পূর্ণাঙ্গ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে ভারতীয় সংস্কৃতি। অন্যের মধ্যে যাহা কিছু ভাল ভারতবর্ষ গ্রহণ করিয়াছে এবং অপরের ভিতর প্রবেশ করিয়া আপন শক্তিতে সকলকে নিজের করিয়া লইয়াছে। এই আপন বোধের মূলমন্ত্র রহিয়াছে উপনিষদে। উদার উপনিষৎ কল্যাণময়ী মাতৃস্বরূপা। তিনি সকলকে গ্রহণ করিয়া সমস্ত জীবজগতের উৎস যে পরব্রহ্ম তাহাই বারবার দেখাইয়া দিয়া বলিয়াছেন—'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', 'একমেবা-দ্বিতীয়ম্', 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি'। যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী, সত্যকাম-জাবাল, যম-নচিকেতা, ইন্দ্র-হৈমবতী-উমা প্রভৃতি যত সব সার্বজনীন, সার্বকালিক, সার্বদেশিক উপাখ্যান আমাদের বিভিন্ন উপনিষদে ছড়াইয়া রহিয়াছে—উহাই যুগ যুগ ধরিয়া পুষ্ট করিয়াছে, করিতেছে ও করিবে সমগ্র মানবের জীবন। লৌকিক দৃষ্টিতে উহা উপাখ্যান, কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিতে উহা ব্রহ্মবিদ্যা—যাহা মানুষকে স্ব-স্বরূপ জানাইয়া অমর করাইয়া দেয়। কাজেই যে ভাবেই হউক, যে ভাষাতেই হউক, যে উপাখ্যানের মাধ্যমেই হউক উপনিষদের মূলভাবের প্রচার মানুষের কল্যাণেরই নিদান।

শান্তি*

স্বামী প্রশান্তানন্দ

[অনুবাদক : শ্রীগোকুলচন্দ্র ঘোষ]

আজ আমরা, পৃথিবীর দূর দূরান্তর হ'তে আগত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ও সভ্যগণ, একত্র মিলিত হয়েছি ভাবের আদান-প্রদান দ্বারা শান্তিলাভের উপায় অন্বেষণ করতে।···বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিকদের এই সম্মেলনে যাঁরা ভাষণ দিচ্ছেন, তাঁরা সকলেই শান্তি কামনা করেন এবং নিজ নিজ বিশ্বাস ও সামর্থ্যমত পৃথিবীতে আপেক্ষিক শান্তিস্থাপনে প্রয়াসী। কিন্তু প্রথমেই আমাদের জানতে হবে আসল (পরা) শান্তি বলতে কি বুঝায়, আর যাঁরা পরা শান্তির রাজ্যে উপনীত হয়েছেন, সেই মহাপুরুষদের সম্বন্ধে ধারণা করতে হবে। কেবলমাত্র এই সম্যক্ ধারণা হ'তে আপেক্ষিক শান্তিলাভমূলক কর্মধারার নির্দেশ পাওয়া সম্ভব। যদিও আমি পরা শান্তির বিষয় বলতে চাই, আমি জানি যে অধিকাংশ লোকের পক্ষে তা লাভ করা খুবই কঠিন, তবুও তা কি এবং যাঁরা তা লাভ করেছেন তাঁদের কর্মধারা কি—সে সম্বন্ধে আমাদের পরিষ্কার ধারণা থাকা আবশ্যক। পরা শান্তি কি—এ প্রশ্নের উত্তর হ'ল, বাসনা-উদ্ভূত চিন্তাধারা (Mentations) বা সমস্ত সংকল্প-বিকল্পের নিরোধই পরা শান্তি। লণ্ডন বুদ্ধিষ্ট্ সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত 'Universal Mind' নামক 'হুয়াং পো নীতি'-র অনুবাদক 'Mentation' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। ইহার দ্বারা মনের সকল অবস্থা বুঝায় না, বুঝায় কেবল সেই সব চিন্তাধারা যেগুলি ইন্দ্রিয়জ ভোগ-বাসনা থেকে উদ্ভূত হয়।

সকল জিনিসেরই চরম পরিণতি স্থৈর্য। ঘড়ির পেণ্ডুলামের দিকে তাকালে দেখি, পেণ্ডুলামটি দক্ষিণ থেকে নেমে আসে মধ্য বিন্দুতে বিশ্রাম করতে, কিন্তু যে গতিশীল—তার সামর্থ্য সে ইতিপূর্বে পেয়েছে, তা তাকে টেনে নিয়ে যায় প্রতিক্রিয়ার শেষ বিন্দু পর্যন্ত। আবার সে মাঝখানে এসে স্থির হ'তে চায়, কিন্তু সবই বৃথা হয়, জড়ানো স্প্রিং-এর শক্তি তাকে পুনরায় গতিশীল করে। আমাদের মনের ভিতরও অনুরূপ কার্য হয়; আমরা দেখি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুলাভের আকাঙ্ক্ষা মনকে স্থির হ'তে দেয় না, অধিকতর শক্তিতে তাকে চঞ্চল ক'রে তোলে। স্প্রিংকে সরিয়ে নিতে বা তার কার্যকারিতা নষ্ট ক'রে দিতে পারলে দেখা যায় পেণ্ডুলামের দোলন কমতে কমতে ক্রমে স্থির হ'য়ে যায়। তেমনি হৃদয় হ'তে যদি বাসনা দূর করা যায় তবে মনও স্থির হ'য়ে যাবে, শান্তি লাভ হবে।

যাঁর কোনও বস্তুর প্রতি আসক্তি নাই, যাঁর নিকট হ'তে ভয় পাবার কোনও আশঙ্কা নাই, যাঁকে কিছুই বিচলিত করতে পারে না, যা সম্মুখে উপস্থিত হয় তা পাবার আগ্রহ বা তাকে প্রত্যাখ্যানও যিনি করেন না, যিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ, সুখ-দুঃখ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সব বস্তুকে যিনি সমভাবে উপেক্ষা করেন, তিনিই আদর্শ

* ১৯২০ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে বিশ্বধর্মসভায় প্রদত্ত মূল ইংরেজী ভাষণের অনুবাদ। ভাষণটি লণ্ডন এবং ভারতের কয়েকখানি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

মানব, পরা শান্তির অধিকারী পুরুষ, ভোগাকাঙ্ক্ষা জানার ইচ্ছা, এমনকি জীবন-বাসনাও তাঁর হৃদয় থেকে মুছে গেছে, এরূপ আদর্শ পুরুষের অভাব কোন যুগেই হয় না। কথিত আছে. জনক রাজা এরূপ অবস্থাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। বুদ্ধ, কৃষ্ণ, খৃষ্ট প্রভৃতি অবতার-গণের কথা আমরা শুনেছি। এমনকি বর্তমান যুগেও এরূপ মহাপুরুষের অভাব নাই। রোমাঁ রোলাঁ-প্রণীত শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা একথা উপলব্ধি করবেন। ব্যক্তিগত-ভাবে এরূপ কয়েকজন ব্যক্তির সংস্পর্শে আসবার সুযোগ আমি পেয়েছি। শ্রীরামকৃষ্ণ সহধর্মিণী শ্রীশ্রীমা, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী অদ্ভুতানন্দ প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যবর্গের কথাই আমি বলছি। তিরুভান্নামালাইয়ের রমণ মহর্ষিকেও আমি দেখেছি।

শান্তির পথ সকলেরই এক নয়, শান্তিকামীর স্বভাবের অনুকূল যে-কোনও পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে, যদি তা হৃদয়ের আসক্তিগুলি নির্মূল করতে ও মনকে পার্থিব বোধের উর্ধ্বে নিয়ে যেতে পারে। অবশ্য পরম শান্তি আসে তখনই, যখন শান্তি-কামনাও দূর হ'য়ে যায়; তখনই লাভ হয় পরম প্রজ্ঞা, পরা শান্তি বা ব্রাহ্মী স্থিতি—ভাষা দিয়ে সে অবস্থা প্রকাশ করা যায় না, কারণ তা বাক্য-মনের অতীত।

দু'রকম মানুষ আছে,—যুক্তিবাদী ও ভাবপ্রবণ। যুক্তিবাদীদের মধ্যে কেউ আস্তিক, কেউ নাস্তিক, কেউ বাস্তববাদী আর কেউ বা শূন্যবাদী; কিন্তু সকলেই শান্তি কামনা করেন। এখানে যাঁরা ভাষণ দিয়েছেন, দেখা যায়, জগতের সৃষ্টিকর্তারূপে ঈশ্বরের ধারণা যে-কোনও ভাবে তাঁদের মধ্যে অনেকেরই আছে। নাস্তিকেরা বলেন, বিশ্বসংসারের সৃষ্টিকর্তা ব'লে কেউ নাই, স্বর্গ নাই, নরক নাই। দেখা যায় যে, বিভিন্ন মানসিক অবস্থার লোকের আপেক্ষিক ধারণা অনুযায়ী ঈশ্বরের ধারণাও বিভিন্নরূপে হয়। এমনকি উপজাতিগণের মধ্যেও ঈশ্বরের একপ্রকার ধারণা আছে। তাদের দৈনন্দিন জীবনে ভগবান এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে রয়েছেন—রোগ, শোক, বিপদ, আপদ দিয়ে শাস্তি তিনিই দেন, আবার সাংসারিক ও ব্যক্তিগত কামনা-পূরণেরও সহায়তা করেন। শুধু উপজাতি নয়, তথাকথিত সভ্য লোকদের মধ্যে অনেকেই ইহা বিশ্বাস করেন, কেবল তার সঙ্গে যোগ করেন পরকালের ধারণা, নরকভোগ বা স্বর্গসুখ।

এখন একথা থাক, কারণ ঈশ্বর, স্বর্গ, নরক আছে কিনা প্রমাণ করা যায় না। সেদিন এক বন্ধু বলেছেন, শান্তি ঈশ্বরের একটা গুণ। কিন্তু আমি বলি ঈশ্বর যদি থাকেন, তিনি হলেন স্বয়ং শান্তি। আপেক্ষিকতা ও দ্বৈত-বুদ্ধি দ্বারা ঈশ্বর ও তাঁর গুণ আমাদের ধারণায় আসে। বস্তুর জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই তার বিপরীত ধর্মের জ্ঞান অনুস্যূত। আপেক্ষিকতার বোধ জন্মাতে হ'লে চাই নিরপেক্ষতা—অর্থাৎ একম্, অনন্তম্, অদ্বিতীয়ম্-এর ধারণা। কেউ-ই, এমনকি শূন্যবাদীরা পর্যন্ত আত্মার—নিজের অস্তিত্বে অবিশ্বাস করতে পারেন না। অভাব থেকে বস্তু উৎপন্ন হয় না। জন্মাবার পূর্বেও আত্মার অস্তিত্ব ছিল এবং এই দেহের বিনাশের পর ভবিষ্যতেও তা থাকবে। আমাদের বর্তমান জীবন এক চিরন্তন অসীম শৃঙ্খলের অতি ক্ষুদ্র একটি গ্রন্থিমাত্র। স্বপ্নের মতো তা অতিবাহিত হ'য়ে চলেছে। কালের ধারণার সঙ্গে দেশের ধারণা জড়িত। এক থেকে অপর ধারণাটি পৃথক করা যায় না। আসলে কাল বা দেশের কোনও অস্তিত্ব নাই। মনরূপ যাদুকরের আপেক্ষিকতারূপ যাদুদণ্ডের

স্পর্শেই এ সবের বোধ জন্মায়। এর নাম দেওয়া যেতে পারে 'মায়া'। এই মায়ার ভেতর স্বপ্নের ন্যায় আমাদের জীবন কাটে।

সময়ের বিষয়ে আমার মন একবার কিরূপ যাদুর খেলা দেখিয়েছিল, সেই অভিজ্ঞতার বর্ণনা এখানে করছি। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বের ঘটনা, তখন আমি ভারতের বারাণসীতে আছি। একদিন বৈকালে কোনও বিশেষ কাজে একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। দুপুরে আহার করার পর একটু বিশ্রাম করার ইচ্ছা হ'ল। সামনে একটি ঘড়ি রেখে শয়ন করলাম। সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্ন দেখলাম। স্বপ্নটি বেশ বড ছিল। সারাজীবনব্যাপী জাগ্রত অবস্থায় ঘটনাবলী ছিল ঐ স্বপ্নের বিষয়বস্তু; ঘুম ভাঙতেই মনে হ'ল বহু সময় নষ্ট করেছি। কিন্তু দেখে বিস্মিত হ'লাম যে একমিনিটও গত হয় নাই। নিশ্চয়ই আপনাদের অনেকেরই এরূপ অভিজ্ঞতা হয়েছে। দেশ কাল বা অপর কিছু যা বাস্তব ব'লে আমরা বোধ করি, তার কোনও নিত্য অস্তিত্ব নাই। আমরা বর্তমানে জীবনের স্বপ্ন দেখছি, দেহের বিনাশের পর অন্য আর এক স্বপ্ন দেখব, কিন্তু যিনি স্বপ্ন দেখছেন তিনি চির-বিদ্যমান--আত্মা একইরূপ থাকেন।

আত্মার অস্তিত্ব কেউ অস্বীকার করেন না। সোঽহং—আমি সেই এক, আমি অনন্ত, আমি অদ্বিতীয়। আমি অস্তি নাস্তি দুয়েরই অতীত। কাল, দেশ, কারণের আমি অতীত। আপেক্ষিক পরিবেশ যদি স্বীকার করি, অতীতে আমাদের সৃষ্টি হয়েছিল, তা হ'লে কোন না কোন আকারে অতীতে আমাদের অস্তিত্ব ছিল। যদি অতীতে আমাদের (আত্মার) বিনাশ না হ'য়ে থাকে, ভবিষ্যতে আমাদের বিনাশ সম্ভব নয়। মৃত্যুভয়ই মনকে চঞ্চল করে। যখন আমরা জানি বা বিশ্বাস করি যে আত্মার মৃত্যু অসম্ভব এবং যখন আমরা ক্ষণস্থায়ী দেহের প্রতি আসক্ত না হই, তখনই আমরা নিজদিগকে মুক্ত করি ও উপলব্ধি করি— আত্মা অবিনশ্বর। এর দ্বারাই পাওয়া যায় মনের স্থৈর্য, ফলে শান্তি। একেই বলা যেতে পারে—অতীত ও ভবিষ্যতের চিন্তাশূন্য হ'য়ে বর্তমানে বাস করা।

আর যদি আমরা মনেই করি যে, দেহের পাঞ্চভৌতিক বিশেষ যোগাযোগের ফলে আমাদের আমি-বোধ জাগছে এবং মৃত্যুর পর তার অস্তিত্ব থাকবে না, সে ক্ষেত্রেও একদিন সেই নিশ্চিত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার জন্য আমাদের সাহসের সহিত প্রস্তুত হ'তে হবে। মৃত্যুভয়কে জীবনে চুপিসারেও আসতে দেওয়া হবে না। ভীরু বহুবার মরে কিন্তু সাহসী মরে মাত্র একবার।

যাঁহারা ভাবপ্রবণ, তাঁরাও যদি সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী জগৎস্রষ্টা ঈশ্বরের কল্পনা দ্বারা তাঁর হাতে সব ছেড়ে দিয়ে বিশ্বমনের অর্থাৎ ঈশ্বরের ইচ্ছায় (নিজের ইচ্ছায় নয়) সমস্ত কর্ম ক'রে যান, তবে এই মৃত্যুভয় হ'তে মুক্ত হ'য়ে শান্তি লাভ করতে পারবেন।

মানবগোষ্ঠীর শতকরা নব্বুই জনই ভাবপ্রবণ। তাই ভগবান-বা শান্তি-লাভের এইটাই সহজতম পথ। এর দ্বারা আমরা ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হ'তে পারি, বাসনার ঊর্ধ্বে উঠতে পারি এবং পরিশেষে ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে সর্বজনীন ইচ্ছার সহিত একীভূত করতে পারি। যদি সর্বশক্তিমান ভগবান তাঁর প্রাণিজগৎকে সৃষ্টি ক'রে থাকেন, তিনি কি তাদের দেখা-শোনার ভার নিতে সমর্থ নন? তাঁর ইচ্ছা নিশ্চয়ই পূর্ণ হবে। ব্যক্তিগত ইচ্ছা ভগবদিচ্ছার বিরোধী হ'লে কখনই তা পূর্ণ হয় না। তবে কেন আমরা তাঁর বিরোধিতা করি? তাঁর

ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। আমরা যেন স্থির হ'তে পারি, শান্তিলাভ করতে পারি।

প্রশ্ন হ'তে পারে, যাঁরা পরা শান্তি লাভ করেছেন, তাঁদের চেনা যায় কি দেখে? বাহিরের কোনও চিহ্ন দ্বারা ঐ সব ব্যক্তিকে চেনা বড় কঠিন। এইসব ব্যক্তি বিভিন্ন রকমের হন। কেউ বালকবৎ আচরণ করেন, কেউ উন্মাদবৎ, কেউ বা রাজার ন্যায় আচরণ ক'রে থাকেন। তত্ত্বদর্শী পুরুষ তাঁদের সংস্রবে এলেই চিনতে পারেন। নিম্নশ্রেণীর শিশুদের পক্ষে উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তিগণের জীবনযাপনের অবস্থা সম্বন্ধে যেমন কেবল কিঞ্চিৎ অনুমান করা ছাড়া কিছু ধারণা করা সম্ভব নয়, তেমনি যাঁরা নাম, যশ ও অর্থের আকাঙ্ক্ষায় লিপ্ত তাঁরা এই ঈশ্বর-প্রতিম ব্যক্তিদের বুঝতে পারেন না। এই ঈশ্বরতুল্য ব্যক্তিগণকে জানতে হ'লে আগে আমাদের খানিকটা উন্নত হওয়া আবশ্যক।

আর একটি কথা ব'লেই আমার বক্তব্য শেষ করছি,—সদ্ব্যবহারে আদর্শ মানব আনন্দ বোধ করেন না বা অসদ্ব্যবহারে দুঃখবোধও করেন না; বর্তমান নিয়ে তিনি বাস করেন; তাঁর অতীতের চিন্তা নেই, ভবিষ্যতেরও চিন্তা নেই; জীবনকে তিনি রক্ষাও করতে চান না; 'প্রজ্ঞায়', 'আনন্দে', 'শান্তিতে' তিনি অবস্থান করেন।

আগমনী

শ্রীঅক্রূরচন্দ্র ধর

হেরো গিরিবর কী সে মনোহর আকাশে আলোর খেলা,
বাতাসে সরসপরশমাধুরী বনে সবুজের মেলা!
শরতের মাঠ, গ্রাম, পথ, ঘাট রূপে রসে ভরপূর,
শাখায় শাখায় অলিগুঞ্জন, ভোম্‌রার গীতিসুর!
ফুলে ফুলে ভরা বন উপবন, নদী ভরা কূলে কূলে,
ভাবী ফসলের স্বপনোল্লাসে ধানক্ষেত উঠে দুলে!
দুর্দম ঘোর শাওন মেঘের উদ্ধত পরিহাস
বিদ্যুৎ জ্বালা নৃত্যচপল-চরণে করিয়া নাশ
গগনে অযুত তারকাবলীর সুষমাভূষিতকায়
এসে থাকে যদি "সত্য ও শিব" মুক্ত এ জোছনায়—
সারা বরষার শবসাধনার ফল বরাভয় হাতে
শিশিরকণার আল্পনা-আঁকা ধরণীর অঙিনাতে
"সুন্দর" যদি এসে থাকে, যদি "শঙ্কর" এসে থাকে,
উমাও আসিবে শান্ত অমল শুভ্র মেঘের ডাকে—
সরসীর জলে কুমুদে কমলে বিহগ-কাকলি মাঝে
পবন-স্বননে ঐ শোনো তারি আগমনীসুর বাজে।

মৃত্যু ও অমৃতত্ব

শ্রীমতী শেফালিকা দেবী

বকরূপী ধর্ম যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন —"এই জগতে সবচেয়ে আশ্চর্য কি?"

যুধিষ্ঠির উত্তর দিয়েছিলেন :

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্যমতঃপরম্॥

—প্রতিদিন জীবিত প্রাণিগণ মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে, কিন্তু অবশিষ্টগণ চিরদিনই বেঁচে থাকার ইচ্ছা পোষণ করে—এর চেয়ে আশ্চর্য আর কি হ'তে পারে?

সত্য কথা বলতে কি যদিও আমরা সকলেই মনে মনে জানি যে, এই জগতে আমরা চিরদিন থাকতে আসিনি তবু কার্যক্ষেত্রে অহরহ তার যে পরিচয় আমরা দিই, তার থেকে অন্ততঃ সহজে এটুকুই প্রমাণিত হয় যে, এই চিরন্তন সত্যটাকে আমরা মন প্রাণ দিয়ে কতখানি গ্রহণ করতে পেরেছি!

সৃষ্টির আদি যুগ থেকেই মানুষ বারংবার এই সত্যের সম্মুখীন হয়েছে। জলে, স্থলে, আকাশে, অন্তরীক্ষে, অরণ্যে, পর্বতে, শান্ত গৃহকোণে, উন্মুক্ত প্রান্তরে, প্রভাতে, সন্ধ্যায়, দিবসে, নিশীথে কত বিচিত্র রূপ ধরে এই সত্য তার সামনে এসেছে। কেউ তাকে দেখে ভয় পেয়েছে, কেউ নির্ভীক থেকেছে, কেউ তাকে কামনা করেছে, কেউ তাকে কামনা করেনি। সে নির্বিকার ভাবে সবার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। আদর, অনাদর, চাওয়া, না-চাওয়া কিছুকেই সে গ্রাহ্য করেনি। যে তাকে কামনা করেছে, তার কাছে সে যেমন আগেও আসেনি, তেমনি যে তাকে কামনা করেনি, তার কাছে সে দেরীতেও আসেনি। যথানির্দিষ্ট সময়ে সে এসে দাঁড়িয়েছে—স্থির, অচঞ্চল ভাবে। সুসময়, দুঃসময়, ঝঞ্ঝা, দুর্যোগ কিছুই তার আগমনকে রোধ করতে পারেনি।

এটা যেমন সত্য যে মানুষকে একদিন মৃত্যুর মুখোমুখি হ'তেই হবে, তেমনি এও সত্য যে, সে মৃত্যুকে চায় না। সাধারণ মানুষের মধ্যে এই ইচ্ছা অভিব্যক্ত হয়েছে অমর হওয়ার বাসনায় আর অসাধারণ মানুষদের মধ্যে এই ভাব ফুটে উঠেছে মৃত্যুজয়ের সাধনায়।

প্রিয়জন যখন শেষ শয্যায় শায়িত, মৃত্যু তার শীতল হাতের স্পর্শে যখন জীবনের স্পন্দন-টুকু ধীরে ধীরে থামিয়ে দিতে চাইছে, নিমীলিত নয়নে নেমে আসছে চিরনিদ্রার রেশ—চিকিৎসক যখন তাঁর অক্ষমতা জানিয়ে বিদায় নিয়েছেন—তখন মানুষ তার শক্তিহীনতা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে। আর্তনাদ, হাহাকার, অনুনয়, প্রার্থনা কিছুই তার গতি রোধ করতে পারে না। এই দুর্জয় শক্তির কাছে মানুষ বাধ্য হয় নতি স্বীকার করতে।

তারপর সেই প্রিয় দেহটিকে—যাকে কেন্দ্র ক'রে কত সুখ, আনন্দ, আশা, উচ্ছ্বাস আবর্তিত হয়েছিল, তাকে অগ্নির লেলিহান শিখা গ্রাস ক'রে নেয়। চোখের সামনে দেখতে দেখতে সব নিঃশেষিত হ'য়ে যায়। একটি প্রশ্নই তখন বেদনার্ত বুকের মাঝে মাথা কুটতে থাকে —এর কি কোন প্রতিকার নেই?

কিন্তু পরাজয় স্বীকার ক'রে বসে থাকা মানুষের ধর্ম নয়। সৃষ্ট হওয়ার পর থেকেই সে অবিরত সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতির বিরুদ্ধে। মৃত্যুজয়ের সাধনাও

তাই দু'পথে অগ্রসর হয়েছে। একদল চেয়েছে তাকে বাইরে থেকে রোধ করতে, আর একদল চেয়েছে তাকে জয় করতে, তার বশীভূত না হ'তে। প্রথম দল তাই এমন কিছু আবিষ্কার করতে চেয়েছে যা পান করলে বা গ্রহণ করলে এই দেহ নিয়ে সে চিরকাল থাকতে পারবে। তাই সে চায় অমৃত, চায় মৃতসঞ্জীবনী। বর্তমান যুগেও সে চেষ্টার বিরাম নেই। অন্যের রক্ত, অস্থি, দেহাংশ এমনকি হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত সংযোজন ক'রে মানবদেহের স্থায়িত্ব-বিধানের তথা মৃত্যুকে জয় করার প্রচেষ্টা চলছে। কিন্তু সে স্থায়িত্ব কতদিনের জন্য? একশ বৎসর, হাজার বৎসর, না লক্ষ বৎসর? মহাকালের ঘটিকাযন্ত্রে তার মান কতটুকু?

দ্বিতীয় দল সম্পূর্ণ বিপরীত পথ অবলম্বন করলেন। তাঁরা খুঁজলেন দেহাতীতকে। এই পথের পথিক যাঁরা তাঁদের মধ্যে আছেন উপনিষদ্-যুগের ঋষিগণ, আছেন বুদ্ধ, শঙ্কর, নানক, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি বহু সাধক ও সন্তগণ। তাঁরা আবিষ্কার করলেন—আসল মানুষের মৃত্যু নেই, মৃত্যু হয় তার দেহের। তেমনি নতুন দেহে আবার পুনর্জন্মও হয়—"জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যু-র্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।" জন্ম হলে মৃত্যু হবেই এবং মৃত্যুর পর আবার জন্ম হবে। এটা অপরিহার্য। সুতরাং মৃত্যুর হাত এড়াতে হ'লে জন্মের হাতও এড়াতে হবে। দুঃখ থেকে রেহাই পেতে গেলে সুখকেও ছাড়তে হবে। কিন্তু সাধারণ মানুষ এটা কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু যে একই জিনিসের এ-পিঠ ও-পিঠ তা আমাদের কিছুতেই বোধগম্য হয় না। প্রতিক্ষণেই আমরা সুখ চাই, কিন্তু দুঃখকে বাদ দিয়ে; জীবনকে কামনা করি, কিন্তু মৃত্যুকে বাদ দিয়ে; যৌবনকে ভালবাসি, জরাকে নয়। সুখ, জীবন, যৌবন যে-দেহকে আশ্রয় ক'রে আছে, দুঃখ জরা মৃত্যুরও আশ্রয় স্থান যে সেই দেহই—এটা আমরা ভুলে যাই। তাই দ্বিতীয় দল বললেন, যদি সত্য সত্যই মানুষ মৃত্যুকে অতিক্রম করতে চায় তবে তাকে এমন কিছু হ'তে হবে যা দেহাতীত, যার জন্ম মৃত্যু জরাদি কিছুই নেই। যা শাশ্বত, যা অবিকারী, একমাত্র তা-ই মৃত্যুহীন হ'তে পারে। এই অবস্থা লাভ করলেই মানুষ—"জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে।"

কিন্তু পথ কি? কঃ পন্থাঃ? "মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ"—মহাপুরুষগণ যে পথ অবলম্বন করেছেন তাই পথ। সুতরাং মানুষ যদি মৃত্যুকে জয় করতে চায় তবে তাকে কান পেতে শুনতে হবে সেই মৃত্যুঞ্জয়ী ঋষির উদাত্ত আহ্বান—

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"

হে মানবগণ, তোমরা অমৃতের পুত্র, তোমরা মৃত্যুহীন; তোমরা এবং সেই দিব্য-ধামবাসী সকলেই শোন (দুঃখ-শোক-মৃত্যু-অজ্ঞানরূপ) অন্ধকারের পরপারে যে সূর্যের মতো ভাস্বর পুরুষ রয়েছেন তাঁকে আমি জেনেছি। একমাত্র তাঁকে জানলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়—এ ছাড়া আর কোন পথ নেই—কোন পথ নেই।

এই পুরুষকে জানা ও আমরা আসলে কি তা জানা একই কথা, কারণ অবিনাশী তিনিই আমাদের স্বরূপ—"ব্রহ্মাদ্বয়মস্ম্যহম্।"

স্বামী বিবেকানন্দ ও আধ্যাত্মিক সংহতি*

স্বামী নির্বেদানন্দ

ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করা

জীবনের শ্রেষ্ঠাংশের তিন বছরেরও বেশী সময় বিবেকানন্দ আমেরিকা ও ইউরোপে কাটিয়েছিলেন। গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী জগতে প্রচার করার জন্য এবং সেই সঙ্গে তাঁর প্রিয় জন্মভূমিকে জগৎসভায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার কাজে পাশ্চাত্য যা কিছু দিতে পারে তা আহরণ করে নিয়ে আসার জন্য বিদেশে অশেষ শ্রমসাধ্য প্রচেষ্টার ফলে তাঁর শরীর অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। হিন্দু-ধর্মের মহার্ঘ অবদানের সঙ্গে তিনি হাজার হাজার পাশ্চাত্যবাসীর পরিচয় ঘটিয়েছিলেন এবং এভাবে তাদের সসম্ভ্রম দৃষ্টিপথে ভারতকে তুলে ধরেছিলেন। তাছাড়া তিনি পাশ্চাত্যবাসীর মনে এই বিশ্বাস জাগিয়ে দিয়েছিলেন যে, আধুনিক যুগে সর্বজনীন ধর্মের একান্ত প্রয়োজন রয়েছে এবং সব ধর্মের মধ্যেই এই সর্বজনীন ভাব নিহিত আছে; ধর্মগুলির মূল অংশের দিকে তাকালেই আমরা তা দেখতে পাব। আমাদের সকলকেই ধর্মের এই মূল অংশের প্রতি নিবদ্ধ-দৃষ্টি হতে হবে। পাশ্চাত্যবাসীদের তিনি সজাগ করে দিয়েছিলেন যে, আজ সকলকে সাম্প্রদায়িকতার সীমারেখা অতিক্রম করে এসে ধর্মের সর্বজনীনতার এই মহান আদর্শ উপলব্ধি করতেই হবে। জগতের প্রাচীনতম শাস্ত্রগ্রন্থ বেদের অন্তর্নিহিত হিন্দু-বিশ্বাসের সঙ্গে তিনি তাঁদের পরিচিত করে দেন। হিন্দু-ধর্ম-বিশ্বাসের নৈর্ব্যক্তিক শিক্ষার কথা, তার সর্বজনীন বাণীর উদারতার কথা, একই ভগবানকে অদ্বৈত বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিভিন্নভাবে প্রকাশ করার কথা তিনি তাঁদের কাছে বিবৃত করেছিলেন। হিন্দুধর্মে মানুষের সর্ববিধ রুচি প্রকৃতি ও সামর্থ্যের উপযোগী বহুবিধ সাধনপ্রণালী আছে, যেগুলিকে প্রধানতঃ জ্ঞানযোগ, রাজযোগ, কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ—এই চারিটি মূলভাগে বিভক্ত করা যায়, সে-সব সাধনপ্রণালীর কথাও তিনি বিশদভাবে বলেছিলেন; *কর্ম ও পুনর্জন্মবাদের* কথা তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন; আর বুঝিয়েছিলেন হিন্দুমতানুসারে কিভাবে পরব্রহ্মরূপ চরমসত্যের সঙ্গে নিজের অভেদত্ব উপলব্ধি করে মানুষ মুক্ত হয়ে যেতে পারে। কি কারণে হিন্দুদের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী যুক্তির তীক্ষ্ণতম বিশ্লেষণও সহ্য করতে পারে এবং কেনই বা বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত তথ্যের সঙ্গে কখনো তার কোন সংঘর্ষই বাধে না, সেকথাও যুক্তিবিশ্বাস-সহায়ে তিনি সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। সর্বোপরি, বেদান্তের উদার বিশাল বাণীর মধ্যে সব ধর্মেরই বিজ্ঞান যে নিহিত রয়েছে, একথা জোর দিয়ে বলেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, বেদান্তকে অবলম্বন ক'রে সর্বধর্মের অন্তর্নিহিত মূলগত ঐক্য জগৎ অনুভব করতে পারবে এবং ধর্মের এই সর্বজনীনতারূপ অনবদ্য দৃঢ় ভিত্তির ওপর সারা পৃথিবীর মানুষই মিলিত হয়ে দাঁড়াতে পারবে। এ সত্যটিও তিনি তাঁদের কাছে প্রকট করেছিলেন যে, হিন্দুধর্মের নিকট এমন একটি স্বর্ণময় সূত্র আছে যা দিয়ে কোনটিকে খর্ব বা অঙ্গহীন না করেও সে জগতের বিভিন্ন ধর্মমতগুলিকে একসঙ্গে গেঁথে দিতে পারে।

---

* লেখকের মূলগ্রন্থ Sri Ramakrishna and Spiritual Renaissance হইতে অনূদিত—সঃ

তিনি বুঝিয়েছিলেন, জীবন ও অস্তিত্বের মূল সত্য সম্বন্ধে উপনিষদের ঋষিদের যে সিদ্ধান্ত, তার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার কোন স্থান নেই। সমালোচনামূলক যুক্তির বিরোধিতা কাটিয়ে নিজ নিজ ধর্মে বিশ্বাস আনার জন্য এবং অপর ধর্মমতগুলিকে উদার দৃষ্টিতে দেখতে শেখার জন্য মানবজাতির সকল শ্রেণীর লোকই বেদান্তকে গ্রহণ করে আপনার করে নিতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর গভীর ও সুদূরপ্রসারী উপলব্ধি-সহায়ে এ সত্যটি বহুপূর্বে আবিষ্কার করে-ছিলেন; গুরুর সেই চরম আবিষ্কারের কথাই তাঁর যোগ্য লীলাসহচর জগৎকে সিংহগর্জনে শুনিয়ে গেছেন। স্বামীজীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, উপনিষদের সু-উচ্চ উদার বাণীর পুনরুজ্জীবনই হিন্দু-পুনর্জাগরণ নিয়ে আসবে, আর সেই সঙ্গে জগতের সব ধর্মকেই একটা দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে বন্ধুত্বসূত্রে একত্রবদ্ধ করবে। সে-জন্য স্বামীজীর মতে হিন্দু-পুনর্জাগরণই হল বিশ্বজনীন ধর্মের শুভাগমন-বার্তাবাহী অগ্রদূত।

গুরুর ও নিজের উপলব্ধির আলোক-সম্পাতে উদ্ভাসিত হিন্দুশাস্ত্র হতে স্বামীজী ধর্মসম্বন্ধে এক অতি উচ্চাঙ্গের দৃষ্টিভঙ্গী আহরণ করে এনেছিলেন, যা আধুনিক যুগের বিদ্বৎ-সমাজের চাহিদার সর্বথা অনুকূল। তাঁর কথা শুনে পাশ্চাত্য জগৎ ধর্মকে নতুন এক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে শিখেছে। "মানুষের অন্তরে পূর্ব হতেই নিহিত দেবত্বের বিকাশের নামই ধর্ম"—স্বামীজীর মুখে ধর্মের এই নতুন ব্যাখ্যা শুনে জনসাধারণের ধর্মবিরোধী মনোভাব নিশ্চয়ই কেটে গিয়েছিল। স্বামীজীর মতে ধর্ম হচ্ছে মানুষের অভ্যন্তর হতে উদ্ভূত একটা উন্নতি, যা মানুষকে ক্রমোন্নত করতে করতে এগিয়ে নিয়ে ক্রমবিবর্তনের শেষ ধাপে পৌঁছে দেয়, যেখানে পৌঁছে মানুষ তার পূর্ণত্ব সম্বন্ধে সব কল্পনার ও পরিপূর্ণ মুক্তির রূপ নিজেরই অন্তরে প্রত্যক্ষ করে। সে তখন দেখে, যে-স্বর্গরাজ্য সে আবিষ্কার করে ফেলেছে, তা চিরদিন তার অন্তরেই বিদ্যমান ছিল। কোন-কিছুর ক্রমবিকাশ বললেই বোঝা যায়, সেটা তারই মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল। কাজেই ক্রমবিবর্তিত মানুষের পূর্ণত্বও নিশ্চয়ই তার অন্তরেই বীজাকারে বর্তমান থাকে। মানুষ তার সমস্ত চিন্তার ভেতর দিয়ে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এই পূর্ণত্বকে বিকশিত করবার জন্যই চেষ্টা করে চলে। মানুষ যখন নিজ প্রকৃতিকে জয় করে ফেলে তখনই সে পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়; 'স্বর্গবাসী পিতা' যতখানি পূর্ণ, সে তখন ততখানিই পূর্ণ হয়। তখন সে প্রত্যক্ষ করে যে প্রকৃতির নিত্যমুক্ত নিয়ন্তা এবং পূর্ণতার ও চিরমুক্তির মূর্তবিগ্রহ ভগবানই হচ্ছেন তার নিজের স্বরূপ। এ অবস্থায় যে-মানুষ পৌঁছায় তাকেই ধার্মিক বলা চলে। সেইজন্যই স্বামীজী বলেছেন, "ধর্ম পুস্তকেও নেই, বুদ্ধির ধারণাতেও নেই, যুক্তিতেও নেই; যুক্তি, কল্পিত মতবাদ, প্রমাণ, শাস্ত্রোপাদেশ, গ্রন্থ, ধর্মাচার-অনুষ্ঠান—এ সবই হচ্ছে ধর্মের সহায়ক মাত্র। আসল ধর্ম রয়েছে উপলব্ধিতে।" সেজন্য ধর্মের কথা বলতে গিয়ে স্বামীজী শুধু শাস্ত্রপ্রমাণ, প্রথা ও অনুশাসনের ওপর জোর দেননি, অতিপ্রাকৃতিকতা টেনে এনে বিষয়টাকে ঘোলাটে করেও তোলেননি· বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বা প্রত্যক্ষানুসারী সাধারণ বুদ্ধিতে যে বিষয়- ও ভাবগুলির সমর্থন পাওয়া যায় না, যুক্তিপ্রমাণ ছাড়াই সেগুলিকে মেনে নেবার কথা তিনি কাউকেই বলেননি। ধর্মকে তিনি "মানবজীবনের অতি সহজ ও প্রকৃতিগত স্বভাব" বলে অভিহিত করেছেন। ধর্মসম্বন্ধে এরূপ যুক্তিসম্মত ধারণা চিকাগোর জন হেনস হোমস-এর (John Haynes

Holmes) এই আধুনিক চিন্তাধারার সঙ্গে মিলে যায়: "ধর্ম হচ্ছে মানবজীবনের একটি সহজ ও প্রকৃতিগত স্বভাব। ধর্মকে অতিপ্রাকৃতিক বিষয় বলে অভিহিত করলে ধর্মের কিছুই বলা হল না। ধর্মকে চাতুরী বা কল্পনা-প্রসূত কুসংস্কারও বলা যায় না। ধর্ম হচ্ছে মানবপ্রকৃতির উচ্চতর স্তরের ক্রিয়া-কলাপের নিছক অনুভূতি মাত্র।"

এর পর স্বামীজী দেখিয়েছিলেন যে, ধর্ম মানুষের প্রকৃতিগত ও স্বাভাবিক অঙ্গমাত্রই নয়, ধর্ম হচ্ছে মানবজীবনের একটি সর্বজনীন ঘটনা। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, পূর্ণত্বলাভ করার জন্য এবং অনন্ত জীবন, আনন্দ ও জ্ঞান লাভ করার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে মানুষের মজ্জাগত সংস্কার। মানুষের প্রকৃতিই তাকে সর্ববিধ বন্ধনের হাত থেকে মুক্তি লাভ করার অবিরাম প্রচেষ্টায় প্রণোদিত করে। মানুষের অন্তঃপ্রকৃতি মানুষকে জগতের অনিত্যতা সম্বন্ধে চিরদিন চোখ বুজে থাকতে দেয় না; জড় প্রকৃতির অনিত্যতা বোধ হওয়া মাত্র নিজের নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ততা লাভের উদ্দেশ্যে একটা চির-অস্তিত্বের অবলম্বনভূমি খুঁজে বের করার জন্য তার ভেতর থেকে অনুপ্রেরণা জাগে। জগতে সবই ক্ষণস্থায়ী; কোন জাগতিক বস্তুর বিয়োগে হৃদয়ে যখন প্রচণ্ড আঘাত লাগে, মানুষ তখন এমন একটা বাস্তব অবলম্বন খুঁজে বের করার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে, যার সঙ্গে চিরদিন সে প্রেমের ডোরে আবদ্ধ হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু "সে-মানুষের কাছেও মৃত্যু আসে—সে-মানুষও প্রশ্ন করতে বাধ্য হয়, 'এ কি সত্য?' এই প্রশ্নের সঙ্গেই ধর্মের আরম্ভ, আর এর উত্তরে তার সমাপ্তি।" সত্য, চিরন্তন, পূর্ণ ও চিরমুক্ত আদর্শের জন্য—অর্থাৎ ভগবানের জন্য—যে সর্বজনীন অন্বেষণ, তার উদ্ভব হয় মানুষের অন্তঃপ্রকৃতিগত ধর্মানুপ্রেরণা হতেই। এই জন্যই স্বামীজী বলেছেন, "আমার বিশ্বাস, মানুষের গঠনের ভেতরেই ধর্মভাব ওতপ্রোত রয়েছে; এতদূর পর্যন্ত বলা যেতে পারে যে, যতক্ষণ মানুষ দেহ-মন ত্যাগ না করতে পারছে, যতক্ষণ সে চিন্তা ও জীবন ত্যাগ না করতে পারছে, ততক্ষণ পর্যন্ত ধর্ম ত্যাগ করা তার পক্ষে অসম্ভব।" স্বামীজী ধর্মকে মনুষ্যজীবনের স্বাভাবিক ও সবজনীন ঘটনা বলে নিজ অভিমত প্রকাশ করায় পাশ্চাত্য জগৎ তাঁর এই ধারণার মধ্যে সম্পূর্ণ মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীর সন্ধান লাভ করেছিল। পাশ্চাত্যবাসীদের তৎকালীন রুচির সঙ্গে তা অদ্ভুতভাবে খাপ খেয়েও গিয়েছিল। স্বামীজীর ভাবেরই প্রতিধ্বনি তুলে হ্যাভলক এলিস (Havelock Ellis) ধর্মকে ব্যাখ্যাও করেছেন "আধ্যাত্মিক ক্রিয়ারূপে, যা প্রায় মানসিক ক্রিয়ারই মতো।"

স্বামীজী দেখিয়েছিলেন, "বিজ্ঞান ও আলোচনার বিষয়রূপে ধর্ম মানবমনের পক্ষে সব চেয়ে বড় ও সবচেয়ে বেশী স্বাস্থ্যকর অনুশীলন। অনন্তের জন্য এই অন্বেষণ, অসীমকে ধরা-ছোঁয়ার জন্য এই সংগ্রাম, ইন্দ্রিয়ের সীমা লঙ্ঘন করে জড়কে অতিক্রম করার এবং মানুষের আধ্যাত্মিক স্বরূপকে অভিব্যক্ত করার এই প্রচেষ্টা, অনন্তের সঙ্গে নিজের সত্তাকে মিলিয়ে দেবার এই প্রয়াস—এ-সবই হচ্ছে মানুষের সর্বাধিক কল্যাণকর, সর্বোচ্চ গৌরবময় প্রয়াস।"

ধর্মকে স্বাভাবিক, সর্বজনীন, স্বাস্থ্যকর ও উন্নতিবিধায়ক ক্রিয়ারূপে অভিহিত করা ছাড়াও স্বামীজী একে সর্বশ্রেষ্ঠ সুখের আকর বলেও ঘোষণা করে গেছেন। তিনি বলেছেন,

"দেহ-গঠন যত নিম্নস্তরের হয়, প্রাণীর ইন্দ্রিয়-সুখের অনুভূতি হয় তত বেশী তীব্র। একটা কুকুর বা একটা নেকড়ে যতটা আনন্দ নিয়ে খায়, খুব কম মানুষই সেভাবে খেতে পারে। কিন্তু কুকুর বা নেকড়ের সব সুখই যেন ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কেন্দ্রীভূত। সব জাতিরই নিম্নস্তরের লোকেরা ইন্দ্রিয়সুখ নিয়েই মেতে থাকে, আর শিক্ষিত ও সংস্কৃতিমান ব্যক্তিরা আনন্দের সন্ধান পায় চিন্তারাজ্য ও দর্শনবিদ্যার মধ্যে, কলাবিদ্যা ও বিজ্ঞানের অনুশীলনের মধ্যে। আধ্যাত্মিকতা আরো উচ্চস্তরের; বিষয়টি অসীম বলে তার স্তরও সর্বোচ্চ, এবং যাদের ধারণা করার শক্তি আছে তাদের কাছে এর আনন্দও সর্বোত্তম। মানুষ আনন্দ চায়, কাজেই উপযোগিতার দিক থেকেও তার ধর্মচর্চা করা উচিত, কারণ যত রকম আনন্দ আছে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ আনন্দ রয়েছে এখানে।"

তবু উপযোগিতার নিক্তিতে ওজন করে ধর্মের মূল্য নির্ধারণ করার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। তিনি শিখিয়েছিলেন, চিরন্তন সত্যের শ্লাঘ্য অন্বেষণরূপে ধর্ম নিজেই নিজের পুরস্কার। উপযোগিতা দেখে যাঁরা মূল্য নির্ধারণ করেন তাঁদের তিনি প্রতিবাদ জানিয়েছেন এই বলে, "প্রয়োজনসিদ্ধি ও অর্থের মান দিয়ে সত্যের বিচার করা উচিত—এ প্রশ্ন তোলার কী অধিকার আছে মানুষের? যদি ধরা যায় ধর্ম দিয়ে আমাদের কোন প্রয়োজনই সিদ্ধ হবে না, তাতে ধর্মের সত্যতা কিছু কমবে কি? প্রয়োজন-সিদ্ধি সত্যের মাপকাঠি নয়।" তবু সব বিষয়েই যাঁরা 'টাকা-আনা-পাই' হিসেব করে চলেন, তাঁদের পরিতৃপ্তির জন্য স্বামীজী দেখিয়েছেন, ধর্মচর্চা বা পূর্ণতালাভের জন্য নিয়মিত প্রচেষ্টা কিভাবে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের সহায়ক হয় এবং মানুষকে অসীম শক্তি ও আনন্দের অধিকারী করে তোলে। আরো একটু বেশী এগিয়ে গিয়ে তিনি বলেছেন যে শুধু ব্যষ্টি নয়, ব্যষ্টির সমষ্টিরূপ সমাজও ধর্মের দ্বারা উপকৃত হয়। কারণ দেখা যায়, সমাজের প্রাণের পুষ্টিসাধনের ক্ষেত্রে ধর্ম সবচেয়ে বেশী শক্তিমান ও বেশী হিতকর। দৃঢ়কণ্ঠে তিনি বলে গেছেন, "মানবজাতির ভাগ্যনির্ধারণকল্পে যেসব শক্তি ক্রিয়াশীল হয়েছে বা এখনো হচ্ছে তাদের মধ্যে কোনটিই, যে-শক্তির বিকাশকে আমরা ধর্ম বলি তার চেয়ে বেশী শক্তিমান নিশ্চয়ই নয়। এই অদ্ভুত শক্তিই সর্ববিধ সামাজিক সঙ্ঘবদ্ধতার পটভূমি, পরস্পর মিলিত হয়ে থাকার জন্য যা কিছু প্রাণের বিকাশ মানুষের মধ্যে দেখা গেছে, তারও উদ্ভব হয়েছে এই শক্তি হতেই।…মানুষের মনে প্রেরণা জাগাবার জন্য সব চেয়ে বেশী গতিসঞ্চারী শক্তি এটি। আধ্যাত্মিক আদর্শ আমাদের যে-পরিমাণ শক্তি দিতে পারে, সে-পরিমাণ শক্তি আর কোন আদর্শই দিতে পারে না। মানুষের ইতিহাস প্রথম থেকেই এর সাক্ষ্য বহন করে আসছে; এ শক্তি এখনো প্রাণবন্ত হয়ে আছে। কেবল উপযোগিতার ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে মানুষ খুব সৎ ও নীতিপরায়ণ হতে পারে, একথা আমি অস্বীকার করছি না।…কিন্তু জগতে যাঁরা আলোড়ন তোলেন, যাঁরা জগতে আসেন আকর্ষণী-শক্তির একটা বিরাট আধার হয়ে, যাঁদের উদ্দাম ভাবধারা শত-শত সহস্র-সহস্র লোকের মনে প্রভাব বিস্তার করে, যাঁদের জীবনদীপের স্পর্শে অপরের জীবনেও আধ্যাত্মিকতার দীপ জ্বলে ওঠে,—সর্বত্র দেখা যায় এই ধরনের লোকের পটভূমি থাকে আধ্যাত্মিকতা। এঁদের প্রেরণা আসে ধর্ম থেকে। যে অনন্ত শক্তি জন্ম হতেই প্রতিটি মানুষের প্রকৃতিগত,

সে শক্তিকে উপলব্ধি করতে সর্বাধিক প্রেরণা দেয় ধর্ম; কাজেই ধর্মের বিচার এদিক থেকেই করা উচিত।" উইলিয়ম ইলেরী চ্যানিং (William Ellery Channing) এই-জাতীয় ভাব প্রকাশ করে বলেছেন, "মানুষের সব অভাবের মধ্যে পরমতম অভাব হচ্ছে ভগবানের অভাব। ভগবৎ-সজাগতা মানুষকে নৈতিক সাহস দিয়েছে; অন্যান্য সব তথ্য মানুষকে যা দিতে পেরেছে তা একত্র করলে যা হয়, ধর্ম আমাদের তার চেয়েও বেশী কর্মশক্তি, সহশক্তি ও দুঃখবরণ করার শক্তি দিয়েছে।" স্বর্গীয় রেভারেণ্ড জে. টি. সাণ্ডারল্যাণ্ড (Rev. J. T. Sunderland) এর বিপরীত দিকটা ফুটিয়ে তোলার মাধ্যমে স্বামীজীর কথাই সমর্থন করেছেন— "যদি কখনো এমন দিন আসে যখন সারা জগতের লোক ব্যাপকভাবে বিশ্বাস করতে থাকবে যে, অনন্ত মনের সঙ্গে সংযুক্ত কোন আধ্যাত্মিক বা ভাগবত সত্তা মানুষের নেই, অর্থাৎ আর একটু তলিয়ে বললে, ঈশ্বরের সন্তান সে নয়—তার অস্তিত্ব ফুটে উঠেছে একটা সহসা-সংঘটিত প্রাকৃতিক কারণে, সে একটা অতিমাত্রায় বুদ্ধিমান পশুমাত্র; তাহলে তার ফল কি হবে? মানবজাতি তার নিজের সম্বন্ধে ধারণাকে এতখানি নীচে টেনে নামালে যে আতঙ্কজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হবে, তার ফল ভয়ানক হয়ে উঠবে না কি? যেমন একটা দিক ধরা যাক—সমাজ, শিক্ষা, নীতি ও ধর্ম, এসব বিষয়ে মানুষের অগ্রগতি সে-ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় ব্যাহত হবে না কি? উন্নতির প্রতি তার আস্থা কমে যাবে না কি? যত দিন যাবে, ততই সে এই কথাটাই বলতে চাইবে না কি—'দুদিন পরে তো মরেই যাবো, কাজেই খেয়ে-দেয়ে স্ফূর্তি করা যাক'?"

মানবসমাজের সমষ্টিগত নিরাপত্তা ও সুখের জন্য ধর্মের যে অবশ্য-প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, সে বিষয়ে স্বামীজীর বদ্ধমূল বিশ্বাস ছিল। পাশ্চাত্য দেশ ধর্ম পরিত্যাগ করার দিকে ক্রমশঃ ঝুঁকছে দেখে ভয়ে শিউরে উঠেছিলেন তিনি। তাঁর ধারণা ছিল, ধর্মহীন সভ্যতা আর পালিশ-করা পাশবিকতা একই জিনিস; সে সভ্যতার ফলে অতীতের লুপ্ত বিশাল সাম্রাজ্যগুলির মতো সমগ্র সমাজটাই নিশ্চিত একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। আতঙ্কে তিনি বলেই ফেলেছিলেন যে, আধ্যাত্মিকতার প্রতি ক্রমশঃ উদাসীন হয়ে গোটা ইউরোপটা যেন একটা আগ্নেয়গিরির মুখের ওপর এসে বসেছে, যে-কোন মুহূর্তে যার অগ্ন্যুৎপাত শুরু হতে পারে। গত প্রথম মহাযুদ্ধ এবং সারা ইউরোপে আর একটা বীভৎসতর যুদ্ধের আয়োজন দেখে স্বামীজীর এ আশঙ্কা যে কত সত্য তা বোঝা যায়।* বর্তমান কালের ডঃ উইল ডুরাণ্ট-এর (Dr. Will Durant) অকপট করুণ স্বীকৃতিতে স্বামীজীর ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা ফুটে উঠেছে: "কেবলমাত্র পার্থিব বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল একটা নৈতিক পদ্ধতির সাহায্যে সামাজিক শৃঙ্খলা ও জাতির প্রাণশক্তি ঠিক রাখা সম্ভব কি না, তা দেখার জন্য আমরা আমেরিকায় (যে আমেরিকা ভগবান ও ধর্মকে ত্যাগ করেছে) একটা পরীক্ষায় নিযুক্ত হয়েছি। এথেন্স-এ এবং (খৃঃ ১৪শ—১৬শ শতাব্দীর) পুনরভ্যুদীয়মান ইটালীতে এ পরীক্ষা ব্যর্থ হয়েছে।...... এর ফলে ইতোমধ্যেই সাহিত্য-নীতি ও পৌর-রাজনীতিতে আমেরিকার 'এ্যাংলো-স্যাক্সন' নেতৃত্বের গোপন সর্বনাশ সাধিত হয়েছে; পরীক্ষার কাজ আরও এগিয়ে গেলে (যদি এগিয়ে যায়) বোধ হয় পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকার সব মানুষকেই তা দুর্বল করে ফেলবে। শেষকালে একটা নিঃশেষিত আগ্নেয়গিরিতে পরিণত হব আমরা।"

(ক্রমশঃ)

---

* রচনাটি ১৩৩৭ খৃষ্টাব্দের।

শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য-কৃত 'বেদান্তকেশরী'

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপক বটুকনাথ ভট্টাচার্য

বিষয়-প্রকাশ সূর্য আদিতে না হয়,
তাহে কেন উপজিবে অন্তরে বিস্ময় ?
সূর্য হতে না সম্ভবে সূর্যের প্রতীতি,
চন্দ্রবিম্ব হতে কিংবা চন্দ্রের প্রত্যয়,
অগ্নি হতে নাহি হয় অগ্নির প্রকাশ।
রবি আদি স্ফুরে নেত্রে চিৎ-এর প্রেরণে,
আত্মজ্যোতি পুরুষের অত্যদ্ভুত তেজ
দীপ্ত করে ইন্দ্রিয়ের প্রভু দেবগণে ॥ ৮৭ ॥

প্রাণের সহায়ে জীব বারি করে পান,
বার বার অন্ন তাহে করে সে ভোজন,
প্রাণবলে প্রজ্বলিত বিলম্বে ত্বরিতে,
জীর্ণ করে উহা জঠরের হুতাশন,
সর্বাঙ্গের নাড়ীপথে রসের সঞ্চারে
ব্যান-বায়ু অনন্তর প্রাণ তৃপ্ত করে,
সার-হীন করি সব ভুক্ত বস্তুচয়
দেহের বাহিরে আনি অপান নিঃসরে ॥ ৮৮ ॥

হেন পঞ্চবৃত্তি-সমন্বিত প্রাণবায়ু
যতেক জীবন-কার্য প্রতি-দেহ-গত
ইন্দ্রিয়গণের প্রভু হয়ে প্রত্যক্ষতঃ
নির্বিরোধে সম্পাদন করিছে সতত—
যার চিদ্‌ঘন সত্তা সনে সম্মিলিত,
সেই আমি হই সাক্ষী এই নিখিলের,
প্রাণের ইহাই প্রাণবস্তু সর্বব্যাপী,
যতেক দেহীর ইহা নেত্র নয়নের ॥ ৮৯ ॥

চিদ্‌ঘন একক যা হলে প্রকাশিত,
জল-বায়ু-রবি-আদি, ক্ষিতি, নিশাপতি
তারি তেজে ভিন্ন ভিন্ন গতি লভি হয়
উদ্ভাসিত, আর করে তাহাতে বসতি—
বিদ্যুতের পুঞ্জ, অগ্নি বিবিধ অথবা
নক্ষত্র-বিস্তার সেই পরমেশে নারে
প্রকাশিতে—শান্তজ্যোতিঃ সীমাতীত কবি
অনাদি শাশ্বত যাহা জন্ম-মৃত্যু-পারে ॥ ৯০ ॥

'সেই ব্রহ্ম হই আমি' এই অনুভব
যদি কোন পুরুষের হয় সমুদিত,
সদ্‌গুরুদের কৃপাকটাক্ষের ক্ষণে
সুধাসিক্ত যাহা বিশ্বে হয় অতুলিত,
ভ্রমাচ্ছন্ন মন হতে জীবন্মুক্ত হয়
উত্তরি উপাধি সব অনাদি অশেষ
নাশিয়া সংশয় যত, সর্বোত্তম ধাম
অদ্বিতীয় নিত্যানন্দে করে সে প্রবেশ ॥ ৯১ ॥

নহি দেহ, ইন্দ্রিয়-নিচয় কিংবা মন
সুচঞ্চল, আমি নহি বুদ্ধি বিনশ্বর
কিংবা নহি প্রাণ আমি, জড়বস্তু যত
এ সকল নহি আমি, কিংবা তারি সম
অহঙ্কার নহি আমি। স্বজন বা ভূমি
গৃহ সুত অর্থ হতে অনেক অন্তর,
সকলের সাক্ষী আমি, প্রত্যগাত্মা, চিৎ
শুধু, নিখিলের অধিষ্ঠান শিবোপম ॥ ৯২ ॥

নীল পীত আদি অগণিত রূপ যাহা
দৃশ্য হয় নানাবিধ সুস্পষ্ট সতত,
এ সব দেখিছে চক্ষু কিন্তু অনুভবে
নানা নহে একরূপ হয় সে নয়ন,
দ্রষ্টা সেও দৃশ্য হয় যথা অন্তরের,
বিষয় আকারে বুদ্ধিবৃত্তি পরিণত—
আত্মা তার হয় সাক্ষী, আত্মা বিশ্বপ্রভু
দ্রষ্টা, দৃশ্য নহে, করে নিখিল দর্শন ॥ ৯৩ ॥

আঁধা অন্ধকারে রজ্জু অজ্ঞানের ফলে
দেখায় সহসা যথা ভুজঙ্গ ভীষণ।
আত্মার অজ্ঞানে তথা অতি দুঃখময়,
আপনাতে হয় জীববুদ্ধি-আরোপণ,
আপ্ত বাক্য শুনি সর্পভ্রম গেলে টুটে,
এক রজ্জু হয় জ্ঞান, আমি সেইমত
নহি জীব, আসে বোধ গুরু-উপদেশে,
নির্বিকার শিব আমি হই সাক্ষীভূত ॥ ৯৪ ॥

কি তোমার জ্যোতিঃ, বৎস? দিনমানে রবি,
রাত্রে হেরি চন্দ্র দীপ আদির প্রভায়।
হবে তাই, কিন্তু সূর্য দীপালোক আদি
হেরিবারে কিবা শুনি হয় জ্যোতিঃ তব?
চক্ষু জ্যোতিঃ। তার নিমীলনে থাকে কিবা?
রহে বুদ্ধি। বুদ্ধির প্রকাশে কি উপায়?
সেথা থাকি আমি। অতএব তুমি সেই
পরম আলোক। প্রভো! আমি তাই হব ॥৯৫॥

জীবন্মুক্ত জীব ইহ থাকে কিছুকাল,
দেহপিণ্ডে আর নাহি গণে আপনার,
প্রারব্ধ কর্মের যত দিন আছে ভোগ
অসঙ্গ বুদ্ধিতে তাহে করে ব্যবহার;
মমত্ব ও অহঙ্কারে মুক্ত, দ্বন্দ্বহীন,
নিত্যশুদ্ধ, নিত্যতৃপ্ত জানে আপনায়;
ব্রহ্মানন্দে মগ্ন, স্থিরমতি ও অচল,
সদা তার সর্বমোহ অবসান তায় ॥ ৯৬ ॥

জীবাত্মা ও ব্রহ্মে ভেদ বিদলিত করে
যে পুরুষ, সদা তার সমুদিত হয়
অন্তরেতে অতুলন পবিত্র পরম
বিজ্ঞান-স্বরূপ সত্তা স্বপ্রকাশময়;
সংসারের মূলহেতু যাহা সুবিদিত
তা হতেই সেই মায়া তার লয় পায়;
বিজ্ঞানের বিশদ-প্রকাশে একবার
নাশ হলে নাহি আসে মায়া পুনরায় ॥ ৯৭ ॥

অসৎ প্রপঞ্চ নানাবিধ প্রমাণের
বলে জগতের প্রতিভাস লুপ্ত হলে,
জ্ঞানী জন ত্যজে আস্থা, যথা পিয়ে জল
সুবাসিত নারিকেল ফল দেয় ফেলে,
সচ্চিদ্-আনন্দঘন ব্রহ্ম অদ্বিতীয়
তাঁহার অমৃত-স্বাদ হৃদিমাঝে ধরে,
শান্তচিত্ত আত্মজ্ঞানী, জানিয়া অসার
নিখিল জগৎ সেই হেতু পরিহরে ॥ ৯৮ ॥

ক্ষয় পায় সর্বকর্ম, গ্রন্থি হৃদয়ের
উদ্ভিন্ন হইয়া যায় তার সমুদয়,
পরব্রহ্ম সাক্ষাৎ করিলে ছিন্ন হয়
জন্ম মৃত্যু—পরিণামী সকল সংশয়
চিন্মাত্রস্বরূপ পরতত্ত্ব, গুণ-মল-লেশ
নাহি তাহে, তত্ত্বমসি বাক্যে নিরূপিত,
বিধিবাক্য-মন-আগোচর, নির্বিকার,
প্রত্যাগাত্মা, সর্বেশ্বর, ব্রহ্ম অভিহিত ॥ ৯৯ ॥

আদি মধ্য অবসানে জন্ম মৃত্যু ফল,
কর্ম যার হয় মূল, আকার সংসার,
জানিও বিশাল মহীরুহ, ভ্রান্তি দর্প,
শোক ও আহ্লাদ নানা পল্লব তাহার,
কাম ক্রোধ আদি বহুবিধ শাখা-যুত,
পুত্র পত্নী কন্যা পশু পক্ষীর আশ্রয়,
অনাসক্তি অসি দিয়া ছেদি সুবৃহৎ
হেন তরু, বাসুদেবে অর্পিবে হৃদয় ॥ ১০০ ॥

আমাতেই সমুদ্ভূত নিখিল সংসার,
আমাতে আবার উহা রহে অবস্থিত,
আমাতেই পাবে লয় তেমতি সকল;
সুতরাং ব্রহ্মবস্তু আমি সুনির্ণীত।
যাঁহার স্মরণমাত্রে যজ্ঞাদি সকল
শুভকর্ম অনুষ্ঠিত শাস্ত্রবিধিমত
সুসম্পূর্ণ সুনিশ্চিত হয়, সে-অচ্যুতে
পূর্ণানন্দে বারংবার হইনু প্রণত ॥ ১০১ ॥

আবেদন

পশ্চিমবঙ্গের বন্যাপীড়িত অঞ্চলে রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য

গত জুলাই মাস হইতে আরামবাগ মহকুমায় বন্যাপীড়িতদের সেবাকার্য চলিতেছে। প্রথমতঃ ২নং ব্লকের সমগ্র আটটি অঞ্চল লইয়া সেবাকার্য আরম্ভ হয়। পরে নিকটবর্তী ১নং ব্লকের দুটি অঞ্চল—থানাকুল ও রামমোহন—অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় এবং সেখানকার অধিবাসীদের সনির্বন্ধ অনুরোধে মিশনের কার্যক্ষেত্র বাড়াইয়া এই দুটি অঞ্চলেরও দায়িত্ব লইতে হইয়াছে। এই অঞ্চলগুলি একান্ত দুর্গম। অধিকাংশ স্থল এখনও জলমগ্ন, এজন্য নৌকার সাহায্য ছাড়া যাতায়াত সম্ভব নয়। বহু স্থানে নৌকা বা কোনপ্রকার যানবাহন চলে না। সুতরাং পায়ে হাঁটা ছাড়া গত্যন্তর নাই। সেবকরা বহু কষ্টে সর্বত্র সাহায্য পৌঁছাইবার সাধ্যমত প্রয়াস করিতেছেন। এই বিশাল এলাকায় মাসাধিক কাল কাজ করার জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন।

ইহা ব্যতীত আসামের কাছাড় জেলায় হাইলাকান্দি মহকুমাতে বন্যার্তদের সেবাকার্য জুলাই মাস হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সেখানেও মাসাধিক কাল কাজ চালাইতে হইবে।

উড়িষ্যার ঢেনকানল জেলার হিন্দোল মহকুমায় খরাত্রাণকার্য জুন মাস হইতে চলিতেছে। সেখানকার কাজ অক্টোবর মাস পর্যন্ত চলিবে।

এই তিন রাজ্যের বিশাল ক্ষেত্রে প্রয়োজনানুরূপ সেবাকার্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য সহৃদয় জনসাধারণের নিকট মুক্তহস্তে সাহায্যের আবেদন জানাইতেছি। নিম্নলিখিত ঠিকানাগুলিতে সাহায্য পাঠাইলে উহা কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে ; চেক 'রামকৃষ্ণ মিশন' (Ramakrishna Mission)—এই নামে লিখিবেন :

১। রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ কামারপুকুর, জেলা-হুগলী
২। রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা-হাওড়া
৩। উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৩
৪। রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিট্যুট অব কালচার, গোল পার্ক, কলিকাতা-২৯

৫ই আগস্ট, ১৯৬৮,
বেলুড় মঠ, হাওড়া

স্বামী গম্ভীরানন্দ
সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন

সমালোচনা

শ্রীম-দর্শন—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ শ্রীম-র কথামৃত (পঞ্চম ভাগ) : স্বামী নিত্যাত্মানন্দ। প্রকাশক : শ্রীসুরজিৎচন্দ্র দাস, জেনারেল প্রিণ্টার্স য্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা ১৩। পৃষ্ঠা ৩৩১+৮, মূল্য পাঁচ টাকা।

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'কার পরম ভক্ত শ্রীম (মাস্টার মহাশয় শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত সাধু ও ভক্তবৃন্দের সহিত অবসর-সময়ে ধর্মপ্রসঙ্গ করিতেন। স্বামী নিত্যাত্মানন্দ দীর্ঘকাল 'শ্রীম'র সঙ্গ করেন এবং এই সব আলাপ-আলোচনা তাঁহার দিনলিপিতে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। 'শ্রীম-দর্শন' সেই ডায়েরিরই মুদ্রিত রূপ। গ্রন্থকার শ্রীম-র নিকট হইতে ডায়েরি রাখিবার প্রণালী জানিয়া লইয়াছিলেন, তাই দেখা যায় তাঁহার গ্রন্থে কথামৃতেরই পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছে।

ইতঃপূর্বে চার খণ্ড শ্রীম-দর্শন প্রকাশিত হইয়া ভক্তগণের বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে। প্রথম খণ্ডে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা এবং দ্বিতীয় খণ্ডে যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ সন্ন্যাসী সন্তান ও গৃহস্থ ভক্তগণের অমর কথা পরিবেশিত হইয়াছে। তৃতীয় খণ্ডটিকে স্বয়ং কথামৃতকার কর্তৃক কথিত অমরগ্রন্থ শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণকথামৃতের বিজ্ঞানসম্মত অপূর্ব ভাষ্য বলা যাইতে পারে। চতুর্থ খণ্ডটি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনালোকে সমুদ্ভাসিত গীতা, উপনিষদ্, ভাগবত, পুরাণ, বাইবেল প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থের উদার ও অভিনব ব্যাখ্যা।

বর্তমান খণ্ডে পূর্বপ্রকাশিত খণ্ডগুলির বিষয়সমূহও আলোচিত হইয়াছে, কিন্তু সর্বাধিক জোর দেওয়া হইয়াছে উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্বের উপর। এবারের নূতন নৈবেদ্যের বৈশিষ্ট্য—শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনালোকে বেদের সার উপনিষদের মহাবাণী সহজ-সরল ভাবে আমাদের বুদ্ধিগ্রাহ্য করার প্রচেষ্টা। এখানে পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন - শ্রীম ঋষির ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া বেদমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনালোকে উপনিষদ্ ব্যাখ্যা করিতেছেন।

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' পরিবেশন করিয়া শ্রীম নিজে জনমানসে অমর হইয়া রহিয়াছেন এবং সংসারসন্তপ্ত নরনারীগণকে অমৃতত্ব-লাভের সন্ধান দিয়াছেন। 'শ্রীম-দর্শন' গ্রন্থগুলি ভক্ত-সমাজে অনেক স্থানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের ভাষ্যরূপে সমাদৃত হইতেছে। পূর্বখণ্ডগুলির ন্যায় বর্তমান খণ্ডটিও মানুষের মনে চরম-বস্তুলাভে প্রেরণা জাগাইবে, সন্দেহ নাই। পুস্তকখানির পরিচ্ছন্ন মুদ্রণ এবং বাঁধাই ইত্যাদির জন্য প্রকাশক ধন্যবাদার্হ।

সরল সচিত্র যোগব্যায়াম—যোগাচার্য ডাঃ শ্রীললিতকৃষ্ণ। মডেল পাবলিশিং হাউস, ২এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। পৃষ্ঠা ৬০, মূল্য—বোর্ড বাঁধাই ২'২০।

নীরোগ সুস্থ দেহ লাভ করিবার জন্য যোগ-ব্যায়ামের উপযোগিতা সর্বাধিক। যোগব্যায়াম বইখানি ছোটদের জন্য লেখা ; কিভাবে তাহারা দেহ-মনে সুস্থ সবল হইয়া আদর্শ নাগরিকরূপে নিজেদের গড়িয়া তুলিতে পারে, তাহার সুন্দর দিগ্দর্শন আছে পুস্তকখানিতে, বয়স্ক ব্যক্তিগণও এই পুস্তকপাঠে লাভবান হইবেন।

গ্রন্থের প্রথমাংশে ধ্যানাসন সম্বন্ধে এবং দ্বিতীয়াংশে স্বাস্থ্যাসন সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। পদ্মাসন, বজ্রাসন, ভুজঙ্গাসন, সর্বাঙ্গাসন প্রভৃতি আসনের ৩২ খানি সুন্দর চিত্র থাকায় পুস্তকখানির আকর্ষণ বাড়িয়াছে। প্রতিটি আসনের প্রণালী সম্বন্ধে যথাযথ নির্দেশ-দানের প্রারম্ভে কণ্ঠস্থ করিবার যোগ্য ক্ষুদ্র মনোজ্ঞ কবিতা দেওয়া হইয়াছে, যথা—ভুজঙ্গাসন সম্বন্ধে :—

'মাথা তুলে যেমন ক'রে সর্প ফণা ধরে,
উপুড় হয়ে শুয়ে মাথা ওঠাও তেমন ক'রে।'

'স্বাস্থ্য-ধর্মে অ, আ, ক, খ', 'লম্বা হইবার উপায়', 'যোগের অষ্টাঙ্গ', 'যৌগিক পন্থার সারকথা' পরিচ্ছেদগুলি সুলিখিত। এই পুস্তকখানির প্রতি যোগব্যায়াম সম্বন্ধে আগ্রহশীল ও স্বাস্থ্যলাভেচ্ছু ব্যক্তিগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে।

সংস্কৃত-দীপিকা (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)—গ্রন্থকার ও প্রকাশক : পণ্ডিত কে. এস. পরমেশ্বর শাস্ত্রী, সাহিত্য-শিরোমণি, ইরিনজালকুডা, কেরালা। পৃষ্ঠা—১১৬ ও ১৮০ ; মূল্য—১.৫০ ও ২'৪০।

বর্তমানে সহজতরভাবে সংস্কৃতভাষা-শিক্ষাদানের প্রণালী-উদ্ভাবনের প্রয়াস পণ্ডিত-মণ্ডলীর মধ্যে দেখা যাইতেছে। সংস্কৃত সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করিতে হইলে এই প্রচেষ্টা অত্যন্ত প্রয়োজন ও অভিনন্দনযোগ্য। 'সংস্কৃত-দীপিকা' পুস্তকখানি বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের বিদ্যার্থিগণের জন্য লিখিত হইলেও সংস্কৃতভাষা শিখিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিমাত্রেরই ইহা কাজে লাগিবে। প্রথম শিক্ষার্থী 'সংস্কৃত-দীপিকা'র প্রথম খণ্ড দিয়া শিক্ষারম্ভ করিয়া যখন দ্বিতীয় খণ্ড শেষ করিবেন, তখন দেখিবেন সংস্কৃত-ভাষাজ্ঞান অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। প্রথম খণ্ডে শব্দরূপ, বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, সন্ধি প্রভৃতি এবং দ্বিতীয় খণ্ডে ধাতুরূপ, কারক, সমাস, তদ্ধিত প্রভৃতি অধিগত করিবার নিয়মগুলি সহজভাবে বলা হইয়াছে। পুস্তকে দেবনাগরী অক্ষরে মূল সংস্কৃত ও সঙ্গে ইংরেজী অর্থ বা অনুবাদ থাকায় ইহাতে সংস্কৃত-অনভিজ্ঞ অথচ ইংরেজী-জানা ব্যক্তিগণের সংস্কৃত শিখিবার আগ্রহ হইবে। 'সংস্কৃত-দীপিকা' নামকরণটি তাৎপর্যবোধক। এই গ্রন্থ বহুল-প্রচারিত হইলে সুধী গ্রন্থকারের পরিশ্রম ও সাধু উদ্দেশ্য সার্থকতা লাভ করিবে।

সাহিত্যসুধাকরঃ—গ্রন্থকার ও প্রকাশক : পণ্ডিত কে. এস. পরমেশ্বর শাস্ত্রী, সাহিত্য-শিরোমণি, ইরিনজালকুডা, কেরালা। পৃষ্ঠা—৮০, মূল্য—১৲।

সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যে প্রবেশের জন্য 'সাহিত্যসুধাকরঃ' রচিত। এই গ্রন্থে কাব্যলক্ষণ, রসনিরূপণ, শব্দালঙ্কার, অর্থালঙ্কার, বৃত্তনিরূপণ (ছন্দ, যতি) এবং দৃশ্য কাব্য সহজ-সরল ভাবে আলোচিত। গ্রন্থখানি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ও দেবনাগরী অক্ষরে মুদ্রিত। একখানি ক্ষুদ্র পুস্তকে বিপুলায়তন সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যের বহু বিষয় একত্র সন্নিবেশিত করার জন্য আমরা গ্রন্থকারকে সাধুবাদ প্রদান করিতেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য

ওড়িশায় খরাত্রাণকার্য—ওড়িশার ঢেনকানল জেলায় হিন্দোল, বাসোল ও খাজুরিয়া কাঁটা সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে দুঃস্থ-সেবাকার্যে গত ২২শে জুন (১৯৬৮) হইতে ২১শে জুলাই পর্যন্ত রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক ১৭,৫৯৬ কেজি চাল বিতরণ করা হইয়াছে। সাহায্য-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা—২,৮০০।

মহারাষ্ট্রে ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত জনগণের সেবা—মহারাষ্ট্রের কয়না ও সাতারা সেবা-কেন্দ্রে গত ১৩ই মে হইতে ১২ই জুলাই পর্যন্ত ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত জনগণের সেবাকার্যে মিশন কর্তৃক ২৮,১০৯ ব্যক্তির মধ্যে ১,৬১১ কুইণ্টাল ৫ কেজি গম, ১,০০০ ব্যক্তিকে ১১ টিন বিস্কুট এবং ১১ জনকে ১১ খানি শাড়ী বিতরণ করা হইয়াছে।

কলিকাতায় বন্যার্তসেবা সাম্প্রতিক বন্যার ফলে জনসাধারণের অবর্ণনীয় দুর্দশা হইয়াছে। তপসিয়া অঞ্চলে গত ১৪ই হইতে ২১শে জুলাই রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক প্রতিদিন দ্বিপ্রহরে বন্যাপীড়িত ১,২৩৬ ব্যক্তিকে খিচুড়ি খাওয়ানো হয়। ২৭৫ খানি পুরাতন বস্ত্রাদি, প্রয়োজনীয় ভিটামিন ট্যাবলেট, ২৪২ কেজি চাল এবং ৪০ কেজি গম দরিদ্রগণের মধ্যে বিতরণ করা হয়। স্থানীয় এলাকায় কীটনাশক ঔষধ ছড়ানো হয় এবং রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থাও করা হয়।

বেলিয়াঘাটায় বন্যাপীড়িত অঞ্চলে গত ১৪ই জুলাই হইতে ১৯শে জুলাই পর্যন্ত দৈনিক ৯৬৫ জনকে খিচুড়ি খাওয়ানো হইয়াছে।

অন্যত্র বন্যা-সেবাকার্য—পশ্চিমবঙ্গে হুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমায় এবং আসামে কাছাড় জেলার হাইলাকান্দি মহকুমায় রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক ব্যাপকভাবে বন্যার্তদিগের মধ্যে সেবাকার্য আরম্ভ করা হইয়াছে।

কার্যবিবরণী

মাদ্রাজ—শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ (ময়লাপুর) দাতব্য চিকিৎসালয়ের (এপ্রিল, ১৯৬৭—মার্চ, ১৯৬৮) বার্ষিক কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এই চিকিৎসালয়টি সুদীর্ঘকাল ধরিয়া আর্ত-নারায়ণের সেবাকার্যে রত।

১৯৬৭-৬৮ খৃষ্টাব্দে অ্যালোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি উভয় বিভাগে মোট ১,৬১,৬২৯ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে। অ্যালোপ্যাথি বিভাগে চিকিৎসিতের সংখ্যা ১,৬০,৩৮১, তন্মধ্যে নূতন রোগী ৬২,২৭৪ এবং পুরাতন রোগী ৯৮,১০৭। হোমিওপ্যাথি-বিভাগে চিকিৎসিতের সংখ্যা ১,২৪৮, তন্মধ্যে নূতন রোগী ৪৬০ এবং পুরাতন রোগী ৭৮৮।

আলোচ্য বর্ষে চক্ষু-বিভাগে ২১,০৯৯, চক্ষু-কর্ণ-গল-রোগের চিকিৎসা বিভাগে ৯,৫২৯, এবং দন্ত বিভাগে ৪,২৬১ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়। এক্স-রে বিভাগে ৪৭৫ জনের এক্স-রে করা হয়। ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষিত নমুনার সংখ্যা ৫৪৫। পুষ্টির অভাব-গ্রস্ত ১১,৪৬০টি শিশুকে নিয়মিতভাবে দুগ্ধ দেওয়া হইয়াছে। সহৃদয় ও বদান্য জনগণের উপযুক্ত আর্থিক সাহায্যে দরিদ্র আর্ত জন-সাধারণ অধিকতর সেবালাভে সমর্থ হইবে।

আমেরিকায় বেদান্ত

সেণ্টলুই—বেদান্ত-সোসাইটির বার্ষিক (এপ্রিল, ১৯৬৭ হইতে মার্চ, ১৯৬৮) সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ।

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা-সভা: সোসাইটির উপাসনা-মন্দিরে প্রতি রবিবার সকালে ও প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কেন্দ্রাধ্যক্ষ স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ ধর্মালোচনা করেন। রবিবারগুলিতে তিনি বিভিন্ন ধর্ম ও দর্শন অবলম্বনে ভাষণ দেন। প্রতি মঙ্গলবার ধ্যানশিক্ষা ও শাস্ত্রব্যাখ্যার ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে ভজনাদির ব্যবস্থাও করা হয়। ধর্মসভাগুলি সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়। সোসাইটির সভাবৃন্দ ও বন্ধুগণ ছাড়া ধর্মীয় ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান হইতে শ্রোতৃবর্গ এগুলিতে যোগদান করেন। ইউনাইটেড হিব্রু টেম্পল, ব্রেণ্টউড কন্‌গ্রিগেশন্যাল চার্চ, ইউনাইটেড চার্চ অব ক্রাইস্ট, কেনরিক ক্যাথলিক থিওলজিকাল সেমিন্যারি, ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়, সেণ্টলুই বিশ্ববিদ্যালয়, লিনডেনউড কলেজ, ওয়েবস্টার কলেজ এবং ম্যাকক্লিউর হাই স্কুল হইতে অনেকে এই সব সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির ছাত্রগণ তাঁহাদের শিক্ষক ও অধ্যাপকগণের সঙ্গে আসিয়াছিলেন।

গ্রীষ্মকালে সাত সপ্তাহ যাবৎ সোসাইটির উপাসনা-মন্দিরে নির্দিষ্ট ধর্মালোচনা বন্ধ ছিল। ধ্যান ও নীরব উপাসনার জন্য ছুটির দিন ব্যতীত সারা বৎসর সপ্তাহের সব দিনে বেলা ১১টা হইতে ১২টা পর্যন্ত উপাসনা-মন্দির খোলা রাখা হইয়াছিল।

(২) মাসিক 'কথামৃত'-ক্লাস: প্রতি মাসের প্রথম বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সোসাইটির সদস্যবৃন্দ ও বন্ধুগণের নিকট শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত (The Gospel of Sri Ramakrishna) আলোচিত হইয়াছিল। বাহিরের ব্যক্তিগণ এই আলোচনা-সভাসমূহে যোগদান করেন।

বেদান্তবিষয়ক মুদ্রিত পত্র ও পুস্তিকা বিনামূল্যে বিতরণের জন্য অভ্যর্থনা-গৃহে রাখা হইয়াছিল।

(৩) নানা স্থানে বক্তৃতা: স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ আমন্ত্রিত হইয়া নিম্নলিখিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে ভাষণ প্রদান করেন: মেরিভিলে কলেজ, ওয়েবস্টার কলেজ, কেনরিক ক্যাথলিক থিওলজিকাল সোসাইটি, ম্যাক্‌ক্লিউর হাই স্কুল।

(৪) চিকাগো ও ক্যানশাস ভ্রমণ: গত ২১.৪.৬৭ স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ চিকাগো বেদান্ত সোসাইটির শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসবে যোগদান ও ভাষণ দান করেন।

২১.৬.৬৭ তিনি ক্যানশাসে স্থানীয় বেদান্ত সোসাইটিতে আয়োজিত সভায় বক্তৃতা করেন।

(৫) উৎসব: আলোচ্য বর্ষে শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের পুণ্য জন্মতিথি পূজা ও আলোচনাদির মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হয়।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রসাদ-দানের বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

এতদ্ব্যতীত গুডফ্রাইডে ও খৃষ্টজন্মদিবস সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপন করা হয়। শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার সময় পূজাদি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

(৬) উল্লেখযোগ্য অন্যান্য কার্য: আলোচ্য বর্ষে বর্তমান উপাসনা-ভবনের পুনর্গঠন এবং উপর তলায় দুইটি শোবার ঘর ও অন্যান্য কার্যের জন্য দুইটি ঘর নির্মাণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বিভিন্ন সময়ে নানা স্থান হইতে প্রায় ৩৫

জন অতিথি সোসাইটি পরিদর্শন করিতে আসেন এবং উপাসনাদিতে যোগদান করেন।

সোসাইটির সদস্যবৃন্দ ও বন্ধুবর্গ গ্রন্থাগারের পুস্তকসমূহের যথোপযুক্ত সদ্ব্যবহার করিতেছেন।

অন্যান্য সংবাদ

রাঁচি রামকৃষ্ণ মিশন টি.বি. স্যানাটোরিয়ামে গত ২৭.৭.৬৮ তারিখে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ নবনির্মিত অতিথি-ভবনের উদ্বোধন করিয়াছেন।

বারাণসী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে গত ২৭.৬.৬৮ তারিখে নূতন অপারেশন থিয়েটার ব্লকের ভিত্তিস্থাপন করেন বারাণসীর মহারাজা শ্রীমান বিভূতিনারায়ণ সিংহ বাহাদুর। এই অনুষ্ঠানে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

ছাত্রগণের কৃতিত্ব

আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে গৃহীত উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় রামকৃষ্ণ মিশনের কয়েকটি কেন্দ্রের ছাত্রগণ বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছে।

নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ বিভিন্ন শাখায় মোট ৮টি স্থান অধিকার করিয়াছে। মোট ১২০ জন পরীক্ষার্থীর সকলেই উত্তীর্ণ হইয়াছে—প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগে যথাক্রমে ৫০, ৬৮ ও ২ জন। বিভিন্ন বিষয়ে প্রাপ্ত সর্বসমেত লেটার মার্কস্-এর সংখ্যা ৫৫।

রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমের বিজ্ঞান শাখার জনৈক ছাত্র ৬ষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে।

পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠের ৫৭ জন ছাত্র পরীক্ষা দিয়াছিল, সকলেই উত্তীর্ণ হইয়াছে—প্রথম বিভাগে ১৮ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ৩৯ জন। একজন ফাইন আর্টস শাখায় প্রথম স্থান ও একজন টেকনিক্যাল শাখায় ৩য় স্থান অধিকার করিয়াছে।

প্রচারকার্য

স্বামী প্রণবাত্মানন্দ গত ১৯শে জানুআরি হইতে ২৯শে জানুআরি ও ৩রা মার্চ হইতে ২রা জুলাই পর্যন্ত বেঙ্গলী ক্লাব—তেজপুর, বেঙ্গলী হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল—তেজপুর, রামকৃষ্ণ আশ্রম—তেজপুর, লক্ষ্মী ক্লাব—যোরহাট, রামকৃষ্ণ আশ্রম—যোরহাট, মারোয়াড়ী ঠাকুরবাড়ী—যোরহাট, রামকৃষ্ণ বিদ্যামন্দির—খেলমাটি, রামকৃষ্ণ-আদর্শ বিদ্যালয়—মার্ঘেরিটা, এ. আর. টি. উচ্চ বিদ্যালয়—মার্ঘেরিটা, রামকৃষ্ণ আশ্রম—ডিগবয়, রামকৃষ্ণ আশ্রম ডিব্রুগড, রামকৃষ্ণ আশ্রম—আলিপুরদুয়ার জং, রামকৃষ্ণ আশ্রম—ধুবড়ী, ঠাকুরগঞ্জ, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম—কাটিহার, রামকৃষ্ণ আশ্রম—আরারিয়া, বিবেকানন্দ পাঠচক্র পাণ্ডু, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম—টাকী, কুমীরমারী হাই স্কুল, নরেন্দ্রপুর—কুমীরমারী, মোল্লাখালী হাই স্কুল, দক্ষিণপাড়া—কুমীরমারী, রামকৃষ্ণ যোগোদ্যান মঠ—কুমীরমারী, ২নং কাছারী - কুমীরমারী, রামকৃষ্ণ-ব্রহ্মানন্দ আশ্রম—শিকড়াকুলীনগ্রাম, রাহারহাটি, বসিরহাট, রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রম—বারাসত ইত্যাদি স্থানে 'ধর্মজগতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অবদান', 'মানবজীবনে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা', 'শিক্ষাপ্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ', 'ভারতে শক্তি-পূজা' সম্বন্ধে মোট ৬০টি বক্তৃতা দিয়াছেন, তন্মধ্যে ৪৪টি ছায়াচিত্রযোগে প্রদত্ত হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

দেলুয়া (পাবনা) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩৩তম জন্ম-মহোৎসব গত ২৫শে জ্যৈষ্ঠ হইতে ৩রা আষাঢ় পর্যন্ত দশ দিন ধরিয়া পূজা, পাঠ, ভজন, শোভাযাত্রাদির মাধ্যমে মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এই উৎসবে জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে বহু ভক্ত যোগদান করেন। এতদুপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনাদর্শ-আলোচনাকল্পে গত ২৮শে জ্যৈষ্ঠ বিকালে একটি জনসভা আয়োজিত হয়। উক্ত সভায় পৌরোহিত্য করেন স্থানীয় উন্নয়ন দপ্তরের আঞ্চলিক প্রশাসক জনাব আব্দুল আলীম সাহেব এবং প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন যশোহর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী সুধানন্দ। শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনাদর্শ ও সনাতন ধর্মের উপর মনোজ্ঞ আলোকপাত করেন বাগেরহাট (খুলনা) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ ব্রহ্মচারী সুকুমার ও অধ্যাপক গৌরচন্দ্র পোদ্দার। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সান্যাল মহাশয় স্বামীজীর জীবনী আলোচনা করেন।

শ্রীশ্রীভবতারিণী মাতার অর্চনা, ভক্তিমূলক সঙ্গীতানুষ্ঠান, দরিদ্রনারায়ণের সেবা প্রভৃতি উৎসবের উল্লেখযোগ্য অঙ্গ ছিল।

পরলোকে যোগেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

গত ৪ঠা শ্রাবণ (২০ই জুলাই) বেলা ১২টার সময় যোগেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ৮৪ বৎসর বয়সে শ্রীশ্রীমায়ের নাম জপ করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি ছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য। ঢাকা নগরীর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে তাঁহার সংযোগ ছিল নিবিড়। তিনি দীর্ঘকাল ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের হাসাড়া গ্রামে কালীকিশোর উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল মনুষ্যত্ব ও স্বদেশপ্রেমের আদর্শে শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করা। তিনি অত্যন্ত সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁহার দেহত্যাগে একজন ছাত্রবৎসল আদর্শ শিক্ষক ও প্রকৃত আর্তবন্ধুকে আমরা হারাইলাম। তাঁহার আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

চন্দ্রপুরা তাপ-বিদ্যুৎ কারখানা

গত ৭ই জুলাই প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বিহারের হাজারিবাগ জেলার চন্দ্রপুরায় ভারতের বৃহত্তম তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের তৃতীয় জেনারেটরটির উদ্বোধন করিয়াছেন। ১৮০০ একর জমির উপর কেন্দ্রটি অবস্থিত।

চন্দ্রপুরা তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রত্যেকটি জেনারেটরই ১ লক্ষ ৪০ হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করে; মোট উৎপাদন ৪ লক্ষ ২০ কিলোওয়াট। ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে কেন্দ্রটি চালু হয়।

চন্দ্রপুরায় উৎপন্ন বিদ্যুৎ-শক্তিকে বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে পূর্ব হইতেই কাজে লাগানো হইয়াছে। কলিকাতা হইতে মোগলসরাই রেলপথে বৈদ্যুতীকরণ সম্ভব হইয়াছে চন্দ্রপুরায় উৎপন্ন বিদ্যুৎ পাওয়াতেই।



শ্রীশ্রীদুর্গা (বেলুড় মঠ)

যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।

নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥

উদ্বোধন

দিব্য বাণী

দেবো ভূত্বা যজেদ্দেবং নাদেবো দেবমর্চয়েৎ ॥—শক্তিসঙ্গমতন্ত্র, কালীখণ্ড, ৮।২২
চৈতন্যং সর্বভূতানাং যদ্ ব্রহ্ম সোঽহমীশ্বরঃ।
সোঽহমিত্যস্য সততং চিন্তনাদ্ দেবরূপতা ॥—গন্ধর্বতন্ত্র, ১৩।৩
ন দেবঃ পর্বতাগ্রেষু ন দেশে বিষ্ণুসদ্মনি।
দেবশ্চিদানন্দময়ো হৃদি ভাবেন দৃশ্যতে ॥
যত্র যত্র দৃঢ়া ভক্তির্যদা যস্য মহাত্মনঃ।
তত্র তত্র মহাদেবী প্রকাশমনুগচ্ছতি ॥—কৌলাবলীনির্ণয়তন্ত্র

(জগদীশ্বরী হৃদয়ে আমারি, তিনিই ব্রহ্ম—এ ভাব যত
হৃদয়ে বসিবে, ততই হইবে আরাধনা তাঁর সঠিক মত।)

দেবতা হইয়া দেবভাব নিয়া দেবতার পূজা করা যে চাই,
দেবভাবময় না হলে হৃদয় দেবতার পূজা করিতে নাই ॥
চেতনারূপেতে সর্বভূতেই যে-পরব্রহ্ম বিরাজমান
সে-ব্রহ্ম আমি, ঈশ্বর আমি—এই চিন্তায় মন ও প্রাণ
সতত মগ্ন হলে সে-ধ্যানেই মানুষ দেবতা হইয়া যায়—
হৃদি-অবকাশে দেবতা হরষে জাগিয়া ওঠেন সে-চিন্তায় ॥

পর্বতশিরে, হরি-মন্দিরে নাই দেব, নাই বিশেষ স্থানে,
আনন্দময় চেতনারূপেই রয়েছেন তিনি হৃদয়াসনে ;
ভাবের নয়ন মেলিয়া যখন অন্তরপানে সাধক চায়
তখনি সেখানে সে-পরমধনে রাজিত সদাই দেখিতে পায় ॥
যে-মহামতির যেথায় যখনি ভকতি উছলি পড়ে
জগৎ-জননী সেথায় সেভাবে নিজেরে প্রকাশ করে ॥

কথাপ্রসঙ্গে

'সকলি তোমারি ইচ্ছা'

বিশ্বের ঘটনাগুলি ঘটে কেন? এগুলির পিছনে কোন চেতন সত্তার ইচ্ছার অঙ্গুলিহেলন আছে কি? না 'নেচার' নামক কল্পিত কোন অ-সত্তা ইহার পরিচালক?

সত্যদ্রষ্টাগণের প্রত্যক্ষ-করা সত্য

কেন ঘটে - এ প্রশ্ন মানুষের মনে জাগিয়াছে আদিকাল হইতেই। প্রথমে মানুষ এ বিষয়ে নানারূপ বিশ্বাস করিয়াছে পৃথিবীর নানা স্থানে। মোটামুটিভাবে মানুষ ভাবিত কোন চেতন সত্তাই ঘটনাগুলি ঘটায়—সে সত্তার সম্বন্ধে ধারণা যে স্থানে যাহাই হউক না কেন। ভূতে কিছু ঘটনা ঘটায়, শয়তান কিছু ঘটায়, দেবতারা কিছু ঘটান, অথবা কোন একজন দেবতাই সব ঘটান—এমনি নানারূপ ধারণা ছিল। পরে ঈশ্বরের ধারণা আসিয়াছে। যেমন, ভারতে এ বিষয়ে ধারণা অনেকখানি অগ্রসর হওয়ার পরও বিশ্বাস ছিল ইন্দ্রদেবতার ইচ্ছায় বারিপাত হয়, পবনদেবতার ইচ্ছায় ঝড় হয় ইত্যাদি। ক্রমে এ বিশ্বাস আরও একধাপ আগাইয়া যায়—ইন্দ্র বরুণ প্রভৃতি দেবগণ বিভিন্ন শক্তির অধিকারী হইলেও আসলে ইহারা সকলে একটি সত্তারই, ঈশ্বরেরই বিভিন্ন রূপ। সেই ঈশ্বরের শক্তিতেই, ইচ্ছাতেই বিশ্বের সব ঘটনা ঘটিতেছে। এ বিশ্বাস কল্পনাপ্রসূত নয়; সত্যদ্রষ্টাগণ সাধনা-সহায়ে ইহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যক্ষ-করা সত্যই এ বিশ্বাসের ভিত্তি। পরে সত্যদ্রষ্টাগণ আরও উচ্চতর সত্য প্রত্যক্ষ করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন এই ঈশ্বরের যাহা স্বরূপ তাহাতে ইচ্ছারও বিকাশ নাই এবং এবং কাজে কাজেই সেখানে তাঁহার ইচ্ছাপ্রসূত জীবও নাই, জগৎও নাই। নাই যদি, তবে ইহা প্রত্যক্ষ করিলই বা কে, আর সে সত্যকে প্রত্যক্ষ-করা সত্য বলিয়া ঘোষণাই বা করিল কে? এই মহাশূন্যতায়, 'বিশ্ববিহীন বিজনে' আসিয়া সত্যদ্রষ্টাগণ আরও দুইটি মহাসত্যের সন্ধান পাইলেন। একটি হইল, এই অদ্বয়তত্ত্ব মহাশূন্য নহে, অসৎ নহে, ইহা মহাপূর্ণতা, চির অস্তিত্ববান একটি সত্তা। এখানে আসিয়া সত্যদ্রষ্টাগণ শূন্য হইয়া যান নাই, এই সত্যের সহিত নিজেকে এক বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন। উপলব্ধির পর সেখান হইতে ফিরিয়াও আসিয়াছেন। ফিরিয়া আসিয়া আর একটি সত্য তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছেন—তিনিই এই বিশ্বের সব কিছুতে ওতপ্রোত, তিনিই সব কিছু হইয়া রহিয়াছেন। অচেতন পদার্থের যাহা উপাদান—সত্তা–স্বরূপ, চেতন প্রাণীর স্বরূপও তাহাই, ঈশ্বরের স্বরূপও তাহাই। কি ভাবে এই অদ্বয় সত্তা বহু হন, বিচিত্র জীবজগৎ হন? সত্যদ্রষ্টাগণ বলিয়াছেন, নিজেকে বহু করিবার বা বহুরূপে দেখাইবার শক্তি তাঁহার ভিতর হইতেই বিকশিত হয়। ইচ্ছারূপেই এই শক্তির প্রথম বিকাশ। সেই শক্তিবলেই তিনি জীবজগৎ হন। কেন হন?—বহু বিচিত্র ঘটনার সমষ্টিই তো বিশ্ব, সে-সব ঘটনা ঘটে কেন? ইহার একমাত্র উত্তর, (যদি ইহার উত্তর বলিয়া কিছু থাকা সম্ভব হয়) সত্য-দ্রষ্টাগণ বলিয়াছেন, তাঁহার ইচ্ছা।

এই ইচ্ছাসংযুক্ত চৈতন্যকেই সগুণ ব্রহ্ম,

ঈশ্বর বা জগজ্জননী বলা হয়। তাঁহার ইচ্ছাই স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতের অমোঘ নিয়মের রূপ ধারণ করিয়াছে, তাঁহার ইচ্ছাই কঠিন বাস্তবাকার ধারণ করিতেছে,—মন হইতেছে, বুদ্ধি হইতেছে, স্থূল জড়পদার্থ হইতেছে। তাঁহার ইচ্ছাতেই সেগুলির মধ্যে পরিবর্তন আসিতেছে, সেগুলির ভাঙ্গা-গড়া চলিতেছে। বিশ্বের সব ঘটনাই ঘটিতেছে তাঁহার ইচ্ছায়। একটি বালুকণা স্থানচ্যুত হইতেছে, গ্রহ-তারকা চূর্ণ হইতেছে, অগ্নি দাহ করিতেছে, সূর্য আলোক ও তাপ দিতেছে তাঁহারি ইচ্ছায়; বীজকে বৃক্ষে পরিণত করিতেছে, প্রাণিদেহ গড়িয়া তুলিতেছে, প্রাণিদেহে চেতনাকে প্রতিফলিত করিতে সক্ষম মনবুদ্ধির বিকাশ ঘটাইতেছে তাঁহারই ইচ্ছা। ইহা অনুভব করিয়াই সাধক কবি গাহিয়াছেন, 'সকলি তোমারি ইচ্ছা।'

বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সত্য

উচ্চতম সত্য প্রত্যক্ষ করার শক্তি সকলের থাকে না। কয়েকজন মহাশক্তিমান মানব সে-সত্য প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার কথা ঘোষণা করিয়া যান; তাঁহাদের উপলব্ধ সত্যকে প্রত্যক্ষ করিবার পথের সন্ধানও দিয়া যান, জীবনে সে-সত্যকে প্রয়োগ করার কৌশলও শিখাইয়া যান। যাঁহাদের শক্তি আছে, তাঁহারা সেই পথ ধরিয়া চলিয়া চরম সত্যকে নিজে পরীক্ষা করিয়া লইতে পারেন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষকে তাঁহাদের কথা বিশ্বাস করিয়াই লইতে হয়। বিশ্বাস করিয়া নিজ নিজ শক্তিমত সে-সত্যকে জীবনে প্রয়োগ যাঁহারা করেন, তাঁহারা লাভবানই হন। সব সত্য সম্বন্ধেই একই কথা।

গোটা পৃথিবীর মানুষ তাই যুগ যুগ ধরিয়া কোন না কোন আকারে ইহাই বিশ্বাস করিয়া আসিতেছিল যে, ঈশ্বর আছেন এবং ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই সব কিছু ঘটিতেছে।

সব মানুষ কি ইহা বিশ্বাস করিত? নিশ্চয়ই নয়। ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না, এমন মানুষের অস্তিত্ব পৃথিবীতে চিরদিনই আছে, চিরদিনই থাকিবে; সংখ্যা কমবেশী মাত্র হয়। প্রাচীনকালে কখনো কখনো তাঁহাদের কণ্ঠ চার্বাকদের মাধ্যমে সোচ্চার হইয়াছে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষেরই বিশ্বাস তাহাতে টলে নাই।

উনবিংশ শতাব্দী হইতে বিপুল শক্তি লইয়া বিশ্বময় ব্যাপকভাবে মানুষের মনে এই বিশ্বাসের মূলে প্রচণ্ড আঘাত হানিতে শুরু করিল জড়বিজ্ঞানের একের পর এক সত্যাবিষ্কার। জড়বিজ্ঞানীরা বিশ্বাসই করিলেন না, বাহির হইতে কাহারো ইচ্ছা আসিয়া কোন ঘটনা ঘটায়; তাঁহারা বস্তুর ভিতরেই তাহার পরিবর্তনাদি ঘটনার কারণ খুঁজিতে, 'কেন'র উত্তর খুঁজিতে লাগিয়া গেলেন এবং একের পর এক তাহার সন্ধানও পাইলেন। এই 'কেন'র সন্ধান করিতে করিতে স্থূল হইতে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর ঘটনার কারণ তাঁহারা খুঁজিয়া বাহির করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, যখন কোন স্থূল ঘটনা ঘটে তখন তাহার পিছনে থাকে সূক্ষ্ম একটি ঘটনা; সেই সূক্ষ্ম ঘটনাটিকে ঘটায় সূক্ষ্মতর আর একটি ঘটনা। এমনিভাবে চলিয়া তাঁহারা আজ বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন, কিন্তু ইহার শেষ, সব কিছু ঘটনার মূলে যাহা রহিয়াছে তাহার সন্ধান এখনো পান নাই। খোঁজা চলিতেছে।

বিশ্বে কত রকমের ঘটনাই তো ঘটে। কাদার পিণ্ডে চাপ দিলে তাহার আকার পরিবর্তিত হয়; লোহাকে আগুনে রাখিলে

তাহার কাঠিন্য চলিয়া গিয়া তারল্য আসে; জল বাষ্প হয়, বরফ হয়। এসব এক ধরনের ঘটনা, এসব ঘটনায় বস্তুর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য-বিশিষ্ট সূক্ষ্মতম অংশগুলি, অণুগুলি, অপরিবর্তিতই থাকে; শক্তিপ্রয়োগের ফলে অণুগুলির পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকিবার শক্তি কমে বা বাড়ে মাত্র, সেগুলির স্থান-পরিবর্তন ঘটায় মাত্র। আর এক ধরনের ঘটনা আছে। খোলা জায়গায় ফেলিয়া রাখিলে লোহায় মরিচা ধরে, লোহা মরিচায় পরিণত হয়; একটি বিশেষ প্রক্রিয়ায় জল আর জল না থাকিয়া হাই-ড্রোজেন ও অক্সিজেন নামক দুইটি গ্যাস হইয়া যায়। এই ধরনের ঘটনাগুলিতে বস্তুর অণুর ভিতরেই পরিবর্তন ঘটে, তাহার ভিতরকার পরমাণুগুলি বিচ্ছিন্ন ও পুনর্বিন্যস্ত হইয়া নূতন অণু তৈয়ারী করে। বস্তুর বৈশিষ্ট্যই পাল্টাইয়া যায়। আবার যখন ইউরেনিয়াম-এর পরমাণু ভাঙিবার বা দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু জুড়িয়া হিলিয়াম পরমাণু গড়িবার ফলে বিপুল শক্তির উদ্ভব হয়, তখন আর এক ধরনের ঘটনা ঘটে। তখন পরমাণুর ভিতরকার কেন্দ্রস্থ প্রোটনাদি জড়ত্বগুণবিশিষ্ট কণাগুলির (ম্যাটারের) কিছুটা অংশ পুরোপুরি শক্তিতে (এনারজিতে) রূপায়িত হয়। আবার, যখন একটি ইলেক্ট্রন ও একটি পজিট্রন কণার সংযোগ ঘটে তখন দুইটিরই জড়ত্বগুণ একেবারে লোপ পায়—দুইটিই শক্তি হইয়া যায়।

জড়বিজ্ঞানের জগতে এই শক্তিকেই সূক্ষ্মতম সত্তা বলা যাইতে পারে। বস্তুর ভিতর যে-কোন পরিবর্তনের ক্ষেত্রেই এই শক্তি ক্রিয়াশীল। এই শক্তি আবার নিজেকে আলোক-তাপ-আদি বিভিন্নরূপে রূপায়িত করে। এগুলিও ঘটনা। আরো বহুবিধ ঘটনা ঘটে তাহার ভিতর।

জড়জগতে যত রকমের রূপান্তর ঘটিতেছে, বিজ্ঞানীরা শক্তি এবং শক্তি-সংযোগে সাধিত ঘটনাগুলি দিয়াই সেগুলির ব্যাখ্যা করিতে পারেন, সেগুলি কেন ঘটিল তাহার উত্তর দিতে পারেন। এ ঘটনাটি কেন ঘটিল?—আর একটি ঘটনা ইহা ঘটাইয়াছে। কেন ঘটাইয়াছে? বিজ্ঞানীরা বলিবেন, এরূপই হয়, ইহাই নিয়ম, প্রকৃতির নিয়ম; একজায়গায় নয়, এক সময় নয়, একবার নয়, বিশ্বের সর্বত্র, সর্বকালে বারবার এই নিয়মগুলি একই রকমের ঘটনা ঘটায়। প্রকৃতি কি শক্তির মতো বা তার চেয়েও সূক্ষ্ম কোন সত্তা নাকি? কোন চেতন সত্তা, যাহা নিয়মকে পরিচালিত করে? —না, ও একটা শব্দ মাত্র। তাহা হইলে নিয়মগুলিই কি কোন চেতন সত্তা, যাহা শক্তিকে পরিচালিত করে?—না; শক্তি কেন কতকগুলি বাঁধা ছক ধরিয়া চলিয়া বিশ্বজুড়িয়া ঘটনাগুলি ঘটায়, তাহা জানি না; অথচ দেখি সেগুলি সর্বত্র কতকগুলি বাঁধা ছকে চলিতেছে, তাই সেগুলিকে নিয়ম বলি। যাহা ঘটে তাহার বিবৃতিই নিয়ম। ইহা 'কেন'র উত্তর নহে।

কিন্তু নিয়ম ঘটনাগুলি ঘটাইলেও নিজে নিজে ঘটনার পরিবেশ সৃষ্টি করিতে পারে না, বিজ্ঞানীদের জানা জগতের নিয়ন্ত্রণের মূলে কোন ইচ্ছার স্থান নাই; কোন কোন বিজ্ঞানীর মনে সেখানে ইচ্ছার অস্তিত্বের সম্ভাবনা ভাসিয়া উঠিলেও তাহা বৈজ্ঞানিক সত্য রূপে গৃহীত নহে।

অথচ এই বিশ্বের মধ্যেই কী আশ্চর্য ঘটনা ঘটিয়া চলিয়াছে—ইহার মধ্যে ইচ্ছা ও চেতনার বিকাশ হইতেছে; বিশ্বনিয়ন্ত্রণের মূলে বিজ্ঞান এখন পর্যন্ত যাহা পাইয়াছে, সেই এনারজি এবং নিয়ম যাহা পারে না, এই ইচ্ছা তাহা পারে—নিজের প্রয়োজনমত ঘটনা ঘটাইবার পরিবেশ সৃষ্টি করিতে পারে, শক্তি ও নিয়মকে দিয়া

ইচ্ছানুরূপ কাজ করাইয়া লইতে পারে। ইতর প্রাণীর এবিষয়ে শক্তি সীমিত; কিন্তু মানুষ আজ প্রকৃতির নিয়মগুলি সম্বন্ধে প্রভূত জ্ঞান অর্জন করিয়াছে বলিয়া তাহার এবিষয়ে শক্তি বিপুলপ্রসারিত, এবং তাহা ক্রমপ্রসারিত হইয়াই চলিয়াছে। এই ইচ্ছা এবং চেতনা আসে কোথা হইতে? শূন্য হইতে যে কিছু আসিতে পারে না, বিজ্ঞানীরাও তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। আরো একটি সত্য বিজ্ঞানেরও অনুমোদিত—কোন বস্তুর কারণ (যাহা হইতে সেটি উৎপন্ন) সর্বক্ষেত্রেই সেই বস্তু অপেক্ষা সূক্ষ্ম। অণুর উপাদান পরমাণুগুলি অণু অপেক্ষা সূক্ষ্ম; পরমাণুর উপাদান ইলেকট্রন-প্রোটনাদি আরো সূক্ষ্ম, তাহাদেরও উপাদান শক্তি আরো সূক্ষ্ম—জড়জগতে সর্বাধিক সূক্ষ্ম সত্তা। আবার স্থূল জগতে কোন ঘটনা ঘটিবার সময় সূক্ষ্ম শক্তিই অপেক্ষাকৃত স্থূল পরমাণু প্রভৃতিকে দিয়া কাজ করাইয়া লয়। ইচ্ছা যখন শক্তিকেও কাজে লাগাইতে পারে, তখন ইচ্ছা শক্তি অপেক্ষাও সূক্ষ্ম হওয়াই স্বাভাবিক, ইহা ভাবিতে আজ আর বেশী বাধা নাই। ইচ্ছা অপেক্ষা চেতনা আরো সূক্ষ্ম, কারণ পটভূমিতে চেতনা না থাকিলে ইচ্ছার বিকাশই হয় না, কোন অচেতন পদার্থে ইহার বিকাশ নাই; চেতনাকেই আবার আমরা ইচ্ছার চালকরূপে দেখিতে পাই। ইচ্ছা ছাড়া চেতনার অস্তিত্ব আমরা কল্পনা করিতে পারি, কিন্তু চেতনা ছাড়া ইচ্ছার কল্পনাও করা যায় না।

সত্যদ্রষ্টাগণের প্রত্যক্ষ-করা সত্য অবৈজ্ঞানিক বা যুক্তিবিরুদ্ধ নহে

এখন, শূন্য হইতে কোন কিছুই উদ্ভূত হয় না, সূক্ষ্মই স্থূলের কারণ, সূক্ষ্মকে বাদ দিলে স্থূলের অস্তিত্বই থাকে না, ইত্যাদি আজ পর্যন্ত বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত জ্ঞানের আলোকপাত করিয়া পক্ষপাতশূন্য হইয়া চিন্তা করিলে এ অনুমানকে অযৌক্তিক বলা চলে না যে, বিশ্বে ম্যাটার, এনারজি, ইচ্ছা, চেতনা প্রভৃতি যাহা কিছুর অস্তিত্ব আমরা দেখি, সেগুলির মধ্যে যেটি সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম সেইটিই সবগুলির কারণ, সেইটিই সূক্ষ্ম হইতে স্থূলতর হইয়া বিশ্বের সব কিছু হইয়াছে। এবং এই দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিয়া ইহাও অনুমান করা যুক্তিবিরুদ্ধ নহে যে, চেতনা হইতে ইচ্ছার বিকাশ হইয়াছে, ইচ্ছাই ক্রমে এনারজি ম্যাটার প্রভৃতির রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছে।

বিশ্ব নিয়ন্ত্রণের মূলে এই ইচ্ছা রহিয়াছে একথা ভাবিলে, এই দৃষ্টিকোণ হইতে, আজ আর ইহাকে আগের মতো অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীও বলা চলে না; কারণ ইচ্ছা এখানে বস্তুর বাহির হইতে তাহাকে নিয়ন্ত্রণ করিতেছে না, বস্তুর ভিতরেই তাহার সত্তারূপে রহিয়াছে বলা হইতেছে। যেমন এনারজি বস্তুর মধ্যে রহিয়াছে বলিয়াই উহা দ্বারা বস্তুর পরিবর্তনাদির ব্যাখ্যা আমরা পাই, সেরূপ বস্তুর আরো গভীরে ইচ্ছার অস্তিত্ব থাকিলে তাহা দ্বারাই সব ঘটনা ব্যাখ্যাত হইতে পারে।

ইহা অনুমান নয়, সত্যদ্রষ্টাগণ অন্য পথ ধরিয়া এ সত্য প্রত্যক্ষই করিয়া গিয়াছেন। শুদ্ধ চৈতন্যকে, ইচ্ছার বিকাশসংযুক্ত চেতনাকেও —জগজ্জননীকেও—সব কিছুর ভিতর সাক্ষাৎ দেখিয়াছেন। একদা কোন একজন নয়, বহু জন, যুগে যুগে। যে-কেহ এ সত্য পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন, তাঁহাদের কথা শুধু মানিয়া লইবার প্রয়োজন নাই। কিভাবে এ সব সত্য প্রত্যক্ষ করিতে হইবে, তাহার বিস্তারিত উপায়ের নির্দেশও তাঁহারা

দিয়া গিয়াছেন। ধাপে ধাপে এই সত্যোপলব্ধির দিকে অগ্রসর হইবার সময় যে সব আপেক্ষিক সত্য পর পর উপলব্ধ হয়, তাহাও বলিয়া গিয়াছেন। এ দিকটিও পরিপূর্ণভাবে বৈজ্ঞানিক-দের পদ্ধতিরই অনুরূপ। তবে পথ আলাদা। সে তো হইবেই, বিভিন্ন ধরনের সত্য-পরীক্ষার পথ বিভিন্নই হয়।

তাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন, শুদ্ধ চৈতন্যই বিশ্বের মূল কারণ—তাঁহার ইচ্ছাই বিশ্বের সব কিছু হইয়াছে—তাঁহার ইচ্ছাতেই সব কিছু ঘটিতেছে। ইচ্ছাসংযুক্ত তিনিই—জগজ্জননী মহাশক্তিই—সব কিছু ঘটাইতেছেন।

সত্যদ্রষ্টাগণও কিন্তু আমাদের প্রথম প্রশ্নের, 'কেন'র উত্তর দিতে পারেন নাই—শুদ্ধ চৈতন্যে কেন ইচ্ছার উদয় হয় তাহার কোন উত্তর নাই। কারণ উত্তর হয় না। একটি সীমা হইতে অন্য সীমা, সেখান হইতে অন্য সীমা—মৃৎপিণ্ড হইতে অণু, সেখান হইতে পরমাণু, সেখান হইতে এনারজি, মন-বুদ্ধি—এই পর্যন্ত আমরা 'কেন'কে লইয়া আসিতে পারি। মনবুদ্ধির পারে এই 'কেন'কে লইয়া যাওয়া যায় না। লইয়া যাইবে কে? যে-মনবুদ্ধি ইহার বাহন, সেই সেখানে থাকে না। কার্য-কারণ-সম্বন্ধও, যাহাকে নিয়ম বলি, তাহাও দেশকালেরই সীমাতেই আবদ্ধ। চরম সত্য দেশকালাতীত।

তাই এই 'কেন'র যদি কোন উত্তর থাকে, তো তাহা হইল 'তাঁহার ইচ্ছা'। গাছের পাতা নড়ে কেন? এর সবচেয়ে কাছের উত্তর, হাওয়া দিলে নড়ে, কেহ বা কিছু গাছটিকে বা পাতাটিকে নাড়িয়া দিলে নড়ে। কেন?—এর উত্তরে, তারও পরের 'কেন'র উত্তরে জটিল হইতে জটিলতর বৈজ্ঞানিক ঘটনার বিবৃতি দিতে দিতে শেষে আমরা পাই—প্রকৃতির নিয়মে নড়ে। নিয়ম কেন নাড়ায়? বিজ্ঞানীরা এখনো ইহার উত্তর দিতে পারেন নাই, এখানেই থামিয়াছেন। সত্যদ্রষ্টারা আরো আরো গভীরে গিয়া, মূলে পৌঁছিয়া বলিয়াছেন, 'ঈশ্বরের ইচ্ছায়, মায়ের ইচ্ছায় নড়ে।' সত্যদ্রষ্টাগণ প্রত্যক্ষ করিয়াই বলিয়াছেন, "তাঁর ইচ্ছা ছাড়া গাছের পাতাটিও নড়ে না", "সকলি তোমারি ইচ্ছা"; বলিয়াছেন,

> "সংসারের শ্রেষ্ঠ—বিধি খেয়াল তাঁহার
> ইচ্ছামাত্র অমোঘ বিধান।"

চিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দ

"আমি যে আমেরিকায় গিয়াছিলাম, তাহা আমার ইচ্ছায় বা তোমার ইচ্ছায় হয় নাই, ভারতের ঈশ্বর, যিনি ইহার অদৃষ্ট নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই আমায় পাঠাইয়াছেন"—একথা বলিয়াছেন স্বামী বিবেকানন্দ, ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের জানুআরি মাসে, আমেরিকা হইতে প্রথমবার ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর। ভারতবর্ষ হইতে যুগে যুগে সারা জগতে আধ্যাত্মিক উচ্চচিন্তাগুলি ছড়াইয়াছে; যখনই অন্যান্য জাতিগুলির সহিত ভারতের যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছে তখনই ইহা ঘটিয়াছে। বর্তমান যুগে জগতের জাতিগুলির মধ্যে বিস্তৃত যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ায় "এক্ষণে সেই সুযোগ আবার উপস্থিত।" "এই সুযোগে ভারত জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে কালবিলম্ব না করিয়া জগৎকে তাহার আধ্যাত্মিক উপহার দান করিয়াছে।"

ইহাই হইল স্বামী বিবেকানন্দের চিকাগো ধর্মমহাসভায় গমনের মূল কথা, একটি যুগান্তকারী ঐতিহাসিক ঘটনা। ভারতের এবং সমগ্র মানবজাতিরই কল্যাণের জন্য ঘটনাটি ঘটাইয়াছেন ভারতের ভাগ্যবিধাতা,

স্বামী বিবেকানন্দকে যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়া। ভারতের একান্ত প্রয়োজন ছিল নিজ ধর্ম ও সভ্যতায় সশ্রদ্ধ হওয়া; আত্মবিশ্বাস লইয়া জাগিয়া ওঠা; আর সেইসঙ্গে পাশ্চাত্যের জাগতিক বিদ্যা গ্রহণ করা। জাগতিক বিদ্যায় উন্নত, রজঃপ্রধান পাশ্চাত্যের একান্ত প্রয়োজন ছিল ভারতের আধ্যাত্মিকতাকে গ্রহণ করা। এভাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবের মিলনে সমগ্র মানবজাতিকে উন্নত করার সিংহদ্বার উন্মুক্ত হইয়াছিল চিকাগো ধর্মমহাসভায়।

আমরা জানি, শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছাই বিবেকানন্দকে ধর্মপ্রচারে নিয়োজিত করে। শ্রীরামকৃষ্ণ একখণ্ড কাগজে লিখিয়াছিলেন, "নরেন্দ্র শিক্ষে দেবে।" স্বামী বিবেকানন্দ তখন নরেন্দ্রনাথ, নির্বিকল্প সমাধিলাভ ও তাহাতে সর্বক্ষণ মগ্ন থাকা ছাড়া অন্য কোন ইচ্ছা তাঁহার মনে তখন নাই; তিনি বলিয়াছিলেন যে, তিনি লোকশিক্ষা দিতে পারিবেন না। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ হাসিয়া বলিয়াছিলেন, 'মা' তাঁহাকে দিয়া ইহা করাইয়া লইবেন। কাশীপুরে নরেন্দ্রনাথের নির্বিকল্প-সমাধিলাভের পরই শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, এ উপলব্ধি তালা বন্ধ রহিল, চাবি রহিল তাঁহার হাতে; মায়ের কাজ আছে, নরেন্দ্রনাথকে তাহা করিতে হইবে; কাজ শেষ হইলে শ্রীরামকৃষ্ণ তালা খুলিয়া দিবেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সর্ববিধ ভাবের সহিত যিনি পরিচিত, যিনি আধুনিক যুগে ঈশ্বরে অবিশ্বাস সম্বন্ধে যত প্রকার সংশয় উঠিতে পারে তাহার মূর্ত প্রতীকরূপে শ্রীরামকৃষ্ণসন্নিধানে আসিয়া নিজের যুক্তিকে তৃপ্ত করিয়া এবং নিজে সব প্রত্যক্ষ করিয়া তবে শ্রীরামকৃষ্ণের সব কথা মানিয়া লইয়াছেন এবং সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক অনুভূতির ও বিপুল শক্তির অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহাকেই যে আধুনিক যুগের পৃথিবীতে ধর্মস্থাপনের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ নির্বাচন করিবেন, ইহা স্বাভাবিক। বস্তুতঃ এই অমিত-শক্তিধর পুরুষকে এই কাজের জন্ম তিনিই আনিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের সাত বৎসর পরে স্বামীজী চিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগদান করিতে যান। তাহাও শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছার নিশ্চিত পরিচয় লাভের পর। চিকাগো ধর্মমহাসভা আয়োজিত হইয়াছিল পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিদের লইয়া সব ধর্মের মধ্যে নিহিত সার কথাগুলির একত্র আলোচনার জন্য—বলা যায়, 'মানবজাতির ধর্ম' আলোচনার জন্য। ইতিহাসে ইহাও একটি অভূতপূর্ব ঘটনা। সমগ্র মানবজাতি আজ বিস্তৃত যোগাযোগের ফলে এক-পরিবারের মতোই হইয়া আসিয়াছে; সকলের সভ্যতা, ধর্ম প্রভৃতির মূল বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াই সে-গুলির সমন্বয়সাধন করিয়া পৃথিবীর মানুষকে আজ মৈত্রী-বন্ধনে আবদ্ধ করিতে না পারিলে পরস্পর সংঘর্ষের ফলে মানবজাতির বিনাশ যে আসন্ন, তাহা বর্তমান সময়ে সকল চিন্তাশীল মানুষই বুঝিতেছেন। এই মহাসমন্বয়েরই উদ্বোধন করিয়াছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ ধর্মমহাসভায়। যে পথের সন্ধান তিনি দিয়া গিয়াছেন, মানবজাতিকে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে এবং যথার্থ উন্নত হইতে হইলে সেই পথে আমাদের চলিতেই হইবে। পৃথিবীর সর্বত্রই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবের মিলন ঘটাইতে হইবে, আধ্যাত্মিক ও জাগতিক জীবনকে এক-সূত্রে গাঁথিতে হইবে, ভগিনী নিবেদিতার ভাষায়, প্রতিটি কর্মকে আরাধনায়, প্রতিটি কর্ম-ক্ষেত্রকে অর্চনালয়ে রূপায়িত করিতে হইবে।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর চিকাগো শহরের আর্ট-ইনষ্টিট্যুটে ধর্মমহাসভার প্রথম অধিবেশন হয়। খৃষ্টধর্মের প্রতিনিধিগণ ছাড়া এই ধর্মমহাসভায় আলোচনার জন্য আসিয়াছিলেন হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ, ইহুদি, কনফুসিয়াস, শিণ্টো, মুসলমান এবং পারসিক ধর্মের প্রতিনিধিগণ। স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিরূপে গিয়াছিলেন; আরো কয়েকজন গিয়াছিলেন।

প্রথম দিনই স্বল্প সময়ের ভাষণে স্বামী বিবেকানন্দ সকলের মন জয় করিয়া লইলেন, বিশ্ববিখ্যাত হইয়া গেলেন। প্রথম দিন বক্তৃতার প্রারম্ভেই তাঁহার "আমেরিকাবাসী ভগ্নী ও ভ্রাতাগণ" সম্বোধনই শ্রোতাদের হৃদয় আন্দোলিত করিয়া তোলে। কয়েক মিনিট ধরিয়া তুমুল করতালির মাধ্যমে সে আনন্দ প্রকাশ পায়। ইহা নিশ্চয়ই শব্দ কয়েকটির জন্য নহে—শব্দ কয়টি বিবেকানন্দের হৃদয়ের সীমাহীন মানবপ্রেমের সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়াছিল বলিয়াই উহা অমিত শক্তি লইয়া শ্রোতাদের হৃদয় নিবিড়ভাবে স্পর্শ করিয়াছিল।

চিকাগো ধর্মমহাসভার পরবর্তী অধিবেশনগুলিতে স্বামী বিবেকানন্দ এবং তাঁহার বাণীই সর্বাধিক আকর্ষণের বস্তু হয়। চিকাগো ধর্মমহাসভাই জগতের কাছে ভারতীয় সভ্যতা ও ধর্মের রত্নভাণ্ডারের দ্বার জগজ্জনের নিকট উন্মুক্ত করিয়া দেয়, ভারতকে জগৎসভায় গৌরবের আসনে বসায়।

ইহাতে বহির্জগতের মতো ভারতবর্ষও লাভবান হইল। ভারতীয় সভ্যতা ও ধর্মের প্রতি পাশ্চাত্যবাসীর সশ্রদ্ধ ভাব দেখিয়া নিজ ধর্ম ও সভ্যতার প্রতি ভারতের ক্রম-অপস্রিয়মাণ শ্রদ্ধা আবার ফিরিয়া আসে, নিদ্রিত জাতি আত্মবিশ্বাস লইয়া আবার জাগিয়া উঠে। সেদিক দিয়া চিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর বাণী ভারতের নবজাগরণের মঙ্গলশঙ্খনাদ।

ইহার প্রায় চার বৎসর পর, ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুআরি ভারতে ফিরিয়া স্বামী বিবেকানন্দ নবজাগ্রত জাতিকে অগ্রগতির পথ দেখাইতে শুরু করেন।

সেপথ ধরিয়া চলিয়া ভারত উন্নতির দিকে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু বর্তমানে তাহার গতি মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে। বহুসমস্যাজর্জরিত জাতি আজ যেন পথনির্ণয়ে একটু বিভ্রান্ত। স্বামীজীকে ভুলিয়া যাওয়াই ইহার কারণ। স্বামীজীর বাণীর মধ্যেই আমরা ঠিক পথের সন্ধান পাইব। আজ ভারতপ্রেমিক, মানবপ্রেমিক স্বামী বিবেকানন্দের চিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগদানের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে যদি আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে চাই, তাহা হইলে তাঁহার কথামত জীবনগঠন ও জাতিগঠনের প্রচেষ্টাই হইবে উহার শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য। তাঁহার ভাবপ্রচারেরও ইহাই শ্রেষ্ঠ উপায়—"জীবনে দেখাও—উহাই শ্রেষ্ঠ প্রচার।"

ভগবানলাভের পথ

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ

আমাদের দেশের প্রাচীন ঋষিরা ভগবান লাভকেই জীবনের লক্ষ্য বলে গেছেন। আমাদের দুঃখকষ্টের অবসানের জন্য, নিজ স্বরূপ উপলব্ধি করে শান্তিলাভ করার জন্য তাঁরা এই আদর্শকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। এ আদর্শ এত প্রাণস্পর্শী যে, এদেশের অসংখ্য উচ্চস্তরের মানুষ, এমনকি বহু রাজা, রাজকুমার এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অতি উন্নত ব্যক্তিদের হৃদয়েও তা দাগ কেটেছে এবং তাঁরা ভগবান-লাভের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন; তাঁরা বুঝেছিলেন, জগতে কোনকিছুই চিরস্থায়ী নয়, সবই পরিবর্তনশীল এবং একমাত্র ভগবানই নিত্য সত্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, "যদি বুঝতাম জগৎটা নিত্য, তাহলে কামারপুকুরকে সোনা দিয়ে মুড়ে দিয়ে যেতাম। কিন্তু দেখছি, জগৎটা অনিত্য।" রূপগোস্বামী নামে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর একজন বিশিষ্ট শিষ্য বৃন্দাবনে বাস করতেন; তাঁর ভাই বাংলার নবাবের উজীর ছিলেন এবং বিষয়ে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন; ভাই-এর প্রতি স্নেহপরবশ হয়ে তিনি তাঁকে একটি শ্লোক লিখে পাঠিয়েছিলেন, যার অর্থ: "ভেবে দেখ, সে অযোধ্যাপুরীই বা কোথায়, সে দ্বারকাপুরীই বা কোথায়? কাজেই জানবে, একমাত্র ভগবান ছাড়া জগতে আর সবই অনিত্য।" এতে তাঁর ভাই-এর চোখ খুলে যায়; তিনি বাংলার মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিয়ে বৃন্দাবন চলে যান এবং ভগবানকে প্রত্যক্ষ করার জন্য সাধনায় মগ্ন হন। এ আদর্শ চিরদিন ভারতবাসীর মনে দাগ কেটে আসছে। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন, "অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্।" যে জগতে এসেছ তা অনিত্য, আনন্দহীন; আমায় ভজনা কর। কাজেই দেখা যাচ্ছে, আমাদের শাস্ত্র, আমাদের ঋষি, অবতার ও আচার্যগণ সকলেই বলছেন—বৈষয়িক জীবনে শান্তির আশা ক'রো না, তা থেকে দূরে গিয়ে আত্মস্বরূপ-উপলব্ধির এবং শান্তিলাভের চেষ্টা কর। বিষয়বদ্ধ জীবনে কখনো শান্তিলাভ হতে পারে না।

ঋষিরা বলেন, সচ্চিদানন্দই আমাদের স্বরূপ; এই স্বরূপের বোধ আমাদের নেই বলেই আমরা দুঃখকষ্ট পাই। শাস্ত্র এবং ঋষিরা একথা বলেন বটে কিন্তু আমরা কি অন্ততঃ বুদ্ধিতেও ধারণা করতে পারি যে আমরা সত্যই সচ্চিদানন্দস্বরূপ? অনুমানসহায়ে আমাদের বুঝতে হয়, বুদ্ধিগ্রাহ্য করতে হয় যে আমাদের স্বরূপ এরূপই হবে। কোন একটা বিশেষ পরিবেশে বাস করতে অভ্যস্ত হবার পর যদি কেউ আমাদের সেখান থেকে সরিয়ে অন্য একটা নতুন পরিবেশে নিয়ে যায়, তাহলে আমরা অস্বস্তি বোধ করি এবং পুরনো পরিবেশেই ফিরে যেতে চাই। কাজেই, স্বরূপ থেকে যদি আমরা বিচ্যুত হয়ে থাকি তাহলে তো আমরা সেখানেই আবার ফিরে যেতে চাইব। মাছকে জল থেকে তুলে ডাঙ্গায় রাখলে সে জলে ফিরে যাবার জন্যই প্রাণপণ চেষ্টা করবে, কারণ জল ছাড়া সে বাঁচতেই পারবে না। কোন লতাকে ছায়ায় এনে রাখলে কিছুদিন পর দেখা যায়, যেদিকে সূর্যালোক পাওয়া যাবে সেদিকে

সেটি নতিয়ে গেছে; এর কারণ, সূর্যালোকই লতাটির জীবন। ঠিক এই কারণেই আমরা আমাদের স্বরূপে ফিরে যাবার জন্য সর্বদা আপ্রাণ চেষ্টা করছি। একটু অনুধাবন করলেই দেখতে পাব, আমরা মরতে চাই না; আমরা বাঁচতে চাই, চিরজীবী হতে চাই। আমাদের ভেতর এই ইচ্ছা জাগে কেন? সবসময় আমরা এ-ইচ্ছা দ্বারা চালিত হই কেন? কারণ, আসলে আমরা চিরজীবী, আমরা 'সৎ-স্বরূপ'। তাই জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে আমরা সর্বদা আমাদের সেই হারানো স্বরূপ ফিরে পাবার চেষ্টা করে থাকি। এইভাবেই অনুমানসহায়ে আমরা বুঝতে পারি যে আমরা 'চিৎস্বরূপ'ও। আমরা যা জানি সবসময়ই তার চেয়ে আরো বেশী জানতে চাই; জ্ঞানের রাজ্যে কোথাও সীমা টেনে তৃপ্তি পাই না, অনন্ত জ্ঞানের অধিকারী হতে চাই; আমরা যে 'চিৎস্বরূপ', এ তারই প্রমাণ। আবার, আমরা সর্বদা সুখে থাকতে চাই, সর্বদা শান্তি চাই, কখনো দুঃখী হতে চাই না, দুঃখকষ্টকে আমরা ঘৃণা করি; কেন? কারণ আসলে আমরা 'আনন্দস্বরূপ'। কাজেই অনুমানসহায়ে আমরা জানতে পারি যে আমরা 'সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ'।

এ স্বরূপ আমরা হারালাম কি করে? অজ্ঞানের জন্য। অজ্ঞানবশে স্বরূপ বিস্মৃত হয়েছি বলেই আমাদের দুঃখভোগ করতে হচ্ছে। আমাদের সব প্রচেষ্টা, সব সংগ্রাম স্বরূপে ফিরে যাবার জন্য হলেও কখনো কখনো আমরা সঠিক পথের সন্ধান না পেয়ে এমন পথে চলি যাতে সংসারের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার পরিবর্তে আমরা তাতে আরো বেশী করে বদ্ধ হয়ে পড়ি।

অজ্ঞানের হাত থেকে মুক্তিলাভ করে স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারলেই সব দুঃখের অবসান হয়। এই অজ্ঞান কি? এই ক্ষণস্থায়ী অনিত্য জগৎকে নিত্য বোধ করার নামই অজ্ঞান। ক্লেদময় এই দেহকে সুন্দর ও পবিত্র বোধ করার নাম অজ্ঞান। পরিণামে দুঃখ আসবে জেনেও ইন্দ্রিয়-সুখকে আনন্দ ও শান্তি-প্রদ মনে করার নামই অজ্ঞান। আসলে কেউ আমাদের আপন নয়, তবু আত্মীয়স্বজনকে আপন বলে মনে হওয়ার নামই অজ্ঞান।

বেদান্তসূত্রের ভাষ্যের প্রারম্ভে আচার্য শঙ্কর মাত্র দুটি বাক্যে এই বিষয়টিকে সমগ্রভাবে অতিসুন্দর করে বুঝিয়েছেন; আজ পর্যন্ত কোন দার্শনিক তার খণ্ডন করেননি। তিনি প্রথমেই বলছেন, "যদিও 'আত্মা' এবং 'অনাত্মা', চৈতন্য ও জড় দিবা ও রাত্রির ন্যায়, আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় পরস্পরবিপরীতধর্মী, তথাপি লোক-ব্যবহারকালে আমরা একের সহিত অপরটিকে মিশিয়ে ফেলি এবং দেহকে 'আমি' বলি।" আত্মা অনন্ত ও সর্বব্যাপী হওয়া সত্ত্বেও আমরা বলি, 'আমি এই ঘরের মধ্যে রয়েছি।' ঠিক এইভাবেই বাইরের জিনিসের সঙ্গেও একাত্মতা অনুভব করি; আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে তারা দুঃখী হলে নিজেকেও দুঃখী ভাবি। আবার নিজের মানসিক অবস্থার সঙ্গেও আমরা একাত্মতা অনুভব করি—নিজেকে সুখী, দুঃখী, অবসন্ন বা অপরের প্রতি দ্বেষ-ভাবাপন্ন বলে ভাবি। আত্মা মন থেকে স্বতন্ত্র; তিনি মনের পশ্চাতে থেকে মনের এই সব অবস্থার সাক্ষিমাত্র হন; আমরা কিন্তু মনের এই পরিবর্তনগুলির সঙ্গে এই আত্মাকে, নিজেকে মিশিয়ে ফেলি, আর তার ফলে কষ্ট পাই। এই আমাদের অবস্থা; এর হাত থেকে আমাদের রেহাই পেতে হবে। সমস্ত ধর্ম এবং সব অবতার এই বন্ধন হতে মুক্তিলাভের পথের

সন্ধান দেন। কিভাবে এই দুঃখ থেকে, এই বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হবে, তাঁরা তাই শিক্ষা দেন এবং যদিও তাঁদের উপদিষ্ট পথের মধ্যে পার্থক্য আছে, তবু লক্ষ্য সব পথেরই এক। বিভিন্ন ধর্মে বিভিন্ন পদ্ধতির নির্দেশ থাকলেও পরিণামে সবই আমাদের একই লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়; সে লক্ষ্য হল মুক্তি।

আর একটি কথা। "এই সব ধর্মগুলি কি সত্যই পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে শিক্ষাদান করছে?" মনোযোগ দিয়ে দেখলেই দেখা যাবে, বিভিন্ন ধর্মগুলি যে-সব পথের সন্ধান দিচ্ছে সেগুলিকে মুক্তিলাভের চারটি প্রধান পথের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। দেখা যাবে, সব ধর্মই রাজযোগ, জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ—এই চারটি পথের যে-কোন একটির অথবা এগুলির দুই বা ততোধিকের মিলিত পথের কথাই প্রচার করছে। মুক্তিলাভের জন্য হয় কর্মের পথ ধরে, না হয় জ্ঞানের বা ভক্তির বা ধ্যানের পথ ধরে যেতে বলছে; অথবা জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি, যোগ—এগুলির দুই বা ততোধিককে একসঙ্গে নিয়ে সাধন করতে বলছে। এই হল মূল কথা; পৌরাণিক বা আনুষ্ঠানিক অংশে প্রভেদ থাকলেও এই মূল বিষয়ে সব ধর্মেরই মিল রয়েছে। যদি সব ধর্মকে একটি সাধারণ ভূমিতে নিয়ে এসে দেখা যায়, তাহলে সাধারণভাবে বলতে পারা যাবে যে, সব ধর্মই এই চারটি প্রধান পথের কথাই বলছে। এই পথগুলির যে-কোন একটি ধরে চলে আমরা 'আমি'-'আমার'-বোধরূপ অহংকার থেকে, এই 'চিজ্জড়-গ্রন্থি' থেকে মুক্তিলাভ করতে পারি। কর্মযোগের পথ ধরে গেলে অপরের সেবা করতে হয়, অপরের দুঃখকষ্টকে নিজেরই দুঃখকষ্ট বলে ভাবতে হয়—যার ফলে সেবাকালে সাময়িকভাবে নিজের প্রয়োজনের কথা, নিজের দেহের কথা, নিজেরই কথা ভুলে যাই আমরা; এভাবে চলতে চলতে, অপরের সঙ্গে নিজেকে এক বলে ভাবতে ভাবতে এসে যখন সমগ্র জগতের সঙ্গে নিজেকে এক বলে বোধ হয়, তখন 'আমি'-'আমার'-বোধ থেকে আমরা মুক্তিলাভ করি। জ্ঞানপথে কোন্‌টি সত্য, কোন্‌টি মিথ্যা তা বিচার করে চলতে হয়; 'আমি দেহ নই, মন নই'—এভাবে 'নেতি, নেতি' করে বিচার করে চলতে চলতে যা কিছু আত্মা নয়, যা কিছু 'আমি' নই তা থেকে নিজেকে পৃথক করে নেওয়া যায়, আত্মাকে নিজের স্বরূপ বলে উপলব্ধি করা যায়। এভাবে আত্মজ্ঞান লাভ করে আমরা সর্ববিধ দুঃখকষ্টের অতীত অবস্থায় উপনীত হই। ভক্তিপথে ভগবানকে ভালবাসাই সাধনা। এ পথে ভগবানকে আমরা ভালবাসি; তাঁর কাছে প্রার্থনা করি, তাঁর জন্য গৃহ-নির্মাণ করি, তাঁর জন্য রান্না করি, যা কিছু করি সবই তাঁর জন্য করি। এভাবে চলতে চলতেই আমরা 'কাঁচা আমি'র হাত থেকে রেহাই পাই। ভক্তিপথে এভাবেই আমরা 'আমি'-'আমার'-ভাব থেকে মুক্ত হয়ে যাই। রাজযোগের বা মনঃসংযমের পথে মনকে বৃত্তিশূন্য করার চেষ্টা করতে হয়। যোগের সংজ্ঞা হল—"চিত্তবৃত্তি-নিরোধ"। মনের স্থৈর্য অব্যাহত রাখার জন্য মনে কোন বাসনা, কোন চিন্তা উঠতে দিতে নেই, মনকে সম্পূর্ণরূপে স্থির করার, পবিত্র রাখার জন্যও চেষ্টা করতে হয়। মন পবিত্র এবং স্থির হলেই আত্মদর্শন হয়। সরোবরের জল যেমন নির্মল ও নিস্তরঙ্গ হলে তার তলদেশ পর্যন্ত দেখা যায়, কিন্তু জল ঘোলা হলে বা তাতে তরঙ্গ থাকলে তা সম্ভব হয় না, তেমনি মন মলিন থাকলে বা সেখানে বৃত্তিরূপ তরঙ্গ উঠলে মনের পশ্চাতে যে আত্মা

রয়েছেন তাঁকে দেখা যায় না, মন মালিন্যহীন ও বৃত্তিহীন হলেই আত্মদর্শন ঘটে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, যে কোন পথ ধরেই চলা যাক না কেন, সব পথেই আত্মজ্ঞান বা স্বরূপ-উপলব্ধির জন্যই চেষ্টা করতে হয়।

কিন্তু সাধারণতঃ মানুষের মন সাধনকালে কেবল একটা পথ ধরে চলতে চায় না। মানুষের মনের গঠনই এমন যে, একসঙ্গে কয়েকটি যোগ অবলম্বন করে সাধনা করা তার প্রয়োজন হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, অন্ততঃ তিনটি যোগ একত্র করা প্রয়োজন। পাখী যেমন দুটি পাখা এবং পুচ্ছের সহায়তায় উড়তে পারে, এর তিনটির কোন একটিকে বাদ দিয়ে পারে না, মানবাত্মাও তেমনি একসঙ্গে তিনটি যোগ অভ্যাস না করলে ঈশ্বরোপলব্ধি পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে না। প্রত্যেকটি যোগই আমাদের চরমসত্য উপলব্ধি করাতে সমর্থ একথা সত্য; তথাপি মানুষের ব্যক্তিত্ব এমনি যে, তিনটিকে একসঙ্গে নিতে হয়। তিনটি একসঙ্গে নিলেও তার মধ্যে যেটির উপর আমাদের ঝোঁক সবচেয়ে বেশী আমরা সেটিকেই আমাদের পথ বলে থাকি। যেমন কারো মধ্যে কর্ম ও বিচারের চেয়ে ভক্তির দিকে ঝোঁক প্রবল হলে আমরা তাকে ভক্তিপথের সাধক বলি, আবার কারো বিচারের দিকে ঝোঁক প্রবল থাকলে তাকে জ্ঞানপথের সাধক বলি। তাই আধ্যাত্মিক সাধনায় একসঙ্গে কয়েকটি যোগ অভ্যাস করলেও যে যোগটি সবচেয়ে বেশী প্রকট, তদনুসারে আমরা সাধককে কর্মী, জ্ঞানী, ভক্ত বা যোগী বলে অভিহিত করি।

আর একটি দিক থেকে এখন আলোচনা করা যাক। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে উপদেশ করছেন: "বিভিন্ন রুচির উপযোগী তিনটি যোগ আমি বলেছি- জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি।" ভোগসুখে যারা নিস্পৃহ তাদের জন্য জ্ঞানযোগ। যাদের ভোগবাসনা প্রবল তাদের জন্য কর্মযোগ; এরূপ লোক কাম্যকর্ম, অর্থাৎ ফলাসক্ত হয়ে ফললাভের আকাঙ্ক্ষায় কর্ম করতে করতে ধীরে ধীরে এমন অবস্থায় উন্নীত হয়, যখন সে অনাসক্ত হয়ে কাজ করতে সমর্থ হয়। অনাসক্ত হয়ে কাজ করার ফলে তার চিত্ত শুদ্ধ হয়, বিচারবুদ্ধির উদয় হয়। তখন বিচারের দ্বারা কোন্‌টা সৎ, কোন্‌টা অসৎ তা বুঝতে পারায় তার মনে বিনশ্বর জগতের প্রতি বৈরাগ্য আসে, ভগবানলাভের ইচ্ছা জাগে। মনের এরূপ অবস্থা হলে তখন সে ভগবানলাভের জন্য সচেষ্ট হয়, এবং স্বভাবতই এমন কোন ব্যক্তির সমীপাগত হয়, যিনি ভগবানলাভে তাকে সহায়তা করতে পারেন। এই জন্যই যাদের ভোগবাসনা প্রবল তাদের জন্য শ্রীকৃষ্ণ কর্মযোগের পথে চলার ব্যবস্থা দিয়েছেন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই জ্ঞানপথে চলার মত বৈরাগ্যবান নয়, আবার এত অধিক মাত্রায় ভোগাসক্তও নয় যাতে বলা যায় কর্মই তার পক্ষে প্রশস্ত। অধিকাংশ মানুষই ভোগাসক্ত হলেও অত্যধিক আসক্তিযুক্ত নয়; তারা ভগবানে বিশ্বাসী, ভগবানের উপাসক। শ্রীকৃষ্ণ এরূপ লোকদের ভক্তিমার্গ অবলম্বন করে চলতে বলেছেন। মধ্যম শ্রেণীর লোকের জন্য এই ভক্তিমার্গই প্রশস্ত। এ পথে সাধক সাধারণতঃ দ্বৈতভাব নিয়ে চলা শুরু করে—ভগবানকে নিজ থেকে পৃথক্ সত্তা জ্ঞানে তাঁর পূজা করে; পরে সাকার ঈশ্বর প্রত্যক্ষ হলে তাঁর কৃপায় তাঁর নিরাকার স্বরূপও উপলব্ধি করে।

ভক্তিপথে 'দ্বৈতভাব' নিয়েই সাধনা শুরু হয়। এ পথে তিনটি স্তর: আনুষ্ঠানিক উপাসনা, জপ ও সমাধি। আনুষ্ঠানিক আরাধনায় বহুবিধ উপচার, প্রতীকাদি অবলম্বনে আমরা তাঁর পূজা করি। এই পূজা আমাদের

মনকে জপের উপযোগী করে দেয়। দিনের পর দিন এভাবে পূজা করার ফলে আমাদের মনে ভগবানের প্রতি অনুরাগ বর্ধিত হয়, এবং তখন তাঁর নামজপ আমাদের কাছে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে, নামজপে আমরা আনন্দ পাই। জপ যখন খুব জমে যায়, গভীর হয়, জপে যখন তন্ময়তা আসে, তখন আমাদের চিত্ত একাগ্র হয়। চিত্তের এই একাগ্রতা স্থিত হলেই সমাধি বা ঈশ্বরদর্শন হয়। এভাবে ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে আমরা এগিয়ে যাই।

ঈশ্বরের কোন বিশেষ মূর্তির, কোন দেবতার নাম পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করার নামই জপ। আমরা জানি, প্রত্যেক চিন্তারই একটি শব্দ-রূপ আছে। শব্দ ও ভাবকে পরস্পর থেকে আলাদা করা যায় না। তেমনি কতকগুলি শব্দ-প্রতীক অধ্যাত্মজগতের কতকগুলি ভাবের সঙ্গে পরস্পর অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। যেমন 'ওঁ' ভগবানের নিরাকার স্বরূপ ব্রহ্মের প্রতীক; যেমন কতকগুলি বীজমন্ত্র পরব্রহ্মের কতকগুলি বিভিন্ন প্রকাশের—দেবতার—প্রতীক এবং পরস্পরসংযুক্ত। বিভিন্ন দেবতার বীজমন্ত্রও বিভিন্ন। কোন দেবতার বীজমন্ত্র জপ করার সময় আমাদের মন সেই দেবতায় একাগ্র হয়।

মন্ত্র কি? যা আমাদের মনকে জগৎ থেকে ভগবানের পাদপদ্মে টেনে আনে তাই মন্ত্র। এই বীজমন্ত্রগুলি শব্দ বা ধ্বনিমাত্র নয়, এগুলির মধ্যে শক্তি নিহিত থাকে। বৃক্ষের একটি বীজের মধ্যে এমন শক্তি থাকে যা বীজটিকে বর্ধিত করে ক্রমে ফুলফলে শোভিত বৃক্ষে পরিণত করে। বৃক্ষটি বীজের মধ্যে অব্যক্ত অবস্থায় থাকে, তাকে বৃক্ষরূপে অভিব্যক্ত করার ক্ষমতা এবং প্রাণশক্তিও বীজটির মধ্যে নিহিত থাকে। বীজমন্ত্রগুলিও সেরূপ ধ্বনিমাত্র নয়, জাপককে দেবদর্শন করাবার, ঈশ্বরদর্শন করাবার শক্তি সেগুলির মধ্যে নিহিত। যথাযথরূপে জপ করলে এই সব বীজমন্ত্র ইষ্টের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করে দেয়। বৃক্ষের বেলা যেমন বীজবপনের পূর্বে ক্ষেত্রটিকে চাষ করে, জলসেচ করে, সার দিয়ে প্রস্তুত করতে হয়, গরুছাগলের হাত থেকে রক্ষার জন্য বেড়া দিয়ে ঘিরতে হয়, তবেই যথাকালে বীজ থেকে অঙ্কুর উদ্গত হয়ে ক্রমে বড় হয়ে বিরাট বৃক্ষে পরিণত হয়, মন্ত্রের বেলাও তাই; বীজমন্ত্রের মধ্যে ঈশ্বরদর্শন করাবার শক্তি নিহিত থাকলেও তার সম্যক্ বিকাশের জন্য সাধনার প্রয়োজন। বীজকে বৃক্ষে রূপায়িত করবার জন্য মালীর পরিশ্রমও যেমন প্রয়োজন, ভগবানলাভের জন্য তেমনি সাধকের সাধনারও প্রয়োজন। বীজমন্ত্রের মধ্যে নিহিত শক্তি এবং সাধকের সাধনশক্তি—এই উভয় শক্তি মিলিত হয়ে পরিণামে সাধককে ঈশ্বরদর্শন করায়। 'জপ' বলতে এই বোঝায়। জপকালে আমরা ইষ্টচিন্তাও করি; দুই-ই একসঙ্গে চলে, কারণ নাম ও নামী অভেদ। মন্ত্র-উচ্চারণকালে মন্ত্রের অর্থও চিন্তা করতে হয়। মন্ত্রের অর্থচিন্তা মানেই মন্ত্রের উদ্দিষ্ট দেবতার বা ইষ্টের চিন্তা। কারণ মন্ত্র ইষ্টেরই প্রতীক, মন্ত্র ইষ্টই। এভাবে ইষ্টে চিত্তনিবেশের চেষ্টার ফলে মন একাগ্র হয়। এভাবে আরাধ্য দেবতায় মন ক্রমে অধিকতর একাগ্র হতে থাকে। আধ্যাত্মিক পথে ক্রমোন্নতি এভাবেই হয়।

আধ্যাত্মিক জীবন আরম্ভ করার সময় আমাদের প্রায় সকলেরই মনে হয়, দু-দশ দিন জপ-ধ্যান করলেই মন স্থির হয়ে যাবে। কিন্তু যে মন এত দীর্ঘকাল ধরে বাইরে বিক্ষিপ্ত হয়ে বেড়িয়েছে, তাকে ঝট করে টেনে এনে বিপরীত-মুখী করে তক্ষুণি ইষ্টে নিবিষ্ট করা সম্ভব নয়। তা করা খুবই কঠিন। কিন্তু তাতে কিছু যায়

আসে না—আমাদের কঠোর সংগ্রাম করতে হবে। প্রথম প্রথম ধ্যান করতে বসলেই হয়ত দেখা যাবে হাজার রকম চিন্তা এসে মনে ভিড় করছে। হয়ত দেখা যাবে এমন সব চিন্তা উঠছে যার কথা এর আগে আমরা কখনো ভাবিইনি। এ চিন্তাগুলি আসে অবচেতন মন থেকে। এ অবস্থায় সব চেয়ে ভাল এগুলিকে গ্রাহ্য না করা, এগুলির প্রতি কোন মনোযোগই না দেওয়া; তাহলেই দেখা যাবে আস্তে আস্তে এ চিন্তাগুলি সরে যাচ্ছে। এ চিন্তাগুলির প্রতি মনোযোগ দিলেই এরা আমাদের পেয়ে বসে এবং এদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া কঠিন হয়।

এ ছাড়া অন্য চিন্তা আছে যেগুলিকে এড়িয়ে যাওয়া কঠিন। মনের চেতন স্তরে কাজকর্ম-সংক্রান্ত বা ঐ জাতীয় বহু চিন্তা থাকে; সেগুলির হাত থেকে রেহাই পাবার দুটি উপায় আছে। একটি হল ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করা; জোর করে মনকে বলতে হবে, 'শোন, এখন ভগবচ্চিন্তা ছাড়া আর অন্য কোন বিষয়ের চিন্তা করতে পাবে না।' কোন অন্যায় কাজ করলে ছোট ছেলেকে যেভাবে শাসন করে, মনকেও সেভাবে কড়া শাসন করতে হবে। এভাবে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করলে দেখা যাবে, কিছুদিনের মধ্যেই মন আমাদের শাসন মেনে নিচ্ছে। আর একটি উপায় হল মনকে বোঝানো—'এসব তুচ্ছ বিষয়ের চিন্তা করে কি হবে? ভগবানের চিন্তা কর তাতে শান্তি পাবে, আনন্দ পাবে।' ছোটছেলেদের বুঝিয়ে বললে তারা যেমন কথা শোনে, দেখা যাবে এভাবে বুঝিয়ে বললে মনও কথা শুনবে, ক্রমে মনই আর এচিন্তাগুলিকে প্রশ্রয় দিতে চাইবে না; ধ্যানের বিঘ্ন আর থাকবে না। এ অভ্যাস ধীরে ধীরে অথচ দৃঢ়তা নিয়ে করে যেতে হয়।

মনকে দু-এক দিনে বশে আনা যায় না। শুধু যে আমাদেরই মন সহজে ধ্যানে স্থির হয় না তা নয়, অর্জুনের মত উচ্চ অধিকারীরও এ অভিজ্ঞতা হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ যোগের উপদেশ দেবার পর অর্জুন বলেছিলেন, "তুমি যে যোগের কথা বললে তাতে স্থিতিলাভ কি করে হবে তা তো বুঝতে পারছি না, কারণ মন বড় চঞ্চল, তাকে বশে আনা কঠিন কাজ; মনকে বশে আনা বাতাসকে বশে আনার মতই কঠিন।" শ্রীকৃষ্ণ একথা মেনে নিয়ে বলেছিলেন, "তুমি যা বললে তা সত্য। তবু মনকে বশে আনা সম্ভব, অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে বশে আনা যায়।" পতঞ্জলি মুনিও বলেছেন যে, অভ্যাস এবং বৈরাগ্য এ দুটিই হল চিত্তবৃত্তি-নিরোধের উপায়। কাজেই একমাত্র এই উপায়ে আমরা ধ্যানের বিঘ্ন অপসারণ করতে পারি।

সর্বদা অভ্যাস করে যেতে হবে। অভ্যাস মানে, ধ্যেয় বস্তু থেকে মন যখনই অন্য বিষয়ে সরে যাবে, তখনই তাকে আবার ধ্যেয় বস্তুতে ফিরিয়ে আনতে হবে। এ প্রচেষ্টা একটানা চালিয়ে যেতে হবে। এভাবে নিয়ত অভ্যাস প্রয়োজন।

বৈরাগ্য কি? ইন্দ্রিয়সুখে অনাসক্তিই বৈরাগ্য। আমাদের মনে যে-সব বাসনা লুকিয়ে আছে, বিচারসহায়ে সেগুলি ত্যাগ করতে হবে। এই বাসনাগুলিই মনকে চঞ্চল করে। যেমন কোন সরোবরে ঢিল ছুড়লে সরোবরের বুকে তরঙ্গ ওঠে এবং তার ফলে সেখানে চাঁদের প্রতিবিম্ব স্পষ্ট দেখা যায় না, ঠিক তেমনি মনে বাসনার উদয় হলে মনে বৃত্তিরূপ তরঙ্গ ওঠে এবং তার জন্য স্পষ্টভাবে আমাদের ইষ্টদর্শন হয় না। এই বাসনাগুলিকে ত্যাগ করতেই হবে, মনকে শুদ্ধ করতে হবে, তবে আমাদের ধ্যান গভীর হবে। কিন্তু সাধারণতঃ আমরা আন্তরিক-

এবং যথাযথ-ভাবে চেষ্টা করি না, কিছুক্ষণ ধ্যানে বসি এবং ভাবি যে তাতেই মন একাগ্র হবে। তা হয় না। মনকে শুদ্ধ করতেই হবে। মন বাসনায় পূর্ণ হয়ে রয়েছে; সেখানে ভগবানের এসে বসার মতো কোন ঠাঁই নেই। সর্ববিধ মালিন্যমুক্ত করে হৃদয়কে পবিত্র করতে হবে। হৃদয় পবিত্র হলে তখন নিশ্চয়ই আশা করা যায়, যে-কোন মুহূর্তে ভগবান এসে সেখানে বসবেন। প্রেমিক যেমন অধীর আগ্রহে প্রেমাস্পদের আগমনের জন্য প্রতীক্ষা করে, আমাদেরও তেমনি সর্বদা উন্মুখ হয়ে থাকতে হবে—কখন তিনি এসে হৃদয়ে বসবেন! প্রতি মুহূর্তে ভাবতে হবে তিনি আসছেন—এই এলেন বলে! এভাবে সর্বক্ষণ সতর্ক থেকে তাঁর চিন্তা করলে তবে তাঁর আসার ও হৃদয়ে বসার সম্ভাবনা। এ সাধনায় সর্বদা লেগে থাকতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, খানদানী চাষী কখনো চাষ ছেড়ে দেয় না, দু-এক বছর অনাবৃষ্টি হলেও না। কিন্তু যারা সখ ক'রে বা অন্য কোন কারণে চাষ করে, দু-এক বছর বৃষ্টি না হলেই তারা চাষ ছেড়ে দেয়। যথার্থ সাধক সেরূপ ঈশ্বরীয় আনন্দের আস্বাদ না পাওয়া পর্যন্ত কখনো ধ্যানাভ্যাস ছাড়েন না, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর তাতে লেগে থাকেনই; ঈশ্বরীয় আনন্দের আস্বাদ কিছুটা পেলে আরো এগিয়ে যাবার ইচ্ছা তীব্রতর হয়ে ওঠে। কাজেই নিরন্তর প্রচেষ্টা প্রয়োজন। তাঁর চিন্তা করতে ভাল লাগুক বা না লাগুক, এমনকি তা নীরস বলে বোধ হলেও কখনো দ'মে যেতে নাই, ধৈর্য-সহকারে এগিয়ে যেতে হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আধ্যাত্মিক সাধনা প্রথম প্রথম নীরস বোধ হয়। ধৈর্য নিয়ে লেগে থাকলে কয়েক বছরের মধ্যেই ধ্যান আনন্দপ্রদ হয়ে ওঠে। প্রথম দিকে অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে যেতেই হবে। সাধক-জীবনের এই অংশটি, প্রায় তিন-চার বছর, সর্বাধিক নীরস; কিন্তু নিত্যকার সাধন-অভ্যাস ছাড়তে নেই—যো-সো ক'রে লেগে থাকতে হয়।

আর একটি কথা মনে রাখতে হবে। আমাদের নিজেদের ওপর আস্থা, আত্মবিশ্বাস থাকা চাই, এই জন্মেই ভগবানলাভ করব—এ বিশ্বাস থাকা চাই; রোখ থাকা চাই—এই দেহ-মন নিয়ে এই জীবনেই ভগবানকে পাব। সাধনায় এর গুরুত্ব অনেকখানি। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা, ব্যক্তিগত দৃঢ় সঙ্কল্প ছাড়া আমাদের অধ্যাত্মজীবনের উন্নতি সম্ভব নয়।

কখনো কখনো অনেককে বলতে শোনা যায়, "আমি ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করেছি, আমার আর কিছু করবার নাই।" কিন্তু আত্মসমর্পণ এত সহজ নয়, খুবই কঠিন। যথার্থ আত্মসমর্পণের ভাব আনতে সুদীর্ঘকালের, হয়ত জীবনব্যাপী সাধনারই প্রয়োজন হয়। প্রাণপণ চেষ্টা ছাড়া তা হয় না। ভগবানলাভের জন্য নিজের সবশক্তি নিয়োগ করে সুদীর্ঘকাল তীব্র সাধনা করার পর যখন দেখা যায় তাতেও তাঁকে পাওয়া গেল না, তখনই আমরা ঠিক ঠিক আত্মসমর্পণ করতে পারি, আর তখনই ভগবান কৃপা করেন। কিন্তু নিজের চেষ্টা না থাকলে তাঁর কৃপালাভ আশা করা যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলতেন, "আমাদের সর্বক্ষণ তাঁর দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, তবেই তিনি কৃপা করবেন।" আমাদের কাজ হল তাঁর দরজায় গিয়ে দাঁড়ানো; অর্থাৎ সব সময় তাঁর চিন্তা করতে হবে, তাঁর খুব কাছে থাকতে হবে, তাহলে তাঁর কৃপালাভের সম্ভাবনা নিশ্চয়ই খুব বেশী। কিন্তু তাতেও তাঁর কৃপার ওপর দাবি

করার কোন অধিকার আমাদের আসবে না; কৃপা করা তাঁর ইচ্ছাধীন। কাজেই আমরা যত সাধনা, যত লক্ষ জপই করি না কেন, একথা কখনো বলা যায় না যে, এতখানি সাধনা, এত জপ বা এতটা তপস্যা করলেই ভগবানলাভ হবে। মোটের ওপর সাধনা দ্বারা যতখানি যাওয়া সম্ভব তার শেষ সীমা পর্যন্ত এগিয়ে যেতে হয়, কিন্তু শেষে তাঁকে পাওয়া যায় তাঁর কৃপাবলেই। কাজেই তাঁকে লাভ করতে হলে নিজের চেষ্টা না থাকলে হবে না; সেইসঙ্গে তাঁর কৃপাও চাই। তাঁর কৃপায় আমরা তাঁর স্বরূপ প্রত্যক্ষ করতে পারি।

শ্রীরামকৃষ্ণের এই গল্পটি হয়তো মনে আছে: ভগবতী হিমালয়ের ঘরে তাঁর কন্যা হয়ে জন্মেছেন, কন্যার মতোই হেসে খেলে বেড়াচ্ছেন। একদিন হিমালয় তাঁকে বললেন, 'তোমাকে তো আমি আমার কন্যারূপেই দেখছি, তোমার স্বরূপ কি তা জানতে ইচ্ছে হচ্ছে।' জগজ্জননী তাঁকে বললেন, 'বাবা, আমার স্বরূপ যদি প্রত্যক্ষ করতে চাও, তাহলে মুনিঋষিরা যেমন আমার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করার আগে জন্ম জন্ম ধরে তপস্যা করেছিলেন, তোমাকেও তাই করতে হবে। আমি তোমার কন্যা হয়ে এসেছি বলেই যে তুমি তা প্রত্যক্ষ করতে পারবে, তা হয় না।' আধ্যাত্মিক জীবনে এইটিই সত্য। আমরা যখন আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে ভগবান-লাভ করতে চাই, তখনই তিনি কৃপা করেন, তাছাড়া নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের আর একটি গল্প: একদা নারদ বৈকুণ্ঠে যাচ্ছেন, পথে দুজন সাধকের সঙ্গে দেখা হল। দুজনেই তাঁকে অনুরোধ করলেন, নারায়ণকে জিজ্ঞেস করবেন, মুক্তি-লাভের জন্য আর কতদিন তপস্যা করতে হবে? বৈকুণ্ঠ থেকে ফেরার সময় নারদ যখন সেই পথ দিয়েই যাচ্ছেন, তখন তাঁকে দেখে সেই দু'জন সাধকের একজন জিজ্ঞেস করলেন, 'নারায়ণকে জিজ্ঞেস করেছিলেন?' নারদ বললেন, 'হ্যাঁ, করেছি।' 'কি বললেন তিনি?' বললেন, 'আর চার জন্ম তপস্যা করলেই তুমি মুক্ত হবে।' আরো চার জন্ম তপস্যা করতে হবে শুনে সাধকটি একেবারে দমে গেলেন। দ্বিতীয় সাধকটির কাছে গেলে নারদকে তিনিও জিজ্ঞেস করলেন, 'নারায়ণকে আমার কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন?' নারদ বললেন, 'হ্যাঁ।' 'আর কত জন্ম তপস্যা করলে মুক্তিলাভ করব?' 'পাশের তেঁতুল গাছটি দেখছ তো? ওর কত পাতা আছে দেখছ? ঐ তেঁতুলগাছে যত পাতা আছে, আর তত জন্ম তপস্যা করার পর তুমি মুক্তিলাভ করবে।' এত জন্ম পর হলেও মুক্তিলাভ তাহলে হবে—এই ভেবেই সাধকটি আনন্দে নৃত্য করতে লাগলেন। তখনই দৈববাণী শুনলেন, 'বৎস, তুমি এখনই মুক্ত হয়ে গেলে!' দ্বিতীয় সাধকটির সঙ্কল্পের দৃঢ়তা দেখে খুশী হয়ে ভগবান তখনি তাকে মুক্ত করে দিলেন। প্রথম সাধকটি আর চার জন্ম তপস্যা করতে হবে শুনেই দমে গিয়েছিলেন।

কৃপা কিভাবে আসে তার আর একটি গল্প আছে—দুটি পাখীর গল্প। পাখী দুটি সমুদ্রের বেলাভূমিতে ডিম পেড়েছিল। ডিম সেখানেই রেখে তারা খাদ্যের সন্ধানে বেরুল। ফিরে এসে দেখে সেই ফাঁকে সমুদ্রের ঢেউ এসে ডিম দুটিকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। দেখে খুব রাগ হল তাদের। স্থির করলে, সমুদ্রের জল শুষে ফেলে ডিম দুটি ফিরিয়ে আনবে। তখনই কাজে লেগে গেল—ঠোঁটে করে জল এনে বালির ওপর ফেলতে লাগল। দিনরাত একইভাবে এই কাজ চলল। সমুদ্রের দেবতা বরুণ এদের কাণ্ড দেখে কাছে এসে জিজ্ঞেস

করলেন, 'কি করছ তোমরা?' পাখী দুটি বলল, 'সমুদ্র আমাদের ডিম ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। আমরা ডিম দুটি ফিরে পাবার জন্য সমুদ্রকে শুকিয়ে দেবার চেষ্টা করছি।' তাদের অধ্যবসায় ও সঙ্কল্পের দৃঢ়তা দেখে বরুণদেব ডিম দুটি ফিরিয়ে দিলেন।

কাজেই বিনা চেষ্টায়, বিনা তপস্যায় কৃপালাভ হয় না, একথা নিশ্চিত। আমাদের যতটা শক্তি আছে তার সবটুকু নিয়োগ করে যখন আমরা তাঁকে পাবার চেষ্টা করি, তখনই তিনি কৃপা করেন। তা না করে কেবল তাঁকে আত্মসমর্পণ করেছি মনে করলেই তাঁর কৃপা পাওয়া যায় না। বললেই আত্মসমর্পণ করা যায় না, তা করা খুবই কঠিন, তার জন্য তীব্র সাধনার প্রয়োজন। আত্মসমর্পণ করলে নিজের আর কিছুই করার থাকে না, তখন নিজের ইচ্ছা ব'লে কিছু আর থাকে না।

জনক রাজার উদাহরণ আছে। তিনি অষ্টাবক্রের কাছে আধ্যাত্মিক বিষয়ে উপদেশ চাইতে গিয়েছিলেন। উপদেশলাভের পর জনক যখন ফেরার জন্য ঘোড়ায় চড়তে যাচ্ছেন, এক পা জিনের পাদানিতে রেখেছেন, সেই সময় অষ্টাবক্র বললেন, 'কই, আমার গুরুদক্ষিণা দিলে না যে!' জনক বললেন, 'আমার সর্বস্ব আপনায় দিলাম। আমার রাজ্য, আমি নিজে, এবং আমার বলতে যা কিছু আছে, গুরুদক্ষিণারূপে সবই আপনায় দিলাম।' অষ্টাবক্র সে দক্ষিণা গ্রহণ করলেন। রাজা জনক এক পা পাদানিতে রাখা অবস্থাতেই দাঁড়িয়ে রইলেন, ঘোড়ার পিঠে চড়তে পারলেন না। কিছুক্ষণ পর অষ্টাবক্র তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হল, ঘোড়ায় উঠছো না কেন? মিথিলায় ফিরবে না?' জনক উত্তর দিলেন, 'যাই কি করে? আমার সর্বস্ব তো আপনাকে সমর্পণ করেছি, আমার নিজের বলতে কিছুই তো নেই। কাজেই নিজের ইচ্ছা বলতেও কিছু নেই আর। ঘোড়ায় চড়ার ও মিথিলায় ফিরে যাবার শক্তিই আমার নেই।' অষ্টাবক্র তখন জনককে সব ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমার হয়ে তুমি রাজ্যশাসন কর।' এরই নাম যথার্থ আত্মসমর্পণ। আত্মসমর্পণ কথার কথা নয়।

আমরা জানি, গিরিশচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণকে বকলমা দিয়েছিলেন। তিনি বলতেন, 'বকলমা দেওয়ার চেয়ে সাধন করাই আমার ভাল ছিল। বকলমা দিয়েছি, কাজেই আমার করার আর কিছুই নাই; কিছু করতে গেলেই তক্ষুণি মনে করিয়ে দেয়, আমি তো একাজ করতে পারি না, কি করতে হবে শ্রীরামকৃষ্ণই তা ঠিক করে দেবেন। এই পরীক্ষার ভেতর দিয়ে চলা আমার পক্ষে খুবই কঠিন।'

কাজেই আত্মসমর্পণ করতে পারা খুব সহজ কাজ নয়। 'ভগবানে সর্বস্ব সমর্পণ করেছি, আমাদের আর কিছুই করার নেই'—একথা বলে নিজেকে যেন প্রবঞ্চিত না করি আমরা। ভগবানলাভ করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে আমাদের লেগে পড়তে হবে, তবেই আমাদের শিরে তাঁর কৃপা বর্ষিত হবে। পরিণামে ভগবৎকৃপাই ভগবানলাভ করায় ঠিকই, কিন্তু একথাও সত্য যে, নিজের চেষ্টা ছাড়া সে কৃপা আসে না।*

---

* বোম্বাই শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে (২৪. ৯. ৬৭) প্রদত্ত ইংরেজী বক্তৃতার অনুবাদ—সঃ

'কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম'

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

বনপথচারী শ্রীরামচন্দ্র পথের পাশে এক জায়গায় ধনুকটি মাটিতে গাড়িয়া রাখিতে গিয়া দেখেন একটি ভেককে আহত করিয়াছেন। ভেকের রক্তে স্থানটি রঞ্জিত। করুণাসাগর রঘুনাথের হৃদয়ে বড় কষ্ট হইল। ব্যাঙটি তখনও মরে নাই। রামচন্দ্র তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাপুহে, অন্য সময়ে তো তোমার কণ্ঠের কো কো রবে সকলের কান ঝালাপালা করিয়া ছাড়; আর এখন আমি যখন মাটি ঠুকিয়া ধনুকটি লাগাইয়া রাখিতে যাইতেছিলাম তখন কি একটা ডাকও ডাকিতে পারিলে না? একটু শব্দ করিলে বা একটা লাফ দিলেই তো আমি বুঝিতে পারিতাম তুমি এখানে বিরাজ করিতেছ; সাবধান হইতাম এবং তোমাকেও এমন ভাবে মরিতে হইত না।" ভেকের উত্তর বড় মর্মস্পর্শী। "ঠাকুর, যখন বিপদে পড়ি তখন 'রাম রক্ষা কর' বলিয়া চিৎকার করি। কিন্তু এখন দেখিলাম, রামই মারিতেছেন; তাই চিৎকার করিয়া আর কি লাভ? তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক বলিয়া চুপ করিয়া গেলাম।"

ভেকটি সাধারণ ভেক নয়। ভেকের দেহে কোনও ভক্তোত্তম আমাদের কাছে এক মহৎ আধ্যাত্মিক শিক্ষা রাখিয়া গেলেন। জীবন যাঁহা হইতে, মৃত্যুও তাঁহারই নিকট হইতে প্রসারিত। শ্রীভগবানের সর্বময়তা বুঝিতে পারিলে মৃত্যুকে তাঁহারই দান, তাঁহারই আশীর্বাদ বলিয়া গ্রহণ করিবার হিম্মত আসে। মৃত্যুর সম্মুখে তখন আর আমরা সন্ত্রস্ত হই না, 'ত্রাহি ত্রাহি' বলিয়া কাঁদি না। "তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক" বলিয়া চুপ করিয়া যাই। প্রভুর পদ্মপলাশলোচনের ছবি চোখ বুজিয়া দেখিতে দেখিতে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করি!

যীশুখ্রীষ্ট তাঁহার ভক্তদের যে দৈনন্দিন প্রার্থনা শিখাইয়াছিলেন তাহার মধ্যে একটি লাইন আছে: Thy will be done on earth, as it is in Heaven. তোমার স্বলোক, স্ব-স্বরূপ হইতে সর্বকালে যে দৈবী ইচ্ছা দিকে দিকে বিচ্ছুরিত হইয়া অনন্ত সৃষ্টিপ্রবাহকে চালিত করিতেছে, আমাদের এই মাটির পৃথিবীতে, আমাদের এই সুখ-দুঃখ-আশা-নিরাশা-হাসি-কান্না-বেষ্টিত জীবনে সেই ইচ্ছাই যে ক্রিয়াশীল, এই মহাসত্যকে বুঝিবার শক্তি দাও। আমার ক্ষুদ্র অহঙ্কার কর্তা সাজিয়া জীবনকে জটিল করিয়া তুলিয়াছে। আমার সেই মলিন অহঙ্কার চূর্ণ কর। যাহা কিছু ঘটিতেছে তোমারই ইচ্ছায় ঘটিতেছে এবং ঘটিবে। কর্তা তুমি। আমার পৃথিবীতে, আমার সংসারে, আমার দেহমনঃপ্রাণে তুমি আসিয়া বস। আমার সকল ইচ্ছা তোমার বিরাট ইচ্ছায় বিলীন হউক। ঈশ্বরই কর্তা—এইটি যখন আমরা ঠিক ঠিক বুঝিতে পারি তখনই আমাদের যথার্থ নির্ভরতা আসে। তখন আমরা শান্ত হইয়া যাই, মনের উদ্দাম হাঁক-পাঁকানি তখন আর আমাদিগকে চঞ্চল করিতে পারে না। আমাদের সকল কাজ তখন ঈশ্বরের পায়ে সমর্পিত হয়। প্রচণ্ড কর্মে ব্যাপৃত থাকিয়াও আমরা তখন হৃদয়ে নিরবচ্ছিন্ন প্রশান্তি বোধ করিতে পারি।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন—

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥
গীতা, ১৮।৪৬

"যাঁহা হইতে জীবের সকল প্রবৃত্তি উৎসারিত হইতেছে, যাঁহার শক্তি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ওতপ্রোত, নিজের কর্ম দ্বারা তাঁহাকে আরাধনা করিয়া মানুষ সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়।"

মানুষ তো কর্ম না করিয়া তিষ্ঠিতে পারে না। যতক্ষণ জীবন ততক্ষণ কাজ করিতে হইবে, কিন্তু অহংবুদ্ধি বর্জন করিয়া কাজ করিতে পারিলে কাজ আমাদিগকে বাঁধিতে পারে না। সকল কাজের উৎস হইলেন শ্রীভগবান, সকল কাজের শক্তি তাঁহা হইতেই আসিতেছে—এই বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া কাজ করিলে কর্ম আমাদিগকে মুক্তির পথে লইয়া যায়। যে-কোনও কাজ আমরা করি না কেন, উহা ঈশ্বরের পূজা-স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়।

শক্তিসাধক রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন, "কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি।" ইহা গীতার এবং যীশুখ্রীষ্টের উপর্যুক্ত বাণীরই প্রতিধ্বনি। সাধন-জীবনের প্রারম্ভে আমরা ধর্মের নানা তত্ত্ব, ঈশ্বরের নানা বিভূতি, ধ্যান-ধারণার নানা প্রণালী লইয়া আলোচনা করি, তর্ক-বিতর্ক করি। নানা শাস্ত্র পড়িতে চাই, নানা ব্রত নিয়ম উপবাস প্রভৃতি পালন করিতে উৎসাহী হই, নানা সাধুসন্তের কাছে যাতায়াত করি, নানা তীর্থ মঠ মন্দির দর্শন করিয়া বেড়াই, কিন্তু সাধন-জীবনে আমরা যত অগ্রসর হই, ততই বাহিরের এই সকল কার্যকলাপ কমিয়া আসে। রামপ্রসাদ অনুভূতির উচ্চ স্তরে পৌঁছিয়া দেখিলেন, তাঁহার আরাধ্যা ইষ্টদেবীই সব কিছু হইয়া রহিয়াছেন। তিনিই কারণ, তিনিই করণ, তিনিই কার্য। তিনিই সাধ্য, তিনিই সাধনা। তিনিই বন্ধন, তিনিই মুক্তি। অতএব করিবার তো আর কিছু নাই। হাত পা ছুঁড়িয়া তো কোনও লাভ নাই। অসংখ্য পরিবর্তন, অসংখ্য অভিব্যক্তি জগজ্জননীরই লীলাবিলাস। এই লীলাবিলাস যখন স্তিমিত হয় তখন জগজ্জননী অপরিবর্তনীয় নিরুপাধিক ব্রহ্মস্বরূপে প্রতিভাত হন। যিনি নৃত্যময়ী মা, তিনিই চিরপ্রশান্ত পরম পুরুষ। কর্ম এবং কর্মাতীত দুটি আলাদা তত্ত্ব নয়, একই তত্ত্বের দুটি দিক। ঐ মহাসত্য ধারণা করিয়া ভক্তপ্রবর রামপ্রসাদ বুঝিতে পারিলেন আর ছুটাছুটির কোনও প্রয়োজন নাই। 'মা-ই সব'—ইহা সর্বদা স্মরণ করিয়া পাপপুণ্য, বিধিনিষেধ, ভালমন্দ প্রভৃতি যাবতীয় দ্বন্দ্বের বাহিরে দাঁড়ানোই উত্তম পন্থা। মায়ের ইচ্ছায় নিজের ইচ্ছা সমর্পণ করিয়া দেওয়াই শ্রেয়স্কর। মা সর্বান্তর্যামিণী—তিনি সব দেখিতেছেন, সব জানিতেছেন। শিশুর মতো তাঁহার উপর নির্ভর করিতে পারিলে আর কোনও হাঙ্গামা থাকে না।

রামপ্রসাদ 'কালীর মর্ম' জানিয়া ধর্মাধর্ম' সব ছাড়িতে পারিয়াছিলেন। ধর্মাধর্ম সব ছাড়া অর্থে নিজের অহংবুদ্ধি-প্রসূত যাবতীয় আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টাকে ত্যাগ করা। কালীর মর্ম হইল ভগবৎসত্তার সর্বব্যাপিত্ব, সর্বাবগাহিত্ব, সর্বকর্তৃত্ব। কালীর মর্ম যখন জানি নাই, তখন 'ক্ষুদ্র আমি'ই আমার জীবনে প্রধান হইয়া বসিয়াছে। সেই ক্ষুদ্র আমির কত লম্ফঝম্প। কালীর নিকট প্রার্থনা ও আবদারেরই কি আর অন্ত আছে? "মা, আমার শরীর ভালো রাখো, নাতি-নাতনীদের চিরকাল বাঁচাইয়া রাখো, অর্থ-কষ্ট দূর কর, শত্রুদের নিপাত কর, অমুক ইচ্ছাটা পূর্ণ কর" ইত্যাদি, ইত্যাদি। মা যদি না শুনিলেন তো মায়ের প্রতি নালিশেরই কি সীমা আছে? "মা, এত ডাকিলাম, তবুও

তুমি শুনিলে না? আমি তো জীবনে কোনও পাপ করি নাই—তবুও আমায় কেন ঐ প্রচণ্ড শোক পাইতে হইল?" ইত্যাদি।

কালীর মর্ম যখন জানিয়াছি তখন 'ক্ষুদ্র আমি' লজ্জায় মাথা লুকাইয়াছে। তখন দেখিতে পাইয়াছি জীবনের অন্তরে বাহিরে মায়ের সর্বব্যাপিনী মূর্তি। যাহা কিছু ঘটিতেছে তাঁহাতেই ঘটিতেছে। তিনিই সর্বকর্মনায়িকা, সর্বকর্মসাধিকা। দুই হাতে বর ও অভয় দেন। আবার দুই হাতে সঙ্কট ও ভীতি প্রসার করেন। তাঁহাতেই জন্ম, তাঁহাতেই মৃত্যু, তাঁহাতেই উল্লাস, তাঁহাতেই বেদনা, তাঁহাতেই বন্ধন, তাঁহাতেই মুক্তি। শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুর উদ্যানবাটীতে তাঁহার শেষশয্যায় একদিন বলিয়া উঠিলেন, "কি দেখছি জানো? মা-ই দেবতা, আবার মা-ই বলি ও হাড়কাট।" ইহারই নাম কালীর মর্ম জানা, কালীই যে বৃহত্তম—ব্রহ্ম তাহা জানা। ভক্ত ভেকটির এই জ্ঞান হইয়াছিল। তাই রামের ধনুকের ঘা খাইয়া সে চিৎকার করিয়া উঠে নাই। 'Thy will be done' 'তোমারি ইচ্ছা পূর্ণ হউক'—শ্বাস বন্ধ করিয়া এই মন্ত্র জপ করিয়াছিল।

যাহা বৃহত্তম তাহা হইতে কিছু বাদ দেওয়া চলে কি? তাঁহার অনুভূতিতে স্বাস্থ্য রাখিয়া রোগকে বাদ দেওয়া যায় কি? সুরূপটি রাখিয়া কুরূপকে ছুঁড়িয়া ফেলা সম্ভবপর কি? মিত্রকে রাখিয়া শত্রুকে কবর দেওয়া যায় কি? না—ব্রহ্ম হইতে কিছু বাদ দেওয়া চলে না। বাদ দিলে তিনি তো আর ব্রহ্ম থাকেন না। তাই তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ বলিতেছেন, যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে অথ তস্য ভয়ং ভবতি। "যখন কেহ সর্বাবগাহী ব্রহ্ম হইতে অণুমাত্র কিছু পৃথক করিতে চান, তখন তাঁহার ভয়ের কারণ থাকে।"

অতএব ছান্দোগ্য উপনিষদে শাণ্ডিল্য ঋষি উপদেশ দিতেছেন—সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত। যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করিতেছ সকলই ব্রহ্ম—তাঁহা হইতেই সৃষ্টি, তাঁহাতেই স্থিতি আবার তাঁহাতেই প্রলয়। শান্ত হইয়া এই ভাবনায় চিত্ত নিবিষ্ট কর। সৃষ্টি দেখিয়া হাসিও না, স্থিতি পাইয়া নাচিও না, তিরোভাব আসিলে কাঁদিও না। ব্রহ্মমূর্তি মহাকালীর ত্রিবিধ নৃত্যরঙ্গে বাস্তবিক-পক্ষে এক নিবিড় সমতা অনুস্যূত। সেই সমতাকে ধরিবার চেষ্টা কর।

সেই সাম্যকে ধরিতে পারিলে আমরা শান্ত হইয়া যাই। কোনও কিছু আর আমাদিগকে চঞ্চল করিতে পারে না। মান-অপমান নিন্দা-স্তুতি সম্পদ-বিপদ সকল অবস্থাতেই আমরা অবিচলিত থাকি। গীতা বলিতেছেন—

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাৎ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥

গীতা, ৫।১৯

"যাঁহাদের মন সাম্যে অবস্থিত, তাঁহারা এই জন্মেই সংসারকে জয় করিয়াছেন। চিরশুদ্ধ ব্রহ্মের অপর নাম সমতা। এই তত্ত্বদ্রষ্টা মহাত্মাগণ তাঁহাদের সমদৃষ্টির ফলে সর্বদা ব্রহ্মেই অবস্থান করেন।"

সুরথ রাজা এবং সমাধি বৈশ্য দুজনেই মায়ের উপাসনায় লাগিয়া গেলেন, উদ্দেশ্য মায়ের দর্শনলাভ। দেবীসূক্ত জপ করিয়া, মায়ের মৃত্তিকামূর্তি গড়িয়া, পুষ্প ধূপ দীপ দিয়া, আহার-বিহারে সংযত থাকিয়া, ধ্যান-ধারণায় মগ্ন হইয়া, এমনকি নিজের শরীর হইতে রক্ত অর্পণ করিয়া তিনটি বৎসর কাটাইয়া দিলেন। মায়ের দয়া হইল। ভক্তদ্বয়ের কাছে

দেবী প্রত্যক্ষ আবির্ভূতা হইলেন। বলিলেন, তোমাদের তপস্যায় তুষ্ট হইয়াছি, বর চাও। রাজার মনে বিষয়-বাসনা সম্পূর্ণ যায় নাই। তিনি হৃতরাজ্য ফিরিয়া পাইতে চাহিলেন, বৈশ্য সমাধি বুঝিয়াছিলেন, সং—সার, সংসার। কাজেই তিনি চাইলেন জ্ঞান, যাহা 'আমি-আমার'-রূপ মিথ্যাভিনিবেশকে দূর করে। কালী-ব্রহ্মের মর্ম উপলব্ধি হইলে 'আমি-আমার' ভাবের ক্ষান্তি হয়। তখন শান্তি।

সুরথ রাজার ন্যায় অনেক উপাসক কালী-ব্রহ্মের মর্ম জানিতে উৎসাহী হন না। তাঁহারা শ্মশানকালীর, রক্ষাকালীর অর্চনা করিয়াই থামিয়া যান। সপ্তদ্বারের পারে মহাসিংহাসনে রাজরাজেশ্বরী বসিয়া আছেন, কিন্তু সপ্তদ্বার পর্যন্ত যাওয়ার ধৈর্য ও অনুরাগ সকলের হয় না। কাজেই রাজরাজেশ্বরীর আসল মূর্তিদর্শন সমাধি-বৈশ্যের ন্যায় দু'চারজনের ভাগ্যেই ঘটে। রামপ্রসাদ হেঁয়ালি চাপাইয়া গাহিতেছেন—

প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যাঁরে।
সেটা চাতরে কি ভাঙবো হাঁড়ি বোঝ না
রে মন ঠারে ঠোরে॥

মানের নাম করিতেছি, মায়ের কথা বলিতেছি, লিখিতেছি কিন্তু মা বলিতে হৃদয়ের হৃদয়ে আমি কি বুঝিতেছি তাহা তোমাদের বুঝাইব কি করিয়া? সে যে গভীর হইতে গভীরতর তত্ত্ব। বর্ণনা করিবার ভাষা নাই। "বেদ-বেদান্ত পায় না অন্ত," ষড়দর্শনে না পায় দরশন আগম নিগম তন্ত্রসারে।" অতএব ঠারে ঠোরে বুঝিয়া লও। ইসারায় হৃদয়ঙ্গম কর। কালীর মর্ম ঐইভাবে উপলব্ধি করিয়া পাপ-পুণ্য, সুখ-দুঃখ, আলোক-আঁধারের পারে গিয়া দাঁড়াও। শান্ত হও।

জেগে থাকো

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

মাথা পেতে আছি প্রভু, বজ্র হানো শিরে!
রুদ্রাণী, তোমারে নমি দুঃখের তিমিরে!
বেদনার হল-মুখে বিদীর্ণ আত্মার
মরুতে ফোটাও তুমি পুষ্পের সম্ভার!
আনো মোর জন্মান্তর! তোমা হ'তে মন
স'রে গিয়ে পঙ্ক-কুণ্ডে ছিলো নিমগন!
তন্দ্রাচ্ছন্ন সেই ক্ষণে এলো তব ঝড়!
উড়াইল শুভবুদ্ধি! আঘাতে জর্জর
ভগ্ন-উরু আমি আজ! কোথায় আশ্রয়?
শোনাও সে দিব্যবাণী ওগো দয়াময়,
"মন্মনা, মদ্ভক্ত হও! যে রাখে আমারে
অনুক্ষণ ভাবনায়, মুক্ত করি তারে
সর্ব পাপ হতে। জেগে থাকো অহরহ;
যারা জাগে তারা পায় মোর অনুগ্রহ!"

সমাজ-সেবার নবরূপ

ডক্টর নীরদবরণ চক্রবর্তী

সমাজ-সেবা যে মহৎকর্ম, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সেজন্যই সমাজ-সেবীরা আমাদের সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র। সমাজ-সেবা মহৎকর্ম হলেও আমরা অনেকেই সমাজ-সেবার চেয়ে আত্ম-সেবা, পরার্থ-চিন্তার চেয়ে স্বার্থ-চিন্তা অধিকতর কাম্য বলে মনে করি। ফলে অন্যায় লোভ, অসঙ্গত প্রতিযোগিতা এবং অশালীন ক্ষমতা-মত্ততা সমাজে প্রাধান্য পায়, দেখা দেয় কালোবাজার, গলা-কাটা মুনাফা-শিকার, ধনী ও ক্ষমতাবানের পীড়ন, অন্যান্য বিবিধ অপরাধ এবং নিরুপায়, নিঃসহায় সাধারণ মানুষের হাহাকার। আজ আমাদের দেশের এই অবস্থা।

পরিত্রাণের উপায় কি? এবিষয়ে নানা মুনির নানা মত। আমরা মুনি নই। মত দেবার অধিকার রাখি না। তবে মনে হয়, সমাজ-সেবার নবরূপায়ণের মাধ্যমে এ সঙ্কট থেকে উদ্ধার পাওয়া যেতে পারে। সমাজ-সেবার নবরূপায়ণ বলতে কি বোঝাচ্ছি, তা খুলে বলা দরকার।

আমরা সকলেই সামাজিক জীব, সমাজে বাস করি। খাদ্য, পানীয়, বেশ-ভূষা, বাসস্থান, ভাষা, আমোদ-আহ্লাদ সব কিছুর জন্যই আমাদের সমাজের ওপর নির্ভর করতে হয়। সমাজে থাকি এবং সমাজের মধ্যেই কাজ করি বলে আমাদের সকলের স্বাভাবিক কর্মই সামাজিক কর্ম। আসলে আমরা সচেতন বা অসচেতন ভাবে সমাজেরই সেবা করে যাচ্ছি। কিন্তু অধিকাংশ লোকই একথা বোঝে না বা জানে না।

সাধারণ লোকের ধারণা, সমাজ-সেবা সকলের কাজ নয়; বিশেষ বিশেষ লোকেরই কাজ। সমাজ-সেবা করতে হ'লে সংসারের স্বাভাবিক কাজকর্ম করা যায় না। পৈতৃক অর্থ দরকার। অফুরন্ত অবকাশ দরকার এবং বাড়ীর কোন সমস্যা না থাকা দরকার। সমাজসেবী হ'তে হ'লে অকৃতদার হওয়া বাঞ্ছনীয়। আর সবচেয়ে ভালো হয় সন্ন্যাসী হ'তে পারলে। দাতব্য চিকিৎসালয়-স্থাপন, পুষ্করিণী-খনন, পথ-ঘাট-নির্মাণ, স্কুল-কলেজ-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সমাজ-সেবামূলক কাজ বলে পূর্বে স্বীকৃত ছিল। অধিকাংশ সময় জমিদার-শ্রেণীর লোকেরাই একাজ করতেন। এখন দিন বদলেছে। এসব কাজ স্বাধীন দেশের সরকারই সাধারণতঃ করে। তবে কোন কোন ব্যবসায়ী বা জন-সেবা-মূলক প্রতিষ্ঠানও মাঝে মাঝে একাজ করে থাকে। বন্যার্ত-ত্রাণ, খরা-দুঃখদূরীকরণ এবং অন্যান্য বিপদকালীন সাহায্য-দান সরকার, ব্যবসায়ী, জন-সেবা-মূলক প্রতিষ্ঠান সবাই করে।

এই সমস্ত বৃহৎ সমাজসেবা-কর্ম নিশ্চয়ই মহৎ। কিন্তু প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে প্রত্যেকটি সামাজিক মানুষই সমাজের যে সেবা করে চলেছে, তার কি কোন মূল্য নেই? সাধারণ দৃষ্টিতে সার্থকতাহীন বিন্দু বিন্দু জল নিয়েই তো বিরাট সাগর, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালিকণা নিয়েই তো মহামরু-ভূমি। আমাদের ধারণা, তেমনি প্রত্যেকটি সামাজিক মানুষেরই ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, সামান্য সমাজ সেবা দিয়েই বিরাট সমাজের প্রতিষ্ঠা। কারও সেবাই উপেক্ষণীয় নয়, অবজ্ঞেয় নয়; সকলের সেবাই সম্মানের ও শ্রদ্ধার।

মেথর যদি ময়লা পরিষ্কার না করতো, ধোপা যদি কাপড় পরিষ্কার না করে দিত, মুচি যদি জুতো সেলাই না করতো, তবে সমাজ টিকতো কি? মেথর, ধোপা, মুচি প্রভৃতি অবহেলিত, অপাঙ্‌ক্তেয় ব্যক্তিরাও সমাজ-সেবাই করে যাচ্ছে। এরাও সমাজ-সেবী। অন্যেরাও তাই। ছাত্র, শিক্ষক, করণিক, পদস্থ কর্মচারী, পুলিশ, সামরিক কর্মী, কৃষক, জেলে, তাঁতী যে যাই করুক না কেন সমাজসেবাই করছে। কারণ তাদের প্রত্যেকেরই কাজ কোন না কোন ভাবে সমাজের উপকারে আসছে। তবে সাধারণতঃ আমরা এবিষয়ে অবহিত নই।

আমরা যে প্রত্যেকেই নিজ নিজ মতে সমাজ-সেবা করে চলেছি, এবিষয়ে আমাদের অবহিত হওয়া প্রয়োজন। এতে আমরা নিজেদের এবং অন্যদের কাজের গুরুত্ব ও মূল্য বুঝবো, কাউকেই আর অবজ্ঞা করতে পারবো না, কর্মে আনন্দ পাওয়া যাবে, ফলে কাজ আরও ভাল হবে, সমাজ উপকৃত হবে এবং সর্বোপরি দৃষ্টিকোণ একটু ঘুরিয়ে নিলেই আমরা ধর্মাচরণ বা ঈশ্বর-সেবা করছি বলে মনে হবে। অর্থাৎ একই সঙ্গে ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ সাধিত হবে। বক্তব্য ব্যাখ্যা করছি।

সমাজে যারা সাধারণ কাজ করে তারাও সমাজেরই সেবা করছে, এ বোধ জাগ্রত হ'লে আমরা সাধারণ কাজ-করা লোকদের আর অবজ্ঞা করবো না। সমাজ-সেবী বলে তাদেরও শ্রদ্ধা করবো। তারাও নিজের কাজ 'শুধু দিন-যাপনের, শুধু প্রাণ-ধারণের গ্লানি বলে মনে না করে, সমাজ-সেবা বলে মনে করে তার গৌরব উপলব্ধি করবে, কর্মের গৌরব উপলব্ধি করে কাজে আনন্দ পাবে, তাতে কাজ খুব ভাল হবে। ফলে মুচি, মেথর, জেলে, তাঁতী কেউই আর অবজ্ঞার পাত্র থাকবে না। সবাই হবে শ্রদ্ধেয় সমাজ-সেবী।

সমাজের অন্যান্য লোক—ছাত্র, শিক্ষক, করণিক, পদস্থকর্মচারী, উকিল, ডাক্তার, এমনকি ব্যবসায়ীও সমাজেরই সেবা করে। ব্যবসায়ী ব্যবসায় করে বলেই জিনিসপত্র আমাদের কাছে সহজলভ্য হয়। এই দিক থেকে ব্যবসায়ীও যে সমাজের সেবা করছে তাতে সন্দেহ কি? তবে ব্যবসায়ীকে এবিষয়ে সচেতন হ'তে হবে। স্বার্থ-বুদ্ধি যদি তার দৃষ্টিকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করে দেয়, তবে সে তার বৃত্তির সামাজিক পটভূমিকা বিস্মৃত হয়, তখন সে কালোবাজার সৃষ্টি করে, অন্যায় মুনাফা লোটে। কিন্তু যদি সে অন্তর দিয়ে তার সমাজ-সেবার দিকটি উপলব্ধি করে তবে অন্যায় লোভ তাকে আর পরিচালিত করবে না। অন্যেরাও ব্যবসায়ীর এই সমাজ-সেবার দিকটি যদি স্মরণ রাখে তবে ব্যবসায়ী সমাজ সেবাব্রত ভঙ্গ করলে তারাই একত্রে ব্যবসায়ীর সঙ্গে অসহযোগ করে তাকে শাস্তি দেবে। সমাজের সমস্ত লোক যদি একজন ব্যবসায়ীর সঙ্গে অসহযোগ করে তবে সে সমাজে ব্যবসায় করবে কি করে? অর্থাৎ ব্যবসায়কে সমাজ-সেবা বলে গ্রহণ করলে সৎ ব্যবসায়ী না হ'য়ে উপায় নেই।

ছাত্র যখন লেখাপড়া করে তখনও সে সমাজেরই সেবা করে। লেখাপড়া করলে ভবিষ্যতে সে সুনাগরিক হবে, সমাজ তাতে উপকৃত হবে। আর সে যদি ঠিকভাবে শিক্ষা-লাভ না করে তবে ভবিষ্যতে অসামাজিক কর্মে লিপ্ত হবে, এমন আশঙ্কা অমূলক নয়। তাতে সমাজের ক্ষতি। শিক্ষক, ডাক্তার প্রভৃতি যে সমাজ-সেবী একথা সাধারণতঃ সকলেই স্বীকার করে। শিক্ষক, ডাক্তার প্রভৃতির

একথা অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। তবেই তাঁরা কর্মে অবহেলা করতে লজ্জা পাবেন। সমাজের কলহ বা অন্যায় দূর করতে সাহায্য করে উকিলও সমাজেরই সেবা করছেন। তিনিও সমাজ-সেবী। একথা উপলব্ধি করলে তিনিও কাজ করবেন আরো ভাল।

কত আর বলবো। আসল কথা, আমরা যে যা-ই করি না কেন, তা-ই সমাজ সেবা, ক্ষুদ্র নয়, তুচ্ছ নয়—এ বোধ যদি জাগ্রত হয় তবে যে যা-ই করুক না কেন তাতে সে আনন্দ পাবে, ফাঁকি দেবে না। শুধু অর্থোপার্জনের জন্যই কাজ, এ হীন ভাব তার থাকবে না। কর্মের গৌরবে সে গৌরবান্বিত হবে। এই গৌরব তাকে সৎ হতে, নিষ্ঠাবান হতে প্রেরণা দেবে। ফলে অন্যায় সাধারণতঃ কেউ করবে না, আজকের দুঃখ দূর হবে, নানা বিপর্যয় থাকবে না। আমরা সুখে শান্তিতে সমাজে বাস করতে পারবো।

আজকে আমরা শুধু দাবি জানাই আর প্রতিবাদ করি। তখন আমরা নিজেদের কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হ'য়ে দাবির কথা বলবো না, নিজের কর্তব্য করেছি কি-না, তা-ই বিচার করবো। আর সকলেই যদি তা-ই করে, তবে প্রতিবাদ কি নিয়ে হবে? আমরা তখন সবাই সমাজ-সেবী—এই গৌরববোধে, কর্তব্য-বোধে উদ্বুদ্ধ হ'য়েপরস্পর প্রীতি-বিনিময় করবো, পরস্পরের সাহায্য ও সহযোগিতায় নিজেকেও সার্থক করবো, অন্যকেও সার্থক হ'তে সাহায্য করবো। তখন আমাদের বক্তব্য হবে—প্রতিবাদ নয়, প্রীতিবাদ।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের কোন সময়ে ভক্তগণ-পরিবৃত হ'য়ে নানা সদালাপ করবার সময় বৈষ্ণবধর্মের কথা আলোচনা করেছিলেন। তখন নরেন্দ্রনাথও সেখানে উপস্থিত। শ্রীরামকৃষ্ণ বৈষ্ণবদের 'জীবে দয়া' ভাবটির চেয়ে 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' করার ভাবটির উৎকর্ষ ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছিলেন। নরেন্দ্রনাথ সে ব্যাখ্যায় মুগ্ধ হ'ন। স্বামী সারদানন্দ এই প্রসঙ্গে বলেছেন, "ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের ঐসকল কথা তখন সকলে শুনিয়া যাইল বটে, কিন্তু উহার গূঢ়মর্ম কেহই তখন বুঝিতে ও ধারণা করিতে পারিল না। একমাত্র নরেন্দ্রনাথই সেদিন ঠাকুরের ভাবভঙ্গের পর বাহিরে আসিয়া বলিলেন, 'ঠাকুর আজ ভাবাবেশে যাহা বলিলেন, তাহাতে বুঝা গেল বনের বেদান্তকে ঘরে আনা যায়, সংসারের সকল কাজে ইহাকে অবলম্বন করিতে পারা যায়। মানব যাহা করিতেছে, সে-সকলই করুক তাহাতে ক্ষতি নাই, কেবল প্রাণের সহিত ইহা সর্বাগ্রে বিশ্বাস ও ধারণা করিলেই হইল—ঈশ্বরই জীব- ও জগৎরূপে তাহার সম্মুখে প্রকাশিত রহিয়াছেন।'" ঠাকুরের এই ব্যাখ্যা নরেন্দ্রনাথকে সেবাধর্মপ্রচারে উদ্বুদ্ধ করেছিল। পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ শিবজ্ঞানে জীব-সেবাকেই যুগধর্ম বলে প্রচার করেছিলেন।

স্বামীজী বলেছেন, ঈশ্বর সর্বত্রই আছেন, তিনি মানুষের মধ্যেও আছেন। দেবালয়ের ঈশ্বরকে যে নিষ্ঠা, যে পবিত্রতা নিয়ে আমরা সেবা করি, সেই নিষ্ঠা, সেই পবিত্রতা নিয়ে মানুষের সেবা করলেও ঈশ্বরেরই সেবা করা হয়।

মানুষের সেবাই ঈশ্বরসেবা বা ধর্ম।

আজকের মানবতাবাদের দিনে স্বামীজীর এই মন্ত্র আমাদের জীবনের বীজমন্ত্র হ'তে পারে। মানুষের জয়গান আজ তো সবাই করে। সাধারণভাবে ধর্মের প্রতি মানুষ আকৃষ্ট না হ'লেও মানুষের সেবারূপ ধর্মে আকৃষ্ট না হওয়ার কোন কারণ নেই।

পূর্বে বলেছি, আমরা যে যা করছি তা সবই সমাজ-সেবা—এ-বোধ জাগ্রত হ'লে শুধু ঐহিক নয়, পারত্রিক কল্যাণও হবে, আমরা ধর্মাচরণ করছি, একথা বোঝা যাবে। সমাজ-সেবা-বোধ জাগ্রত হ'লে ঐহিক কল্যাণ কিভাবে হয় তা আমরা আলোচনা করেছি। এবার সমাজ-সেবা-বোধ থেকে কিভাবে পারত্রিক কল্যাণ হবে, তা স্বামীজী-প্রচারিত সেবা-ধর্মের-আলোকে আলোচনা করবো।

সমাজ-সেবা মানে তো সমাজের মানুষেরই সেবা। মানুষ ছাড়া সমাজ বলে তো কিছু নেই। আমরা সংসারে যে যা করছি তাতে সমাজ সেবা করছি, একথা বলার অর্থই এই যে, আমরা সকলে মানুষেরই সেবা করছি। আমাদের সমাজ-সেবা-বোধ যদি গভীর হয়, আমাদের দৃষ্টি যদি আরও প্রসারিত ও অন্তর্ভেদী হয় তবে আমরা উপলব্ধি করবো, আমরা মানুষের সেবা করে ঈশ্বরেরই সেবা করছি। আমাদের সাংসারিক সমস্ত কর্ম ঈশ্বরেরই সেবা, অর্থাৎ ধর্মাচরণ। এই বোধ গভীর হ'লে ধর্মাচরণের মধ্যে যে নিষ্ঠা, যে ঐকান্তিকতা স্বাভাবিক, সেই নিষ্ঠা, সেই ঐকান্তিকতা আমাদের কর্মে সঞ্চারিত হবে। ফলে আমাদের কর্ম অনেক বেশী আন্তরিক এবং অনেক বেশী সার্থক হবে। আমরা আরও ভাল শিক্ষক, ছাত্র, করণিক, পদস্থ কর্মচারী, ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য বিবিধ বৃত্তির কর্মী হব। সমাজের বর্তমান অবস্থা আর থাকবে না। আমরা প্রাত্যহিক কর্মে সমাজরূপী ঈশ্বরের সেবা করে ধন্য হব। ঈশ্বরবোধে সেবা করায় আমাদের পারত্রিক কল্যাণও হবে। এইভাবে সমাজ-সেবা-বোধে উদ্বুদ্ধ হলে আজকের স্বার্থ-সর্বস্বতার অন্ধকারও কাটবে; বর্তমান দুর্গতি থেকে আমরা পরিত্রাণ পাবো। সমাজ-সেবার এই নবরূপ আমাদের আকৃষ্ট করুক, এই প্রার্থনা করি।

মা

(গান)

স্বামী চণ্ডিকানন্দ

বদনভরে মা বলে ডাক, আদরিণী নেবে কোলে।
সকল দুখ সকল জ্বালা এক ডাকেতে যাবে চলে ॥
সদানন্দময়ী এবার
এসেছে মা হয়ে সবার
সুজন কুজন নাই রে বিচার, কোলে নেয় সে 'বাছা' বলে ॥

ধরা দিতে আমাদেরে
এসেছে সে 'মা' নাম ধরে
ছুটে এসে কোলে করে বারেক যদি ডাকে ছেলে—
মা, মা, মা বলে ॥

আমেরিকায় বিবেকানন্দস্মৃতি

ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার

১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে মার্চ মাসের শেষে আমি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে যাই। প্রায় এক বছর সে দেশে ছিলাম – প্রথমে শিকাগো (Chicago) এবং পরে পেন্‌সিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ইতিহাসের সাময়িক অধ্যাপক (Visiting Professor)-ভাবে। শিকাগো যাবার ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গেই মনের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতি জেগে উঠল। ৬৫ বৎসর পূর্বে তখনকার দিনে অখ্যাত অজ্ঞাত সহায়সম্বলহীন এক যুবক ভারতীয় সন্ন্যাসী এই শহরে কিভাবে সমস্ত বিশ্বের দরবারে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির গৌরব প্রতিষ্ঠা করে আমাদের জাতীয় জীবনে নূতন উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিলেন, সেই কথাই বার বার মনে পড়তে লাগল। মনে করলাম যে, যখন অভাবিত উপায়ে আমার শিকাগোযাত্রা সম্ভব হল, তখন স্বামীজীর চরণরজঃপূত সেই ধর্ম-মহাসভার (Parliament of Religions) অধিষ্ঠান-কক্ষটি দর্শন করে ধন্য হব। সুতরাং শিকাগো পৌছবার কয়েকদিন পরেই সেই স্থানটি কোথায় তার অনুসন্ধান করলাম। তখন ঐ শহরে বহুসংখ্যক ভারতীয় যুবক ছাত্র অনেক দিন যাবৎ ভারত সরকারের বৃত্তি পেয়ে আন্তর্জাতিক হোষ্টেলে (International Hostel) ছিল। তাদের জিজ্ঞেস করলাম; তারা বলল এ বিষয়ে কিছুই জানে না। কয়েকজন বয়স্ক ভারতীয় ওদেশে বহুদিনের বাসিন্দা হলেও ঐ ধর্মসভার অধিবেশন কোথায় হয়েছিল বলতে পারলেন না। একজন জানালেন সে বাড়ীটা এখন একটি নাট্যশালায় পরিণত হয়েছে এবং সে নাট্যশালার নামও বললেন। অনেক খোঁজ করে সেখানে গেলাম, কিন্তু বাড়ীটা দেখে আমার সন্দেহ হল—ঐ বাড়ীতে ধর্ম-মহাসভার অধিবেশন হবার উপযুক্ত কোন কক্ষ দেখলাম না। একজনকে জিজ্ঞেস করলাম যে এ বাড়ীটা কবে তৈরী হয়েছে। তিনি বললেন, বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে; সুতরাং আমার সন্দেহ সত্যে পরিণত হল। তখন আমার মনে হল দুই উপায়ে এর সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। সেই ধর্মসভার সমসাময়িক বিবরণ আছে এমন কোন বই থাকলে তাতে অথবা সেই সময়কার পুরানো সংবাদপত্রে জায়গাটির নির্দেশ থাকা সম্ভব। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থ-তালিকা খুঁজে একখানা বই পেলাম—History of the Parliament of Religions by Neely. এই বইখানা থেকেই সন্ধান পেলাম যে, যে-বাড়ীতে এই পার্লামেণ্টের অধিবেশন হয়েছিল সেটি এখন এই শহরের প্রসিদ্ধ যাদুঘর (Museum)। বস্তুতঃ যাদুঘরের জন্যই বাড়ীটি তৈরী হয়েছিল—১৮৯৩ সালে বাড়ীর কাজ শেষ হয়, কিন্তু যাদুঘরের জিনিসপত্র সেখানে নেবার আগেই এই বাড়ীটির একটি বিশাল কক্ষে উক্ত পার্লামেণ্টের অধিবেশন হয়। পরে এটি যাদুঘরে পরিণত হয়। এই সংবাদ সংগ্রহ করে আমি সেই যাদুঘরে গেলাম। ওদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের (Professors) যথেষ্ট প্রতিপত্তি আছে। আমি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের

অধ্যাপক শুনে ওখানকার অধ্যক্ষ আমাকে খুব খাতির করলেন এবং আমার ওখানে যাওয়ার উদ্দেশ্য শুনে কয়েকজন প্রাচীন কর্মচারীকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন। তাঁদের মধ্যে একজন বৃদ্ধ বললেন যে, ওই বাড়ীতেই হলঘরে পার্লামেণ্টের অধিবেশন হয়েছিল এবং তিনি শুনেছেন যে একজন হিন্দু সন্ন্যাসী সেখানে বক্তৃতা করে খুব বিখ্যাত হয়েছিলেন। সেই হলঘরটি তখন বন্ধ ছিল, কিন্তু অধ্যক্ষ নিজে ঘর খুলিয়ে আমাকে সেই হলঘরে নিয়ে গেলেন। তখন ৬৫ বৎসর পূর্বেকার সেই অতীত দিনের দৃশ্য আমার চোখে ভেসে উঠল—মনে হল কানে শুনছি সেই উদাত্ত কণ্ঠের ধ্বনি "আমেরিকান ভগিনী ও ভ্রাতৃগণ" আর সঙ্গে সঙ্গে বিপুল করতালি-ধ্বনি। বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত এই স্থানটি দর্শন করে জীবন ধন্য হল।

কিন্তু যখনই মনে হত যে, কোন ভারতীয়ই এই পবিত্র স্থানটি কোথায় ছিল তার সম্বন্ধে কিছুই জানেন না এবং জানবার ইচ্ছাও কখনও তাদের মনে জাগে নাই তখন খুবই বেদনা বোধ করতাম। তিন চার মাস ওখানে থাকাবার পর যখন ওদেশের অনেকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হল তখন আমি স্বামীজীর কথাপ্রসঙ্গে আমার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে প্রস্তাব করলাম যে, ওই যাদুঘরে একটি প্রস্তর-ফলক দ্বারা স্বামীজীর স্মৃতিরক্ষা করা সম্ভবপর কিনা। অনেকেই প্রস্তাবটি সমর্থন করলেন, কিন্তু জানালেন যে আমেরিকার নিয়মানুসারে এইরূপ ফলক-প্রতিষ্ঠা ভারত সরকারের প্রস্তাব ছাড়া হতে পারে না এবং আরও অনেক রকম আইনের জটিলতা আছে। আমি শিকাগোতে প্রায় ছয় মাস ছিলাম, তার মধ্যে অনেকের সঙ্গেই এবিষয়ে আলাপ করেছি এবং তখনকার ঐ স্থানের রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বিশ্বানন্দের নিকটও এই প্রস্তাব করেছিলাম। তিনিও চেষ্টা করবেন বলে আশ্বাস দিলেন।

আমি আমেরিকা থেকে দেশে ফিরে আসবার অনেকদিন পরে শুনেছিলাম যে, শিকাগো শহরের কয়েকজন ভারতীয় নাগরিক স্বামীজীর স্মৃতিফলক-প্রতিষ্ঠার জন্য ঐ স্থানের কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করেন। এই আবেদনপত্র সম্বন্ধে ভারত সরকারের রাজদূত বা স্থানীয় প্রতিনিধির নিকট মতামতের জন্য পাঠানো হয়, কিন্তু তিনি এ বিষয়ে কোন আগ্রহ দেখান নি, সুতরাং আবেদনপত্রে কোন ফল হয় না। এই সংবাদ কেহ ভারত সরকারকে জানান এবং ভারত সরকার নাকি তাঁদের প্রতিনিধির অবহেলা বা ঔদাসীন্যের বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য করেন। একথা কতদূর সত্য এবং মোটের উপর ঐ আবেদনে কোন ফল হয়েছে কিনা তা আমার জানা নেই। দিল্লীর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যাঁদের সংস্পর্শ আছে তাঁরা চেষ্টা করলে এ বিষয়ে সঠিক খবর বের করতে পারেন। ভারত সরকার আমার উপরে খুব প্রসন্ন নন, সুতরাং আমি চেষ্টা করলে হয়তো উল্টো ফল হবে, এই ভেবে আমি এবিষয়ে কোন চেষ্টা করিনি।

স্বামীজী শিকাগো শহরের ধর্ম-মহাসভায় যে-সকল বক্তৃতা করেন সে-সময়কার পুরানো দৈনিক সংবাদপত্রে তার এমন কিছু উল্লেখ থাকতে পারে, যা কোন বইতে ছাপা হয় নাই—এই ভেবে আমি সেগুলি পড়বার চেষ্টা করি। এই উদ্দেশ্যে আমি Chicago Daily Tribune এবং Chicago Daily News—এই দুই কাগজের সম্পাদকের নিকট চিঠি লিখি যে, ১৮৯৩ সনের ১১ই সেপ্টেম্বর থেকে ঐ মাসের শেষ তারিখের কাগজগুলি আমি তাঁদের অফিসে গিয়ে পড়তে

পারি কি না। এর উত্তরে তাঁরা সানন্দে অনুমতি দিলেন, কিন্তু আরও লিখলেন যে, আমি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ঐসব সংখ্যার মাইক্রোফিল্ম (Microfilm) সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারেই রক্ষিত আছে—সুতরাং আমি অনায়াসে সেখানেই পড়তে পারি। আমি এই চিঠি পেয়েই গ্রন্থাগারে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম যে, আমি ঐ ঐ সংবাদপত্রের উল্লিখিত সংখ্যাগুলি পড়তে চাই—কবে আসলে সেগুলি পাওয়া যাবে। উত্তরে একটি মহিলা-কর্মচারী জানালেন যে, ইচ্ছে করলে আমি তখনই পড়তে পারি এবং আমি সম্মতি জানালে বোধ হয় আট-দশ মিনিটের মধ্যেই সেই ফিলমগুলি নিয়ে এসে আমাকে একটি ঘরে নিয়ে গেলেন। সেখানে ফিলম পড়বার ৩।৪টি যন্ত্র আছে। কিভাবে ফিলমগুলি যন্ত্রে বসাতে হয় আমাকে দেখিয়ে দিলেন। আমি ৩।৪ দিনের মধ্যেই সবগুলি পড়লাম। পড়ে স্বামীজী সম্বন্ধে কয়েকটি নূতন তথ্য জানতে পারলাম। প্রথমেই একটা বিষম খটকা লাগল। বরাবর স্বামীজীর জীবনী-গ্রন্থে পড়েছি যে, ধর্মসভায় স্বামীজীর প্রথম বক্তৃতায় 'আমেরিকার ভগিনী ও ভ্রাতৃগণ' এই সম্বোধন করা মাত্রই কয়েক মিনিট পর্যন্ত তুমুল প্রশংসাধ্বনি উত্থিত হয়। কিন্তু শিকাগোর এই দুই কাগজে তার কোন উল্লেখ নেই। এই দুই কাগজ যে স্বামীজীকে খুব পছন্দ করতেন না তার অনেক পরিচয় পেলাম। এক সংখ্যায় স্বামীজীর একটি ছবি আছে এবং তাঁর বক্তৃতার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হয়েছে—শিরোনামায় লেখা আছে "A Hindu monk denounces Christianity." অনেক পড়া-শুনার ও আলোচনার পর এই রহস্যের সমাধান করেছিলাম। ব্যাপারটি পুরোপুরি বোঝাতে গেলে অনেক অপ্রীতিকর ব্যক্তিগত আলোচনা করতে হয়—এই সুদীর্ঘকাল পরে তা না করাই ভাল। সংক্ষেপে বলতে পারি যে, ঐ ধর্মমহাসভায় ভারতীয় আরও কয়েকজন প্রতিনিধি ছিলেন—তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বেশ প্রতিষ্ঠা-পন্নও ছিলেন—তাঁরা স্বামী বিবেকানন্দ নামে এক অখ্যাত অজ্ঞাত যুবককে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি বলে স্বীকৃতি দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন, এবং ভারতে তাঁর যে কোন মর্যাদা বা প্রতিষ্ঠা নেই সেটা প্রচার করতে কুণ্ঠিত বোধ করেন নি। তাঁরা হিন্দুধর্মের নানা ত্রুটি কুসংস্কার স্বীকার করে নিতে পরাঙ্মুখ ছিলেন না এবং খ্রীষ্টধর্মের প্রতি খুব অনুরক্ত ছিলেন। অপর-দিকে স্বামীজী হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করতে সর্বদাই তৎপর ছিলেন এবং খ্রীষ্টান মিশনারীদের অনেক দোষত্রুটি দেখিয়ে তাদের নিন্দা করেছেন। এই জন্যই স্থানীয় পত্রিকা-গুলি স্বামীজীর কোনরকম প্রাধান্য স্বীকার করেননি। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করতে পারি যে, স্বামীজীর প্রথম দিনের বক্তৃতার আরম্ভে 'আমেরিকার ভগিনী ও ভ্রাতৃগণ' এই সম্বোধন শুনেই যে শ্রোতাগণ বিপুল অভিনন্দন ও সংবর্ধনা জানিয়েছিল—একথা ঐ ধর্মসভার ঐতিহাসিক বিবরণীতে (Official report) স্পষ্টই লেখা আছে এবং শিকাগোর বাইরের সংবাদ-পত্রে ও শিকাগোরই কোন কোন কাগজে স্বামীজী যে ধর্মমহাসভার শ্রেষ্ঠ বক্তা, একথা স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে। সুতরাং শিকাগোর পূর্বোক্ত দুইটি মুখ্য পত্রে স্বামীজীর প্রশংসার অনুল্লেখ এবং অন্য দুই-এক জন ভারতীয় প্রতি-নিধির বক্তৃতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসার প্রকৃত কারণ কি তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। ঐ দুটি কাগজে দেখেছি ধর্মসভার বাইরে নানা সামাজিক অনুষ্ঠানে অন্য ভারতীয় ২।৪ জন প্রতিনিধির কথা আছে, কিন্তু স্বামীজীর

নামোল্লেখ পর্যন্ত নাই। কিন্তু সত্য চিরকাল কখনও চাপা থাকে না। তাই আজ শিকাগোর ধর্মমহাসভা-প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের নাম জগদ্বিখ্যাত, কিন্তু অন্য যে-সব ভারতীয় প্রতিনিধিদের প্রশংসায় শিকাগোর উক্ত দুইটি সংবাদপত্র পঞ্চমুখ ছিলেন, তাঁদের নাম পর্যন্ত আজ অনেকেরই জানা নেই।

কিন্তু শিকাগোর সংবাদপত্রে স্বামীজীর একটি বক্তৃতার সারাংশ দেওয়া আছে যা আর কোথায়ও পাওয়া যায় না। ১৮৯৩ সনের ১৯শে সেপ্টেম্বর স্বামীজী হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে একটি লিখিত ভাষণ দেন। এটি সভার বিবরণীতে ছাপা হয়েছে। কিন্তু পরদিনের Chicago Daily Tribune কাগজে দেখলাম যে, লিখিত বক্তৃতাটি পড়বার আগে স্বামীজী সভায় দাঁড়িয়ে কয়েক মিনিট একটি মৌখিক অভিভাষণ দিয়েছিলেন—তার সারমর্ম এক কাগজে একটু বড়, আর এক কাগজে একটু সংক্ষিপ্ত। মোটের উপর স্বামীজী যা বলেছিলেন তার মর্ম এই :

"এই সভায় বসে বসে প্রতিদিন খ্রীষ্টধর্মের মহিমা শুনছি- খ্রীষ্টানজাতিরা আজ পৃথিবীতে ধনে মানে সব চেয়ে বড়, সুতরাং আমাদের সকলেরই খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করা উচিত, পুনঃ পুনঃ এইরূপ উপদেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু চারদিকে তাকালে আমরা কি দেখতে পাই? খ্রীষ্টান-জাতির মধ্যে সব চেয়ে সম্পদশালী ইংরেজ পঁচিশ কোটি এশিয়াবাসীকে পায়ের নীচে পিষে ফেলেছে! ইতিহাসের পাতা ওল্টালে দেখতে পাই যে, স্পেনও মেক্সিকো জয় করে বড় হয়েছে। মোটের উপর মানুষের গলা কেটেই খ্রীষ্টান-জাতি সম্পদশালী হয়েছে। হিন্দু কোনদিন এই উপায়ে বড় হবার চেষ্টা করবে না। আজ এই সভায় বসে ইসলামধর্মের বহু প্রশংসা শুনেছি, কিন্তু মুসলমানদের তরবারি ভারতের ধ্বংসসাধনে নিযুক্ত রয়েছে। রক্তপাত ও তরবারি দ্বারা হিন্দু বড় হতে চায় না—হিন্দু-ধর্মের ভিত্তি প্রেম ও ভালবাসা।"* এই বক্তৃতাটি পড়ে বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিলাম—স্বামীজীর কোন বইতে এরূপ উক্তি পড়িনি; বস্তুতঃ ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে এরূপ স্পষ্ট সত্য এমন তেজের সঙ্গে স্বামীজী ব্যক্ত করেছেন—এ কথা কোন দিনই মনে করিনি। সুতরাং এর একটি নকল করে নিউইয়র্কে স্বামী নিখিলানন্দকে পাঠিয়ে দিলাম, কারণ কিছুদিন পূর্বে তিনি স্বামীজীর জীবনী সম্বন্ধে যে চমৎকার বইখানি লিখেছিলেন তাতে এই বক্তৃতার বা অনুরূপ কোন উক্তির উল্লেখ নাই। স্বামী নিখিলানন্দ উত্তর দিলেন যে, তিনি এই বক্তৃতাটির বিষয় পূর্বে কিছুই জানতেন না—বেলুড়ে এ বিষয়ে কোন সংবাদ পাওয়া যায় কিনা আমাকে খোঁজ নিতে বললেন। আমি স্বামী মাধবানন্দকে এ বিষয়ে চিঠি লিখলাম—তিনি বললেন, তিনিও কোনদিন এই বক্তৃতার কথা শোনেননি। সুতরাং শিকাগো কাগজ এই অমূল্য জিনিসটি রক্ষা করে আমাদের যে উপকার করেছে তার জন্য আমি তাদের শত অপরাধ ক্ষমা করতে প্রস্তুত আছি। এর কিছুদিন পরে Marie Louise Burke-প্রণীত 'Swami Vivekananda in America' নামক বইখানি প্রকাশিত হয়। তাতে স্বামীজীর উক্ত বক্তৃতার ছোট সারমর্মটি প্রকাশিত হয়েছে—কিন্তু বড় সারমর্ম – যেটি থেকে আমি এক অংশ উদ্ধৃত করেছি—সেটা সম্ভবতঃ তিনি দেখেন নি। কিন্তু মোটের উপর এই বক্তৃতাটি স্বামীজীর রাজনৈতিক মতবাদের উপর নূতন আলোকপাত করে।

* এর মূল মৎপ্রণীত 'স্বামী বিবেকানন্দ' নামক ইংরেজী গ্রন্থের ৪৩ পৃষ্ঠায় আছে।

শিকাগোতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের কয়েকজন আমেরিকান ভক্তের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। এঁদের নিষ্ঠা ও ভক্তির প্রগাঢ়তা দেখে বিস্মিত হয়েছি। এখানে যে রামকৃষ্ণ মিশন আছে তখন তার অধ্যক্ষ ছিলেন স্বামী বিশ্বানন্দ। আমি ফিরে আসার কয়েক বছর পরে তিনি দেহরক্ষা করেছেন। মিশনে যে কয়জনের সঙ্গে দেখা হয়েছে সকলেই তাঁকে খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করেন এবং ঠাকুরের উপদেশ ও জীবনী শোনবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করতেন। একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের দুইটি মহিলার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তাঁরা স্বামী বিশ্বানন্দের মাধ্যমে আমাকে অনুরোধ করলেন প্রতি সপ্তাহে একদিন রাত্রে তাঁদের বাড়ীতে খেতে। স্বামী বিশ্বানন্দ বললেন যে, তিনি এই শর্তে রাজী হয়েছেন যে, রাত্রি এগারটার মধ্যেই আমাকে হোটেলে ফিরিয়ে দিতে হবে। আমি প্রতি সপ্তাহে একটি সন্ধ্যায় তাঁদের ওখানে যেতাম। পরিবারের দুইটি মহিলা ও তাঁদের এক ভাই শ্রীশ্রীঠাকুরের ও স্বামীজীর সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করতেন এবং আমি যা যা বলতাম খুব আগ্রহ সহকারে শুনতেন। তাঁদের একবার এ দেশে আসবার বিশেষ ইচ্ছা, কিন্তু অর্থের অভাবে এই ইচ্ছা পুরণ করতে পারলেন না, এজন্য খুবই দুঃখ করতেন। তাঁরা তিন জনেই চাকরি করেন, কিন্তু মাইনে যা পান তা প্রায় সবই খরচ করতে হয়। কোনদিন ভারতে আসবার মতো অর্থ সঞ্চয়ের ব্যবস্থা হবে, একথা কল্পনাও করতে পারেন না—এই দুঃখের কথা নানাভাবে প্রায়ই প্রকাশ করতেন।

আমি ওখানে থাকতেই শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। একটি হোটেলে নৈশভোজন ও তৎপরে শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর সম্বন্ধে বক্তৃতাদির ব্যবস্থা ছিল। পাঁচ ডলারের টিকিট কিনে যে অভ্যাগতেরা এই উৎসবে যোগদান করলেন, তাঁদের সংখ্যা প্রায় দেড়শত। এঁদের মধ্যে অনেক মহিলা ছিলেন এবং তাঁদের প্রায় ১৫।২০ জন বাঙ্গালী মেয়েদের মতো শাড়ী পরে এসেছিলেন। একজন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, শাড়ীর আঁচলটা বাঁদিকে না ডানদিকের কাঁধের উপর দিয়ে ফেলতে হবে। এবিষয়ে আমার খুব স্পষ্ট কোন ধারণা ছিল না, কিন্তু "আমি জানি না" একথা স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হলাম, সুতরাং বললাম বাম কাঁধের উপর দিয়ে। তিনি খুব খুশী হয়ে আর কয়েকটি মহিলাকে বললেন। আমি দেশে ফিরে এসে জেনেছিলাম যে, আমি ঠিক নির্দেশই দিয়েছিলাম। আর একটি মহিলা বললেন যে, আঁচলটা বারে বারে খুলে পড়ছে—কি করা যায়। এবারে আমি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলাম—একটি সেফ্‌টি-পিন (Safety-pin) দিয়ে আঁচলটা আটকে রাখতে। আমাদের দেশীয় পোশাকে অনভ্যস্ত এই মহিলাদের শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাবার জন্য বাঙ্গালী মেয়েদের পোশাক পরার এই আগ্রহ দেখে খুবই ভাল লাগল। আহারের ব্যবস্থা ছিল বিশুদ্ধ পাশ্চাত্য জাতির ডিনার। স্বামী বিশ্বানন্দ ও স্বামী অখিলানন্দ উপস্থিত ছিলেন। আমি হেসে তাঁদের বললাম, "ঠাকুরের জন্মোৎসবে বিলাতী আমিষ-ডিনারের ব্যবস্থা করলেন।" তাঁরা জবাবে বললেন, "Do in Rome as the the Romans do." ভোজনের পর কয়েকটি বক্তৃতা হল। ওখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন আমেরিকান অধ্যাপকও বক্তৃতা করলেন।

নিউইয়র্কের আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী নিখিলানন্দ শারদীয়া পূজার সময় নিমন্ত্রণ

করেছিলেন। সেখানে রীতিমত পূজার আয়োজন। প্রায় ২৫।৩০টি আমেরিকান পুরুষ ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে ৪০।৫০ মাইল দূর থেকে এই পূজা দেখতে এসেছেন। পূজার আয়োজন—নৈবেদ্য প্রভৃতি—তাঁদের মধ্যে ২।৩টি মহিলা করলেন। একটি যুবক ধুতি-চাদর পরে পূজায় অঞ্জলি দিলেন। ইংরেজী অক্ষরে সংস্কৃত মন্ত্র ও বাংলা গান লিখে প্রত্যেককে এক কপি করে দেওয়া হল। সকলে সমস্বরে আবৃত্তি করলেন এবং কয়েক জন গান গাইলেন। পূজার পর প্রসাদ-বিতরণ হল।

নিউইয়র্কে আর একটি আশ্রম আছে—এর অধ্যক্ষ স্বামী পবিত্রানন্দ। দুই আশ্রমেই শিক্ষিতা দুটি আমেরিকান মহিলা রান্না পরিবেশন প্রভৃতি নিজেরা করেন। আহারাদির পর দেখলাম সকলেই নিজের নিজের বাসন ধুতে নিয়ে গেলেন। আমিও আমার বাসন ধোয়ার উদ্যোগ করতেই ঐ মহিলা দুটি আমার হাত থেকে বাসন নিয়ে ধুয়ে আনলেন। এর মধ্যে একটি মহিলা কলেজের লেকচারার ছিলেন—তা ছেড়ে দিয়ে আশ্রমে এসে নতুন জীবন যাপন করছেন।

ফিলাডেলফিয়াতে যখন ছিলাম তখন শ্রীননীগোপাল বোস নামে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তিনি স্বদেশী আন্দোলনের সময় বিপ্লবী ছিলেন, পুলিশের হাত এড়াবার জন্য আমেরিকায় পালিয়ে যান। অনেক দুঃখকষ্ট পেয়েছেন, কিন্তু ৫০ বছর পরে ব্যবসায়ে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হয়ে তখন নিজে বাড়ী গাড়ী করে বেশ সাচ্ছল্য নিয়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ করছেন। শহর থেকে প্রায় ৩০।৪০ মাইল দূরে তাঁর বাড়ী—তিনি নিজের গাড়ী করে আমায় নিয়ে গেলেন। তাঁর স্ত্রী একটি আমেরিকান মহিলা—তিনি রামকৃষ্ণ আশ্রমে দীক্ষা নিয়েছেন--আমাকে দেখে খুব খুশী হলেন। তিনি যে গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়েছেন তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথা বলে তাঁর একটি ফটো দেখালেন। আমি ফটো দেখেই বললাম ইনি আমার একজন বিশিষ্ট বন্ধু—একসঙ্গে এম-এ পড়েছি—একই মেসের এক ঘরে দুবছর একসঙ্গে ছিলাম। এই শুনে তিনি আমার প্রতি যেরকম শ্রদ্ধা-ভক্তি দেখাতে আরম্ভ করলেন, তাতে আমি বিশেষ সঙ্কোচ বোধ করে বললাম, 'আপনি ভুলে যাবেন না যে আমি সাধু সন্ন্যাসী নই। স্বামী যতীশ্বরানন্দ আপনার গুরু, তাঁর সাংসারিক জীবনে আমি তাঁর বন্ধু ছিলাম মাত্র, কিন্তু এখনকার জীবনে আমাদের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত।' কিন্তু তবু তাঁর কাছে যে আদরযত্ন পেয়েছি তা কখনও ভুলব না। তাঁর ওখানে গিয়ে সারাদিন কাটিয়েছি—দেশী ভাত ডাল তরকারি রান্না করে আমাকে খাইয়েছেন এবং মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর শ্রীশ্রীঠাকুর, স্বামীজী ও তাঁর গুরুদেবের সম্বন্ধে বহু আলোচনা হত। আমাদের আলোচনা শুনতে শুনতে বোস সাহেব ঘুমিয়ে পড়তেন—তাঁর স্ত্রী ইশারা করে তাঁকে দেখিয়ে আমাকে বলতেন, 'ওঁর এসব কথা মোটেই ভাল লাগে না।' এই নিয়ে অনেক দুঃখ করতেন। তিনি এদেশে এসেছিলেন এবং জয়রামবাটী গিয়েছিলেন—সে-সব কথা বলতে বলতে ভক্তিতে গদ্‌গদ হতেন।

বোষ্টনে স্বামী অখিলানন্দ ছিলেন আশ্রমের অধ্যক্ষ। আশ্রমটি একটি বড় নদীর পারে এবং খুবই সুন্দর। স্বামীজী জানালেন যে, ঐ আশ্রমের সমস্ত ব্যয় বহন করেছেন একজন মহিলা। কথায় কথায় বললেন যে, বোষ্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়তন বাড়তে বাড়তে প্রায় ঐ

আশ্রমের কাছে পৌঁছেছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ এক লক্ষ ডলার দিয়ে ঐ বাড়ীটা কিনবার প্রস্তাব করেছেন। কিন্তু স্বামীজী তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। স্বামী অখিলানন্দও দেহরক্ষা করেছেন।

মোটের উপর আমেরিকায় ঘুরে আমার এই বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে যে, সংখ্যায় খুব অল্প হলেও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এখনও একদল পুরুষ ও মহিলা আছেন যাঁরা স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি পোষণ করেন এবং ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক চেতনা সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা খুবই উচ্চ।

এই প্রসঙ্গে আমাদের একটি জাতীয় কলঙ্কের উল্লেখ করেই এই স্মৃতিকথার উপসংহার করব। আমেরিকার অনেক শিক্ষিত লোকের ধারণা যে, ভারতবাসী মাত্রেই স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর প্রচারিত আধ্যাত্মিক ধর্ম ও জ্ঞান সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। তাই এই শ্রেণীর আমেরিকানরা ভারতবাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ বা আলাপ হলেই এ সম্বন্ধে তাঁদের কাছ থেকে অনেক কিছু জানতে চান। কিন্তু অধিকাংশ আমেরিকা-প্রবাসী ভারতীয়—শতকরা ৯৯ জন বললেও অত্যুক্তি হবে না—এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ; কিছুই বলতে পারেন না। অনেক ভারতীয় আমাকে বলেছেন যে, একথা স্বীকার করতে তাঁদের লজ্জাবোধ হয়, কিন্তু কলেজে বা অন্যত্র তাঁরা এসব কিছুই শেখেননি ও জানেন না। আমি দেশে ফিরে এসে এ বিষয়টি ভারত সরকারের কয়েকজনকে বলেছি এবং এ প্রস্তাবও করেছি যে, সরকার যে শত শত ভারতীয় যুবককে বৃত্তি দিয়ে নানা বিষয় শিক্ষা করবার জন্য আমেরিকায় পাঠান তাদের সাধারণভাবে হিন্দু-ধর্ম ও -সভ্যতা এবং বিশেষভাবে শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের সম্বন্ধে কিছু জ্ঞানলাভের যেন ব্যবস্থা করেন। কোন ভাল লোককে দিয়ে দশ-বারোটি বক্তৃতা দেবার ব্যবস্থা করলে এবং ২।৪ খানা সহজবোধ্য বই পড়বার নির্দেশ দিলেই এ কাজটি হতে পারে। বলা বাহুল্য, এতে কিছু ফল হয় নাই।

মায়ের পূজা

স্বামী জীবানন্দ

আবাহন

অয়ি দশভুজে শরণাগতবৎসলে শারদে, এস মা! সমস্ত দেবতার সমবায়-শক্তিমূর্তি তুমি মা। দশপ্রহরণধারিণি! দরিদ্র সন্তানগণের শূন্য কুটির আলো ক'রে এস মা! আকাশে বাতাসে ধরণীতে আজ শারদীয় সুষমা! প্রকৃতি যেন তোমায় বরণ করতে চায়। শরৎ এলেই তোমার কথা মনে পড়ে। শরৎঋতুতে তোমার আগমন হয়, তাই মা, তোমার নাম শারদা।

মা, আমাদের না আছে অর্থ, না আছে সামর্থ্য—সহায় সম্বল। ভক্তি নেই, অনুরাগ নেই। কী দিয়ে তোমার পূজা হবে? সব দিক দিয়ে দেশের আজ অশেষ দুর্গতি! কখনো অনাবৃষ্টি, কখনো অতিবৃষ্টি, বন্যা, মহামারী, দুর্ভিক্ষ! আমরা অন্নহীন, বস্ত্রহীন, আমাদের অধিকাংশেরই অত্যন্ত অভাব অনটন, এমনকি মোটা ভাত মোটা কাপড়েরও সংস্থান নেই। তার উপর আছে কেবল স্বার্থ, দ্বন্দ্ব, দ্বেষ, হিংসা। ঐক্য নেই, ভ্রাতৃভাব নেই। কেমন ক'রে তোমার পূজা হবে, মা!

মা, বিপদে পড়ে তোমায় স্মরণ করলে তুমি সব প্রাণীরই ভয় দূর কর, স্বস্থ অবস্থায় তোমাকে স্মরণ করলে তুমি অতীব শুভ বুদ্ধি দাও। হে দারিদ্র্যদুঃখভয়হারিণি জননি! সকলের এমন মঙ্গলকারিণী দয়াবতী তুমি ছাড়া আর কে আছে?

'দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষজন্তোঃ
স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতিমতীব শুভাং দদাসি।
দারিদ্র্যদুঃখভয়হারিণি কা ত্বদন্যা
সর্বোপকারকরণায় সদার্দ্রচিত্তা॥'

শক্তিরূপিণি দুর্গতিনাশিনি দুর্গে, আমাদের মনে পূর্ণভাবে উদিত হয়ে শক্তি দাও, আমাদের তোমার পূজার যোগ্য ক'রে তোল। আমরা তোমার পূজা করব।

হে বিশ্বার্তিহারিণি দেবি, আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। ত্রিলোকবাসী সকলের আরাধ্যা জননি, তোমার চরণে প্রণত সন্তানগণের প্রতি বরদা হও।

'প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি বিশ্বার্তিহারিণি।
ত্রৈলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব॥'

মানসপূজা

মা, সকলের হৃদয়পদ্ম আলো ক'রে অন্তর্যামিনী-রূপে তুমি অবস্থান করছ। আমাদের হৃদয়পদ্ম তোমার স্থায়ী আসন হোক। তোমার কৃপায় আমরা যেন বুঝতে পারি তুমি আমাদের হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। আমরা তোমার মানসপূজা করব। শুধু আনুষ্ঠানিক পূজার সময়ে নয়, সর্বদা সর্বক্ষণ তোমায় অন্তরের অন্তস্তলে উপাসনা করব, কারণ সব সময়েই তুমি আমাদের অন্তরে অধিষ্ঠান করছ।

মানসপূজায় বাইরের ষোড়শোপচারে পূজার মতো আন্তর উপচারে পূজা করব। আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, স্নানীয়, আচমনীয়, বসন, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য প্রভৃতি নিবেদন করব তোমারই দেওয়া অন্তরের দ্রব্য- ও গুণ-সম্ভারে।

আমাদের এই ভাবের পূজায় সহস্রার থেকে ক্ষরিত অমৃত হবে তোমার পাদ্য, সেই অমৃতধারায় ধৌত করব তোমার চরণযুগল। আচমনীয় ও স্নানীয় হবে সেই অমৃতে। শুদ্ধ মনটি

হবে অর্ঘ্য, আকাশতত্ত্ব বস্ত্র, গন্ধতত্ত্ব চন্দনাদি সুগন্ধিদ্রব্য। চিত্ত হবে পুষ্প। প্রাণ-ধূপ জ্বেলে দেবো। তেজস্তত্ত্ব হবে দীপ, পরমামৃত নৈবেদ্য, হৃদয়ের অনাহতধ্বনি ঘণ্টা, বায়ুতত্ত্ব চামর। আমাদের ইন্দ্রিয়ের কর্ম ও মনের চাঞ্চল্যকে কল্পনা করব তোমার পূজায় আনন্দ-নৃত্য। সহস্রার পদ্ম যেন তোমার মস্তকের ছত্র এবং শব্দতত্ত্ব তোমার ভজন-গীতি।

অনেক রকমের পুষ্প নিবেদন করব। তার মধ্যে দশটি পুষ্প হচ্ছে—অমায়, অনহংকার, অরাগ, অমদ, অমোহ, অদম্ভ, অদ্বেষ, অক্ষোভ, অমাৎসর্য, অলোভ। তোমার পূজার পাঁচটি মহাপুষ্প—অহিংসা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, দয়া, ক্ষমা, জ্ঞান। এই সব পরম দিব্য কুসুমে রচিত লম্বমান মালো সুশোভিত হবে তোমার কণ্ঠ ও বক্ষঃস্থল। অঞ্জলি ভরে ভরে তোমার পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দেবো। আসল পুষ্প তো চিত্ত; সমগ্র চিত্তটি যেন তোমার শ্রীচরণকমলে উৎসর্গীকৃত হয়।

মা, শুনেছি তুমি নাকি বলিপ্রিয়া। তুমি মানবহৃদয়ের কামক্রোধরূপী পশুকেই বলিরূপে গ্রহণ করতে চাও। ছয় রিপুই বলির উপযুক্ত। এদের দোর্দণ্ড প্রতাপ। এরা প্রবল হলে মানুষের মহত্ত্ব ফুটে ওঠে না, দেবভাব বিকশিত হয় না। মা, তোমার মানসপূজায় আমরা যেন ষড় রিপুকে, ভেতরের এই পশুগুলিকে তোমার চরণে বলিরূপে উৎসর্গ করতে পারি। সম্পূর্ণ স্বার্থত্যাগই যথার্থ বলিদান। মা, আমরা যেন তোমার কৃপায় সব রকম স্বার্থ বিসর্জন দিতে সমর্থ হই। কেবল স্বার্থচিন্তা ক'রে ক'রে আমাদের হৃদয় সংকীর্ণ হয়ে গেছে। স্বার্থপরতা চলে গিয়ে যাতে নিঃস্বার্থভাব আসে এমন করে দাও আমাদের। 'তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত'—যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের এই মহাবাক্য সতত যেন আমাদের স্মরণে থাকে তোমার কৃপায়।

বাহ্যপূজা

মা, তোমার মানসপূজা আমাদের সব সময়ের পূজা, কারণ সব সময়েই যে তুমি অন্তরে বিরাজ করছ। কিন্তু বাহ্যপূজাও আমরা করব, তোমার নামে মহানন্দে মাতবো। এই শরৎকালে মৃন্ময়ী প্রতিমায় তোমার অর্চনা করব। চণ্ডীবর্ণিত মহারাজ সুরথ ও সমাধি বৈশ্য মেধা মুনির আদেশে মৃন্ময়ী প্রতিমায় অত্যন্ত ভক্তিসহকারে তোমার আরাধনা করে কৃতকৃত্য হয়েছিলেন। তোমার কৃপায় রাজ্যহারা সুরথ পেয়েছিলেন সাম্রাজ্য এবং হয়েছিলেন সাবর্ণি মনু। আর সমাধি বৈশ্যের হয়েছিল পরম জ্ঞান, যা মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য। পূর্বে কত সাধক মৃন্ময়ী প্রতিমায় চিন্ময়ী চৈতন্যস্বরূপিণী বিশ্বব্যাপিনী তোমার পূজা ক'রে ধন্য হয়েছেন।

আমরা তোমার সুদৃশ্য প্রতিমা নির্মাণ করাব, যেন দর্শনমাত্রেই তোমার ভাবে হৃদয়মন পূর্ণ হয়। প্রতিমায় যে উৎকৃষ্ট শিল্পের পরিচয় থাকবে না, তা নয়; কিন্তু সেই শিল্প সাজসজ্জা—সবই হবে ভাবভক্তিবৃদ্ধির সহায়ক।

মা, তোমার যে বাহ্যপূজা, তা যেন রাজসিক ভাবের পূজা, কারণ তাতে চাই দ্রব্যবাহুল্য। কিন্তু অত উপচার দরিদ্র আমাদের দ্বারা নিখুঁতভাবে সংগ্রহ করা কি সম্ভব? আমরা প্রাণ ঢেলে ভক্তিভরে যা সম্ভব তাই সংগ্রহ করব। তুমিই সৃষ্টি করেছ সব জিনিস। যা কিছু উপচার সংগ্রহ করব সে-সব তো তোমারই। ত্রিলোকের অধীশ্বরি জননি! তোমারই জিনিস সংগ্রহ করব তোমার পূজায়। তবে আমরা কী দেবো? আমরা দেবো প্রাণের ভক্তি। যা কিছু উপচার সংগ্রহ করব

তা ভক্তিভরে অন্তরের অনুরাগের সহিত তোমায় নিবেদন করব। মা, তোমার মহাপূজার জন্য যত উপচারই সংগৃহীত হোক না কেন, তা মনে হয় সর্বৈশ্বর্যময়ী তোমার নিকট অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু তাই ব'লে শাস্ত্রবিধি অনুসারে যে দ্রব্যাদির অবশ্য প্রয়োজন, তা সংগ্রহ করতে কোন ফাঁকি ও কুণ্ঠা থাকবে না আমাদের।

মা, যিনি হবেন অর্চক অর্থাৎ যিনি পূজাকার্যে ব্রতী হবেন, তিনি যেন দেবভাবসম্পন্ন হন, সেদিকে আমরা লক্ষ্য রাখব, তা নইলে ভূতশুদ্ধি মন্ত্রশুদ্ধি দ্রব্যশুদ্ধি ইত্যাদি ঠিকমত হবে না এবং পূজাও হবে অঙ্গহীন। তাই পূজককে হতে হবে কঠোর সংযমী, নিষ্ঠাবান এবং নির্লোভ ও পবিত্র।

সর্বজনীন পূজা

মা, তোমার কত পূজা হয়, সহস্র সহস্র প্রতিমায় তোমার অর্চনা হয়। তুমি যে সর্বজনের জননী, সকলে মিলে যখন পূজা করা হয় তখন নাম দেওয়া হয় সর্বজনীন পূজা। কিন্তু এত পূজা করেও আমাদের দুঃখ তো ঘোচে না, বরং অশান্তির আগুন বাড়ছেই। তবে কি মা তোমার পূজা ঠিক ঠিক হচ্ছে না? এ সব পূজা কি নিছক আনন্দোৎসব? এতে কি ভক্তির লেশ নেই? সকলে মিলে তোমাকে ডাকা, তোমার নামে মেতে যাওয়া এক হিসাবে বেশ মনে হয়। কিন্তু মা, এতে তোমার অর্চনা হয় না, দেখাবার প্রয়াস আর জাঁকজমক থাকে বেশি। পূজার দিকে লক্ষ্য থাকে কম, নামমাত্র বললেই হয়। আমরা চৈতন্যময়ীর পূজা করছি, এ বোধ থাকে না। আমাদের পূজা যেন জড়ের উপাসনায় পর্যবসিত হয়েছে। আমাদের সে দৃষ্টি নেই, সে বোধ নেই, ধারণা করার সে প্রচেষ্টাও নেই। অতি সাধারণ উৎসবে পরিণত হয়েছে আমাদের সর্বজনীন পূজাগুলি!

মা, তোমার পূজা কামনা-বাসনা নিয়ে করতে গিয়ে যদি অনুষ্ঠানগুলি সুষ্ঠুভাবে না করা হয়, তবে তার ফল হয় নাকি উল্টো। তাই বুঝি এত পূজা করা সত্ত্বেও আমাদের দুঃখদারিদ্র্য না কমে বাড়ছে। মা, তুমি আমাদের মনগুলিকে এক সুরে বেঁধে দাও, আমরা যেন সমস্ত অনৈক্য ভুলে তোমার নামে তোমার ভাবে একত্র হয়ে সুন্দর পবিত্র স্থানে ও পরিবেশে সুদৃশ্য প্রতিমায় তোমার পূজায় ব্রতী হই।

মা, তোমার সর্বজনীন পূজার জন্য সংগৃহীত অর্থ অনেক সময় উদ্বৃত্ত হয়; সে অর্থ বৃথা আমোদপ্রমোদে ব্যয় না করে যদি তোমার দুঃস্থ সন্তানদের দুঃখমোচনে ব্যয় করি, তাতে তুমি নিশ্চয়ই অধিকতর প্রসন্না হবে! মা, সম্পন্ন গৃহস্থেরা বহু অর্থব্যয়ে রাজসিকভাবে তোমার পূজা করতেন। আজ অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেসব উঠে গেছে এবং তার স্থান অধিকার করেছে সর্বজনীন পূজা। সর্বজনীন পূজাতেও দানাদির দিকে যাতে আমাদের মন থাকে, সেই ভাব এনে দাও মা!

বিরাটরূপিণীর পূজা

মা, সকলের মধ্যে তুমি রয়েছ, তাই সকলের সেবাই তোমার সেবা। সর্বভূতের—সর্বপ্রাণীর সেবাই বিরাটরূপিণী মা তোমার পূজা-উপাসনা।

মা, তুমি সর্বভূতে বিরাজিতা হলেও নারীগণের মধ্যে তোমার সমধিক প্রকাশ—'স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।' তাই নারীজাতির প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান-প্রদর্শন ও তাঁদের সর্ববিধ উন্নতির প্রচেষ্টা তোমারই পূজার অঙ্গীভূত।

বিশ্বপ্রকৃতিতে বিবিধ উপচারে নানা

সৌন্দর্যসম্ভারে—রূপে রসে রঙে, ছন্দে গানে—অপরূপ ভাবে তোমার পূজা চলেছে। চন্দ্র সূর্য নক্ষত্র, আকাশ বাতাস, নদনদী, বৃক্ষলতা—সকলেই বিরাটরূপিণী মহামায়া তোমার উপাসক। আলোয় জলে ফুলে ফলে এই উপাসনা।

মানুষ আমরা, বিরাটরূপিণী তোমার পূজা করব কিভাবে? আমাদের পূজা হবে মানুষেরই সেবার মধ্য দিয়ে। আমাদের চারিদিকে রয়েছে দারিদ্র্যপীড়িত অজ্ঞ, দুঃস্থ, রোগগ্রস্ত, গৃহহীন, নিরন্ন অসংখ্য মানুষ—তাদের সেবায় যেন আমরা আত্মনিয়োগ করতে পারি, তাদের সেবাকে যেন মা তোমারই পূজারূপে ভাবতে পারি।

ভগবান কপিল মাতা দেবহূতিকে বলেছিলেন, যে ব্যক্তি অপর প্রাণীতে দ্বেষবুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে প্রতিমা পূজা করে, তার পূজা নিরর্থক।

জীবন্ত নরনারীকে মা তোমার এক একটি প্রতিমা ব'লে ভাবলেই তবে মৃন্ময়ী মূর্তিতে চিন্ময়ী তোমার ধারণা হওয়া সম্ভব। জ্ঞানে প্রেমে কর্মে সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে একাত্মবোধেই প্রতিমা-পূজার সার্থকতা।

জ্যান্ত দুর্গা

মা, তুমি আদ্যাশক্তি, মহামায়া, মহাশক্তি। সন্তানগণকে শান্তির পথ, মুক্তির পথ দেখাবার জন্য মানবী মূর্তি ধারণ ক'রে মাতৃহৃদয়ের অপার-করুণামণ্ডিতা হয়ে তুমি যুগে যুগে আবির্ভূতা হও। শ্রীভগবান যখন যুগপ্রয়োজনে জগৎকল্যাণে ধর্মস্থাপনের জন্য নরলীলায় অবতীর্ণ হন, তখন আদ্যাশক্তি তুমিও তাঁর লীলা-সহায়িকা হয়ে আগমন কর। অচিন্ত্যশক্তি তোমাকে সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না।

যুগাবতার সর্বভাবময় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাসঙ্গিনী শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী যে তোমার মানবীমূর্তি তা যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়েছিল। তিনি মা সারদাদেবীকে বলেছেন—'জ্যান্ত দুর্গা'। বীরভক্ত গিরিশচন্দ্র মহাষ্টমী পূজার দিনে সাক্ষাৎ ভগবতী-জ্ঞানে সারদাদেবীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়েছিলেন।

যুগধর্মপাত্রী বিশ্বমাতা সারদাদেবীরূপে যত দিন তুমি মানবী শরীরে ছিলে, ততদিন তোমার জীবনের প্রতিটি চেষ্টা জীবকল্যাণে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই দিব্য নরলীলায় তোমার জীবনব্যাপী সাধনা, জপ, তপ, ধ্যান, সমাধি, ব্রত, ত্যাগ, নিষ্ঠা, সংযম, সকলের প্রতি সমান স্নেহভালবাসা, সেবাপরায়ণতা, নিজ শরীরের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীনতা, সরলতা, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা—সমস্তই মানুষের শিক্ষার জন্য, আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য। সারদাদেবীরূপে মা তোমার আকাশের ন্যায় উদার হৃদয় বিভিন্ন-প্রকৃতিবিশিষ্ট সকল সন্তানেরই সহিত এক হয়ে অজস্র স্নেহধারায় সকল সন্তাপ দূর ক'রে দিত। সমস্ত মাতৃহৃদয়ের করুণাঘন তোমার সারদা-মূর্তি কোটি কোটি মানবহৃদয়ের আরাধ্যা শান্তিদাত্রী দেবী।

তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং
বৈরোচনীং কর্মফলেষু জুষ্টাম্।
দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে
সুতরসি তরসে নমঃ॥

যথাগ্নের্দাহিকাশক্তিঃ রামকৃষ্ণে স্থিতা হি যা।
সর্ববিদ্যাস্বরূপাং তাং সারদাং প্রণমাম্যহম্॥

ভগিনী নিবেদিতা*

সীতাদেবী

আজ যে সর্বজনপূজিতা মহীয়সীর জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আমরা এখানে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করতে এসেছি, তাঁর বিষয়ে বলবার আমার যে খুব একটা. যোগ্যতা আছে তা নয়। তবে দুটি কারণে আজ আমি সামান্য কিছু বলতে এসেছি। এক, বাংলা দেশের এই শহরে থেকে তিনি বাংলার মেয়েদের সকল দিকের উন্নতির জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি যখন যা করতেন, তা দায়-সারা ভাবে কখনও করতেন না, সমস্ত অস্তিত্বের শক্তি দিয়েই করতেন। তাই এই যে কাজটিকে তিনি জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করেছিলেন, সেটি যাতে সুন্দরভাবে সর্বাঙ্গসম্পূর্ণভাবে করে তুলতে পারেন তার জন্য সমস্ত দেহমনপ্রাণ দিয়েই চেষ্টা করে গিয়েছেন। এই দিক দিয়ে সমস্ত বাংলার নারীসমাজ তাঁর কাছে ঋণী, সকলের কাছ থেকেই তিনি কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্য দাবি করতে পারেন।

দ্বিতীয়ত: তিনি আমার পরলোকগত পিতৃদেব রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। দুজনের মধ্যে খুব গভীর একটা শ্রদ্ধার সম্পর্ক ছিল। কখন যে তাঁদের আলাপ হয়েছিল তা আমি জানি না, কিন্তু প্রায় শিশুকাল থেকেই আমরা ভগিনী নিবেদিতার নামের সঙ্গে পরিচিত ছিলাম। প্রবাসী ও Modern Review-এ তিনি লিখতেন এবং এই সূত্রে তাঁর ও বাবার মধ্যে চিঠিপত্র চলত। তিনি যে-সব বিষয়ে লিখতেন তা বুঝবার বয়স তখন আমাদের ছিল না, কিন্তু চিত্রপরিচয়গুলি আমরা পড়তাম। নানা রং-এ ছাপা ছবি, নানা আশ্চর্য উজ্জ্বল মোহিনী ভাষায় লেখা সে-গুলির পরিচিতি—কোন্‌টি আমাদের মন বেশী হরণ করত তা বলা শক্ত। তবে তখন থেকেই আমরা তাঁর গুণমুগ্ধ হয়ে পড়েছিলাম। বড় হয়ে তাঁর লেখা অনেক পড়েছি।

Journalist হিসাবেও তিনি প্রথম-শ্রেণীরই ছিলেন।

প্রবাসী আর Modern Review-এর উন্নতির জন্য তিনি যতরকমে পারেন সাহায্য করতেন। বাবার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের বিষয়েও তিনি সর্বদা অবহিত থাকতেন। দোষত্রুটি দেখলে যথার্থ শুভানুধ্যায়ীর মতো কঠোর সমালোচনা করতেন, কিন্তু এই সমালোচনার অন্তর্নিহিত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা বেশ প্রকট হয়েই থাকত।

আমরা এলাহাবাদ ছেড়ে কলকাতায় এসে বসবাস আরম্ভ করলে, তাঁকে একবার চোখে দেখবার ও কানে তাঁর কথা শোনবার সৌভাগ্যও আমার হয়েছিল। ১৯০৮ বা ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে বাবা একবার পীড়িত হয়ে পড়েন। বন্ধুবান্ধব সকলেই প্রায় তাঁকে দেখতে আসতে লাগলেন। একদিন শোনা গেল নিবেদিতা বাবাকে দেখতে আসছেন। সেই অতি সাধারণ অনাড়ম্বর দোতলার ছোট ঘরে তাঁকে নিয়ে আসা হল। দীর্ঘাঙ্গী, সুদীর্ঘ শাদা পোশাক পরা, পায়ে জুতো; গলায় যেন একটি রুদ্রাক্ষের মালা ছিল বলে মনে হচ্ছে। ঘরের সামনে এসে জুতো খুলে ফেললেন। আমরা ব্যস্ত হয়ে বারণ করলাম।

---

* 'বালিগঞ্জ মহিলা সংঘে' ভগিনী নিবেদিতার শতবর্ষ জয়ন্তী উৎসবে সভানেত্রীর ভাষণ।

তিনি বললেন, "আমি জানি, জুতো খুলতে হয়।" ইংরেজীতেই কথা বললেন।

তিনি ঘরে এসে দাঁড়াতেই মনে হল যেন এমন জ্যোতির্ময়ী মূর্তি নারীর মধ্যে আর কখনও দেখিনি। কবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "এ যেন আগমন নয়, এ আবির্ভাব"; রক্তমাংসে গড়া মানবীর মূর্তি এ নয়, যেন আগুন দিয়ে গড়া, তেজ দিয়ে গড়া দেবীমূর্তি। এই একবারই তাঁকে আমি চাক্ষুষ দেখেছি। এর বছর দুই-তিন পরেই তিনি দার্জিলিং-এ দেহত্যাগ করেন। শেষ সময়ে তিনি বাবাকে দেখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু দেরিতে খবর পৌঁছানোতে বাবা যেতে পারেননি।

আত্মীয়-বিয়োগের দুঃখই সেদিন আমরা পেয়েছিলাম। বাবা লিখেছিলেন, "এমন সমস্ত প্রাণ দিয়ে আমার কাগজের উন্নতির চেষ্টা আর কেউ করেছেন বলে জানি না।" যা করবেন তা প্রাণ দিয়ে করারই স্বভাব তাঁর ছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে নাম দিয়েছিলেন "লোকমাতা", যদিও তিনি নিজে নাম নিয়েছিলেন "রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা"। মায়ের মতোই তিনি অতন্দ্রিতা প্রহরিণী হয়ে এই বহুদুঃখ-পীড়িত ভারতের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তার সেবা করবার জন্যে, তাকে রক্ষা করবার জন্যে, তাকে সার্থক করবার জন্যে। বিধাতা তাঁকে প্রেরণা দিয়েছিলেন, শক্তি দিয়েছিলেন, তবে পরমায়ু বেশী দেননি, তাই অকালেই তিনি চলে গেলেন এই দুর্দশাগ্রস্ত দেশকে বঞ্চিত করে।

বাংলার শরৎ ও মা

শ্রীগোপেশচন্দ্র দত্ত

বাংলার আকাশ স্নিগ্ধ শরতের নিয়ে প্রসন্নতা,
হাসির বিস্ময় মেখে চোখে মুখে ভোরের আকাশ
আনন্দের স্পর্শসুখ নির্মাল্যের মতন আশ্বাস
অন্তরে বিছিয়ে দেয়, প্রাণের এ-সনাতন কথা।
জ্যোৎস্নার শরীরে দেখি আমার বাংলার পেলবতা,
পৃথিবীকে মনে হয় জীবনের উজ্জ্বল বিকাশ ঃ
শত দুঃখ-বেদনায় এইটুকু কল্পনা-বিলাস
শরৎ আমাকে দেয়, দূর করতে চায় বিষণ্ণতা।

শরৎকে তাই চাই বারবার ঋতুর অয়নে,
এই আশ্বিনের দিনে আমার বাংলাকে খুঁজে পাই ;
সেই সঙ্গে পাই মাকে জীবনের আনন্দ-স্বপনে
এ-বিশ্বের কান্তিরূপে, যে-মার তুলনা কিছু নাই।

সে-কান্তিরূপিণী মাতা সকল মায়ের বুকে জাগে,--
স্নেহের স্নিগ্ধতা তাই শারদ শিশিরে এসে লাগে

শ্যামা মা

(গান)

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(অনুযোগ)

'যে-ভালো করেছ শ্যামা, আর ভালোতে কাজ নাই।
(এখন) ভালোয় ভালোয় বিদায় দে মা, আলোয় আলোয় চলে যাই।'*

কেমন তোমার করুণা মা, জানাতে বাকি নেই তো শ্যামা,
তবুও মুখ ফেরালে মা— ভাবতে আজো ব্যথা পাই।
শুনেছিলাম—তোমার শরণ যে-ই চায় সে-ই পায় মা চরণ,
কেবল আমিই সব ক'রে পণ অকূলে যে কূল না পাই।
তবু শোনো রাখি ব'লে : জীবন যদি যায় বিফলে,
মরণেও চোখের জলে তোমারি পায় চাইব ঠাঁই :
গাইব শুধু তোমারি নাম— তোমার দেখা পাই না পাই।

আখর :

জানি আমি মনে ব্যথায়— সব দিতে তোর পারিনি পায়
তবু শিশু তার হাত বাড়ায় চাঁদ দেখে দূর নীলিমায়।

(প্রত্যুত্তর)

'মা ব'লে ডাকিস না রে মন, মাকে কোথায় পাবি ভাই ?
থাকলে এসে দেখা দিত, সর্বনাশী বেঁচে নাই॥'*

ঘনালে রাত আমরা জপি :
"ভয় কি ? কালই উঠবে রবি !"

দেয় যে আলো বেসে ভালো
করে তাকেই প্রেম সবাই।

রং যার আঁধার নেই স্নেহ যার
কে চায় তার কোলে ঠাঁই ?

কাঁদে শিশু : "হায়, মা বিনা
আমি যে কিছুই চিনি না,

মার বুকে ভাই জাগি ঘুমাই
হাসি কাঁদি নাচি গাই !

মা ছাড়া যার নেই কেউ—তার
গায় না কি প্রাণ : মাকেই চাই ?"

মা বলে হাত বাড়িয়ে হেসে :
"কাঁদাই আমি ভালোবেসে,

অশ্রু-মেঘে স্নেহে জেগে
রামধনু হাসির রঙাই ;

কান্না-নিশার ব্যাকুলতার
ডাকেই উষার সুর সাধাই।"

আখর :

শিশু বলে : জানি জানি
আমি কেবল মাকেই মানি,
ঘুম পাড়াবে কোলে টানি'
এর পরে বল্ আর কি চাই ?

---

* প্রথম দুটি চরণ—অস্থায়ী—খ্যাতনামা সাধক কুমার নরসিংহ রায়ের লেখা। বাকিটুকু পাদপূরণ।

স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর স্মৃতি

স্বামী বিজয়ানন্দ

স্বামী ব্রহ্মানন্দজীকে প্রথম দেখেছি ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে হাওড়া স্টেশনের প্লাটফর্মে। উনি উড়িষ্যার কোন দিকে যাচ্ছেন, ভদ্রক বা কোঠার। মহারাজ যে কে তখন আমি জানতুম না। প্লাটফর্ম থেকেই দেখলুম যে, গৈরিক কাপড় পড়া, দীর্ঘদেহ, এক সন্ন্যাসী কুচবিহার মহারাজের সাদা রোল্স্ রয়েস গাড়ী থেকে নামলেন—গলায় চারনালী ফুলের মালা, এবং প্লাটফর্মে নেমেই অপর-দিকে একটি ট্রেনের কামরার দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছেন। পিছনে রয়েছেন কয়েকজন সন্ন্যাসী এবং শতাধিক ভদ্রলোক। ট্রেনের একটি কামরা থেকে যখন একজন বৃদ্ধা মহিলা বেরিয়ে এলেন সেই সময় মহারাজ প্লাটফর্মের ওপরেই তাঁকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন। মহিলা বললেন, "বাবারা, রাখালকে তুলে ধর।" তখন অন্যান্য সাধুরা ঐ দীর্ঘদেহ সন্ন্যাসীকে অতি সন্তর্পণে তুলে ধরলেন। উনি করজোড়ে শুধু বলতে লাগলেন, "মা, মা, মা!" তখন মহিলা বললেন, "রাখাল, বাবা, তুমি ওখানে গিয়েই আমাকে একটি তার কোরো। আর ছেলেদের বোলো, যেন আমাকে হপ্তায় দুটো করে চিঠি দেয়। গোড়ার দিকে জল ফুটিয়ে খেয়ো। আর ভক্তেরা যা কিছু যত্ন করে পাঠান না কেন, সব খেয়ো না।"

পরে আমি খবর নিয়ে জানলাম ঐ মহিলা হচ্ছেন শ্রীরামকৃষ্ণ-সহধর্মিণী জগন্মাতা শ্রীশ্রীসারদাদেবী, আর ঐ সন্ন্যাসী হলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের মানসপুত্র, তাঁর আদরের রাখাল। একথা শোনার পর আমি একটু চিন্তিত হয়ে যেখানে থাকতুম সেখানে ফিরে গেলুম।

তার পরের বারে আমি মহারাজকে দেখি বেলুড় মঠের ঘাসের জমির ওপর বেড়াতে। তাঁর পাশে ছিলেন পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ, শরৎ মহারাজ এবং খোকা মহারাজ। তাঁরা মঠের মন্দির থেকে পুরনো ডাক্তারখানার দিকে ধীরে ধীরে আসছিলেন এবং ফিরে যাচ্ছিলেন। এর পূর্বে এবং পরে মহারাজের হাঁটার মতো ভঙ্গী, যা আমার কাছে অপূর্ব মনে হয়েছিল, তা আর কারোরই কখনো দেখিনি।

তৃতীয় বার দেখি ১৯২০ খৃষ্টাব্দের পর জানুআরি মাসে। শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের কৃপায় আমি তখন ব্রহ্মচারী হয়েছি। মহারাজ শ্রীশ্রীস্বামীজীর তিথিপূজার পর ভুবনেশ্বর থেকে এলেন। তাঁর মঠে ঢোকা এবং পরে মঠের আমগাছতলায় বেঞ্চির ওপর বসা আমার কাছে একটা উৎসব বলে মনে হল। একের পর এক সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীরা তাঁকে প্রণাম করার পর আমি সর্বশেষে যখন তাঁকে প্রণাম করলুম, তখন পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ বললেন, "রাজা, এই ছেলেটিরই নাম পশুপতি। তোমাকে এর বিষয় চিঠিতে আগে লিখেছি। এ আগে তোমাকে দেখেছে।" পূজনীয় মহারাজ বললেন, "তুই বুঝি আগে আরো মোটা ছিলি?" আমি জবাবে বললুম, "না, মহারাজ, ঠিক উল্‌টো। আপনিই

আরো মোটা ছিলেন।" মহারাজ হাসতে আরম্ভ করলেন। সেই দিন থেকেই আমার ভয় চিরকালের জন্য চলে গেল।

তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের রাজা, সঙ্ঘাধ্যক্ষ। সকলেই তাঁকে পরম শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। কিন্তু আমার কাছে তিনি ছিলেন আমার প্রিয়তম। তাঁর কাছে আমি পরে অনেক দুষ্টুমি করেছি, যেমন ছোট-ছেলে বাবার কাছে করে থাকে।

আমার নিজের অভিজ্ঞতায় মহারাজ ছিলেন দয়ার সাগর। একটা ছাড়া সব ভুলই তিনি ক্ষমা করতেন। তিনি মিথ্যে কথা একেবারেই পছন্দ করতেন না। বলতেন, "ভয় পেয়ে মিথ্যে বলা হয়তো ক্ষমা করা যেতে পারে, কিন্তু জ্ঞানতঃ যে মিথ্যা বলে, সে ভগবানের কাছ থেকে সরে গেছে।" আমি বিশেষ পুঙ্খানু-পুঙ্খরূপে তাঁর কার্যপ্রণালী দেখতুম। দেখেছি, তিনি যে কাজই যখন করতেন, সবটাই অতি সুন্দরভাবে করতেন। একদিন তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, "মহারাজ, আপনি সামান্য সামান্য বিষয়ে এত মন দেন কেন?" উত্তরে মহারাজ বললেন, "বাবা, তোরা জীবনে যাকে সামান্য বলিস, তাকে বড় করে ভাবতে শেখানোর জন্য ঠাকুর আমাকে এই দেহে রেখেছেন।"

ঠিক এই সময়ই তিনি আমাকে ইংরেজী করে বলেন, "Patience with limit is intolerance." (সীমিত ধৈর্য অধৈর্যেরই সমান)।

তারপর আমাকে বললেন, "দেখ্, বাবা, তোকে বক্তৃতা এবং রিলিফের কাজে যেতে হয়। কাউকে কখনো কোন জিনিস দিয়ে অপমান করিস না। হেলায় কাউকে কিছু দিবি না, (পূজায়) অঞ্জলি দেবার মতো দিবি (মহারাজ অঞ্জলি দেবার মতো দেখিয়ে দিলেন)। তাতে ফল কি হবে জানিস? তোরও চিত্ত-শুদ্ধি হবে, আর যে নেবে তারও মনে লাগবে না।"

আনন্দ করে, ফষ্টিনাষ্টি করে মহারাজ আমাদের অনেক কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন। তার বেশীর ভাগই হল ব্যক্তিগত। তিনি মনের কথা বুঝতে পারতেন।

মহারাজের শিক্ষা—গুরুর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। মঠের গিরিশ মেমোরিয়াল-এর দক্ষিণের বারান্দার ধারে মহারাজ একটি ম্যাগনোলিয়া গাছ পুঁতেছিলেন। একদিন আমাকে বললেন, "বাবা, সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পরে দু-বালতি করে জল এই গাছটায় দিস।" আমি সেইভাবেই দিতুম। একদিন তাঁরই আদেশে কলকাতায় বক্তৃতা দিতে আসি এবং ফিরতে রাত্রি হয়ে যায়; ফিরে এসেই গাছটিতে দু-বালতি জল দিই। পরদিন সকালে মহারাজ এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, গাছে ঠিকমত জল পড়েছে কি না, এবং নিজে গিয়ে দেখলেন যে ঠিক সময়ে জল দেওয়া হয়নি। তখন কিছু বিরক্ত হয়ে আমাকে বললেন, "বাবা, আমি তোর গুরু, তোকে একটা অনুরোধ করলাম, সেটাও পালন করলি না। তোর ব্রত নষ্ট হয়েছে।" আমি কাঁদতে কাঁদতে তাঁকে বললুম, "মহারাজ, আপনিই তো আমাকে কলকাতা পাঠিয়ে দিলেন, আমার রাত্রে আসতে দেরী হল। আমার অন্যায়টা কোথায়?" মহারাজ তাঁর গাম্ভীর্য রক্ষা করে আমায় বললেন, "কাউকে বলে গেলি না কেন?" এর পর তাঁর যে-কোন আদেশই হোক না কেন অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি।

এই ঘটনার আগে এবং পরে লক্ষ্য করে দেখেছি, এবং আজও মনে হচ্ছে—মহারাজের আদেশ দেওয়ার একটা বিচিত্র ধরন ছিল; কোন কাজের আদেশ দেওয়ার সময় বলতেন,

"এটা করবি কি ?" দীর্ঘ ৪৩ বৎসর পরে মনে হয়, তিনি এমন মিষ্টিভাবে কথা বলে আমাদের মন গলিয়ে দিতেন যে, তারপর তাঁর আদেশ পালন করতে কোন কষ্ট বা চিন্তা হত না।

মহারাজের মতো ভালবাসা অন্য কোন মানুষের মধ্যে জীবনে আর দেখিনি। তিনি ভালবাসার জমাট মূর্তি ছিলেন। এখন মনে হয়, তিনি ভালবাসা ছাড়া আর কিছুই জানতেন না। এই ভালবাসার শেষ স্তর হচ্ছে অহেতুকী কৃপা। আর অন্যদিক দিয়ে দেখতে গেলে এইটিই হচ্ছে প্রেম। মহারাজ জগতের কাছে পরিচিত শ্রীশ্রীঠাকুরের মানসপুত্র বলে। তিনি আমার কাছে ছিলেন আমার আশ্রয়দাতা, আমার বাবা, বন্ধু এবং আমার উপদেষ্টা, গুরুদেব। কত কিছু আবদার করেছি, আমাকে খুব কম সময়ই ধমকেছেন। তাঁর ধমকানির ভেতরও ছিল আমাদের পরম কল্যাণের চেষ্টা।

স্বামী বিবেকানন্দের কবিতা প'ড়ে

শ্রীমতী মায়াঞ্জনা গোস্বামী

সূর্যও স্বপ্ন দেখে।
অমিত সাধন-বেগ, তীব্র দাহ, অনির্বাণ মুমুক্ষার মাঝে
গোপনে সঞ্চিত রাখে,
আশ্চর্য স্বপ্নালু কবি-মন।

সেই মন স্বপ্ন দেখে—কর্ম ও প্রেমের ;
সেই মহাব্রতে—
"রয়েছে আপন সাজ প্রত্যেকের তরে—
রৌদ্রে জলে আবর্তিয়া চলে দৃশ্যান্তর।"

আপনার মর্মতল মাঝে,
সূর্য তবু একা—
বেদনা-গভীরে জ্বলা চিন্ময় আলোকে
নিত্য তার আত্মপরিক্রমা।

সেই চিদালোকে
একা একা সে কবিতা লেখে।

'জ্যান্ত দুর্গা'

স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ

"ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্যা
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ
ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ॥"

শ্রীশ্রীস্বামীজী শ্রীমা সারদাদেবী-প্রসঙ্গে তাঁর শিবকল্প গুরুভ্রাতা শিবানন্দজীকে লিখেছিলেন, "জ্যান্ত দুর্গার পুজো করবো তবে আমার নাম।" কেন যে তিনি এ কথা বলেছিলেন, সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। তাঁর অবতারকল্প গুরুভ্রাতাদের তিনি লিখেছিলেন, "মা ঠাকরুন কি বস্তু তোমরা এখনও বুঝনি। তাঁর কৃপায় আমি একটু একটু বুঝছি।" তাঁর গুরুভ্রাতাদের সম্বন্ধেই যখন এই, অপরে আর কি করে বুঝবে? তবুও সেই দৈবশক্তির অনুধ্যান যে যেমন পারে করে থাকে। এই জন্যেই "প্রাংশু-লভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ" এই ক্ষীণ প্রচেষ্টা। ভরসা আছে, জগদম্বা পঞ্চো-পচার বা গন্ধপুষ্পের পূজাও গ্রহণ করে থাকেন।

মহামায়া নির্গুণা ও সগুণা, নিত্যা ও লীলাময়ী, জিজ্ঞাসু বনবাসী সম্রাট সুরথকে মেধা ঋষি এই কথাই বলেছিলেন, "এবং ভগবতী দেবী সা নিত্যাপি পুনঃ পুনঃ। সম্ভূয় কুরুতে ভূপ জগতঃ পরিপালনম্।" যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী দেব- ও নর-লোকে মহামায়ার লীলাবিগ্রহধারণের কথা শাস্ত্রাদিতে উল্লেখ আছে। যাঁরা বীর সাধক তাঁরা এসবের যে-কোন একটিকে অবলম্বন করে সাধনমার্গে এগিয়ে যান এবং কৈবল্য লাভ করেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ, যার ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত, তার কি সাধ্য এ সবের কাছে এগোয়? কিঞ্চিৎ ধ্যানের চেষ্টা করলেই হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার যোগাড়। এইজন্য করুণাপাথার জগজ্জননী মানবীবেশে মানুষের ঘরে আসেন। মানুষ তাঁকে তাই সহজে ধরতে পারে, তাঁর কৃপা লাভ করে ধন্য হয়ে যায়।

বর্তমান যুগে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাসঙ্গিনী শ্রীমা সারদাদেবী 'সাক্ষাৎ জগদম্বা'। ঠাকুরের যেমন দিব্য জন্ম, তাঁরও তাই; তিনি নিজেই বলেছেন, "আমার জন্মও ঐ রকম (ঠাকুরের মতন): আমার মা (শ্যামাসুন্দরী) শৌচে গিয়েছিলেন; শৌচ হ'ল না; সামনের একটি বেলগাছ থেকে অনুপমা সুন্দরী একটি মেয়ে এসে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে বললেন, 'আমি তোমার ঘরে এলাম, মা।'" এই দেবীদর্শনের ফলে শ্যামা-সুন্দরীর বাহ্যসংজ্ঞা লোপ হয়ে যায়। আশ্বিন মাসে মহাপূজার প্রাক্কালে বিল্ববৃক্ষেই তাঁর বোধন অধিবাস ও আমন্ত্রণ হয়ে থাকে। সপ্তমীর প্রভাতের আবাহন-কালে বলা হয়— "আগত্য বিল্বশাখায়াম্ চণ্ডিকে কুরু সন্নিধিম্।" কবি বলেছেন:

"সিংহশাবক ক্ষুদ্র হলেও
মদবিমলন হাতীরে হানে।
শক্তিমানের প্রকৃতি ইহাই,
বিক্রম কভু বয়স মানে?"

জয়রামবাটী অঞ্চলে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ। পিতা রামচন্দ্র সকলের জন্যে খিচুড়ির ব্যবস্থা করেছেন। করুণাময়ী মা তখন নেহাত বালিকা, তবুও ছোট্ট হাতে একটি হাতপাখা নিয়ে হাওয়া

দিয়ে খিচুড়ি ঠাণ্ডা করে দিচ্ছেন, কেননা অত গরম গরম কি খাওয়া যায়? কেউ তো তাঁকে একথা শিখিয়ে দেয়নি, প্রয়োজনও নেই—"যা দেবী সর্বভূতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা…"

তাঁর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিয়ে এক অভূতপূর্ব ব্যাপার। এটি মোটেই জাগতিক বিয়ে নয়। প্রাচীন সাহিত্যে হরপার্বতীর মিলনের সংবাদ আমরা পড়ে থাকি। সে মিলনে বুভুক্ষু ইন্দ্রিয়গ্রামের হুল্লোর নেই, অথচ "আগম পুরাণ বেদ পঞ্চতন্ত্র কথা, পঞ্চমুখে পঞ্চানন কহেন উমারে।"—এটি যে একটি নিছক কবিকল্পনা নয়—একথা প্রতিপন্ন করার জন্যই শ্রীভগবান রামকৃষ্ণদেব তথা শ্রীমা সারদাদেবীর এই অভূতপূর্ব লীলাবিলাস। ঠাকুর যেমন ভারতে তথা ভারতেতর দেশে উদ্ভূত সমগ্র সাধনমার্গ অতিক্রম করেছিলেন, সেরূপ শ্রীমার জীবনেও বহু সাধন-তপস্যার কথা আছে। তবে তাঁর জীবনে এই সাধনালব্ধ ফল খুবই গোপন ছিল। কদাচিৎ প্রকট হতো। এই সব সাধনার প্রেরণা ও উপদেশ তিনি ঠাকুরের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন।

বালিকাবধূ যখন কামারপুকুরে গেলেন, স্নানের সময় প্রত্যহ দেখতেন তাঁরই মতন চেহারার আটটি মেয়ে সঙ্গে সঙ্গে হালদার পুকুরে যাচ্ছেন, একসঙ্গে স্নান করছেন, ঘরে ফিরবার সময় আবার কোথায় শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছেন। শাস্ত্র বলেন, জগদম্বা সর্বদা অষ্টসখী-পরিবৃতা—"উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্রা চণ্ডনায়িকা। চণ্ডা চণ্ডবতী চৈব চণ্ডরূপাতিচণ্ডিকা। আভিঃ শক্তিভিরষ্টাভিঃ সততং পরিবেষ্টিতাম্। চিন্তয়েৎ জগতাং ধাত্রীং ধর্মকামার্থমোক্ষদাম্।" নরলীলা হলেও কখনো কখনো দেবত্বের বিকাশ ঘটে, অথচ এর পেছনে কোন বিশেষ প্রচেষ্টাও থাকে না। উত্তরকালে তিনি যখন এসব কথা বলতেন খুব সাধারণ ভাবেই বলতেন।

তেপান্তরের মাঠে সন্ধ্যাবেলা একাকিনী ডাকাতের সামনে পড়লেন। এমন অবস্থায় অনেক জোয়ান লোকেরও ভয় পেয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু তিনি ভয় তো পেলেনই না বরং তাঁর অপার্থিব প্রেমের পরশে সে ডাকাত চিরকালের মতো নিজ জন হয়ে গেল। শোনা যায় যে, শ্রীমার পশ্চাতে ডাকাত তার ইষ্টমূর্তি দেখেছিল। একথা অসম্ভব নয় মোটেই। কেন না ঐশী করুণার কোন কালাকাল নেই। "সর্বোপকারকরণায় সদার্দ্রচিত্তা।"

দ্বাদশবর্ষব্যাপী কঠোর তপস্যার সমগ্র ফল ও জপমালা শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর পাদপদ্মে অর্পণ করলেন। ফলহারিণী কালিকাপূজার রাত্রে তাঁরই শরীর অবলম্বনে শ্রীশ্রীষোড়শীপূজার অনুষ্ঠান করলেন। বিল্ববৃক্ষ থেকে যে শক্তি শ্যামাসুন্দরীর কণ্ঠলগ্ন হয়ে বলেছিলেন—'আমি তোমার ঘরে এলেম, মা', এতদিনে তাতে পরিপূর্ণভাবে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হলো। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর মধ্যে সাক্ষাৎ মা আনন্দময়ীকে শুধু যে প্রত্যক্ষ করলেন তাই নয়, উত্তরকালে সমগ্র মানবসমাজের পরমকল্যাণনিরতা ও জগন্মাতারূপে প্রতিষ্ঠিতাও করলেন। "যোগীন্দ্রপূজ্যাং যুগধর্মপত্নীম্।"

এর কিছুকাল পর থেকেই নরেন্দ্রনাথপ্রমুখ চিহ্নিত পার্ষদগণের আগমন ঘটতে থাকে। ঠাকুরের সেবার সঙ্গে সঙ্গে এই ভক্তমহলের পালন ও আধ্যাত্মিক কল্যাণে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োগ করলেন। স্বয়ং ঠাকুরকে তিনি বলেছিলেন, "আমার ছেলেদের ধর্মজীবন—সে আমি দেখে নেবো।" ঠাকুর যে এতে বিশেষ খুশী হয়েছিলেন একথা বলাই বাহুল্য। তাঁর মধ্যে যে অপার্থিব মহাশক্তির আবির্ভাব

ঘটেছিল, সে সম্বন্ধে হৃদয়কে ঠাকুর সাবধান করে দিয়েছিলেন, বলেছিলেন, "দেখ্, হৃদু, এটার মধ্যে (নিজের শরীর দেখাইয়া) যে আছে, সে যদি ফোঁস করে তাহলে বাঁচলেও বাঁচতে পারিস, কিন্তু ওর মধ্যে (মাকে দেখাইয়া) যে আছে, সে যদি ফোঁস করে, তোকে কেউ বাঁচাতে পারবে না।" অন্য সময় তিনি আরও বলেছিলেন, "ও সাক্ষাৎ সরস্বতী—জ্ঞান দিতে এসেছে।" "মেধে সরস্বতি বরে ভূতি বাভ্রবি তামসি। নিয়তে ত্বং প্রসীদেশে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥" তাঁর মধ্যে ঠাকুরই যে খালি আনন্দময়ীকে সাক্ষাৎ করেছিলেন তা নয়, তিনিও ঠাকুরের মধ্যে জগদম্বাকেই সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অদর্শনের পরে "আমার মা-কালী গো, তুমি আমায় কি দোষে ফেলে গেলে!" বলে অশ্রু বিসর্জন করেছিলেন। জগতের ইতিহাসে এ এক অভূতপূর্ব লীলাবিলাস। সেই মহাশক্তি মহামায়া স্বেচ্ছায় দু'টি দেহ ধারণ করেছেন: "যথা সৌম্য একেন লোহমণিনা সর্বং লোহময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ। বাচারম্ভণং বিকারনামধেয়ম্ লোহম্ ইত্যেব সত্যম্।" শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অথবা শ্রীমা যাঁকেই অবলম্বন করার চেষ্টা করা যাক না কেন, সেই সচ্চিদানন্দকেই অবলম্বন করা হয়, এতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

শিব কখনো শক্তি ছাড়া থাকেন না। আবার শক্তিও কখনো শিব ছাড়া থাকেন না। তাঁরা সর্বদা অভেদ। এই জন্যেই শ্রীরামকৃষ্ণের অদর্শনের পরেও শ্রীশ্রীমা ঠাকুরকে বহু জায়গায় বহু ভাবে বহু প্রকারে দেখেছিলেন এবং তাঁরা যে সর্বদা অভেদ একথাও জিজ্ঞাসু ভক্তকে সহজ ভাষায় বলতেন—"ঠাকুর ও আমাকে অভেদ জানবে।"

প্রাচীন সাহিত্যে পার্বতীর কঠোর তপস্যার কথা আছে। উত্তরকালে সেইসব কথা পাঠ করি আর বিস্মিত হয়ে যাই। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের অদর্শনের পরে কামারপুকুরের ভিটে আগলে জীর্ণবস্ত্রপরিধানা কঠোরতপস্বিনী সারদাদেবীর তুলনা মেলে কি? ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন, "শাক বুনবে আর শাকভাত খাবে আর হরিনাম করবে।" তিনি সে আদেশ আক্ষরিক ভাবেই পরিপালন করেছিলেন। শাকের সঙ্গে নুনটুকুও জুটতো না। অথচ কারোর কাছে হাত পাতেননি। তাঁর দিক্‌পাল-সদৃশ ত্যাগী সন্তানেরা তীব্রবৈরাগ্য-সম্ভূত তপশ্চর্যায় মগ্ন, কে খবর করে? পার্বতীর তপস্যায় তুষ্ট মহাদেবের আবির্ভাবের মতোই এই কালে তাঁর শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন ঘটেছিল, তিনি দেখেছিলেন সপার্ষদ রামকৃষ্ণদেব এগিয়ে আসছেন আর তাঁর পায়ে পায়ে গঙ্গা—"গাঙ্গ্যং বারি মনোহারি মুরারিচরণচ্যুতম্।" ভাবাবেশে মুঠো মুঠো জবাফুল তুলে গঙ্গায় অঞ্জলি দিলেন। এই সময়ই ঠাকুর তাঁকে চিন্ময় স্বামীর কথা বলেছিলেন। আরও বলেছিলেন, "আজ সন্ধ্যেবেলায় গৌরদাসী আসবে, তার কাছে সব শুনবে।" গৌরদাসী বা গৌরীমা সেদিনই সন্ধ্যায় এলেন এবং বৈষ্ণবশাস্ত্র থেকে চিন্ময় স্বামীর কথা মাকে শোনালেন। দিব্যমিলনের পরিপূর্ণতা হয়ে গেল। "A complete spriritual communion of the Divine couple."

শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন, "যে রাম যে কৃষ্ণ সেই ইদানীং রামকৃষ্ণ।" স্বামীজীও বলেছেন, "সোঽয়ং জাতঃ প্রথতপুরুষঃ রামকৃষ্ণস্ত্বিদানীম্।" তবে এবারে গোপনে আবির্ভাব, রাজা যেমন ছদ্মবেশে রাজ্য-পরিদর্শনে আসেন। ছদ্মবেশ হলেও এটি বড় জানতে বাকি থাকে না, বিশেষতঃ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে বিদ্যার ঐশ্বর্য দেখা গেছে। কত ভাব, কত সমাধি,

কত তপস্যা, কত প্রেম, কত করুণা; নির্বিকল্প সমাধি, যেটি লাভ করতে তাঁর গুরু তোতাপুরীকে দীর্ঘ চল্লিশ বছর তপস্যা করতে হয়েছিল, সেটি তিনি একদিনে আয়ত্ত করেছিলেন এবং নিরন্তর ছটি মাস তাঁর এইভাবে অবস্থিতির কথা লোকপ্রসিদ্ধ। এ সমাধি তাঁর কাছে শ্বাসপ্রশ্বাসের মতনই সহজ—"ধৃতসহজসমাধিং চিন্ময়ং কোমলাঙ্গম্।"

কিন্তু শ্রীমার বেলা যে গোপনীয়তা, ত্রিভুবনে তার তুলনা নেই। পরম পূজ্যপাদ প্রেমানন্দজী এক ভক্তকে চিঠিতে লিখেছিলেন—"অপার শক্তি, অপার করুণা, জয় মা, জয় মা।" অনেকেই শ্রীমার দর্শনে গিয়ে তাঁকে সামান্যা সংসারী নারীবোধে ফিরে এসেছে, কেননা যাদের কাছে তিনি স্বয়ং না ধরা দেবেন, তাদের কি সাধ্য তাঁকে ধরে বা বোঝে—"ন জ্ঞায়সে হরিহরাদিভিরপ্যপারা," যেহেতু এসবের মুক্তির দ্বার উন্মুক্ত হওয়ার সময় হয়নি। কিন্তু এ সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে দেবীভাবের বিকাশ ঘটেছে বহুবার। হরিশকে বুকে হাঁটু দিয়ে জিভ টেনে ধরে চপেটাঘাত করেছিলেন। এই করে তিনি হরিশের বেয়াড়াপনার শাসন করলেন—"দুর্বৃত্তবৃত্তশমনং তব দেবি শীলম্।" জিভ টেনে ধরে অসুরকে আঘাত করার কথা পুরাণাদিতে আছে—"দেবীং স্মরামি ধৃতমুদ্গরবৈরীজিহ্বাং ···। জিহ্বাগ্রমাদায় করেণ দেবীং বামেন 'শত্রূন্ পরিপীড়য়ন্তীম্।" উত্তরকালে কোন কোন ভক্তের কাছে তিনি যখন এই ঘটনার বর্ণনা করতেন, তার সঙ্গে যে দরদের পরশ থাকতো, তারও তুলনা মেলে না। আবার সরলমতি শিবরাম যখন তাঁকে বললেন—তুমি কে বল; তাঁকে বললেন, "লোকে বলে আমি মা কালী।" শিবরাম আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "একথা ঠিক তো?" মা বললেন—"হাঁ, ঠিক।" "স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে।"

শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন মনুমেণ্টের উপরে উঠলে সব সমান দেখা যায়। জয়রামবাটীতে ভোজনরত আমজদকে স্বয়ং পরিবেশন করে খাওয়ালেন। নলিনী প্রভৃতি ভাইঝিরা বললেন.—"পিসিমা, তোমার জাত গেল।" মা শুনে বললেন, "শরৎও (সারদানন্দ) আমার যেমন ছেলে, আমজদও আমার তেমন ছেলে।" কোথায় চন্দ্রসূর্যসংকাশ ব্যাসকল্প মহাপুরুষ স্বামী সারদানন্দ আর কোথায় এই সামান্য গ্রামের মুসলমান ডাকাত আমজদ—ত্রিভুবন-জননী ছাড়া অপরের পক্ষে এই সমদৃষ্টি কি সম্ভব? গোলাপমার এক কথার উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "কি করবো, গোলাপ, মা বলে দাঁড়ালে আমি থাকতে পারি না"—"শরণাগতদীনার্তপরিত্রাণপরায়ণে।" জিজ্ঞাসু ভক্ত প্রশ্ন করলেন—ঠাকুরকে আপনি কি দৃষ্টিতে দেখেন? স্থির অকম্পিত কণ্ঠে মা জবাব দিলেন— "সন্তানের মতো"—"ঈশানমাতরং দেবীং···।"

যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা—ঠিক কথা। তা সত্ত্বেও লীলাতে অনন্তকাল তো থাকা যায় না। সর্বদাই নিত্যে ফেরার জন্যে আগ্রহ থাকেই। ঠাকুর বলতেন, "তোদের জন্যে বাদুর-ঝোলা হয়ে আছি।" মার বেলায়ও তাই। কখনো কখনো তিনি বলতেন, "এ কি করছি! আমি তো বৈকুণ্ঠে নারায়ণের পাশে লক্ষ্মীর মতো থাকতে পারি।" 'শ্রীঃ কৈটভারিহৃদয়ৈককৃতাধিবাসা'। হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গার মতন তিনি সকল ভক্তকে অভয় দিয়েছেন, "বিধির সাধ্য নাই, আমার ছেলেকে রসাতলে ফেলে—"ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরানাং···।" আবার কখনো বলতেন, "আমার মতন আর একজন খুঁজে বার কর দেখি?

তিনি তাঁর ত্যাগী ছেলেদের সম্বন্ধে বলতেন "জীবের মুক্তির চাবিকাঠি এদের হাতে"—"বিশ্বাশ্রয়া যে ত্বয়ি ভক্তিনম্রাঃ।"

স্বামীজী বলেছেন, ভারতে নারীজাতির জাগরণের জন্যে মাঠাকুরাণীর আবির্ভাব। তাঁকে কেন্দ্র করে বহু বহু গার্গী মৈত্রেয়ী খনা লীলাবতীর আবির্ভাব ঘটবে।—একথা কখনও মিথ্যা হতে পারে না—"ঋষির নয়ন মিথ্যা হেরে না, ঋষির রসনা মিছে না কহে।" তিনি যে সপ্তর্ষিমণ্ডলের ঋষি নররূপী নারায়ণ। এই আপ্ত-বাণীর সফলতা শুরু হয়েছে, যার ফল সুদূর-প্রসারী হবে।

জগদম্বা তার লীলাবিগ্রহ পরিত্যাগ করে নিত্যে চলে গেছেন। ত্রিভুবনধ্বংসকারী সমুদ্র-মন্থনের বিষ কণ্ঠে ধারণ ক'রে শিব নীলকণ্ঠ। শ্রীরামকৃষ্ণও জগতের যত অমঙ্গল সানন্দে গ্রহণ করে নীলকণ্ঠ হয়েছেন। শ্রীমাও সকলের দুঃখ, সকলের পাপ স্বেচ্ছায় সানন্দে গ্রহণ করে সকলের মুক্তির দ্বার খুলে দিয়েছেন—"মোক্ষ-দ্বারকপাটপাটনকরি!"

আজ তিনি যোগীর ধ্যানগম্যা। স্থূল চক্ষে দেখতে না পাওয়া গেলেও তিনি ঠিক আছেন। যিনি সরল, যিনি পবিত্র এবং তাঁর কৃপায় একান্ত-ভাবে শরণাগতি লাভ করেছেন, তাঁর অন্তরে তিনি বরাভয়করা হয়ে বিরাজ করছেন, সন্দেহ নেই। সুতরাং তাঁর রাতুলচরণে আমরাও প্রার্থনা করবো: মা, তোমার কৃপায় আমাদের সকলের শুভবুদ্ধি হোক; সরলতা, পবিত্রতা ও ভক্তি-বিশ্বাসে হৃদয় পরিপূর্ণ হোক্।

"প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি বিশ্বার্তিহারিণি।
ত্রৈলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব॥"

"বলিদান বা সম্পূর্ণ স্বার্থত্যাগ ভিন্ন শক্তিপূজা অসম্পূর্ণ, ফলও তদ্রূপ।"

"ঈশাহি ধর্মশাস্ত্র বলিয়াছেন, 'Death of the old man'—পুরাতন মানবের মৃত্যু; ভারতের দার্শনিক বলিয়াছেন, ত্যাগ- ও বৈরাগ্য-সাহায্যে মনের নাশ করা; তন্ত্রকার বলিয়াছেন, দেবীর সম্মুখে আত্মবলিদান দেওয়া; যোগী বলিয়াছেন, পূর্ণ একাগ্রতা বা চিত্তবৃত্তিনিরোধ। নানাজাতির ভিতর ঐরূপে ঐ একই মানসিক অবস্থা যে কত প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা সুকঠিন।"

—স্বামী সারদানন্দ

কবে

বনফুল

নবীনের অন্তরালে হে প্রবীণ প্রচ্ছন্ন মহান,
অচেতন মাঝে ওগো সদা সচেতন,
প্রস্তরেও স্বস্থ তুমি, লক্ষ লক্ষ দূর্বাদলে
ওড়ে তব সবুজ কেতন :
বহু শত শতাব্দীর ধ্বংস-মরু অতিক্রমি
তব ধারা চির স্রোতস্বিনী,
গঙ্গা-ফল্গু-সিন্ধু-তাপ্তী-কৃষ্ণা-কাবেরীতে
তুমি ওজঃ, তুমি ওজস্বিনী।

পাতালেতে ভোগবতী, আকাশে আকাশ-গঙ্গা,
স্বর্গলোকে মন্দাকিনী-ধারা
বিভিন্ন বিচিত্র রূপে স্বর্গে মর্ত্যে পাতালেতে তুমি আত্মহারা।
তোমারই মাঝারে রূপ লুপ্ত হয়ে হয় রূপান্তর,
সমুদ্র পর্বত হয়, পর্বত প্রান্তর,
তিরোধান হয় অবির্ভাব,
মৃত্যু হয় নব জন্ম-লাভ।

হে শাশ্বত, চিরন্তন, চিরদীপ্ত, চির-অভিরাম
ঋষিমুখে কবিমুখে শুনিয়াছি তব শত নাম
শুনিয়াছি লক্ষ কোটি গান
বিশ্বাস-নিকষে কবে ওগো জ্যোতির্ময়
অন্তরেতে হবে দীপ্যমান,
পরোক্ষের যবনিকা সরে' গিয়ে কবে
অপরোক্ষ হবে ?

পতিতপাবন

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

কথাটা রাম দত্তই তুললেন। বললেন সুরেশ মিত্তিরকে, মদ খাওয়া তুমি ছেড়ে দাও।

সুরেশ বললেন, তোমার কথাতেই ছাড়বো? আমার এত দিনের অভ্যেস্—ছাড়লেই হলো! চল প্রভুর কাছে যাই। তিনি যা বলবেন তাই করবো।

নবৎখানার সামনে বড় যে বকুলগাছটা ছিল তারই তলায় দাঁড়িয়ে ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। সুরেশকে সঙ্গে নিয়ে রাম দত্ত গিয়ে দাঁড়ালেন সেইখানে। গড় হয়ে দু'জন প্রণাম করতেই অন্তর্যামী ঠাকুর বুঝতে পারলেন তাঁদের মনের কথা। বললেন, দেখ, যা খাবে মাকে নিবেদন করে খাবে। আর যেন মাথা টলে না, পা টলে না।

ফেরার পথে সুরেশ মিত্তির রাম দত্তকে বললেন, শুনলে তো ঠাকুর কি বললেন? তুমি খালি খালি বলছো মদ ছেড়ে দাও, মদ ছেড়ে দাও। প্রভুর আদেশ হয়ে গেছে। আর আমার ভাববার কিছু নাই। মদ আমি খাব।

এমনি করে দিনের পর দিন চলতে থাকলো মাকে নিবেদন করে তাঁর মদ্যপান।

কিন্তু সুরেশ মিত্তির সেই আগের সুরেশ মিত্তির আর রইলেন না। পরম ভক্ত হলেন সুরেশ মিত্তির। মায়ের চিন্তা আর ঠাকুরের চিন্তাতেই মশগুল।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাই বলেছিলেন। বলেছিলেন, দেখ, তাঁকে চিন্তা করতে করতে পান করতে তোমার আর ভাল লাগবে না। তাঁকে লাভ করলে সহজানন্দ হয়।

শেষে সেই সহজানন্দই হয়েছিল সুরেশ মিত্তিরের।

দেশের জন্য যাঁরা ভাবেন তাঁরা উঠে পড়ে লেগেছেন। প্যারীচরণ সরকার 'সুরাপান-নিবারণী সভা' স্থাপন করেছেন। দীনবন্ধু মিত্র 'সধবার একাদশী' নাটক লিখেছেন।

সে এক অদ্ভুত নাটক।

সেই নাটকের প্রধান চরিত্র নিমচাঁদ বলছে, সেকালে ভূতে পেতো, একালে আমাদের মদে পেয়েছে। আমি তাকে ছাড়তে পারি, কিন্তু সে আমাকে ছাড়ছে কই? আর ছাড়বোই বা কেন? এক ব্যাটা বড় মানুষের ছেলে মদ ধরলে দ্বাদশটি মাতাল প্রতিপালন হয়।

সে-যুগে মদ না খাওয়া মানে শিক্ষিত বলে কল্‌কে না পাওয়া। রামগোপাল ঘোষের ভাগনে গ্র্যাজুয়েট হয়েছে কিন্তু মদ খায় না। ঘোষমশাই তাকে দুঃখু করে বলছেন—তুই মদ খেতে শিখলি না, তোকে আমি সমাজে বার করি কি করে?

ওদিকে তখন আবার এই মদ খাবার লোভেই অনেক হিন্দু ছেলে খৃষ্টান হয়ে যাচ্ছে।

খৃষ্টান হলে নাকি প্রকাশ্যে মদ-মাংস খাওয়া চলে। কেউ কিছু বলে না।

পাদরি-সাহেবরা ঘরে ঘরে তখন বাইবেল বিলি করছেন। 'বাইবেল' আর 'লুকলিখিত সুসমাচার'। বাঙ্গালী পাদরির দল রাস্তার ধারে, গলির মোড়ে, স্কুল-কলেজের গেটের সামনে আর পার্কের ভেতর কেরোসিন-কাঠের

বাক্সের ওপর দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে খৃষ্টধর্ম প্রচার করছেন।

অর্থাৎ বলছেন—আমাদের খৃষ্টধর্ম কত ভাল আর তোমাদের হিন্দুধর্ম কত খারাপ! আমাদের ঈশ্বর এক আর নিরাকার। তোমাদের ঈশ্বর একটি-দুটি নয়, তেত্রিশ কোটি। ঘটে পটে আর মাটির ঢেলায়।

আমাদের যীশুখৃষ্ট মানুষের সব পাপ নিজের স্কন্ধে নিয়ে মৃত্যু বরণ করেছেন। আর তোমাদের কালী নিষ্ঠুরভাবে মানুষকে কেটেছে আর উলঙ্গ হয়ে নেচে নেচে বেড়িয়েছে। কেষ্ট তো যেমন লম্পট, তেমনি চোর।

সুতরাং এসো, খৃষ্টধর্ম গ্রহণ কর এবং নিশ্চিন্ত হও!

গীর্জায় গিয়ে দলে-দলে নাম লেখাতে লাগলো।

খৃষ্টান হওয়া মানেই সাহেব হয়ে যাওয়া। কোট প্যাণ্ট পরা আর মদ খাওয়া তো চলবেই।

একে প্রতিরোধ করবার চেষ্টা করলেন রামমোহন রায় বেদান্তের বাণী প্রচার করে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করলেন ব্রাহ্মধর্ম।

কেশবচন্দ্র সেন প্রবর্তন করলেন এক নব-বিধান। খৃষ্টধর্ম এবং হিন্দুধর্মের মধ্যে একটা আপোষ মীমাংসা করলেন তিনি। মূর্তি ছেড়ে দাও, ঈশ্বর হোক নিরাকার কিন্তু ভক্তির ভাবটি ধরে রাখো। জাতিভেদ তুলে দাও আর মুক্তি দাও স্ত্রীজাতিকে।

অনেকের মনে ধরলো কথাটা। ইংরেজের ধর্ম খৃষ্টানীও আছে আবার বাপ-পিতামহের ধর্ম হিন্দুয়ানীও আছে।

কিন্তু সাধারণ মানুষ—কোনোটাই ঠিক বুঝতে পারলে না। না পারলে খৃষ্টধর্মকে বুঝতে, না পারলে ব্রাহ্মধর্মকে। গোঁড়ামি ছিল, কিন্তু ঠাকুর-দেবতাও ঠিকমত বোঝে না, নিরাকার ব্রহ্মও বোঝে না। আসলে কোনও ধর্মেরই ধার ধারে না। ইন্দ্রিয়ের বাইরে আর কোনও অনুভূতির অস্তিত্ব আছে বলে তাদের মনেই হয় না।

মানুষের মন যখন এমনি একটা বিভ্রান্তির মাঝে দিশেহারা, তখন এলেন আমাদের দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। নিয়ে এলেন অতীন্দ্রিয় অনুভূতি। নিয়ে এলেন সহজ মানুষের ধর্ম। নিয়ে এলেন শান্তি, সাম্য আর সমন্বয়। নিয়ে এলেন বুকভরা ভালবাসা, আর সেই ভালবাসার অপরূপ মহিমা।

বললেন, যে যা ভাবে ভাবুক, যে ভাব নিয়েই ভগবানের দিকে এগিয়ে চলুক, আমি কারও ভাব নষ্ট করি না। ভাব যদি আন্তরিক হয় তো ঠিক সে তার ঠিকানায় পৌঁছে যাবে।

মদ খেয়ে যারা মাতাল হয় তাদের সম্বন্ধেও ঘৃণার ভাব ছিল না ঠাকুরের।

গাড়ীতে চড়ে কোথাও হয়তো যাচ্ছেন তিনি—তখনকার দিনের গাড়ী মানেই ঘোড়ার গাড়ী। পথে হয়তো মন্দির পড়ছে, প্রণাম করছেন রামকৃষ্ণ। মসজিদ পড়ছে, সেখানেও প্রণাম।

শুধু মন্দির মসজিদ নয়, মদের দোকানে ভিড় দেখছেন পথের ধারে, সেখানেও প্রণাম। কারণ যাকে মনে পড়ছে, কারণানন্দ মনে পড়ছে।

মেয়েরা দাঁড়িয়ে আছে বাড়ীর বারান্দায় কিংবা রাস্তার ধারে। হাত দুটি জোড় করে প্রণাম করছেন ঠাকুর। বলছেন—মা আনন্দময়ী।

তখনকার দিনে একটুখানি ইংরেজী লেখাপড়া শিখেছে কি অমনি মাথা উঁচু করে চলতে লাগলো। মাথা হেঁট করবে না।

প্রণাম করবে না। প্রণাম করাকে বলে কুসংস্কার। হাতটা একবার কপালে ছুঁইয়ে বলে, গুড্ মর্নিং।

মাথা নোয়ালেই যেন মান যাবে।

ঠাকুর বলেন, ওরে, মাথা নত কর্। প্রণাম করতে শেখ্। মানুষের মধ্যে যেখানে যেটুকু গুণ দেখবি, জানবি ঈশ্বরের কৃপা—ঈশ্বরের প্রকাশ। সেই গুণের কাছে মাথা নোয়া।

নাম কর্ আর প্রণাম কর্!

ভক্তসঙ্গে 'চৈতন্যলীলা'-অভিনয় দেখতে এসেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

খবর পেয়ে গিরিশ ঘোষ এগিয়ে এলেন অভ্যর্থনা করতে। গিরিশকে দেখেই ঠাকুর প্রথমে প্রণাম করলেন।

প্রণাম ফিরিয়ে দিলেন গিরিশ।

ঠাকুর আবার প্রণাম করলেন। গিরিশ যতবার প্রণাম ফিরিয়ে দেন, ঠাকুর ততবার প্রণাম করেন।

গিরিশ শেষে নিজেই থেমে গেলেন। ভাবলেন, দক্ষিণেশ্বরের এই পাগলা বামুনটার সঙ্গে পেরে উঠবো না। প্রণামে ওর ঘাড় ব্যথা হয় না কিছুতেই।

নট ও নাট্যকার গিরিশ ঘোষ।

পাঁড় মাতাল গিরিশ ঘোষ। থিয়েটারে অভিনয় করেন, নাটক লেখেন আর বোতল বোতল মদ খেয়েও তাঁর নেশা হয় না। আরও সব ছিল—কিছুই বাদ যায় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ কী যে দেখেছিলেন এই মানুষটির ভেতর!

দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন গিরিশ ঘোষ।

গিরিশ জানেন তিনি কত পাপ করেছেন। যেখানে বসেন সাত হাত মাটি নাকি তলিয়ে যায় সে পাপের ভারে!

তা এত পাপ কী আছে যা পতিতপাবনও হরণ করতে অক্ষম?

পাপের পাহাড়? সে তো তুলোর পাহাড়। একবার বিশ্বাস নিয়ে মা বলে ফুঁ দিলেই উড়ে যাবে।

বিশ্বাসের বাতাসে, শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় সত্যিই সব উড়ে গিয়েছিল।

গিরিশ বলেছেন, কি আর পাপ করেছি? তুমি আসবে জানলে আরো বেশী করে করতুম।

দক্ষিণেশ্বরে এসে গিরিশ ঘোষ শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সব ভার নিলেন।

গিরিশ জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে এখন থেকে আমি কি করবো?

ঠাকুর বললেন, যা করছো তাই করে যাও।

তা কর্ম করতে হবে বৈকি। তবে তার সঙ্গে একটু স্মরণ-মনন চাই। ওইটেই হচ্ছে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হবার সেতু।

ঠাকুর আবার বললেন, এদিক-ওদিক দুদিক রেখে চল। তারপর যখন একদিক ভেঙ্গে যাবে তখন যা হয় হবে। তবে সকাল-বিকেলে তাঁর স্মরণ-মননটা রেখো।

গিরিশ ভাবনায় পড়লেন। সকালে কখন ঘুম থেকে ওঠেন তার ঠিক নেই। বিকেলে হয় থিয়েটারে নয় অন্য কোথাও। স্মরণ-মননের সময় কই? কিন্তু এইটুকু অনুরোধ—আসন নয়, প্রাণায়াম নয়, পূজো নয়, আহ্নিক নয়, নিশান্তে আর দিনান্তে একবার মাত্র ডেকে ঈশ্বরকে বাধিত করা। তাও পারা যাবে না। কিন্তু মনের সঙ্গে চোখ ঠেরে লাভ নেই—করবো বলা যায় না। আবার সামান্য একটু স্মরণ-মনন করতে বলছেন ঠাকুর, পারবোনাই বা বলেন কোন্ মুখে। গিরিশ মাথা হেঁট করে বসে রইলেন।

ঠাকুর অন্তর্যামী। না বললেও সব বুঝলেন। বললেন, আচ্ছা, তা যদি না পার তো খাবার শোবার আগে তাঁকে একবার স্মরণ করে নিও।

গিরিশ চুপ করেই রইলেন। ভাবলেন, খাবার শোবার কোন ঠিক আছে নাকি আমার। আবার কাজের চিন্তায় যদি তখন ভুলে যাই! মিছিমিছি বলবো, কথা দিয়ে রাখতে পারবো না, সেটা ঠিক নয়।

ঠাকুর তখন গিরিশের দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বললেন, তুই বলবি তাও যদি না পারি, আচ্ছা তবে আমায় বকল্‌মা দে।

তার মানে?

তার মানে গিরিশকে কিছুই করতে হবে না। সব ভার ঠাকুরের। গিরিশের হয়ে তিনিই সব করবেন।

সে দিনের মতো খুব খুশী হয়ে গিরিশ বাড়ী ফিরে এলেন। সব ভার ঠাকুরের ওপর দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ী ফিরেছেন। মনটা খুব হালকা হয়ে গেছে।

ঠাকুরের অহেতুক কৃপার কথা ভাবছেন তিনি।

ভাবতে ভাবতে এমন হলো—দিবারাত্রি ভাবছেন শ্রীরামকৃষ্ণের কথা।

গিরিশ মনে মনে হাসলেন। ঠাকুরের এ তো মন্দ কৌশল নয়! বকল্‌মা নিয়ে ছুটি দিলেন বলে লোহার শিকলে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেললেন তাঁকে।

বকল্‌মা দেওয়ার মধ্যে যে এত আছে তা কে জানতো?

এ ঠাকুরের করুণা।

এখন সব সময়েই ঠাকুরের কথা ভাবছেন গিরিশ। তোমারই হাতে সমর্পণ করেছি আমার যথাসর্বস্ব, আমার জীবনস্বত্ব। এখন তুমি যা করবে তাই হবে। আমার নিজের ওপর আর আমার কোন কর্তৃত্ব নেই।

স্ত্রী মারা গেল গিরিশের। দুটি কন্যাও। পরে ছোট ছেলেটিও।

উপায় নেই। বলবার উপায় নেই—এ কি করলে ঠাকুর! হাহুতাশ করবার উপায় নেই সব গেল বলে। নিজের মনকে প্রবোধ দিলেন গিরিশ। কোন্ পথে তোমার মঙ্গল, কোন্ পথে তোমার অমঙ্গল—তুমি কিছুই জানো না। ঠাকুরের হাতেই সব। সম্পূর্ণ তোমাকে, তোমার যাবতীয় কর্মকে, তোমার ইচ্ছাকে তুমি নিজের হাতে দান করে দিয়েছ শ্রীরামকৃষ্ণকে। তিনি তাঁর নিজের জিনিস নিয়ে যা খুশি তাই করুন মারুন, কাটুন, ভাঙুন, গড়ুন, তোমার কিছু বলবার নেই।

গিরিশের সব দুশ্চিন্তা মুহূর্তে অন্তর্হিত হয়ে যায় শ্রীরামকৃষ্ণের কথা ভেবে—তিনি আমার ভার নিয়েছেন!

জয় শ্রীরামকৃষ্ণ!

ফেরার পথে

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

এবার আমার পশ্‌ছে কানে
দেবাঙ্গনার হুলুধ্বনি ;
কোল পাতিয়া বসে আছেন
ডাক্‌ছে কোলে মোর জননী।
কতই প্রীতি, কতই স্নেহ
পুণ্য আমার ক'রল গৃহ।
যশোদা-মার মতন দিলেন
ক্ষীর নবনী এই অবনী।

দুঃখ ও সুখ পেলাম কত,
পেলাম কত ভালবাসা।
আহা, কত গরুড় পাখী
হৃদয়কোণে বাঁধলে বাসা।
অমৃতের যে স্বাদ পেয়েছি,
পুণ্যতোয়ায় ঢের নেয়েছি ;
কতই তীর্থে করিয়াছি
আমার মায়ের জয়ধ্বনি।

কর্মে গেছে দিবস আমার,
যামিনী হায় তপস্যাতে।
যা চেয়েছি যা পেয়েছি,
অমৃতের আস্বাদই তাতে।
এখন যাওয়ার ক্ষণ যে এল।
দেখছি আমি কেবল আলো।
আনন্দ ও রূপের মাঝে
যাচ্ছে ডুবে দিনমণি।

মুক্তা নহে মুক্তি আমি
লভিয়াছি অজয়-জলে।
গ্রামটি আমার প্রাণের জিনিস
খণ্ড স্বর্গ ভূমণ্ডলে।
'নীললোহিতে' আলিঙ্গিয়া
রইবে জেনো আমার হিয়া।
আমার গ্রামের সুপুত্রেরা
দেশকে আমার ক'রবে ধনী।

পারের কড়ি

শ্রীকালিদাস রায়

মান যশ রটিয়াছে সারা এই বঙ্গে
প্রমাণ-পত্রগুলি নেবে কি গো সঙ্গে
এনেছি বার্তাবহ আঁচল ভরি ?
মিলিবে কি ওতে ভাই পারের কড়ি ?

পড়িয়াছ লিখিয়াছ অনেক কেতাব
পেয়েছো তাহাতে কত ডিগ্রী খেতাব।
নিয়ে যাবে ওয়াগনে সে-সব ভরি ?
না না, ওতে মিলিবে কি পারের কড়ি ?

সাজায়েছো ঘর দামী জিনিস দিয়ে
অনেক পেয়েছো দিয়ে ছেলের বিয়ে
সে সব কি নিয়ে যাবে ভরিয়া লরি ?
না না, ওতে মিলিবে কি পারের কড়ি ?

মেডেল পেয়েছো কত রূপার সোনার
অঙ্গে কি সঙ্গে কি নেবে তা তোমার ?
শিঙায় ডাকিছে মোরে পারের তরী
কিছুই চাই না, চাই পারের কড়ি॥

তত্ত্বমসি

শ্রীনরেন্দ্র দেব

সত্য তুমি কে ? সেই তত্ত্বটি—দেখো খুঁজে তব হৃদয়ভূমি,
তুমি যাহা নও তা' হবার কভু ব্যর্থ চেষ্টা কোরনা তুমি।
জাগ্রত করো বিবেক-বুদ্ধি, আপন মনের গভীরে চাও,
জ্ঞানীরা বলেন ইন্দ্রিয়াতীত হবার পথটি খুঁজিয়া নাও।

মনে করো তব নাহিকো শরীর, চক্ষু, কর্ণ, কিছুই নাই ;
করিবে যে মনে—সেই মনও নেই, অনুভবে তাই মেলেনা খেই !
নিশীথ রাত্রে শয্যার 'পরে নিদ্রার ঘোরে যে অচেতন,
ভেবে দেখো, সেও বেঁচে আছে, টানে শ্বাস প্রশ্বাস প্রতিক্ষণ !

তবে কি আমার নিঃশ্বাস-বায়ু আয়ুরূপে আছে আমাকে ল'য়ে,
এই বায়ু যদি নিঃশেষ হয়, যাবে কি জীবনও শূন্য হ'য়ে ?
কে দিয়েছে গতি ? শব্দ কে দিল ? রসনায় কেবা ফোটালো বাক্ ?
কে যোগালো দেহে অস্থি মাংস ? পঞ্চেন্দ্রিয় নাই বা থাক।

তবু, আছো তুমি। সে তুমি কে তুমি? সেই তো 'সোঽহং' সত্তা তব,
মানুষ তো নয় মাটির পুতুল, মানুষই ধরায় স্রষ্টা নব !
সকল চিন্তা সব ভাবনার অতীত যেজন সেই তো তুমি !
'তত্ত্বমসি' বা 'তৎ সৎ' নও, তুমিই তোমার লীলার ভূমি।

লৌকিক যদি থাকে কিছু সেটা অলৌকিকের সঙ্গে বাঁধা,
দেহ নয় যেটা, নয় যেটা মন, তবে কি এ এক গোলকধাঁধা ?
না না ধাঁধা নয়, তোমারই সত্তা আছে বহুরূপে বিবিধ সাজে,
গ্রহ তারা যত, এই চরাচর, বিশ্ব-বিধাতা তোমারই মাঝে।

তোমারই প্রকাশ নিখিল ধরায়, সূর্য চন্দ্র আজ্ঞাবহ।
বিশ্বপতি যে তুমিই বিরাট, ক্ষুদ্র সীমায় বদ্ধ নহ ॥
অন্তরে তব আনন্দ শুধু, পরমানন্দ স্বয়ং তুমি।
ফলে ফুলে জলে মেঘে বিদ্যুতে, নাচে আলো হাওয়া চরণ চুমি ॥

তরঙ্গ তুমি সৃষ্টিসাগরে, ধ্বংস প্রলয় নৃত্যে তব,
রূপে রসে ভরা নন্দন তুমি, তুমি মন্দারপুষ্প নব।
নব জীবনের সৃজনী শক্তি তব প্রাণবীজে পূর্ণ ধরা,
'মায়া' ব'লে যারা লীলাবে দেখেনা দৃষ্টি তাদের হয়না ভরা!

রহস্য শুধু সেই বোঝে যার মোহঘোর সব গিয়েছে টুটে,
প্রজ্ঞা-আলোকে প্রোজ্জ্বল তার দৃষ্টিতে ওঠে সৃষ্টি ফুটে!
তুমি ভগবান! তুমিই ব্রহ্ম! পুরুষপ্রধান তুমিই জেনো,
এই ধরণীর সরণী বহিয়া তোমার অমৃতপ্রসাদ এনো।

মনের মন্দির

শ্রীঅক্রূরচন্দ্র ধর

পাথরের পরে পাথর গাঁথিয়ে মন্দির গড়া যায়,
কিন্তু মনের মতন করিয়া মনটিরে গড়া দায়।
সে'টি যে পেরেছে তার কিবা আছে মন্দিরে প্রয়োজন?
মনে গয়া-কাশী, ত্রিবেণী প্রয়াগ, মনেই বৃন্দাবন।

সে মহাপুণ্য তীর্থসলিলে শ্রদ্ধায় অবগাহি
দেখে যে সাধক, দেখে সে তখন প্রজ্ঞা-নয়নে চাহি—
আকার-বিহীন দেবতাই তার সাকার হইয়া আছে,
অনলে অনিলে আছে জলে, আছে হৃদি-মন্দির মাঝে!

জগতের যত জীব, শিব; যত জীবালয়, শিবালয়;
যত জলাশয়, সকলি গঙ্গা—পূতসলিলময়।
বিশ্বরূপেই বিরাজ করেন নিখিল বিশ্বনাথ,
মনটি যাহার মনের মতন সেই পাবে সাক্ষাৎ।

শিক্ষাসমস্যায় স্বামী বিবেকানন্দের দান

রেজাউল করীম

আজকাল দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা নিয়ে নানাপ্রকার আলোচনা হচ্ছে। কিন্তু সর্ববাদি-সম্মত কোন স্থির সিদ্ধান্তে কেউ উপনীত হতে পারছেন না। শিক্ষাসমস্যা নিয়ে এই যে তর্কবিতর্ক, কবে যে তার চূড়ান্ত সমাধান হবে তা কেউ নিশ্চয় করে বলতে পারে না। কিন্তু শতবর্ষ পূর্বে বিপ্লবী সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ শিক্ষা সম্বন্ধে বহু চিন্তা করেছিলেন। তিনি বহু মূল্যবান উপদেশ ও নির্দেশ দিয়ে গেছেন। আজকের যুগে শিক্ষাসমস্যা সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার সময় যদি আমরা তাঁর আদর্শগুলি পরীক্ষা করে দেখি, তবে বর্তমান যুগের শিক্ষাসমস্যার উপর যথেষ্ট আলোকপাত করা সম্ভব হবে। এই প্রবন্ধে স্বামীজীর শিক্ষানীতি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করব।

স্বামীজী ছিলেন ভারতের জাগ্রত আত্মার মূর্ত প্রতীক। ভারতের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্য যা করা প্রয়োজন তিনি গভীরভাবে সে-সব কথা চিন্তা করেছিলেন। সেইসঙ্গে শিক্ষার কথাও তিনি ভেবেছিলেন। সে যুগে বৃটিশ সরকারের তত্ত্বাবধানে যে শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল তার শোচনীয় পরিণতি তিনি প্রত্যক্ষ দেখেছিলেন। স্বামীজী মনে করলেন যে, এ শিক্ষাব্যবস্থার দ্বারা জাতির সামগ্রিক উন্নতি সম্ভব হবে না। কেরানি ও অফিসার সৃষ্টির জন্য যে শিক্ষাব্যবস্থা বৃটিশ সরকার প্রবর্তন করেছেন তা সেই নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন মহৎ কাজ করতে পারবে না। তিনি জানতেন যে, দেশের ছেলেমেয়েদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে না পারলে কোন স্থায়ী ফললাভ হবে না। দেশের যথার্থ উন্নতিও হবে না। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, স্বামীজী শিক্ষাব্যাপারে কোথাও একনায়কত্বের ভাব দেখাননি। তিনি নিজে ছিলেন একান্ত দার্শনিক। আর তাঁর মন ছিল গণতান্ত্রিক। তাই তিনি ছাত্রছাত্রীদের জন্যও স্বাধীনতা ও স্বাধীন পরিবেশের প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার করেছেন। তিনি চেয়েছিলেন স্বাধীন পরিবেশে স্বাধীন মন গড়ে তুলতে।

শিক্ষা বলতে তিনি বুঝতেন, ব্যক্তির আত্মশক্তির স্বাধীন ও বাধাহীন বিকাশ। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, প্রত্যেক শিশুর তথা শিক্ষার্থীর একটা সহজাত প্রকৃতি ও প্রবণতা আছে। শিক্ষার্থীর প্রতিভা ও কর্মশক্তি কতটা বিকাশিত হবে তা বহুলাংশে নির্ভর করে তার নিজস্ব শক্তি, প্রতিভা ও প্রবণতার উপর। সেই সঙ্গে সুস্থ পরিবেশের কথাও চিন্তা করতে হবে। কারলাইল একেই বলেন sphere of influence বা প্রভাবের ক্ষেত্র। অন্যান্য শিক্ষাবিদের মতো তিনিও এই সুস্থ পরিবেশের উপর গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন। প্রত্যেক ছাত্রের একটা নিজস্ব কর্মতৎপরতা ও নিজস্ব কর্মপদ্ধতি আছে। পরিবেশের মধ্যেই তার প্রতিভা ও কর্মশক্তির বিকাশ হওয়া দরকার। সে সুযোগসুবিধা তাকে দিতেই হবে। উপযুক্ত পরিবেশ ছাত্রের নিকট একটা মনস্তাত্ত্বিক আবহাওয়া বা পরিমণ্ডল সৃষ্টি করবে। ছাত্রকে সর্বপ্রকার সুযোগ দিতে হবে যেন

সে সেই আবহাওয়ার মধ্যে কাজ করতে পারে, পড়াশুনা করতে পারে, খেলাধুলা করতে পারে, তাকে প্রতিটি কাজ উৎসাহ দিতে থাকে। যেমন জলবায়ু মাটি তার দেহমনের বিকাশকে সাহায্য করবে, সেইরূপ পরিবেশ সহজ ও স্বাধীনভাবে তার মানসিক ও নৈতিক জীবনের বিকাশ সাধন করতে সাহায্য করবে। কিন্তু স্বামীজী বলেন যে, এসব ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, পরিবেশের কাজ সীমিত। পরিবেশের সাহায্য যতটুকু লওয়া দরকার ততটুকুই নিতে হবে। তার বেশীও নয়, কমও নয়। কারণ সবই যদি পরিবেশের উপর ছেড়ে দেওয়া হয় তবে ছাত্র বা শিক্ষার্থী বন্য গোছের হয়ে উঠবে। অবশ্য এমনভাবে ছাত্রকে পরিচালিত করতে হবে যে, তার ভিতরের শক্তির স্বাভাবিকভাবে বিকাশের পথে যেন কোন বাধাসৃষ্টি না হয়। তার আসল সত্তাকে প্রকটিত করতে বাধা দিতে পারে এমন কোন সুযোগ যেন পরিবেশ দিতে না পারে—সে দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।

শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মশিক্ষার কোন স্থান থাকা উচিত কিনা, এ বিষয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কিন্তু এ বিষয়ে স্বামীজীর মনে কোন দ্বিধা-সঙ্কট জাগেনি। তিনি বলতেন যে, ধর্মজ্ঞান ব্যতীত জীবনই ব্যর্থ। ইউরোপ-আমেরিকা যে এত জড়বাদী হয়ে উঠেছে তার প্রধান কারণ—ধর্ম সে-সব দেশে গৌণ বিষয় হয়ে উঠেছে। আমাদের তা করলে চলবে না। তাই শিক্ষাব্যবস্থায় তিনি ধর্মশিক্ষাকে একটা প্রধান স্থান দেবার কথা বলেছেন।

ছাত্রদের কি শিক্ষা দিতে হবে, এটুকু জানলেই সব সমস্যার সমাধান হয় না। শিক্ষকেরও একটা দায়িত্ব আছে। স্বামীজী বলেছেন যে, শিক্ষানীতিতে শিক্ষকেরও একটা প্রধান ভূমিকা আছে। শিক্ষক কেবলমাত্র বেতনভোগী কর্মচারী নন। নিয়মিত সময় স্কুলে আসা-যাওয়া ও নির্দিষ্ট কতকগুলি পাঠ দেওয়াই তাঁর একমাত্র কর্তব্য নয়। এতেই তাঁর নিষ্কৃতি নাই। তাঁকে আরও অনেক প্রকার কর্তব্য কর্ম করতে হবে। তাঁর প্রধান কাজ হবে ছাত্রের ভিতরের শক্তি ও বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে তোলা। সেজন্য একটা মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। ছাত্রের উপযুক্ত বিকাশের জন্য এ কাজটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বস্তুতঃ শিক্ষক একটা মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ রচনা করবেন। তিনি ছাত্রের নিকট তার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে উপস্থিত করবেন। তিনি ছাত্রদের পূর্বপুরুষদের সাহস, মহৎ জীবনাদর্শ ও গৌরবময় কীর্তির ইতিহাস তুলে ধরবেন; জাতির সাংস্কৃতিক পটভূমির উপর ছাত্রদের মনকে তৈয়ার করবার জন্য সতত উৎসাহ দিবেন। বৃটিশ সরকার আমাদের দেশে যে শিক্ষাব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়েছিল, স্বামীজী তার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি দেখেছেন যে, এ শিক্ষার দ্বারা আদর্শ মানুষ গড়ে উঠে না। এই শিক্ষাপদ্ধতিকে তিনি বলতেন 'নেগেটিভ' শিক্ষা'। এই শিক্ষা আমাদেরকে দেশের কথা শিক্ষা দেয় না। "আমরা সামান্য নগণ্য, আমরা কিছুই নই"—এই ধরনের মনোভাব গড়ে উঠে। আমাদের দেশ যে একদিন মহান ছিল, মহামানুষ এদেশে জন্মেছিলেন, একদিন এদেশ সভ্যতার উচ্চশিখরে প্রতিষ্ঠিত ছিল, সে-সব শিক্ষা দেওয়া হত না।

স্বামীজী মনে করতেন যে, শিক্ষার্থিগণ যদি বিশুদ্ধ আদর্শ না পায় তবে তাদের আচরণও বিশুদ্ধ হবে না। সুতরাং তাদের

বিশুদ্ধ আদর্শ দিতে হবে। তাঁর মতে ছাত্রদের যে-সব মহান আদর্শ শিক্ষা দেওয়া দরকার, সেগুলি তাদের চরিত্র গঠন করতে সক্ষম হবে। শিক্ষার একটা প্রধান উদ্দেশ্য হবে character-making assimilation of ideas. শিক্ষার্থীদের সামনে দিতে হবে অতীত যুগের মহামানবগণের কর্মজীবনের মহান আদর্শ। তারা এইসব আদর্শকে মডেল বা নমুনারূপে অবলম্বন করে নিজেদের জীবন গড়ে তুলবে।

আজকাল দেখা যায় যে, শিক্ষার্থিগণ অধীত বিষয়গুলি মুখস্থ করে কোন রকমে পরীক্ষায় পাস করে এবং মনে করে খুব শিখলাম। কিন্তু স্বামীজী শিক্ষাদানের এ নীতি মোটেই বিশ্বাস করতেন না। তিনি বলতেন যে, মুখস্থ করে পাস করলে তা চরিত্রগঠনের কাজে সহায়তা করে না। আজকাল দেশে প্রতি বছর হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী পাস করছে। কিন্তু এতে কি প্রকৃত শিক্ষা হচ্ছে? একথা অস্বীকার করি না যে, মুখস্থ করার ফলে ছাত্রগণ অনেক বিষয়ের খবর রাখে। কিন্তু এতে না হয় চরিত্র-গঠন, না হয় ব্যক্তিত্বের বিকাশ। তাই শুধু বই মুখস্থ করে পাস করার পদ্ধতিকে তিনি নিন্দা করলেন। তিনি বললেন—ভাব (idea) ও আদর্শকে ঠিকভাবে অন্তরের উপাদানে পরিণত করতে হবে। চরিত্রগঠনের পক্ষে সেইটাই দরকার। ভাব ও আদর্শকে নিজের অন্তরের উপাদানে পরিণত করার কাজ পাইকারী হারে হয় না। একাজ একেবারে ব্যক্তিগত ব্যাপার। প্রত্যেক ছাত্রের জন্য বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে। আর একাজ করতে হলে মনঃসংযোগের উপর জোর দিতে হবে। মনঃসংযোগই শ্রেষ্ঠ পন্থা। এই পন্থায় সত্যকার জ্ঞানলাভ সম্ভব হবে। তাঁর মতে শিক্ষার সার কথা হল মনঃসংযোগ। এই মনঃসংযোগ যত বেশী হবে ততই সার্থক জ্ঞানলাভ হবে। সুতরাং জ্ঞানভাণ্ডার আয়ত্ত করতে হ'লে মনঃসংযোগই শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি। প্রশ্ন এই যে, মনঃসংযোগ বলতে স্বামীজী কি বোঝেন? তাঁর মতে মনঃসংযোগ হচ্ছে মনের আবেগ ও শক্তির উপর কর্তৃত্বলাভ। মনঃসংযোগের অভাবে শিক্ষিত লোকের কি অবস্থা হয় তা ম্যাথ্যু আরনল্ডের ভাষায় বলব—"With sick hurry, its divided aims, its head over-taxed, its palsied heart of modern life." - এই হচ্ছে পাশ্চাত্য ধরনের শিক্ষাপ্রাপ্তির ফল এর প্রতিকার কি? উত্তরে স্বামীজী বলেন, "মনের আবেগ ও শক্তির উপর কর্তৃত্ব-লাভ। এ কর্তৃত্ব লাভ করতে হ'লে বিশেষ একটা মানসিক পরিশীলন দরকার। সেই সঙ্গে কিছু দৈহিক কাজ করাও প্রয়োজন। বহু প্রকার বিরুদ্ধ শক্তি একত্র জড় হয়ে শিক্ষার্থীকে সতত বিভ্রান্ত করতে চাইছে। কিন্তু এ সবের সম্মুখীন হয়েও ইচ্ছা-শক্তিকে এমনভাবে গঠন করতে হবে যেন মন কিছুতেই বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়ে। বারবার চেষ্টা করতে হবে। এজন্য চাই আত্মবিশ্বাস, চাই নিজের শক্তি ও ক্ষমতার সম্বন্ধে সচেতনতা। এইভাবে শিক্ষা প্রদান করলে শিক্ষার্থী যথোপযুক্ত বিচারশক্তি লাভ করবে। আজকাল প্রায়ই দেখা যায় যে, ছাত্র ও শিক্ষকের মধুর সম্পর্কের একান্ত অভাব। কিন্তু স্বামীজীর আদর্শ হচ্ছে—শিক্ষককে ছাত্রের বন্ধু হতে হবে। শিক্ষক হবেন একাধারে উপদেষ্টা, পরিচালক, বন্ধু ও সখা। বেত্রহস্তে গুরুগিরি নয়। প্রেম, স্নেহ ও মমতা দিয়ে মায়ের মতো শাসন, পোষণ, শিক্ষাদান। চাই প্রেমের বন্ধন।

মন যখন কোন বস্তুর উপর একান্তভাবে নিবিষ্ট হয়, তখন হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো শিক্ষার্থী দিব্যজ্ঞান অবিষ্কার করে ফেলে। বিশুদ্ধ

জ্ঞান মানেই হ'ল এই দিব্যজ্ঞানের আবিষ্কার। কেবল মুখস্থ করে যে জ্ঞানলাভ হয় তা খাঁটি জ্ঞান নয়। শিক্ষকের কর্তব্য হচ্ছে—অনবরত চেষ্টা করে যাবেন এমনভাবে জ্ঞান দান করবার জন্য, যার ফলে শিক্ষার্থী নিজেই সত্য আবিষ্কার করতে পারবে। প্রকৃত শিক্ষা কেউ অপরকে দিতে পারে না। প্রত্যেককে নিজের চেষ্টার দ্বারা শিখতে হবে। শিক্ষক কতকগুলি ইঙ্গিত দিবেন, শিক্ষার্থী তার সাধ্যানুসারে সেই ইঙ্গিত অনুসারে কাজ করবে, চিন্তা করবে, বিষয়বস্তুকে বোঝবার চেষ্টা করবে। এইভাবে সে নিজেই সত্য আবিষ্কার করতে পারবে। একটি ছোট বীজ তার নিজের শক্তিতে মাটি ফুঁড়ে গজিয়ে উঠে। কিন্তু তার যত্ন না নিলে অকালে নষ্ট হয়ে যাবে। তাকে যত্ন করলে, লালনপালন করলে তবে তো সে পরে বিশাল মহীরুহে পরিণত হবে। ঠিক তেমনি একটি ছাত্রকে যত্ন করে শিক্ষা দিতে হবে। তার ভিতরের শক্তিকে বিকশিত করবার জন্য অশেষবিধ চেষ্টা করতে হবে। গাছটির মতো ছাত্রও তার নিজের সহজাত শক্তি ও অনুকূল পরিবেশে ইঙ্গিতের সদ্ব্যবহার করে ধাপে ধাপে শিক্ষালাভ করবে।

স্বামীজী বিশ্বাস করতেন যে, জ্ঞান প্রত্যেক মানুষের সহজাত। বাহির থেকে জ্ঞান পাওয়া যায় না। যাকে বলে empirical knowledge, তার উপর তাঁর আস্থা ছিল না। সাধারণতঃ জ্ঞান থাকে মনের ভিতর একটা সূক্ষ্ম আবরণ দিয়ে ঢাকা। সেই আবরণকে তিনি অজ্ঞতা আখ্যা দিয়েছেন। মানুষ একটু একটু করে এই অজ্ঞতার আবরণ ভেদ করতে থাকে। এইভাবে তার শিক্ষা হতে থাকে। এই আবরণকে অপসারণ করে ভিতরের পূর্ণতাকে প্রকাশ করা—এরই নাম শিক্ষা। এ বিষয়ে তাঁর বিখ্যাত উক্তিটি স্মরণযোগ্য: "Education is the manifestation of the perfection already in man." দেহ মন ও বুদ্ধি—এই সবের বিকাশের প্রয়োজন আছে সুস্থ শিক্ষার জন্য। সেইজন্য সর্বাগ্রে ছাত্রদের দেহকে শক্ত করে গড়ে তুলতে বলেছেন। ছাত্র যেন সব রকম কষ্ট সহ্য করতে পারে। বস্তুতঃ বলিষ্ঠ দেহ গঠনের উপর তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি এতদূর অগ্রসর হয়েছেন যে, তিনি একথা বলতে কুণ্ঠিত হননি যে, ধর্মশাস্ত্র পড়ার চেয়ে খেলাধূলার মাধ্যমে শরীরগঠন অধিকতর প্রয়োজনীয়। দেহকে সবল সুস্থ নীরোগ করলে তবেই গীতা ভাল করে বুঝতে পারবে। একথা সত্য যে, মনের শক্তি অসীম। কিন্তু নানাকারণে মনের শক্তি বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। মনঃসংযোগ বা ধ্যান দ্বারা মনের সমস্ত চিন্তাকে একটা কেন্দ্র-বিন্দুতে নিবদ্ধ করতে হবে। তা করতে পারলে চরম শক্তি লাভ হবে। তিনি বলেন যে, সমস্ত শিক্ষা-পদ্ধতির মূল কথা হচ্ছে মনঃসংযোগ বা ধ্যান। তিনি বারবার বলেছেন, "যদি আমাকে পুনরায় শিক্ষার জন্য ছাত্র হ'তে হয়, তবে আমি এই মনঃসংযোগের শক্তি অর্জন করব। এবং সমস্ত কিছু থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে বিকশিত হতে চেষ্টা করব এবং তারপর এই মন দিয়ে ইচ্ছামত জ্ঞান সংগ্রহ করব।" হয়তো কেউ কেউ বলবেন—"মনঃসংযোগ বা ধ্যান বড় কঠিন কাজ। আমাদের ছাত্রগণ খুব অমনোযোগী। তারা কিছুতেই মনঃসংযোগ করতে পারবে না।" কিন্তু কেন পারবে না? ধর্মঘট, স্ট্রাইক, সিনেমা, রাজনৈতিক পার্টি—এই সব ছাত্রকে চঞ্চল করে দেয়। এসব বস্তু সব সময় ছাত্রদের মনকে বাইরের দিকে আকর্ষণ করে। সত্যিই এই সব অবস্থার মধ্যে মনঃসংযোগ কঠিন কাজ। গভীর রাত্রে আবহাওয়া শান্ত থাকে। পড়ুয়া ছাত্রগণ

এই সময় রাত জেগে পড়াশুনা করে। কিন্তু তাতে শরীর ভেঙ্গে পড়ে। স্বামীজীর যুগেও নানা বিরোধী উপাদান ছিল। সেইজন্য সেই যুগেই তিনি শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে আবাসিক ধরনের বিদ্যানিকেতন-স্থাপনের চিন্তা করেছিলেন। তাঁর মতে এই সব আবাসিক বিদ্যানিকেতনে শিক্ষকদের এই সব কাজ থাকবে—এখানে শিক্ষক লক্ষ্য রাখবেন ছাত্রের প্রবণতা ও আগ্রহের প্রতি, তাদের সব অভাব যাতে মিটে যায় সেদিকেও দৃষ্টি রাখবেন, তাদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বিশেষ যত্ন নেবেন, তাদের প্রতিভার যেন অঙ্কুরেই বিনাশ না হয়, সেদিকেও তাঁর লক্ষ্য থাকবে। ছাত্রের দেহ-মন- ও বুদ্ধি-বিকাশের জন্য যতটুকু করা দরকার তা শিক্ষককে করতে হবে। দেহ মন ও বুদ্ধি যাতে উপযুক্তভাবে ছাত্রগণ ব্যবহার করতে পারে সেইদিকে লক্ষ্য রেখেই শিক্ষাদান কাজ চলতে থাকবে। আবাসিক বিদ্যানিকেতনে এসব সম্ভব। এইভাবে যদি শিক্ষা দেওয়া হয় তবেই আদর্শ শিক্ষালাভ হবে। এ যুগের শিক্ষা-বিদ্ ও শিক্ষানুরাগীদের নিকট স্বামীজীর আদর্শটি উপস্থিত করলাম। এই আশা পোষণ করব যে, শিক্ষাসংস্কারের প্রস্তাব নিয়ে দেশে যখন আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে তখন শিক্ষাবিদ্‌গণ যেন স্বামীজীর আদর্শ এবং পদ্ধতিটিও একবার ভেবে দেখেন।

মায়ের স্নেহ

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

এই যে সকালবেলা শিউলির গন্ধ,
মাঠে-ঘাটে পর্বতে হাওয়া মৃদুমন্দ,
এই যে শিশিরধোয়া
সবুজ ক্ষেতের ছোঁয়া—
কাশবন, মরালের নৃত্যের ছন্দ!
এ কোন্ মায়ের স্নেহ—এই মহানন্দ!

মালতীর দলগুলি হেসে হেসে লুটছে,
আকাশের সাদা মেঘে জুঁই-আলো ফুটছে!
ভরা নদী ভেসে যায়
পদ্মরা হেসে চায়,
মধুকর খুঁজে পায় বনে মকরন্দ!
এ কোন্ মায়ের স্নেহ—এই মহানন্দ!

শুম্ভ-নিশুম্ভ-বধ

প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা

'দেবানাং কার্যসিদ্ধ্যর্থম্' মহামায়া বহুবার বহুভাবে পৃথিবীতে আবির্ভূতা হইয়াছেন। যখনই অসুরগণ স্বর্গরাজ্য আক্রমণ করিয়া দেবগণকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিয়াছেন, দেবী তখনই তাঁহাদের উদ্ধার করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর উত্তরচরিত দেবীর এমনি এক আবির্ভাবের কাহিনী। উহা অবলম্বনে তাঁহার মাহাত্ম্যও বর্ণিত হইয়াছে। মহিষাসুর-বধের পর কিছুকাল শান্তিতে অতিবাহিত হইল। তারপর কালক্রমে শুম্ভ ও নিশুম্ভ অসুরভ্রাতৃদ্বয় মহাপরাক্রমশালী হইয়া উঠে এবং স্বর্গরাজ্য আক্রমণ করে। তাহাদের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্র রাজ্যচ্যুত এবং দেবগণ স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হইলেন। সর্বত্র হাহাকার পড়িয়া গেল। অবশেষে দেবগণের স্মরণ হইল, দেবী প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, বিপদকালে তাঁহাকে স্মরণ করিলে তিনি তাঁহাদের উদ্ধার করিবেন। অতএব দেবগণ হিমালয়ে গমন করিয়া দেবীর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এমন সময় সেখানে দেবী পার্বতীর আগমন। তিনি আসিয়াছেন জাহ্নবীর জলে স্নান করিবার উদ্দেশ্যে। দেবীর অজ্ঞাত কিছুই নাই, তথাপি তিনি যেন কিছুই জানেন না। আগ্রহের সহিত প্রশ্ন করিলেন—দেবগণ কাহার স্তব করিতেছেন? দেবগণ উত্তর দিবার পূর্বে দেবীর শরীর হইতে আদ্যাশক্তি শিবা আবির্ভূতা হইয়া উত্তর দিলেন—শুম্ভ-নিশুম্ভ কর্তৃক পরাজিত ও বিতাড়িত দেবগণ আমারই স্তব করিতেছেন। পার্বতীর দেহ-কোষ হইতে উৎপন্ন পার্বতীর শক্তি কৌশিকী ও অম্বিকা নামে প্রসিদ্ধ।

দেবীর আবির্ভাবে দেবগণ আশ্বাস লাভ করিলেন। তারপর সেই অপরূপ সৌন্দর্য-শালিনী অম্বিকা বা কৌশিকী তাঁহার দেহপ্রভায় হিমাচল উদ্ভাসিত করিয়া বিরাজ করিতেছেন, এমন সময়ে সেখানে শুম্ভ নিশুম্ভের অনুচর চণ্ড ও মুণ্ডের আগমন। দেবীকে দর্শন করিয়া মুগ্ধ চণ্ডমুণ্ড তৎক্ষণাৎ অসুর শুম্ভকে সংবাদ দিল। কেবল সংবাদ দিল না, প্রলুব্ধ করিল। দেবগণকে পরাজিত করিয়া তাহারা শ্রেষ্ঠ রত্নসমূহ আহরণ করিয়াছে সত্য, কিন্তু এই নারীরত্ন গ্রহণ করিতে না পারিলে সবই বৃথা। 'স্ত্রীরত্নমেষা কল্যাণী ত্বয়া কস্মান্ন গৃহ্যতে?' সবই যখন অধিকার করিয়াছেন তখন এই কল্যাণী স্ত্রীরত্ন কেন অধিকার করিতেছেন না? প্রলুব্ধ শুম্ভও তৎক্ষণাৎ সুগ্রীব নামক দূতকে প্রেরণ করিল। বলিয়া দিল, 'আমার বীরত্বের কাহিনী বর্ণনা করিবে, দেবী যাহাতে সম্প্রীতিপূর্বক আগমন করেন, তাহার চেষ্টা করিবে।' শুম্ভের নির্দেশ-মত সুগ্রীব দেবীর সমীপে গমন করিয়া জানাইল, সে দৈত্যেশ্বর শুম্ভের দূত। শুম্ভ বলিয়া পাঠাইয়াছে ত্রিভুবন তাহার করায়ত্ত, দেবগণও আজ্ঞাধীন, তাহাদের গজ বাজী এবং অন্যান্য রত্নসমূহ সে অধিকার করিয়াছে। দেবী যেহেতু রমণীকুলের রত্নস্বরূপা, দৈত্যেশ্বরের ইচ্ছা—দেবী তাহাকে অথবা তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিশুম্ভকে পতিরূপে গ্রহণ করেন। কারণ

তাহারাই এই স্ত্রীরত্ন লাভ করিবার যোগ্য অধিকারী। প্রস্তাবটি অতি স্বাভাবিক ও সঙ্গত। আর দেবীও সহজভাবে উত্তর দিলেন—তুমি তো যথার্থ বলিয়াছ। শুম্ভ-নিশুম্ভের ন্যায় শক্তিশালী ত্রিভুবনে আর কে আছে? কিন্তু একটা মুসকিল হইয়াছে। অল্পবুদ্ধিবশতঃ আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলিয়াছি যে, সংগ্রামে যিনি আমার দর্প চূর্ণ করিবেন, যিনি আমার তুল্য বলশালী, তাঁহাকেই আমি পতিত্বে বরণ করিব। অতএব শুম্ভ বা নিশুম্ভ যে-কেহ আমাকে পরাজিত করিয়া আমার পাণিগ্রহণ করুক। বিলম্বে প্রয়োজন কি?

উত্তর শুনিয়া দূত সুগ্রীব স্তম্ভিত। এ রমণী বলে কি! ইহা নিতান্তই অসার গর্বের কথা। যে শুম্ভ-নিশুম্ভের পরাক্রমের নিকট ইন্দ্রাদি দেবগণ পরাজিত, ত্রিভুবনে এমন কোন পুরুষ নাই যে তাহাদের সম্মুখে স্থিরভাবে অবস্থান করিতে পারে। তাহাদের সহিত সংগ্রাম করিবে এই বালিকা একাকিনী? ইহাকে বাতুলতা ব্যতীত আর কি বলা যায়! দূত বলিল—এ কথা পুনরায় বলিবেন না। আমার পরামর্শ, প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইয়া শুম্ভ-নিশুম্ভের নিকট গমন করুন। নতুবা শেষে কেশাকর্ষণে অপমানিতা হইয়া যাইতে হইবে।

দেবী কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া বলিলেন—শুম্ভ বলবান্, নিশুম্ভও অতি বীর্যবান্। তাহারা আসিয়া যুদ্ধ করুক। দূত আর কী করিবে? ফিরিয়া গিয়া শুম্ভকে যথাযথ সংবাদ নিবেদন করিল। অসুররাজ শুম্ভের ক্রুদ্ধ হইবারই কথা। এক সামান্য নারীর স্পর্ধা তো কম নহে! তৎক্ষণাৎ সেনাপতি ধূম্রলোচনকে আদেশ দিল—সৈন্য-পরিবেষ্টিত হইয়া গমন কর এবং সেই দুষ্টাকে কেশাকর্ষণে বিহ্বল করিয়া লইয়া আইস।

সৈন্যসহ ধূম্রলোচন হিমালয়ে আসিয়া দেবীকে সেইভাবেই অবস্থান করিতে দেখিল এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিল—যদি স্বেচ্ছায় ও সানন্দে আমার প্রভু শুম্ভের নিকট গমন না করেন, তবে আমি বলপূর্বক কেশাকর্ষণ করিয়া আপনাকে লইয়া যাইব।

দেবী উত্তরে বলিলেন—তুমি দৈত্যরাজ শুম্ভ কর্তৃক প্রেরিত, বলবান্ ও সৈন্যপরিবৃত। তুমি যদি আমাকে বলপূর্বক লইয়া যাও, আমি আর কি করিতে পারি। এ উত্তর শুনিয়া প্রবল-প্রতাপান্বিত দৈত্যনায়ক ধূম্রলোচনের পক্ষে নিশ্চেষ্ট থাকা অসম্ভব। সুতরাং সক্রোধে সে দেবীর অভিমুখে ধাবিত হইবামাত্র তিনি হুঙ্কারের দ্বারাই তাহাকে ভস্মীভূত করিলেন—অর্থাৎ তাঁহার ক্রোধানলেই অসুর দগ্ধ হইয়া গেল। অসুরসৈন্যগণ প্রাণপণে যুদ্ধ করিল, কিন্তু দেবী ও তাঁহার সিংহ কর্তৃক অচিরেই তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। সংবাদ পাইয়া শুম্ভ এবার চণ্ড ও মুণ্ডকেই পাঠাইল—কেশাকর্ষণ করিয়া তাহাকে লইয়া আইস। বলিয়াই কিন্তু শুম্ভের সন্দেহ হইল, হয়তো ঐরূপভাবে তাহাকে আনা সম্ভব হইবে না। সুতরাং পুনরায় আদেশ দিল, যেরূপে হউক তাহাকে আনা চাই। যদি মনে হয়, কেশাকর্ষণ করিয়া তাহাকে আনা যাইবে না, তাহা হইলে শস্ত্রাঘাতে আহত ও বন্ধন করিয়া আনয়ন কর। চণ্ডমুণ্ড চতুরঙ্গবলে অর্থাৎ গজ-বাজি-রথ- ও পদাতিক-সমন্বিত সৈন্যসামন্ত সহ দেবীর উদ্দেশে যাত্রা করিল। দেবী পূর্বের ন্যায় হিমালয়-শিখরে সিংহপৃষ্ঠে আসীনা। মুখে সেই কৌতুকহাসিটি লাগিয়া আছে, যেন কিছুই হয় নাই। চণ্ডমুণ্ডের যুদ্ধে একই পরিণাম। অম্বিকার ললাটদেশ হইতে খড়্গধারিণী ভীষণা কালী নির্গত হইয়া

চণ্ডমুণ্ড সহ সমগ্র সৈন্য সংহার করিলেন। স্বীয় শক্তির প্রভাব দেখিয়া আনন্দিতা হইয়া দেবী বলিলেন, চণ্ডমুণ্ডকে নিহত করিয়াছেন বলিয়া এখন হইতে কালী চামুণ্ডা নামে বিখ্যাত হইবেন।[১] ইহার পর রণসজ্জা করিয়া শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধে গমন ব্যতীত উপায় রহিল না। সেনানায়ক রক্তবীজ এবং অন্যান্য বলবান্ অসুর-সৈন্য-পরিবেষ্টিত হইয়া তাহারা দেবীর সহিত যুদ্ধার্থে যাত্রা করিল। ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। একদিকে দেবী তাঁহার সিংহ এবং অষ্ট শক্তি—ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, নারসিংহী, ঐন্দ্রী ও চামুণ্ডা; ইহা ব্যতীত অন্যান্য শক্তি, ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি বিভিন্ন দেবতার শক্তি দেবীর সাহায্যার্থে আসিলেন। অপরদিকে অসংখ্যসৈন্যসহ শুম্ভ ও নিশুম্ভ। সংগ্রামে দানবশক্তিকে পরাভূত করা সহজ হয় নাই। এমন কি দেবীশক্তি কখন কখন অভিভূত হইয়াছে। অবশেষে নিশুম্ভ হত হইল। তখন শুম্ভ বলিল—'বলাবলেপদুষ্টে ত্বং মা দুর্গে গর্বমাবহ। অন্যাসাং বলমাশ্রিত্য যুধ্যসে যাঽতিমানিনী॥' —হে উদ্ধতা দুর্গে, বলগর্বে গর্বিতা, আর গর্ব করিও না। গর্ব করা তোমার সাজে না, কারণ অন্যান্য শক্তিকে আশ্রয় করিয়াই তো যুদ্ধ করিতেছ। দেবী হাসিয়া বলিলেন—সে কি! আমি ব্যতীত আবার এ জগতে কে আছে? আমিই একা বিরাজ করি—'একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।' অতঃপর দেবী অষ্ট-শক্তিকে সংহরণ করিয়া স্বয়ং শুম্ভকে বিনাশ করিলেন। শুম্ভ-নিশুম্ভ হত হইবার পর আবার শান্তি ফিরিয়া আসিল—অমঙ্গলের বিনাশে চতুর্দিকে আবার মঙ্গলচিহ্নসকল দেখা দিল। দেবতারা ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে মহামায়ার স্তব করিলেন।

মহামায়া প্রসন্না হইয়া বর দিতে চাহিলে দেবগণ করজোড়ে বলিলেন, "মা, এখন যেমন আপনি আমাদের শত্রু বিনাশ করিয়া ত্রিভুবনের সব বিঘ্ন দূর করিলেন, ভবিষ্যতেও যেন সেইরূপ করিবেন।"

প্রসন্না দেবী বর দিলেন :

'ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্॥'

—যখনই দানবগণের প্রাদুর্ভাবের জন্য বিঘ্ন উপস্থিত হইবে, তখনই আমি আবির্ভূতা হইয়া সেই শত্রুদের বিনাশ করিব।"

---

১ মহীশূর নগরে পাহাড়ের উপর চামুণ্ডাদেবীর মন্দির অবস্থিত।

'তোমার নিজের পদ্মকে বিকশিত কর'

ডক্টর রমা চৌধুরী

সাধারণতঃ, জীবনকে পদ্মের সঙ্গে তুলিত করা হয়। যেমন, একটি পদ্ম দশদিকে দশ দল মেলে পূর্ণ প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে, ঠিক তেমনি জীবনকেও পূর্ণ বিকশিত হয়ে উঠতে হবে জ্ঞানে, ভক্তিতে, কর্মে—সবদিক থেকেই। মানবজীবনের উদ্দেশ্য-বর্ণনাপ্রসঙ্গে ভগিনী নিবেদিতা সেজন্য শ্রীরামকৃষ্ণের একটি অনুপম বাণী উদ্ধৃত করতেন—

"তোমার নিজের পদ্মকে বিকশিত কর; ভ্রমরেরা নিজেরাই আসবে।"

আপত্তি হতে পারে যে, পদ্মের উপমা এস্থলে অচল, কারণ পদ্মের বিকাশের জন্য পদ্মকে কোনো প্রচেষ্টাই করতে হয় না। সেক্ষেত্রে মানবাত্মার বিকাশ স্বপ্রচেষ্টালভ্য, সাধনাগম্য, জন্মজন্মান্তরব্যাপী সুকঠোর নিরবচ্ছিন্ন প্রাণ-পণ অধ্যবসায়, পরিশ্রম, আত্মোৎসর্গের ফল। এর উত্তর হল এই যে, ভারতীয় কাব্য-সাহিত্য-দর্শনের এই অতি সাধারণ, অতি প্রিয় উপমাটি অতি উপযুক্তও সমভাবে, নিঃসন্দেহ। পদ্ম বা পুষ্পের কথাই ধরা যাক—ধরা যাক তার প্রস্ফুটিত হবার পূর্বের অবস্থাটি। কতই না আয়োজনের প্রয়োজন এই একটিমাত্র পুষ্পের প্রস্ফুটনের জন্যই! অনন্ত-ঐশ্বর্যধারিণী দিগন্তবিস্তৃতিশালিনী অফুরন্তমাধুর্যস্রাবিণী ধরণী জননী স্বয়ং তার বিকাশের ভার গ্রহণ করেছেন, তাঁরই আদেশে কোমল-সরস বুক পেতে দিয়েছে মৃত্তিকা, শীতল-অমৃত-ধারা বর্ষণ করছে মেঘ, স্নিগ্ধ-মধুর ব্যজন করছে বায়ু, অরুণ কিরণ দান করছে রবি। এই ভাবে মৃত্তিকা-জল-বায়ু-আলোক-সহযোগে প্রস্ফুটিত হচ্ছে সেই পুষ্পটি। কিন্তু তা সত্ত্বেও যখন সব আয়োজন-সমাবেশ সম্পূর্ণ, তখনও প্রকৃত প্রস্ফুটন কিন্তু একটি স্বতঃস্ফূর্ত ঘটনা—সকল বাহ্যিক আয়োজন-প্রয়োজন অতিক্রম করে, সকল পরিবেশ পরিস্থিতির ঊর্ধ্বে, অন্তরের আবেগে, প্রাণের প্রবাহে, জীবনের জয়গানে তা বিকশিত হয়ে উঠছে কোন্ এক শুভ মুহূর্তে এক নূতন আবির্ভাবরূপে। এরূপই হল আবির্ভাব মানবাত্মার স্থলে পরমাত্মারও—সকল সাধনাকে ধন্য ক'রে, সকল প্রচেষ্টাকে পূর্ণ করে, সকল বাহ্যিক আয়োজন-প্রয়োজনকে পশ্চাতে রেখে।

সুতরাং এই যদি হয় পদ্মের, পুষ্পের প্রস্ফুটন; এবং তার পরে যদি ভ্রমরগণ স্বতই তার গন্ধে, তার মধুতে, তার রূপে আকৃষ্ট হয়ে স্বেচ্ছায় তার নিকট এসে পড়ে, তাহলে তার দিক্ থেকে আর "aggression" বা আক্রমণের প্রয়োজন কি? অথচ, তাঁর সুবিখ্যাত **"Aggressive Hinduism"** নামক নিবন্ধে নিবেদিতা বারংবার বিশেষ জোরের সঙ্গেই বলেছেন যে, হিন্দুদের **"aggressive"** হতে হবে, নিজেদের ঢক্কা-নিনাদ নিজেদেরই করতে হবে, অন্যদেরও জয় করে স্ব-মতাবলম্বী করতে হবে—নিজেদের প্রচার প্রকাশ এইভাবে নিজেদেরই করতে হবে নিরন্তর। তা হলে?

এর উত্তর হল এই যে, এই "প্রস্ফুটনই" তো "aggression" অর্থাৎ স্বীয় অন্তর্নিহিত ঐশ্বর্যকে লুকায়িত না রেখে পরিপূর্ণভাবে অকৃপণ ভাবে উন্মুক্ত ভাবে তা জগতের সম্মুখে তুলে ধরা, মেলে দেওয়া, সাজিয়ে রাখা। একেই বলা হয়েছে—"প্রচার", এই প্রস্ফুটনই "প্রচার" বা "প্রকাশ"। ভারতীয়-দর্শনের মতে,

"প্রস্ফুটনের" অর্থ নূতন সৃষ্টি নয়—যা শাশ্বত সত্য, যা চিরস্থিত, যা অনন্ত-নিত্য, তারই বিকাশ অথবা প্রকাশ। এই বিকাশ বা প্রকাশই পুষ্পের জীবন—নয় তো সে ব্যর্থ। তার যে বীজটি অপেক্ষা করে রয়েছে তার শাশ্বত সুধা ও মধু, রং ও রূপ, গন্ধ ও আনন্দ অন্তরে বহন ক'রে, তার আবরণ উন্মোচিত হলে তবেই তো সেই পুষ্পটির বিকাশ বা প্রকাশ সম্ভবপর। এই ভাবে, পুষ্পের প্রস্ফুটন হল তার শাশ্বত সৌন্দর্য-মাধুর্য-ঐশ্বর্যের বিশ্বসমক্ষে প্রকাশ এবং এই হল তার "aggression"; এই হল তার বিশ্বকে "আক্রমণ"; এই হল তার "conversion"; এই তো হল তার জগৎকে স্বমহিমায় "বশীকরণ"। এর অধিক আর সে কি করিতে পারে?

একই ভাবে, ভারতের শাশ্বত আত্মার প্রস্ফুটনও প্রয়োজন এই অর্থে যে, সেই আত্মাকে আর নিভৃতে নির্জনে, শান্ত-সমাহিত তপোবনে আবদ্ধ অজ্ঞাত লুক্কায়িত না রেখে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড-সমক্ষে পূর্ণ বিকশিত করে তুলতে হবে—অঞ্জলি ভরে, অকাতরে, সানন্দে দান করতে হবে—তার সমস্ত সৌন্দর্য মাধুর্য ঐশ্বর্য; বর্ষণ করতে হবে তার সমস্ত মধু; বিকিরণ করতে হবে তার সমস্ত আলোক, রণিত করতে হবে তার সমস্ত সঙ্গীত—এরই নাম "aggression", এরই নাম "conversion"—এর অধিক কিছুই নয়।

এই প্রসঙ্গে "The Bee and the Lotus" নিবন্ধে নিবেদিতা আরেকটি সুন্দর কথা বলেছেন—

"But there is another side of the picture. The bees do come. The lotus feels no difference between today and yesterday. She knows not that at dawn her petals opened wide for the first time. She knows it only by the coming of the bees."

অর্থাৎ, ঐ পদ্মটি যে প্রস্ফুটিত হয়েছে, তা পদ্ম জানতে পারে ভ্রমরপুঞ্জের আগমন দেখেই।

কি সুন্দর কথা এটি! এই মতানুসারে, পুষ্পের প্রস্ফুটন ও ভ্রমরপুঞ্জের আগমন অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে আবদ্ধ, অথবা পরস্পরমুখাপেক্ষী। সেজন্য, ভ্রমরগণের আগমন দেখেই তো জানা যায় যে, পুষ্পটি সত্যই পূর্ণ বিকশিত হয়ে উঠেছে। একই ভাবে, দানের সামগ্রী সত্যই কিছু থাকলে তাতে বিশ্ব স্বতই পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে ক্রমান্বয়ে; এবং বিশ্বের এরূপ ক্রমবিবর্ধিত ঐশ্বর্য দেখেই তো আমরা জানতে পারব যে, কত ব্যক্তির, কত জাতির বিকশিত সৌন্দর্যে মাধুর্যে ঐশ্বর্যে আজ জগৎ এইভাবে মহিমমণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

আবেগভরে নিবেদিতা বলছেন—

"How strange that the lotus has to hear from the bees of its own blooming! So silent are the great spiritual happenings. Yet they are all mastering. Events follow them. They do not lead."

পদ্ম জানবে ভ্রমরগণের নিকট থেকে তার প্রস্ফুটনের কথা—এ কি অতি আশ্চর্যের বিষয় নয়? একদিক থেকে নিশ্চয়ই তাই, অন্যদিক থেকে নয়। কারণ, আধ্যাত্মিক বিকাশ সুদূর-ফলপ্রসবকারী—কত রংএ, কত রসে, কত গন্ধে তা রঙীন, সরস, সুরভিময় করে তুলছে জীবনোদ্যানকে। সেজন্য পৃথিবীতে যে সত্যের আসন পাতা হয়েছে, শিবের পতাকা উড়ছে, সুন্দরের বিজয়ভেরী বাজছে—তা থেকেই সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, ধরণীর ধূলিতেও আসন পাতা হল, পতাকা উড়ল, ভেরী বাজল সেই পরমদেবতার, যাঁরই মূর্তরূপ এই ধরণীই স্বয়ং, নিঃসন্দেহে—যা এতদিন বিকশিত হয়নি সর্ব-সমক্ষে, আমাদের নিজেদেরই অজ্ঞানাবরণে লুক্কায়িত হয়ে।

এই হল নিবেদিতার অভিনব "aggressive policy"র মূল কথা। তিনি স্বয়ং ছিলেন তাঁর নিজেরই অনুপম জীবন-দর্শনের এই মূলীভূত তত্ত্বেরই একটি জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। তাঁর তেজোদীপ্ত, মধুসিক্ত, নির্লিপ্ত আত্মার পূর্ণ-প্রস্ফুটিত রূপ নিয়ে শ্রীভগবৎপাদপদ্মে নিবেদিতা, সার্থকনাম্নী "নিবেদিতা" নিজেকে নিবেদিত করেছিলেন ভারতবর্ষের সেবায়। সকল লজ্জা-ভয়, অলসতা-দুর্বলতা, সঙ্কীর্ণতা-স্বার্থপরতার বহু ঊর্ধ্বে আরোহণ করে তিনি নিজেকে নিঃশেষে দান করেছিলেন জনসেবায়। এই ভাবে, তিনি নিজেকে অন্তরালে লুক্কায়িত করে না রেখে, কেবল নিজের মোক্ষের কথাই না ভেবে, নিজেকে অকাতরে অকৃপণ ভাবে প্রকাশ করেছিলেন সহস্র দিকে, সহস্র ভাবে, সহস্র গরিমায়। সাহিত্য, শিল্প, শিক্ষা, সামাজিক সংস্কার, জাতীয় উন্নতি—সর্বদিকেই তাঁর এই প্রকাশ সহস্ররশ্মি সূর্যের ন্যায়ই আজও ভাস্বর হয়ে আছে। একপে, যে নিষ্কাম-কর্ম ভারতীয় সাধনার প্রারম্ভ ও পরিশেষ—সেই নিষ্কাম কর্মই ছিল নিবেদিতার অপূর্ব "aggressive policy"র মর্মোত্থ বাণী।

"Is victory or defeat my task? Fool! struggle is your task." (The Bee and the Lotus, P. 100)

জয় নয়, পরাজয় নয়, কিন্তু কেবলই সংগ্রাম, ফলাফলের অপেক্ষা না করে; সংসার-পঙ্কে নিমজ্জিত না হয়ে, পদ্ম হয়ে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠার জন্য কেবলই সংগ্রাম; সেই পদ্মকে বিশ্ব-পদে, তথা বিভুপদে, নিবেদন করার জন্য কেবলই সংগ্রাম! এরূপ সংগ্রামই তো জীবন।

ভগিনী নিবেদিতার পুণ্য-জীবন এরই মূর্ত প্রতীক!

ইতিহাসের মহাসন্ধিক্ষণ ও শ্রীরামকৃষ্ণ

অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত

আজ আমরা চারিদিকে দেখছি পুরাতন মূল্যবোধের দ্রুত অবক্ষয়। সমাজ-মানসে যে মুহূর্তে মুহূর্তে বিপুল ভাঙ্গা-গড়া ও রূপান্তর-প্রক্রিয়া চলেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এক যুগ হতে যখন আর এক যুগ আবর্তিত হয়, তখনই এরূপ ঘটে। আমরা কি সেইরূপ কোন ঐতিহাসিক মহামুহূর্তে বিরাজ করছি?—প্রশ্ন জাগে। ভাঙ্গাটাই বেশী করে চোখে পড়ছে, কারণ গড়াটা প্রাথমিক অবস্থায় চলে ধ্বংসস্তূপের অন্তরালে ভিত্তিমূলে। আর তাছাড়া ভাঙ্গা যেমন সহজসাধ্য, অল্পসময়েই সুসম্পন্ন হয়, গড়া তা নয়। গড়া সময়সাপেক্ষ, সুষম-পরিকল্পনা-সাপেক্ষ, কঠিনসাধনা-সাপেক্ষ।

আজ সমাজের সর্বস্তরের মানুষের চিত্তে বিদ্রোহ। পৃথিবীব্যাপী ছাত্র- ও তরুণ-সমাজের বিদ্রোহ আর প্রচ্ছন্ন নেই, তা আজ সর্বত্র অত্যন্ত প্রকট। এইরূপ অগ্নিগর্ভ অবস্থা মানুষের সুস্থ সমাজজীবনকে বিপন্ন করে তোলে। ভাঙ্গাটাই বড় কাজ নয়, গড়া বড় কাজ—এই সুস্থ ভাবনা খুব অল্পসংখ্যক লোকের মুখেই শোনা যায়। অধিকাংশের চিন্তা "যাক না সব ভেঙ্গে যাক, সব ভেসে যাক, ধূলিসাৎ হয়ে যাক"—এ সুস্থ চিন্তার লক্ষণ নয়। গড়া সম্বন্ধে কারুর ধারণা স্পষ্ট নয়, তারা আসলে কি চায় সে-সম্বন্ধেও তাদের ধারণা একেবারেই স্পষ্ট নয়। তবুও রাজনীতির সঙ্গে যাঁরা সংশ্লিষ্ট নন এবং কোনপ্রকার স্বার্থ যাঁদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করছে না, তাঁদের সকলের চিন্তার পশ্চাতে আছে একটি মহৎ আদর্শ—একটি বিরাট মানবিক মুক্তির কল্পনা—সকলপ্রকার দারিদ্র্য হতে, অন্যায় হতে, অত্যাচার হতে, শোষণ হতে গণমুক্তির স্বপ্ন। বাস্তব যে-সকল মডেলের (model) কথা তাঁরা ভেবেছেন—যেগুলি সম্বন্ধেও তাঁদের কোন সুস্পষ্ট ধারণা নেই—তার সঙ্গে তাঁদের মানসলোকের কল্পিত মুক্তি মিলবে কি না সে বিচার করতে আদৌ তাঁরা আজ প্রস্তুত নন। কোন সুদূর-প্রসারী প্রবলবেগসম্পন্ন ভাঙ্গাগড়ার আন্দোলন বা বিপ্লব কখনও যুক্তিবিচারকে আশ্রয় করে চলে না, স্বপ্ন এবং আবেগকে আশ্রয় করেই চলে। সেজন্য আজ অতি-আধুনিক যুগের বিরাট জনমণ্ডলীর অবলম্বন যুক্তি নয়, অন্ধবিশ্বাস, যদিও এযুগে তারস্বরে সকল সময় যুক্তির জয়গান করা হচ্ছে। এবং এজন্যই এই অযৌক্তিক মনোভাব অত্যন্ত অসহিষ্ণুতার সঙ্গে আজ প্রতিনিয়ত প্রকাশ পাচ্ছে যে, সব ভেঙ্গে ফেললেই যেন বিরাট মহৎ কার্য সম্পন্ন হবে, তাদের স্বপ্নের 'মুক্তি' তাদের করায়ত্ত হবে।

কিন্তু সবকিছু ভেঙ্গে ফেলতে দেওয়া চলতে পারে না, তাহলে গতিই থেমে যায়। আগেকার সংগ্রামে লব্ধ যা কিছু সাময়িক, সেগুলির অপসারণ না ঘটালে নূতনের স্থান হয় না। কিন্তু অতীতের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় যা-কিছু লাভ করা হয়েছে তা-ই তো সাময়িক নয়। তার মধ্যে সভ্যতার চিরন্তন সম্পদও তো আছে। সেগুলি ধরে রাখতে না পারলে সভ্যতার পশ্চাদাবর্তন অবশ্যম্ভাবী। সেজন্য এই ক্রান্তিকালে সবচেয়ে কঠিন সমস্যা, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সাধন এই শাশ্বত সম্পদগুলিকে রক্ষা করা। এই বিষয়ে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমাজবিজ্ঞানী

ভগিনী নিবেদিতা যে-কথা বর্তমানে এই ক্রান্তিকালের সূচনায় লগ্নে বলেছিলেন, তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—"What is really wanted everywhere...is a moral sense so strong as to carry the nations over the bridge between the two eras, without any loss of the highest and finest results of civilisation." নিপুণ সমাজ-বিজ্ঞানী নিবেদিতা সুন্দর পথনির্দেশ দিয়েছেন। নির্বিচারে সবকিছু ভেঙ্গে ফেলার মধ্যে একটি নিদারুণ নীতিবোধের অভাব আছে, যা মানুষকে লক্ষ্যপথ হতে চ্যুত করে। সুদৃঢ় একটি নীতিবোধ এ সময়ে প্রয়োজন, যা সভ্যতার চিরায়ত সম্পদগুলিকে চিনতে সহায়তা করবে, সংরক্ষণ করতে শক্তি যোগাবে। না হলে বহু দুঃখের সংগ্রাম, বহু ক্লেশবরণ, বহু জীবনদান, বহু মৃত্যু, বহু রক্তপাত—সমস্তই নিষ্ফল হয়ে যায়। পাশ্চাত্য এই নীতিবোধের সন্ধান পায়নি—না তার উচ্চশ্রেণী, না তার সাধারণ শ্রেণী। উচ্চশ্রেণী সাম্রাজ্যবাদের মত্ততায় দৃষ্টিহীন, নিম্নশ্রেণী হিংস্র ভাঙ্গনের নেশায়। সুন্দরভাবে অল্প কথায় নিবেদিতা এটি উদ্ঘাটন করে বলছেন—"But the outbreak of Imperialism in the highest classes of European democracies and of hooliganism in the lower, would both go to indicate that the moral sense had not made its appearance in the west." (C. W., Vol. II)—প্রশ্ন জাগে, আমরাও কি পেরেছি আজ এই নীতিবোধকে জাগ্রত রাখতে, আমাদের জাতীয় বিবেককে কি আমরা অতন্দ্র রাখতে পেরেছি? ঠিক এই সময়ে যখন নানাদিকে উচ্চ- ও শিক্ষিতশ্রেণীর মধ্যে নানা নীতিহীনতা, দুর্নীতি ও বিবেক-হীনতা প্রকট, অপরদিকে গণচিত্তের বিক্ষোভ যেভাবে নানাপ্রকার বিদ্রোহ ও আন্দোলনের মধ্যে ফেটে পড়তে চাইছে, সেখানেও সেই একই অভাব—নীতিবোধের প্রতি শ্রদ্ধা। এ অবস্থা আমাদের মনে অত্যন্ত নৈরাশ্যের সৃষ্টি করেছে। একদা আমাদের জাতীয় বিবেক সদাজাগ্রত ছিল, ধর্মবোধ অত্যন্ত প্রখর ছিল। সেজন্যই আরও গভীর নৈরাশ্য ঘটেছে।

অথচ আমাদের ক্রান্তিকালের সূচনায় যাঁরা আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাঁরা এই নীতিবোধকে সুদৃঢ়ভাবে গড়ে তোলবার, জাতীয় বিবেককে অতন্দ্র করে তোলবার পথ দেখিয়েছিলেন। একটি জাতির প্রথা-প্রতিষ্ঠান কালবশে বদলাতে পারে, কারণ প্রথা-প্রতিষ্ঠানসমূহ সাময়িক, কিন্তু এগুলির মধ্যে পরিব্যাপ্ত বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষায় লব্ধ এই জাতীয় বিবেক; তা বিসর্জন দিলে সভ্যতার পরাজয় ঘটে। এ বিষয়ে প্রখ্যাত পাশ্চাত্য আইনবিদ্ ও চিন্তাবিদ্ Viscount Haldane-এর কথা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ১৯১৩ সালে উচ্চতর জাতীয়তার ভিত্তি-সম্পর্কে আলোচনাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন—"It is the instinctive sense of what to do and what not to do in daily life and behaviour that is the source of liberty and ease. And it is this instinctive sense of obligation that is the chief foundation of society. Its reality takes objective shape and displays itself in family-life and in our other civic and social institutions." ইষ্টানিষ্টবোধ একটি সহজাত প্রবৃত্তির মতো সকল কার্যে প্রকাশ পাবে, তবেই স্বাধীনতা ও সুখ সমাজজীবনে ধরা দিতে পারবে। সহজাত কর্তব্যবোধ সমাজ-জীবনের ভিত্তিস্বরূপ। ভারতে একদিন সর্বসাধারণের

মধ্যেও শ্রেয়-প্রেয়-বিচার অত্যন্ত প্রখর ছিল, ফলে ভারত এক উন্নত নৈতিক সভ্যতার অধিকারী হয়েছিল। তাকে আজ হারিয়ে ফেলা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। এই জাতীয় বিবেক যুগোপযোগী নূতন প্রথা-প্রতিষ্ঠানকে আশ্রয় করতে পারে, কিন্তু জাতীয় বিবেককে সদা অতন্দ্র, সদাজাগ্রত থাকতে হবে। এ প্রসঙ্গে Haldane আরও বলেছেন—"Its reality takes objective shape and displays itself in family-life and in our other civic and social institutions. It is not limited to any form, and it is capable of manifesting itself in new forms and of developing and changing old forms."

নূতন যুগের অভ্যুদয়ে যখন ভারতীয় সমাজের প্রথা-প্রতিষ্ঠানসমূহ বদলাতে থাকে, তখন নৈতিক ভারসাম্য সংরক্ষণ করবার পথ দেখাতে আবির্ভূত হয়েছিলেন যেসকল মহামানব তাঁদের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বাগ্রগণ্য। কারণ তিনি পুরাতন জাতীয় জীবনের মূল্য-বোধকে নিজ জীবনে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তার নব মূল্যায়ন করে সযত্নে আমাদের হাতে তুলে দিয়ে যান। বিবেকানন্দের ভাষায় তাঁর একটি জীবনে তিনি আমাদের সহস্র সহস্র বৎসরের জাতীয় জীবন যাপন করে গিয়েছেন—"His life is a searchlight of infinite power thrown upon the whole mass of Indian religious thought. He was a living commentary to the Vedas and to their aim. He had lived in one life the whole cycle of the national religious existence." রোঁমা রোঁলাও বলেছেন—"The man···was the consummation of two thousand years of the spiritual life of three hundred million people."

সে দিক দিয়ে তিনি পুরাতন, পুরাতন মূল্য-বোধকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছেন। আবার তিনি সম্পূর্ণ নূতনের অগ্রদূত। এবং তাঁর বাণীর তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী। পুনরায় রোঁমা রোঁলার ভাষায় বলা যায়, তাঁর বাণী হল--"···at once religious and philosophic, moral and social, with its message for modern humanity from the depths of India's past." প্রখ্যাত ভারতীয় সমাজতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক বিনয় সরকার একটি সমীক্ষায় নূতনের অগ্রদূত রামকৃষ্ণকে সুন্দরভাবে উদ্ঘাটিত করেছেন। তাঁর সমীক্ষায় তিনি দেখিয়েছেন—"রামকৃষ্ণকে কোন বিশেষ দেবতা, ধর্মমত, শাস্ত্র বা সম্প্রদায়ের সঙ্গে জড়িত করা চলে না। তিনি কোন ধর্মমত প্রচার করেননি, কোন বিশেষ নীতিশাস্ত্র আওড়াননি। কোন বিশেষ উপদেশাবলী—যাকে বলে 'Do's and don't's' —তিনি বেঁধে দিয়ে যাননি। তাঁর 'কথামৃতে' এ সব কিছুই নেই। নেই কোন জাতিতত্ত্বের কচকচি বা সমাজোন্নয়নের কোন বয়েৎ। রাজনীতি তিনি এড়িয়ে গেছেন ষোল আনা।···

"সমাজের সর্বস্তরের মানুষ দৈনন্দিন জীবনে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়—সাধারণ মানুষের কাছে যার সমাধান অত্যাবশ্যকীয় —সে-সম্বন্ধে রামকৃষ্ণ কর্ণধাররূপে দেখা দিয়েছিলেন। তিনি রক্তমাংসের মানুষকে সোজাসুজি অন্তস্তলে ডাক দিলেন উদাত্তকণ্ঠে এবং যেসব মানবিক বৈশিষ্ট্যের দ্বারা মানুষ জগতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সেগুলিকে উদ্বুদ্ধ ও মার্জিত করেছেন কল্যাণহস্তে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সর্বত্রই বিভিন্ন সামাজিক স্তরের প্রতিটি মানুষ কয়েকটি সহজাত ভীরুতায় ভোগে—রামকৃষ্ণের বাণী উচ্চনীচ সকলকেই ভীরুতা জয় করতে সাহায্য করে, তাদের আত্মবিশ্বাস উদ্বুদ্ধ করে।

"রামকৃষ্ণাশ্রিত মানুষ সবরকম ভীরুতা ও হীনমন্যতা থেকে মুক্ত হয়, সাহসের সঙ্গে জীবন-সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে পারে। তাঁর বাণী মূলতঃ দার্ঢ্যের জয়গান, যে দৃঢ়তা স্থিতধী মানুষের লক্ষণ, যা মানুষকে জীবনপথের শত সহস্র ক্ষুদ্র-বৃহৎ বাধাকে অতিক্রম করতে শেখায়, সাহস দেয়।...

"বিপুলা পৃথ্বীর সর্বত্র এই মহাপুরুষের বাণী জোগাচ্ছে প্রেরণা, উদ্গত করছে আত্মবিশ্বাস, উদ্দীপ্ত করছে প্রাণসচেতনতা, যা মানুষকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে শেখায় এবং বাধা-বিপদ অন্যায়-অবিচারের সামনে মাথা তুলে চলতে উৎসাহিত করে। এই কারণেই একটি বিশেষ অর্থে রামকৃষ্ণ যৌবনের দেবতা, নূতনের উদ্গাতা—কি সমাজে, কি ব্যক্তিগত জীবনে। আত্মিক বিশ্বজয়ের অস্ত্র যুগিয়েছেন তিনি জগতের সকলের কাছে।

"অমৃতময় বাণী ছড়িয়েছেন তিনি বিশেষ-ভাবে গৃহস্থের জন্যে—যাদের জীবন সঙ্কীর্ণ গণ্ডিবদ্ধ, যারা বেঁচে থাকে ছোটখাট সুখদুঃখ নিয়ে। তাঁর অমর বাণী—'জীব শিব' মানুষকে শিখিয়েছে: 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর', বুঝিয়েছে নর-নারায়ণ কথাটা কেবলমাত্র সমাসবদ্ধ পদই নয়, পরন্তু চিরন্তন সত্য।"

আরও এই সমীক্ষা অনুসারে দেখা যায় রামকৃষ্ণ দেখিয়েছেন, "সুষ্ঠু জীবনবোধই মহাত্মার লক্ষণ, জীবনকে শিব-সুন্দর করাই সত্যকার যোগাভ্যাস।" আর শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী 'যত মত তত পথে'র কি তুলনা আছে? অধ্যাপক সরকার দেখিয়েছেন এই বাণী সম্পূর্ণ বিবেকের-মুক্তির বাণী।

শ্রীরামকৃষ্ণের অপর তাৎপর্যপূর্ণ বাণী—"এগিয়ে যাও।" প্রাচীন ভারতে একদিন উচ্চারিত হয়েছিল "চরৈবেতি"। সেই বাণীকে নূতন শক্তি ও তাৎপর্য আরোপ করে 'কথামৃতে' তিনি ব্যক্ত করেছেন। এর থেকে সকল পিছিয়ে-পড়া মানুষ, সকল পিছিয়ে-পড়া জাতি এগিয়ে চলবার প্রেরণা লাভ করতে পারে।

'বেদ' ও 'উপনিষদ্', 'ধর্ম' ও 'আধ্যাত্মিকতা' একটি অপূর্ব মানবতাবাদে পরিণত হয়েছে রামকৃষ্ণের বাণীতে, তাঁর জীবনে। মানবদুঃখে বহ্নিমান বিবেকানন্দ তাঁরই সৃষ্টি। যে-ধর্ম তিনি প্রচার করে গেলেন, তা মানবতার ধর্ম, যে তীর্থের তিনি উদ্বোধন করে গেলেন তা মানবতীর্থ—সে তীর্থের অবস্থান দূরে জনহীন গিরিগুহায় নয়, দুর্গম দুর্লঙ্ঘ্য পর্বতশীর্ষে সমুদ্র-সঙ্গমে নয়, সে তীর্থ ছড়িয়ে আছে আমাদের সমাজে, সংসারে, জনপদভূমিতে, কর্মমুখর নগরীর রাজপথে। তাঁর আধ্যাত্মিকতার বাণী জীবনবিমুখতার বাণী নয়, বলিষ্ঠ জীবন-প্রত্যয়ের বাণী। (ক্রমশঃ)

'নমামি শশিনং ভক্ত্যা'

ডক্টর মুরলীমোহন বিশ্বাস

কূলকিনারাহীন আকাশে কত গ্রহতারা দিনরাত ঘুরছে। তাদের একটি হল প্রাণীদের পিতৃপুরুষের হাজার হাজার বছরের এজমালি বাস্তুভিটা—এই পৃথিবী। এর সবচেয়ে নিকটের ঠাঁইটি এক পোড়ো দেশ। দূর প্রায় দু'শ চল্লিশ হাজার মাইল। মহাকাশের পথে এক ছেদ। সে হল চাঁদ। পৃথিবীর মতো গোল। আড়াআড়ি লম্বা প্রায় দু'হাজার একশ তেষট্টি মাইল। পৃথিবীর এক-চতুর্থাংশের একটু বেশী। তাই দেশটিতে জায়গার পরিমাণ অনেক কম।

মহাকায় গ্রহ-উপগ্রহ-তারকাদের কারো সঙ্গে কারো যোগ নেই। মাঝে রয়েছে দৃষ্টিহারা ফাঁক। অথচ একে অন্যকে নিজের নিজের দিকে টানছে। যে যত বড়ো, টান তার তত বেশী। আবার যারা যত কাছে তাদের পরস্পর আকর্ষণও তত জোর। এ টানকে বলা হয় মহা-আকর্ষণ-শক্তি। এতেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড স্থিত হয়ে রয়েছে। কেউ কারো উপর এসে পড়ছে না। চাঁদ সূর্য আর পৃথিবীর মধ্যেও চলেছে এ অদৃশ্য টানাটানি। চাঁদের আকর্ষণে পৃথিবীর জলে জোয়ারভাটা চলে। শক্ত মাটি উঠানামা করতে পারে না। জল আর বায়ু সহজেই উঠে ও পড়ে। সূর্য চাঁদের চেয়ে ঢের বড়ো হলেও এতো দূরে যে তার আকর্ষণ জোরালো হয় না। গ্রহ তারা আবার নিজ নিজ অঙ্গের প্রতিটি কণাকেও কেন্দ্রের দিকে টানছে। একে মাধ্য-আকর্ষণ বলা হয়। পৃথিবী মাধ্যাকর্ষণে ঘরবাড়ী গাছপালা পাহাড় পর্বত নদী সমুদ্র বায়ু মেঘ সমস্তই, মায় আমাদের পর্যন্ত ধরে রেখেছে। তবেই রক্ষা।

পৃথিবীর গায়ে নাইট্রোজেন অক্সিজেন নানারকম গ্যাসের কমপক্ষে ছ'শ মাইল উঁচু স্তর রয়েছে। চাঁদের এরকম গ্যাস বা বায়ুস্তরের আব্রু নেই। তাই সে একবারে নিঝুমপুরী। টুঁ-শব্দটি হয় না। সেখানে কেউ কারো কথা শুনতে পাবে না। এমনকি গুলির আওয়াজও কানে আসবে না। শব্দ যে বায়ুর উপর ভর না করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পৌঁছয় না। হয়তো বা চাঁদে কোনো-এক সময় বায়ু ছিল। বায়ুস্তরকে আটকে রাখতে যা মাধ্যাকর্ষণশক্তি দরকার চাঁদের তত নেই। মোট যে পরিমাণ বস্তু দিয়ে পৃথিবী তৈরী তা থেকে আশিটি চাঁদ হতে পারে। পৃথিবীর চেয়ে সে এতো ছোটো। তাই কেন্দ্রের দিকে টেনে রাখতেও কমজোরী। হয়তো সেদিনের বায়ুস্তর এজন্য ধীরে ধীরে অনন্ত আকাশে মিলিয়ে গেছে। মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি কম বলে চাঁদে অনেকতলা উঁচু বাড়ী তৈরি করা সম্ভব। পৃথিবীর উপর আমাদের যা ওজন চাঁদে তা ছ'ভাগে দাঁড়াবে। একমণ বিশ সেরের মানুষ কি পাথর হবে দশসেরী! সে দেশে ঋতু নেই। বরফ নদী ঝরনা সমুদ্র নেই। বনজঙ্গল গাছপালা ফুল ফল নেই। শুধু ডাঙা খাঁ খাঁ করছে। বায়ু না থাকায় আকাশে মেঘ নেই, কুয়াসা নেই, বৃষ্টি নেই, ঝড় নেই। রামধনু কোনো দিন হয় না। উল্কা পড়লে আগুন ঝরে না। অরোরা হয় না। আকাশ নীলও নয়। কিবা দিন, কিবা রাত কালো।

সূর্য উঠলে কি ডুবলে কখনো কোনো রঙের একটি ফোঁটাও দেখা যায় না। একেবারে একঘেয়ে। ওঠার সময় সূর্য চট করে উপরে আসে। চাঁদের গা সঙ্গে সঙ্গে আলো হয়। আকাশ কালোই থাকে। দিনেও তারকা দেখা যায়। ডোবার সময়ও চট করে নেমে যায়। সঙ্গে সঙ্গে আঁধার ছেয়ে আসে। উষা হয় না, গোধূলি হয় না। সকাল হয় না, সন্ধ্যা হয় না। সৃষ্টির সে এক অনাসৃষ্টি দেশ।

চাঁদকে সঙ্গে নিয়ে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। সে গ্রহ। চাঁদ আবার ঘুরছে পৃথিবীর চারদিকে। চাঁদ উপগ্রহ। পৃথিবীর দিনের হিসেবে ২৯½ দিনে চাঁদ নিজের চারদিকে একবার ঘোরে যেমন পৃথিবী চব্বিশ ঘণ্টায় ঘোরে। তাই চাঁদের দেশে দিন লম্বা পুরো দু'সপ্তা। প্রায় পনের দিন এক নাগাড়ে রোদ। পরের দু'সপ্তা রাত। দিনে তাপের প্রতাপ এতো যে জল টগবগ করে ফুটবে। রাতে এতো ঠাণ্ডা পড়ে যে জল জমে বরফ হয়ে যাবে। চাঁদ আবার ২৯½ দিনেই পৃথিবীর চারদিকে একবার ঘোরে। তাই তার একই পিঠ সবসময় পৃথিবীর দিকে। আরেক পিঠ টেলিসকোপের ধরাছোঁয়ার বাইরে। ইদানীং রাশিয়ানরা উলটো পিঠেরও ছবি তুলেছে। দু'পিঠের বিশেষ পার্থক্য নেই।

চাঁদের ফরসা গায়ে কালো দাগের কলঙ্ক খালি চোখেও দেখা যায়। কালো মতো সে দাগ বিরাট বিস্তারের জায়গা। আগে সাগর বলে মনে হতো। কিন্তু সাগর নয়। চারদিকে পাহাড় দিয়ে ঘেরা শুকনো সমান ডাঙা। এদের এখনো সাগর বলার রেওয়াজ। বেশ সখের নামও দেওয়া হয়েছে। শান্ত সাগর, মেঘ সাগর, বৃষ্টি সাগর, শান্তি সাগর, উর্বর সাগর। এ ধরনের মহাসাগরও রয়েছে। নাম ঝটিকা মহাসাগর। ঐসব জলের সাগর হলে পৃথিবীর আকর্ষণে সেখানেও ভীষণ জোর জোয়ারভাটা খেলত। চাঁদের গায়ে রয়েছে হাজার হাজার চেপটা গর্ত, লম্বা লম্বা ফাটল, উঁচুনীচু পাহাড়। এক একটি গর্তের ব্যাস প্রায় দেড়শ মাইল পর্যন্ত। গর্তের কিনারা পাহাড় দিয়ে ঘেরা। কোনো কোনোটি পাহাড় দশ হাজার ফুট পর্যন্ত উঁচু। নামজাদা দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকের নামে গর্তের নাম রাখা হয়েছে। যেমন প্লেটো, আরকিমিডস, কোপারনিকস, গ্রীমালডি, ক্লভিঅস, অরিসটরকস, টিকো, কেপলার, এরসটসথিনিস, প্যাসেনডি। গর্তের পাড়ের পাহাড় ছাড়াও পৃথিবীর মতো পাহাড়ের রেঞ্জ রয়েছে। নাম আপেনাইন রেঞ্জ, কারপাথিন। প্রায় পঁচিশ হাজার ফুট হলো সবচেয়ে উঁচু পাহাড়। পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের কাছকাছি। অথচ চাঁদ পৃথিবীর চেয়ে কতো ছোটো। সৃষ্টিক্রিয়ার এমনি রহস্য। ফাটল কয়েক মাইল হতে তিন শ মাইল পর্যন্ত লম্বা, প্রায় আধ মাইল পর্যন্ত চওড়া। কোনোটি সোজা, কোনোটি আঁকা-বাঁকা। চাঁদের গায়ে ধুলো আর নুড়ি-পাথরও রয়েছে। জীবিত বা মৃত আগ্নেয়গিরি আছে কিনা বা সেখানে কোনোদিন ভূমিকম্প হয়েছিল বা এখনো হয় কিনা—এ কথার বিচার আরম্ভ হয়েছে। আমাদের পাশে ঐ-যে দেশ—তা হল আপাদমস্তক পাষাণময়। মনভুলানো মরীচিকাও নেই। সূর্যের যা আলো চাঁদের গায়ে পড়ে তার শতকরা সাতভাগ ঠিকরে পৃথিবীর গায়ে আসে। এতেই সে আমাদের চোখে 'দিব্যশঙ্খতুষারাভম্'। আবার বায়ু মেঘ নদী পর্বত সমুদ্র উদ্ভিদ জন্তু মানুষ, তার ইমারত, হরেক রকমের কলকারখানা, মেসিন প্রভৃতির বিশ্বসংসার

বুকে নিয়ে এই-যে পৃথিবী, একে চাঁদের আকাশে জলজল করে ভাসতে দেখায়, যেমন পৃথিবী হতে দেখায় চাঁদ শুক্র মঙ্গলগ্রহ বা আর পাঁচটি তারাকে।

দিব্যশঙ্খতুষারাভং ক্ষীরোদার্ণবসম্ভবম্, নমামি শশিনং ভক্ত্যা শম্ভোর্মুকুটভূষণম্— এ ক্ষীরোদার্ণবসম্ভবম্ শশীর উৎপত্তির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি এখনো ঠিক হয়নি। যুগে যুগে নানান মত প্রকাশ পেয়েছে। হালের কথায়, অতীতের সে কোন্ অজানা যুগে পৃথিবী আর চাঁদ একসঙ্গে মেঘের মতো গ্যাসের মহাপিণ্ড ছিল। পরে দুভাগ হয়েছে। গ্যাস অনেক পরে ঘন হয়ে এবং তাপ ছেড়ে তরল হয়েছে। তরল বস্তু জমাট হয়ে হয়েছে শক্ত মাটি। একটি চাঁদ আরেকটি পৃথিবী। তাই চাঁদ ও পৃথিবী একবয়সী। যখন হতে এদের গা শক্ত হয়েছে তখন হতে বয়স প্রায় ৪,৫০,০০,০০,০০০ বছর।

শম্ভোর্মুকুটভূষণম্। যাঁরা মহাদেবকে দর্শন করেছেন তাঁরা জানেন মহাদেবের মুকুটে চাঁদ কিরূপ রূপ সৃষ্টি করে। আমরা দেখি আকাশ বাতাস মেঘ গ্রহ উপগ্রহ তারকা যেন পৃথিবীর মাথার উপর মুকুট। কত ভাবে তাকে রূপময় করে। চাঁদ অবশ্যই এ মুকুটের মণি। তার আলোয় পৃথিবীর প্রতিটি অঙ্গ এমন খোলতাই হয় যে, সে বাহার লোকে শতমুখে বর্ণনা করে। একটি দেহে সমগ্র পৃথিবী প্রতিফলিত করলে যে বিশ্বরূপী মূর্তি হয়, মহাদেবকে সে-মহাদেহী ধরলে চাঁদ তারই মুকুটের ভূষণ।

আজকের সভ্যতার আগের যুগেই নয়, মানুষ যখন আগুন জ্বালাতে শিখলেও আলোর ব্যবহার শেখেনি, তারও আগে যখন হতে সে এ-পৃথিবীতে ঘরকন্না পেতেছে তখন চাঁদই ছিল রাতের জীবনে দিশারী। এই সেদিনও জোয়ারভাটা ছিল জলপথে যাতায়াত ও ব্যবসাবাণিজ্যে একমাত্র ভরসা। পৃথিবীর চারদিকে ঐ দূরে চাঁদের গতিকে ভিত্তি করে আজ এ পৃথিবীর আসরে কত ধর্মের কত অনুষ্ঠান চলে! বর্তমানে যান্ত্রিক যুগে চাঁদ না থাকলে হয়তো মানুষের জীবনযাপনে কোনো ক্ষতি হত না। কিন্তু জীবনে প্রয়োজনের অতীত একটি দিক রয়েছে; তার ভেতর দিয়ে মানুষ জীবনকে বুঝতে, রূপ দিতে এবং পরিপূর্ণ করতে চায়। তার কত আয়োজন! চাঁদের আলো মানুষের মনে এক আনন্দের আলো জেলে দেয়। সে তাই আনন্দ পরিবেশনে সঙ্গীতে সাহিত্যে চিত্রে চাঁদের প্রতিমা গড়ে। যে আনন্দ জীবনের প্রয়োজন হতে জন্মায় না, যে আনন্দ জীবনের প্রয়োজন মেটায় না, সে-তো খাঁটি। সে যতই ক্ষীণ বা ক্ষণিক হোক মহা-আনন্দের কণিকা। চাঁদ তার প্রদীপ। সে আমাদের ও অসীমের মাঝে মাঝি। নিখিলের পথে আলো দেখিয়ে বিরাটকে ভাবতে শেখায়। অনন্তের সঙ্গে মিলিত হতে ডাকে। যা যত নীরব— তা তত গভীর। সে ডাকের নীরবতায় কত গভীরতা! নমামি শশিনং ভক্ত্যা।

অন্তরে বাহিরে তুমি

শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ

(ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্)

অন্তরে বাহিরে তুমি, তাই পূর্ণ ঘট
এ-হৃদয়, কলধ্বনি সমুদ্র-সঙ্গীতে
ঘুরে ফিরে বেজে চলে ; আনত ভঙ্গীতে
ঘিরে থাকে আকাশের নীল চিত্রপট।

আমার আকাশ তুমি, আমি তব পাখি,
যতদূর উড়ে যাই কূলহীন দূর
তবু তো ফিরায়ে আনে ; যতো আমি ডাকি,
দূর-দূরান্তরে ডাকে অনাহত সুর।

অন্তরে বাহিরে তুমি, তুমিও যে আমি,
ঘট ভেঙে একাকার, আকাশে আকাশ,
শুধু জল, শুধু ঢেউ, হে নীলাম্বুস্বামি !
তোমারি প্রকাশে সত্য আমার প্রকাশ।

আকাশ সমুদ্রে মেশে, অন্তরে বাহির,
তোমার অনন্তে পাখি ডানা মেলে স্থির।

'তব তত্ত্বং ন জানামি'

শ্রীনৃপেন আকুলি

ধৃতির আধারে তোমার তত্ত্ব নির্ণয় করে সাধ্য কার,
বিরাট আকাশ, বিশাল বারিধি, মৃত্তিকা নহে সীমা যে তার !
এক যুগে নয়, যুগ-যুগ ধরে
জীবন হইতে জীবনান্তরে
অবিরত যদি চলি তবু হায়, পারিব না শেষ সীমায় যেতে ;
তার চেয়ে ভালো এ হৃদয়-মন, পারি যদি তব চরণে দিতে !

কণ্ঠে ঝরিবে মধুক্ষরা নাম, আঁখিজলে পাব পরশ তব,
মোর ভকতির সিত পঙ্কজে চির অনুরাগে জড়ায়ে রব !
আমার বুকের ভালোবাসা প্রভু
তোমার যোগ্য হবে না তো কভু ;
অহেতুক তব প্রেমপরশনে যোগ্য করিয়া নিও হে তারে,
চরণে তোমার সোনা করে নিয়ে গ্রহণ করিও করুণা ক'রে !

সে পরমহংস-স্মৃতি

সুফিয়া কামাল

যেখানে সাম্যের গানে আনে নব চেতনার বাণী
সত্যের সেবায় যাঁরা মুছে দেয় তুচ্ছতার গ্লানি
তাঁরাই ত মানব মহান!
তাঁহাদের পুণ্য নামে সেই স্থান হয় তীর্থস্থান।
ভঙ্গুর মৃত্তিকাপাত্রে হয় যবে অমৃতসঞ্চয়
সে বিন্দু অমৃত পানে যাঁহারা হইল মৃত্যুঞ্জয়
তুচ্ছ করি দেহের বিনাশ
আত্মার অন্তৈশ্বর্যে পুষ্প সম লভিল বিকাশ
সুন্দরে সঁপিল তাঁর সে প্রেমসুরভি
সেই হল কালজয়ী আনন্দ-অমৃত স্বাদ লভি।
কালচক্র আবর্তিয়া কত যে কীর্তিরে করি লয়
বহিয়া চলিয়া গেছে, সে-ও হেরে পরম বিস্ময়।
স্রষ্টার আনন্দে যাঁর শুরু হল বিচিত্র জীবন
সে পরমহংস তাঁর পক্ষ হল নাকো নিমজ্জন
সংসার-সিন্ধুর মাঝে, মুক্ত-পক্ষ সেই নভোচারী
ঊর্ধ্বে, আরও ঊর্ধ্বে ওঠে অলৌকিক আনন্দে বিথারি।
তবুও মর্ত্যের মায়া আর্ত ক্লিষ্ট ব্যথিতের লাগি
স্নেহার্তা জননী সম সতর্কিত রহিয়াছে জাগি
সেবা ধর্ম বাণী করি দান
অযুত ভক্তেরে দানি কর্মময় পথের সন্ধান
মানবসেবার ধর্মপথে
কল্যাণের মহৎ ব্রতেতে।
বিগত শতাব্দী তবু আজও সেই মৃত্যুহীন প্রাণ,
লক্ষ জনতার কণ্ঠে উঠিতেছে সেই নামগান।

দুর্গাপূজার ইতিহাস

অধ্যাপক প্রণবকুমার ভট্টাচার্য

হিন্দুধর্মে ঈশ্বরের রূপটিকে সগুণ ও নির্গুণ এই দুই ভাবেই চিন্তা করা হয়। তাঁহার সগুণ-রূপের ধ্যানই লৌকিক সমাজে প্রচলিত। এইভাবে বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুর উপাসনা করেন, শৈবগণ শিবের পূজা করেন এবং যাঁহারা শাক্ত তাঁহারা করেন দেবীর আরাধনা। শাক্ত কথাটির অর্থ করিতে স্বামীজী একদা বলেছিলেন, "শাক্ত মানে মদ ভাঙ নয়, শাক্ত মানে যিনি ঈশ্বরকে সমস্ত জগতে বিরাজিত মহাশক্তি বলে জানেন।"[১] অন্যভাবে বলিতে গেলে দেবী বিশ্বশক্তির মূর্তপ্রতীকরূপে সাধক-অন্তরে প্রতিভাত হন। বৃহৎ হইতে অতিবৃহৎ বস্তুতে যেমন, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পদার্থেও সেইরূপ এই মহাশক্তির সমান প্রকাশ। মানুষের অন্তর্নিহিত এই মহাশক্তিকে জাগ্রত করাই হিন্দু মন্ত্রশাস্ত্রের একমাত্র লক্ষ্য।[২]

মানবেতিহাসের প্রথম যুগে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই কোন না কোন ভাবে দেবী-পূজার প্রচলন ছিল বলিয়া সাধারণতঃ মনে করা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীনতম সভ্যতার কেন্দ্র হরপ্পা-মহেঞ্জোদারো অঞ্চলে বহু মৃন্ময় স্ত্রীমূর্তি পাওয়া গিয়াছে যেগুলিকে পণ্ডিতেরা পূজার্থে ব্যবহৃত মাতৃকামূর্তি বলিয়া মনে করেন।[৩] বৈদিক যুগে অবশ্য কোন কোন পণ্ডিতের মতে ধর্মবিশ্বাস ও উপাসনায় দেবীগণ এক গৌণ স্থান অধিকার করিতেন।[৪] কিন্তু জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়[৫] বলেন যে, বৈদিক দেবীগণ সংখ্যায় অপেক্ষাকৃত অল্প হইলেও চরিত্র-বৈশিষ্ট্যে প্রোজ্জ্বল ছিলেন। অদিতি, ঊষা, সরস্বতী, পৃথিবী, রাত্রি, ইড়া, পুরন্ধ্রি, ধীষণা, বাগ্দেবী প্রভৃতি দেবীগণের রূপ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে মনে হয় যে, প্রাচীন ঋষিগণ ইঁহাদের উপর ন্যূনাধিক গুরুত্ব আরোপ করিলেও সোমযাগে তাঁহাদের বিশিষ্ট অংশ ছিল না। অম্বিকা, উমা, দুর্গা, কালী প্রভৃতি যেসব দেবীকে আশ্রয় বা কেন্দ্র করিয়া শাক্তধর্মাচার প্রতিষ্ঠিত হয়, তাঁহাদের নামোল্লেখ উত্তর বৈদিক সাহিত্য হইতেই আরম্ভ হয়।[৬]

তৈত্তিরীয় আরণ্যকের দুর্গাগায়ত্রী-মন্ত্রের মধ্যে আমরা দুর্গা বা দুর্গি ব্যতীত দেবীর আরও দুইটি নূতন নাম পাই, যথা কাত্যায়নী ও কন্যাকুমারী।[৭] অন্যত্র অগ্নিবর্ণা তপঃপ্রদীপ্তা

---

১ **উদ্বোধন,** শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৭২, পৃঃ ৪৯১।

২ cf. "......This Sakti may be conceived to be the personification of universal energy in the abstract. She resides in the macrocosm as well as in the microcosm. The discovery and development of Sakti or psychic energy in man is the aim of the Mantra-Sāstra." (T. A. Gopinath Rao, *Elements of Hindu Iconography,* Vol. I, Pt. II, P. 327).

৩ Mackey, Early Indus Civilisation, 2nd ed, P. 54.

৪ Macdonald, *Vedic Mythology.* P. 124

৫ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় **পঞ্চোপাসনা,** ১৯৬০, পৃঃ ২২১-২২৫

৬ **পঞ্চোপাসনা,** পৃঃ ২২৬

৭ গায়ত্রীটি এইরূপ—

"কাত্যায়নায় বিদ্মহে কন্যাকুমারী ধীমহি।
তন্নো দুর্গিঃ প্রচোদয়াৎ।"

—**তৈত্তিরীয় আরণ্যক,** দশম খণ্ড, প্রথম অনুবাক। কন্যাকুমারী দক্ষিণ ভারতের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থের নাম এবং ইহার উল্লেখ আমরা অজ্ঞাতনামা যবন লেখকের গ্রন্থেও

সূর্য্যকন্যা, কর্মফল-বিধাত্রী ও ত্রাণকারিণী-রূপে দুর্গার যে চিত্রটি[৮] পাই, তাহার সহিত পরবর্তীকালের মহাকাব্যে ও পুরাণাদির দুর্গা-স্তবে বর্ণিত দুর্গার রূপের সহিত বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

মূল রামায়ণে শক্তিপূজা সম্বন্ধে বিশেষ কোনও উল্লেখ নাই। বরং রাবণবধার্থে রামচন্দ্র অগস্ত্যমুনি কর্তৃক সূর্য্যারাধনার জন্য উপদিষ্ট হইয়াছিলেন।[৯] শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক রাবণবধার্থে অকালে দুর্গাপূজার যে কাহিনী বাংলাদেশে প্রচলিত আছে এবং যাহা এদেশে ব্যাপকভাবে অনুষ্ঠিত শারদীয়া দুর্গোৎসবের ভিত্তিস্বরূপ, উহার কথা কবি কৃত্তিবাস কর্তৃক বঙ্গভাষায় রচিত রামায়ণ গ্রন্থেই পাওয়া যায়।[১০] ইহার উপাদান কৃত্তিবাস কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে মহাভারতের দুইটি দুর্গাস্তোত্র এবং উহার পরিশিষ্ট হরিবংশের অন্তর্ভুক্ত আর্যাস্তবগুলি শাক্ত-উপাসকের ইষ্টদেবীর যে পরিচয় বহন করে, তাহা এক্ষেত্রে স্মরণীয়।[১১] আর্যাস্তবকর্তা দেবীর মাতা, ভগিনী ও কুমারী-রূপগুলি এবং তাঁহার বৈদিক প্রতিরূপের বর্ণনার সাথে সাথে তাঁহার প্রকাশ যে শবর, বর্বর, পুলিন্দ প্রভৃতি বহুঅনার্যজাতি-পূজিত ও ময়ূরপিচ্ছ প্রভৃতি লাঞ্ছিত দেবীরূপের মধ্যে বিদ্যমান, ইহা সুস্পষ্টভাবে স্বীকার করিয়াছেন।[১২]

মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবীমাহাত্ম্য খণ্ডের অন্তর্গত কয়েকটি দেবীস্তুতিতে দেবীর রূপের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের উপর গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু পুরাণকার সাধারণতঃ দেবীর অনার্যপূজিত রূপ সম্বন্ধে মহাকাব্য-রচয়িতাগণের পন্থা অনুসরণ করেন নাই। তবে মহাকাব্যের ন্যায় দেবীর বৈদিক রূপ, তাঁহার সৌম্য ও উগ্র রূপ, জননী, ভগিনী ও দুহিতা প্রভৃতি বিভিন্নরূপে প্রকাশ ইত্যাদির কথা বিশদভাবে বলা হইয়াছে।[১৩] দেবী মহামায়ার স্বরূপ ও উৎপত্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু সুরথরাজার প্রশ্নের উত্তরে ঋষি মেধস বলিয়াছিলেন যে, "দেবী নিত্যা ও সমগ্র জগতে পরিব্যাপ্তা, তথাপি তাঁহার উৎপত্তি সম্বন্ধে বহু কাহিনী প্রচলিত। আপনি উহা শ্রবণ করুন।"[১৩(ক)] অনন্তর ঋষি দেবীর মহিষাসুর-বিনাশিনী, চণ্ডমুণ্ড-বিঘাতিনী, শুম্ভনিশুম্ভহন্ত্রী প্রভৃতি বিভিন্ন রূপের উৎপত্তি-সম্বন্ধীয় কাহিনীসমুদয় বর্ণনা করিলেন।

দেখিতে পাই। —See *Periplus of the Erythrean Sea*, ed. by Schoff. Section 58, P. 46. কাত্যায়নী নামটি কাত্যবংশীয় ব্রাহ্মণদিগের ইষ্টদেবীর নাম হইতে আসিয়াছে বলিয়া Weber, R. C. Bhandarkar প্রমুখ পণ্ডিতগণ মনে করেন।—See. **পঞ্চোপাসনা**, পৃঃ ২২৬

৮ cf. "তাম্ অগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং বৈরোচনীং কর্মফলেষু জুষ্টাম্।
দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে সুতরসি তরসে নমঃ॥"
—**তৈত্তিরীয় আরণ্যক**, দশম খণ্ড, দ্বিতীয় অনুবাক।

৯ *Rāmāyaṇa*, Canto VI, 106th Sarga of Yuddha Kāṇḍa.

১০ **পঞ্চোপাসনা**, পৃঃ ২০২

১১ (i) যুধিষ্ঠিরকৃত দুর্গাস্তব—মহাভারত ৪.৬
(ii) অর্জুনকৃত " — " , ৬.২৩
(iii) হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব, তৃতীয় অধ্যায়

১২ cf. "শবরৈর্ব্বর্বরৈশ্চৈব পুলিন্দৈশ্চ সুপূজিতা।
ময়ূরপিচ্ছধ্বজিনী লোকান্ ক্রমসি সর্বশঃ॥
- হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব, তৃতীয় অধ্যায়, আর্যাস্তব হইতে গৃহীত।

১৩ **পঞ্চোপাসনা**, পৃঃ ২৩৯

১৩ (ক) cf. "নিত্যৈব সা জগন্মূর্তিস্তয়া সর্বমিদং ততম্।
তথাপি তৎসমুৎপত্তিঃ বহুধা শ্রূয়তাং মম॥"
—মার্কণ্ডেয় পুরাণ, দেবীমাহাত্ম্য······

নারায়ণীস্তুতিতে (৯১৩ম অধ্যায়)। দেবীর বিশ্বাধার, বিশ্ববীজ, বৈষ্ণবীশক্তি, নবমাতৃকা, লক্ষ্মী, নারায়ণী, সরস্বতী, কাত্যায়নী, দুর্গা, ভদ্রকালী, অম্বিকা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকাশের স্তব করা হইয়াছে। পরিশেষে দেবীর উক্তি রহিয়াছে—ইহাতে তিনি যে বিভিন্ন যুগে বিন্ধ্যবাসিনী, রক্তদন্তিকা, শতাক্ষী, শাকম্ভরী, দুর্গা, ভীমা, ভ্রামরী নামে অবতীর্ণ হইয়া অসুরবিনাশ ও জগতে শান্তিপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন সেই কথাই বলিয়াছেন। গোপীনাথ রাও-এর মতে ইহারই মাধ্যমে দেবী তাঁহার বিভিন্ন নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোকপাত করিয়াছেন।[১৪] আবার বয়োবৃদ্ধির সাথে দেবীর নামের পরিবর্তনও এক্ষেত্রে লক্ষণীয়। যেমন, দেবী যখন একবৎসরের শিশু বলিয়া পূজিতা হন, তখন তাঁহার নাম হয় সন্ধ্যা, সেইরূপ দুই বৎসরের সময় সরস্বতী, সাত বৎসরে চণ্ডিকা, আট বৎসরে শাম্ভবী, নয় বৎসরে দুর্গা বা বালা, দশ বৎসরে গৌরী, তের বৎসরে মহালক্ষ্মী এবং ষোল বৎসরে ললিতা নামে পূজিতা হন।[১৫]

গোপীনাথ রাও আগম, তন্ত্রশাস্ত্র, পুরাণ, উপপুরাণ, শিল্পরত্ন, রূপমণ্ডল, বিশ্বকর্মশাস্ত্র ইত্যাদি মূর্তিতত্ত্বসংবলিত শিল্পশাস্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে দেবীমূর্তিসমূহের একটি বিশদ বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। প্রাপ্ত অপেক্ষাকৃত প্রাচীন মূর্তিগুলির মধ্যে দেবীর মহিষাসুরমর্দিনী, সিংহবাহিনী, উমা-পার্বতী, মাতৃকা (সপ্তসংখ্যক), একানংশা, মহামায়া প্রভৃতি রূপগুলি দৃষ্ট হইয়া থাকে।[১৬] মূর্তিতত্ত্বসম্পর্কিত গ্রন্থাদিতে দেবীর ভুজসংখ্যা কোথাও ৪, ৮, ১২ আবার কোথাও ১৬, ১৮, ২০ এমন কি ৩২ পর্যন্ত দেখা যায়।[১৭] আগমগুলিতে দুর্গার বিভিন্ন রূপের পরিচয় পাওয়া যায়,[১৮] যথা—(১) নীলকণ্ঠী (চতুর্ভুজা), (২) ক্ষেমঙ্করী (চতুর্ভুজা), হরসিদ্ধি (চতুর্ভুজা), (৪) রুদ্রাংশ-দুর্গা (চতুর্ভুজা), (৫) বাণদুর্গা (অষ্টভুজা) (৬) অগ্নিদুর্গা (অষ্টভুজা এবং বিদ্যুদুজ্জ্বলবর্ণা), (৭) জয়দুর্গা (চতুর্ভুজা), (৮) বিন্ধ্যবাসিনী দুর্গা (চতুর্ভুজা ও বিদ্যুদুজ্জ্বলবর্ণা), (৯) রিপুমারি দুর্গা (দ্বিভুজা ও রক্তিমবর্ণা)। দেবী ত্রিনয়না, সাধারণতঃ কৃষ্ণবর্ণা, নবযৌবনসম্পন্না, পীনোন্নতপয়োধরা এবং সর্বাভরণভূষিতা। তিনি কখনও পদ্মাসনা, কখনও বা মহিষমস্তকোপরি দণ্ডায়মানা আবার কখনও সিংহোপরি উপবিষ্টা।

তবে উল্লিখিত রূপগুলি অপেক্ষা দেবীর মহিষমর্দিনীরূপটি ভারতের সর্বত্র বিশেষভাবে পরিচিত। সম্ভবতঃ প্রাচীনতম (আঃ খৃঃ ৪র্থ শতক) মহিষমর্দিনীমূর্তিটি ভিলসার নিকটস্থ উদয়গিরির অন্যতম গুহাগাত্রে খোদিত রহিয়াছে। ইহা দ্বাদশভুজবিশিষ্ট। এখানে দেবী সিংহবাহিনী নহেন এবং তাঁহার হস্তধৃত 'গোধা'টিও বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক।[১৯] বাচস্পত্য-উদ্ধৃত বিষ্ণুধর্মোত্তরে মহিষমর্দিনীকে চণ্ডিকা আখ্যা দেওয়া হইয়াছে এবং তাঁহাকে বিংশতিভুজযুক্তা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।[২০] কিন্তু দেবীর দশভুজামূর্তিই সাধারণতঃ সর্বাধিক প্রচলিত। শিল্পরত্নে[২০] (ক) দেবী দশভুজা,

১৪ T. A. Gopinath Rao, op. cit. p. 333
১৫ Ibid., p. 332
১৬ পঞ্চোপাসনা, পৃঃ 288

১৭ Ibid.
১৮ T, A. Gopinath Rao, op. cit., p. 341
১৯ পঞ্চোপাসনা, পৃঃ ২৪০. মঙ্গলচণ্ডীকাব্যের দেবীর 'গোধিকা'রূপে ব্যাধ কালকেতুর গৃহে আগমন-এর কথা এক্ষেত্রে স্মরণীয়।
২০ T. A. Gopinath Rao, p. 343
২০ (ক) Ibid.

ত্রিনয়না, অতসীপুষ্পবর্ণা, জটামুকুট ও চন্দ্রকলা-শোভিতা, পীনোন্নতপয়োধরা প্রভৃতি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তাঁহার দক্ষিণহস্তে ত্রিশূল, খড়্গ, শক্ত্যায়ুধ, চক্র, বাণ এবং বামহস্তে খেটক, পূর্ণচাপ, পাশ, অঙ্কুশ ও ঘণ্টা অথবা পরশু বিদ্যমান। নাগপাশে বেষ্টিত ভ্রূকুটী-ভীষণাননযুক্ত অসুরের হস্তে খড়্গ ও বর্ম রহিয়াছে, কিন্তু দেবী তাহার কণ্ঠে ত্রিশূল নিবিষ্ট করিয়াছেন বলিয়া রুধির বিনির্গত হইতেছে। দেবীর দক্ষিণপদ সিংহের উপর এবং বামপদের অঙ্গুষ্ঠ মহিষোপরি স্থাপিত।

পূর্বে অসুরকে মহিষমুখিরূপে দেখান হইত।[২০ (খ)] কিন্তু মধ্যযুগীয় বাংলা বিহার-উড়িষ্যায় বিচ্ছিন্নশির পশু হইতে নির্গত নররূপী অসুরের সহিত যুদ্ধনিরত সিংহবাহিনী দেবীর বহু মূর্তি পাওয়া গিয়াছে।[২১] পুনরায় এই মহিষ-মর্দিনী মূর্তির সহিত লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক ও গণেশাদির অবস্থান বাংলাদেশের শারদীয় দুর্গোৎসবে পূজিত মৃন্ময়ী দুর্গাপ্রতিমার সহিত দৃষ্ট হয়। মার্কণ্ডেয়পুরাণ-কথিত সুরথরাজা-কর্তৃক নদীতটে দেবীর মৃন্ময়ী মূর্তির নির্মাণ ও পূজা এক্ষেত্রে স্মরণ করা যাইতে পারে।[২২] ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ হইতে জানা যায় যে, পূজাশেষে তাঁহারা মৃন্ময়ী প্রতিমা নদীতে বিসর্জন দিয়াছিলেন। কিন্তু সুরথরাজার পূজা বসন্ত-কালে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া কিংবদন্তী। আজিও বাংলাদেশে কোন কোন স্থানে বাসন্তী-পূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। তবে শরৎকালে দেবীর যে পূজা ব্যাপকভাবে বাংলাদেশে প্রচলিত উহার অন্যতম প্রাথমিক উল্লেখ আমরা কালিকাপুরাণে পাই।[২৩] ইহাতে শারদীয়া পূজার প্রথা দেবগণই প্রথম প্রবর্তন করেন বলিয়া বলা হইয়াছে। কৃত্তিবাস-কথিত শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারা তাঁহার অকালবোধনের কথা নাই। কালিকাপুরাণ কৃত্তিবাসের পূর্বে রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা হয়।

প্রখ্যাত স্মার্ত রঘুনন্দন খৃঃ ১৬শ শতাব্দীতে কালিকাপুরাণ, বৃহন্নন্দিকেশ্বরপুরাণ, ভবিষ্য-পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে দুর্গাপূজার পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞাতব্য অনেক মূল্যবান্ তথ্য লিপিবদ্ধ করেন। বাচস্পতি মিশ্র, শ্রীনাথ, শূলপাণি, জীমূতবাহন, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি নিবন্ধকারগণও দুর্গাপূজার পদ্ধতি লিখিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের কেহ কেহ রঘুনন্দনের পূর্বে আবির্ভূত হইয়া-ছিলেন বলিয়া বিশ্বাস। চতুর্দশ শতকের বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতি ও দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিণী গ্রন্থে দেবীর এইরূপ প্রতিমায় পূজার্চনার কথা লিখিয়াছেন। চৈতন্যভাগবতে[২৩(ক)] আছে—

"মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ আছে সব ঘরে।
দুর্গোৎসবকালে বাদ্য বাজাবার তরে॥"

ইহা হইতেই বুঝা যায় যে ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বেই দুর্গাপূজা বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। শূলপাণি দুর্গারাধনার পদ্ধতি-সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁহার পূর্ববর্তী দুইজন নিবন্ধকার যথা জীবন ও বালক-এর উল্লেখ করিয়াছেন। রাজা হরিবর্মদেবের (খৃঃ একাদশ শতক) প্রধানমন্ত্রী ভবদেব ভট্ট তাঁহার নিবন্ধাবলীতে জীবন, বালক প্রভৃতি নিবন্ধকারগণের উক্তি উল্লেখ করিয়াছেন। এইভাবে আলোচনা

---

২০ (খ) উদয়গিরি ও মহাবলীপুরম্ এর মহিষমর্দিনী panel এর অসুরমূর্তিগুলি তুলনীয়।

২১ **পঞ্চোপাসনা**, পৃঃ ২৪৫

২২ **মার্কণ্ডেয়পুরাণ,** ৮২ অধ্যায়, শ্লোক ৯-১১।

২৩ cf. "শরৎকালে পুরা যস্মান্নবম্যাং বোধিতা সুরৈঃ।
শারদা সা সমাখ্যাতা পীঠে লোকে চ ... ।"
—**কালিকাপুরাণ,** পঞ্চষষ্ঠিতম অধ্যায়, শ্লোক ১।

২৩ (ক) মধ্য—২৩ অধ্যায়।

করিলে মনে হয় মৃন্ময়ী প্রতিমায় দেবীর পূজার্চনা বাংলাদেশে ন্যূনাধিক সহস্র বৎসর ধরিয়া প্রচলিত আছে।[২৪] তবে দেবীর পরিবারাদির রূপায়ণ বাংলাদেশে ঠিক কোন্ সময় হইতে প্রথম প্রচলিত হয় তাহা জানা না গেলেও চতুর্দশ শতকে যে অনুরূপ প্রথার প্রচলন ছিল, সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।[২৫]

দুর্গাপূজার সহিত সংশ্লিষ্ট অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ ও ক্রিয়াদির কথা শূলপাণির দুর্গোৎসব-বিবেকে, কালিকাপুরাণে উল্লিখিত আছে। এই অনুষ্ঠানটি শাবরোৎসব[২৫(ক)] নামে পরিচিত। রঘুনন্দনও দুর্গোৎসবে অনুষ্ঠিতব্য ওই শাবরোৎসব-এর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই সমুদয় অশ্লীলতা যে বহুদিন পর্যন্ত দুর্গাপূজার অঙ্গীভূত ছিল, তাহা উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে জনৈক বিদেশী লেখকের লেখা হইতে জানিতে পারা যায়।[২৬] এই শাবরোৎসব সম্ভবতঃ শবর, বর্বর প্রভৃতি অনার্যজাতির উৎসব ও আচরণের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল।

পরিশেষে নবপত্রিকা-পূজা সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। এই পূজা দুর্গাপূজার পদ্ধতির অন্যতম প্রধান ও প্রাথমিক অঙ্গবিশেষ। একটি সপত্র কদলীবৃক্ষের চারা অন্য আটটি বৃক্ষের ফল, মূল বা শাখার (যথা কচ্বী, ও হরিদ্রা, জয়ন্তী, বিল্ব, দাড়িম, অশোক, মান এবং ধান্য) সহিত নূতন লালপেড়ে শাড়ীতে আচ্ছাদিত ও সিন্দুর-চর্চিত করিয়া প্রতিমার এক পার্শ্বে স্থাপনকরতঃ পূজারম্ভে ইহার (বা সাধারণভাবে এই 'কলা বৌ'-এর) অর্চনা করা অন্যতম বিধি। ইহাই নবপত্রিকাপ্রবেশ এবং ইহার দ্বারা দেবীকে উদ্ভিদসমূহের অধিষ্ঠাত্রীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে।[২৭] রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় পুরশ্চর্যার্ণবের তৃতীয় খণ্ড (খৃঃ ১০৩৪-৩৫) হইতে দেখাইয়াছেন যে, দেবীর বিভিন্ন রূপ—যথা ব্রাহ্মণী, কালিকা, দুর্গা, কার্ত্তিকী (কৌমারী), শিবা, রক্তদন্তিকা, শোকরহিতা, চামুণ্ডা এবং লক্ষ্মী যথাক্রমে কদলী, কচ্বী, হরিদ্রা, জয়ন্তী, বিল্ব, দাড়িম্ব, অশোক, মান এবং ধান্য বৃক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। এ স্থলে দেবীমাহাত্ম্যে বর্ণিত দেবীর 'শাকম্ভরী'রূপের কথা আমরা স্মরণ করিতে পারি।

---

২৪ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও এই মত পোষণ করেন। Sec. **পঞ্চোপাসনা**, পৃঃ ২৮১-২

২৫ বিদ্যাপতি তাঁহার **দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী**তে কার্ত্তিক, গণেশ, জয়া-বিজয়া (লক্ষ্মী-সরস্বতী) এবং দেবীর বাহন সিংহসমেত প্রতিমায় শারদীয় দুর্গাপূজার উল্লেখ করিয়াছেন। দ্রঃ মজুমদার, **বাংলাদেশের ইতিহাস,** (মধ্যযুগ), পৃঃ ২৯৪।

২৫ (ক) —**কালিকাপুরাণ,** একষষ্টিতম অধ্যায় ১৭, ২১।

২৬ দ্রঃ মজুমদার, **বাংলার ইতিহাস** (মধ্যযুগ), পৃঃ ২৯৪-৫।

২৭ See R. P. Chanda, *The Indo-Aryan Races*, 1916, p. 131

শঙ্কর-পার্বতীর মিলনতীর্থে

শ্রীমতী মিনতি সেন

হিমালয়-অঞ্চলের দুর্গম তীর্থগুলি একাধিকবার পর্যটন করার পর আমার যা মনে হয়েছে তা হচ্ছে এই—ত্রিযুগীনারায়ণের মতো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর তীর্থ সে-অঞ্চলে খুব কমই আছে, অবশ্য এটা আমার ব্যক্তিগত মত; তবে এসব স্থানে পূর্বে যাঁরা গিয়েছেন, বা পরে যাঁরা যাবেন, মনে হয় তাঁদের অনেকেই আমার সঙ্গে একমত হবেন। এখানকার মতো দুর্গম, বেশ দুর্গম, কিন্তু পবিত্র তীর্থ দর্শনের দুর্নিবার আকর্ষণ এবং পথের অপরূপ দৃশ্যাবলী সব দৈহিক কষ্ট দূর করে দেয়।

পাহাড়ের পথে আজকাল সোজা গুপ্তকাশী পর্যন্ত বাস যাচ্ছে। অধিকাংশ লোক হরিদ্বার থেকে বাসে হৃষীকেশ হয়ে গুপ্তকাশী যান; কিন্তু এপথে অসুবিধা অনেক। বেশীর ভাগ যাত্রীই এইপথে যাবার চেষ্টা করায়, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় এবং আশ্বিন-কার্তিক এই ক'টি মাস এ পথে প্রচণ্ড ভীড় হয়। অত্যধিক ভীড় এবং যাত্রী-আবাসের স্বল্পতার দরুন বেশ কিছু সংখ্যক যাত্রী কয়েক দিনের জন্য হৃষীকেশে আটকে পড়েছেন, এমন ঘটনা সেখানে বিরল নয়। বলা বাহুল্য, তখন যাত্রীদের অবর্ণনীয় দুঃখ ও অসুবিধায় পড়তে হয়, কারণ সেখানে থাকার জায়গার অভাব। এই অসুবিধার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার একটি উপায় আছে; আমার মতে, হরিদ্বারে গঙ্গার অপর পার থেকে হরিদ্বার-কোটদ্বার রুটে যে বাস ছাড়ে, তাতে গেলে যাত্রীরা অনেকটা আরামে যেতে পারবেন। বাসে তিন ঘণ্টার মতো সময় লাগে; এ পথে ভীড় কম থাকে। কোটদ্বার একটি রেলস্টেশন; হরিদ্বারের কয়েক স্টেশন আগে নাজিবাবাদ থেকে ব্রাঞ্চ লাইন রেলপথেও কোটদ্বার যাওয়া যায়। হরিদ্বার-কোটদ্বার বাস-যাত্রাট যথেষ্ট উপভোগ্য; মনোরম সংরক্ষিত অরণ্য লালচং-এর মধ্য দিয়ে যাবার সময় বন্য হরিণ, ময়ূর ইত্যাদি জন্তু হামেশা চোখে পড়বে। রেলস্টেশন থাকায় কোটদ্বার একটি বড় ও সমৃদ্ধ স্থান। হোটেলেরও অভাব নেই। এখান থেকে ভোরবেলা কেদারে যাবার বাস ছাড়ে; পথে এক রাত কাটিয়ে পরদিন বিকেল নাগাত বাস গুপ্তকাশী পৌছায়।

এখান থেকে হাঁটা পথ শুরু, বারো মাইল হাঁটার পর ত্রিযুগীনারায়ণ যাবার শেষ চটি রামপুর-এর আগের চটি বাদলপুরে ত্রিযুগীনারায়ণের এক পাণ্ডা চন্দ্রশেখরের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছিল। রামপুরে রাত কাটানোর পর পরের দিন সকালে জলখাবার খেয়ে বেরোতে বেরোতে আমাদের প্রায় ৭টা বেজে গেল। দলটি আমাদের ছোটই বলতে হবে—দু'জন মহিলাসমেত মোট ৮ জন লোক। ঠিক হল, রামপুর থেকে আমরা হেঁটেই যাব, তারপর যদি অসুবিধা হয়, তখন ঘোড়া ইত্যাদি করে নিলেই হবে। সুতরাং ভগবানের নাম স্মরণ করে যাত্রা শুরু করলাম; ডানদিকে মন্দানদী অনেক নীচ দিয়ে বয়ে চলেছে, বাঁ দিক দিয়ে রাস্তা। পথ মোটামুটি সমতল, হাঁটতে খুব বেশী কষ্ট হচ্ছিল না। সামান্য কিছু দূর এগিয়ে দেখা গেল, রাস্তা দু' ভাগে ভাগ হয়ে গেছে, ডানদিকেরটা শোনপ্রয়াগ ও গৌরীকুণ্ড হয়ে কেদারে গেছে,

আর বাঁ দিকেরটা সোজা উঠে গেছে ত্রিযুগী-নারায়ণের দিকে। বেশ চড়াই পথ, ধাপে ধাপে ওপরে উঠেছে। আমাদের সঙ্গে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে দু'জনের হেঁটে যাওয়া আর সম্ভব হল না, এখান থেকে তাঁরা ঘোড়া করে নিলেন, আমাদের সে ইচ্ছে ছিল না বলে হাঁটা পথে রাস্তার সৌন্দর্য দেখতে দেখতে এগিয়ে গেলাম।

পথ এত খাড়া যে, উঠতে প্রচুর কষ্ট হচ্ছিল; কিন্তু দু'-তিনটে চড়াই ওঠার পরই বুঝলাম, এ এক অপূর্ব সুন্দর রাজ্যে এসে পৌঁছেছি। খরস্রোতা পাহাড়ী নদীকে ডানপাশে রেখে এসেছি। এখন আর সেটার চিহ্নই নেই, ধূসর রঙের রুক্ষ যে পাহাড়ের শ্রেণী এতক্ষণ চোখ দুটোকে ক্লান্ত করে তুলেছিল, কোন্ যাদুবলে সেগুলি যেন চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে! তার বদলে কচি ফসলে ভরা চোখ জুড়ানো সবুজ রঙের মাঠের সারি স্তরে স্তরে সাজানো। একটা চড়াই পার হয়ে পিছন ফিরে দেখছি যেন সবুজ রঙের গালিচা নদীর ঢেউয়ের মতো নীচে নেমে গেছে। নীল ফ্রেমে বাঁধানো দক্ষ শিল্পীর হাতে আঁকা এক-একটা ছবির মতো মনে হচ্ছিল। মাঠে যারা কাজ করছিল, তাদের মধ্যে পুরুষের চেয়ে মেয়েদের সংখ্যাই বেশী। ক্ষেতে তখন গম হয়েছে, পাকা গমের শিষে গাছগুলো পরিপূর্ণ। বাংলা দেশের মানুষ আমরা, গম পাকলে যে এত গাঢ় লাল দেখায়, তা ধারণা ছিল না। মাঝে মাঝে দু'-এক টুকরো জমিতে নানারকমের ডালের চাষও করেছে দেখলাম, তাতে হলুদ ও নীল রঙের ফুলের সমারোহ। রামপুর থেকে এই দেড় মাইল পথের চড়াইগুলো, অস্বাভাবিক রকমের খাড়া, একাধিকবার বিশ্রাম না নিলে হাঁটা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু প্রকৃতির উজাড় হাতে ঢেলে দেওয়া চোখজুড়ানো সৌন্দর্য দেখতে দেখতে এ কষ্ট তত অসহ্য মনে হয় না।

মাইল দেড়েক হাঁটার পর এসে পৌঁছলাম একটা মন্দিরের কাছে—শাকম্ভরী দেবীর মন্দির। দু'টি পাহাড়ের মধ্যবর্তী কিছুটা সমতল ভূমির ওপর মন্দিরটি অবস্থিত। দুর্গা বা চণ্ডীর অপর নাম শাকম্ভরী দেবী। শোনা যায়, পাণ্ডবরা স্বর্গারোহণের পথে এখানে এসে বস্ত্র দিয়ে দেবীর পূজা করেছিলেন, সেই রীতি অনুসারে বস্ত্র দিয়েই দেবীর পূজা হয় এখনো; পূজার বস্ত্রখণ্ড অবশ্য এখানেই কিনতে পাওয়া যায়। মন্দির-সংলগ্ন দোকানে চা ইত্যাদি খেয়ে আমরা আবার যাত্রা করলাম।

ত্রিযুগীনারায়ণের মন্দির এখনো দেড় মাইল পথ, এখান থেকে মন্দির পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায়। এরপর থেকে কিন্তু পথের চেহারা বদলে গেছে, রাস্তা আর অত খাড়া নয়, শস্যক্ষেত্রও আর চোখে পড়ে না, তার বদলে বিভিন্ন ফুলের বিচিত্র সমারোহ; কত রঙের কত আকারের ফুল যে ফুটে রয়েছে, তার আর ইয়ত্তা নেই। গাছগুলো কোথাও ঘন হয়ে সূর্যালোক আসার পথ বন্ধ করে দিয়েছে, কোথাও বা ফুল ও পাতার ফাঁক দিয়ে একমুঠো নরম রৌদ্র এসে পড়েছে সবুজ ঘাসের ওপর, রাস্তার দু'পাশে ছোট-বড় নানা পাহাড়ী গাছ, ফলে সারা পথটা একটা বীথির মতো মনে হয়। স্থানটির উচ্চতা প্রায় সাত হাজার ফিটের মতো, তাই রৌদ্রটা অদ্ভুত মিষ্টি ও মোলায়েম মনে হচ্ছিল।

ফুলে ঢাকা রৌদ্রের জাফরী দেওয়া সেই অপরূপ বনবীথির মধ্য দিয়ে যেতে যেতে বোধ হয় নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম। শেষ বাঁকটা ঘুরে সামনে তাকাতেই যে দৃশ্য চোখে পড়ল, কী বলে তার বর্ণনা দেব? গাঢ় নীল আকাশের পটভূমিতে মাথা তুলে রয়েছে শুভ্র

ধ্যানগম্ভীর কেদার পাহাড়—অপূর্ব, অনির্বচনীয়। আগাগোড়া তার ধবধবে সাদা বরফে মোড়া, তার ওপর সূর্যকিরণ পড়ায় একটা অদ্ভুত জ্যোতিতে চারিদিক ভরে গিয়েছে। কেদার পাহাড়ের আশে পাশে তুষারাবৃত আরো কয়েকটি শৃঙ্গ চোখে পড়ে, কিন্তু কেদারের রাজকীয় মহিমার কাছে সব কিছুই যেন ম্লান। সেই স্বর্গীয় সৌন্দর্যের উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে আমরা এগিয়ে গেলাম সামনের দিকে।

বেলা দশটা নাগাত পৌঁছলাম ত্রিযুগীনারায়ণ; দূর থেকে মন্দির খুব চিত্তাকর্ষক মনে হ'ল না—পাথরের মন্দির, ৪০ থেকে ৫০ ফুট উঁচু; চতুষ্কোণ ছাদের ওপর চূড়া দূর থেকেই দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের পাণ্ডা ধর্মশালার দোতলায় একটা বেশ বড় ঘরে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন, ঠিক তার নীচেই দোকান, সেখানে পুরী, তরকারী ও হালুয়া পাওয়া যায়। আসল মন্দিরে যেতে হলে কয়েকটা সিঁড়ি ভেঙ্গে নামতে হয়; মন্দিরে প্রবেশের মুখে একটি ছোট্ট শিবমন্দির, সেটির গায়ে সুন্দর অলংকরণ। মূল মন্দিরে নারায়ণের মূর্তি, তাঁর দু'পাশে লক্ষ্মী ও সরস্বতী। হিন্দুদের কাছে ত্রিযুগীনারায়ণ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ মহাপুণ্যক্ষেত্র। পুরাণের কাহিনী অনুযায়ী, শিব ও পার্বতীর এইখানেই বিবাহ হয়েছিল, স্বয়ং নারায়ণ ছিলেন সেই বিবাহের পুরোহিত। মন্দিরের অভ্যন্তরে একটি চারকোণা যজ্ঞকুণ্ডে ধুনি জ্বলছে। শোনা যায়, শিব-পার্বতীর-বিবাহ উপলক্ষ্যেই এই ধুনি জ্বালানো হয়েছিল এবং সত্যযুগ থেকে আজ পর্যন্ত এই ধুনি একবারও নাকি নেভেনি, তিন যুগ থেকে এটি জ্বলছে বলেই স্থানটির নাম বোধ হয় ত্রিযুগীনারায়ণ। প্রতিবছর কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষে নীচে নেমে যাবার সময় পুরোহিতরা এই কুণ্ডে পর্যাপ্ত পরিমাণে কাঠ দিয়ে যান; ছয় মাস পরে মন্দির খোলার সময় দেখা যায়, কুণ্ড তখনো যথারীতি জ্বলছে। মন্দিরের কিছু ওপরে সরস্বতী ও গঙ্গার ধারা। এখানে কুণ্ড আছে মোট চারটি; নিয়ম অনুযায়ী রুদ্রকুণ্ডে স্নান, বিষ্ণুকুণ্ডে আচমন, ব্রহ্মকুণ্ডে মার্জন ও সরস্বতীকুণ্ডে তিল ইত্যাদি দিয়ে তর্পণ করতে হয়। আমাদের মধ্যে অনেকেই পুজো দিলেন।

দুপুরের খাওয়া সেরে একটু বিশ্রাম নেবার পর যখন আমরা সেখান থেকে বেরোলাম, তখন সূর্যদেব মেঘের আড়ালে পর্বতশ্রেণীর পাশে ঢাকা পড়েছেন।

আপন জন

শ্রীঅটলচন্দ্র দাশ

কত দিন কত রূপে কত ভাবে এসেছো
আড়ালে দাঁড়ায়ে থেকে ভালবেসে চলেছো
হে দয়াল, হে ঠাকুর
করুণায় ভরপুর!
চাহিয়া দেখি না তাই লুকাইতে পেরেছো।

যেদিন হইতে পেনু ও-চরণে ভরসা,
চোখে নামিলেও ঘন আবরণ, তমসা,
কোথা দিয়ে কী যে ধ'রে
তব দ্বারে এনু ফিরে!—
আঁধারও দিয়েছ তুমি, হাত-ও ধরে রয়েছো!

আবেদন

রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য

গত জুলাই মাস হইতে পশ্চিমবঙ্গের বন্যাপীড়িত হুগলী ও মেদিনীপুর জেলায় রামকৃষ্ণ মিশন ত্রাণ-কার্য চালাইয়া যাইতেছেন। হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার দুই নম্বর ব্লকের আটটি 'অঞ্চল' ও এক নম্বর ব্লকের দুইটি 'অঞ্চলে' গড়েরঘাট-জগৎপুরস্থ প্রধান সেবা-কেন্দ্র হইতে ত্রাণ-কার্য পরিচালনা করা হইতেছে। মেদিনীপুর জেলার সবং থানার ৫, ৬ এবং ৭নং 'অঞ্চলে' ও ভগবানপুর থানার দুইটি 'অঞ্চলে' সেবাকার্য রাজকুল সেবা-কেন্দ্র হইতে, এবং নন্দীগ্রাম থানার দুইটি 'অঞ্চলে' সেবাকার্য চণ্ডীপুর সেবাকেন্দ্র হইতে পরিচালিত হইতেছে। মিশনের বাকচা রিলিফ কেন্দ্র হইতে স্থানীয় বিবেকানন্দ জনসেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে ময়না থানার আটনম্বর 'অঞ্চলে' সাহায্য দেওয়া হইতেছে। বন্যাপ্লাবিত এই সব এলাকার অধিকাংশ স্থানেই নৌকা ছাড়া যাতায়াত প্রায় অসম্ভব, অথচ নৌকাও সহজপ্রাপ্য নহে; ফলে নৌকার অভাবে বহু স্থানে সেবকদের একগলা জলের ভিতর দিয়া হাঁটিয়া সাহায্য পৌঁছাইয়া দিতে হইতেছে।

আসামের কাছাড় জেলার বন্যাক্লিষ্ট হাইলাকান্দি মহকুমা ও কামরূপ জেলার বারমাতে এবং গুজরাটের সুরাট ও ভাবনগরের বন্যা-বিধ্বস্ত বিস্তীর্ণ এলাকাতেও মিশন ত্রাণকার্যে হাত দিয়াছেন। এ ছাড়াও উড়িষ্যার খরা-প্রপীড়িত ঢেনকানল জেলায় গত জুন মাস হইতে রামকৃষ্ণ মিশনের ত্রাণকার্য চলিতেছে।

এই বিস্তীর্ণ এলাকায় সেবাকার্যে বিপুল অর্থ ও লোকবলের প্রয়োজন। সহৃদয় দেশবাসীর কাছে অকুণ্ঠ আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্যের জন্য রামকৃষ্ণ মিশন আবেদন জানাইতেছেন। প্রেরিত অর্থ আমাদের নিম্নলিখিত কেন্দ্রগুলিতে কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে। 'চেক' "রামকৃষ্ণ মিশন" (Ramakrishna Mission) এই নামে লিখিবেন। উপরে উল্লিখিত এলাকাগুলির কোন্‌টির জন্য সাহায্য প্রেরিত হইল, তাহাও স্পষ্টভাবে জানাইবেন।

সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা:

১) রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা হাওড়া
২) রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌ষ্টিটিউট অব কাল্‌চার, গোল পার্ক, কলিকাতা ২৯
৩) উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩
৪) অদ্বৈত আশ্রম, ৫ ডিহি এণ্টালী রোড, কলিকাতা ১৪
৫) রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ কামারপুকুর, জেলা হুগলী
৬) রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পোঃ মেদিনীপুর
৭) রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম পোঃ তমলুক, জেলা মেদিনীপুর
৮) রামকৃষ্ণ মিশন, খার, বোম্বাই ৫২
৯) রামকৃষ্ণ আশ্রম, পোঃ রাজকোট, গুজরাট
১০) রামকৃষ্ণ মিশন, ভুবনেশ্বর ২, উড়িষ্যা
১১) রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পুরী, উড়িষ্যা

বেলুড় মঠ, হাওড়া
১০. ৯. ১৯৬৮

স্বামী গম্ভীরানন্দ
সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন

সমালোচনা

শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা: শ্রীউপেন্দ্রকুমার দাস। প্রকাশক—রণজিৎ রায়, সম্পাদক, গবেষণা-গ্রন্থ প্রকাশন সমিতি, বিশ্বভারতী। প্রাপ্তিস্থান: বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭। পৃষ্ঠা—১০৬৬+২১৬ (প্রথম খণ্ড—৪০+২৪+৬০৪; দ্বিতীয় খণ্ড—৪৬২+৮২)। মূল্য পঞ্চাশ টাকা।

গ্রন্থটিতে উনিশটি অধ্যায়—প্রথম খণ্ডে ১ম হইতে ১২শ, দ্বিতীয় খণ্ডে ১৩শ হইতে ১৯শ অধ্যায়; প্রথমদিকে প্রধানত: তন্ত্রসাধনার ইতিহাস ও দার্শনিক তত্ত্বই আলোচিত; পরবর্তী অংশে সাধনাদির ও তন্ত্রশাস্ত্রের বিস্তৃত বিবরণ।

দূর, অতিদূর অতীত হইতেই ভারতের জীবনের প্রতি শ্বাসপ্রশ্বাসের সহিত ধর্ম বিজড়িত। জীবন ও বিশ্বের পিছনে সত্য কী রহিয়াছে তাহা জানিবার জন্য যুগ যুগ ধরিয়া সাধনার পর ভারতবর্ষ আবিষ্কার করিয়াছে যে, একটি নামরূপাতীত চিরবিদ্যমান আনন্দময় চেতন সত্তাই জীবন ও বিশ্বের চরম সত্য। এই সত্তা হইতেই সব কিছু সৃষ্ট হইয়াছে, ইহাকে অবলম্বন করিয়াই রহিয়াছে এবং বিনাশকালে ইহাতেই লীন হয়। এই সত্তাকেই বলা হয় ব্রহ্ম।

এ আবিষ্কার কয়েক সহস্র বৎসর পূর্বের। এই সত্যোপলব্ধির পর ভারত সচেষ্ট হইয়াছে—কি করিয়া সর্বসাধারণকে এই উপলব্ধিলাভের পথে অগ্রসর করানো যায়। এই চরম সত্য মনবুদ্ধির অতীত; মন অনেকখানি শুদ্ধ না হইলে, বুদ্ধি অনেকখানি মার্জিত না হইলে এ সত্য সম্বন্ধে ধারণা করাও সম্ভব নয়। তাই এই নির্গুণ নিরাকার সত্তাকেই সগুণ সাকার রূপে উপস্থাপিত করা হইতে লাগিল নানা ভাবে। ইন্দ্রবরুণাদি যে সব দেবগণকে পূর্বে বিভিন্ন বলিয়া ভাবা হইত, তাঁহারা সকলেই একই সত্তার বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র, ইহাও ঘোষিত হইল।

সাকার সগুণ ঈশ্বরকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার নির্গুণ নিরাকার স্বরূপে পৌছাইবার রাজপথ যখন প্রস্তুত হইতেছে, গ্রন্থকারের মতে, সম্ভবত: তখনই তন্ত্রের আবির্ভাব। তবে তন্ত্রের সাধনা খুবই গোপনীয় বলিয়া তন্ত্রকে গ্রন্থরূপে আমরা পাইয়াছি বহু পরে। বেদানুগ পুরাণাদি শাস্ত্র যেমন একদিকে এই রাজপথ প্রস্তুত করিয়াছে, তন্ত্র করিয়াছে অন্যদিকে। পথের পার্থক্য অনেক, কিন্তু লক্ষ্য একই অদ্বয় সত্যের উপলব্ধি লাভ। বেদানুগ শাস্ত্রে সাকার সগুণ ঈশ্বর নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মেরই মায়িক রূপ; তন্ত্রের জগজ্জননী মহাশক্তি মা-ও তাই—"নির্গুণং মায়য়া হীনং সগুণং মায়য়া যুতম্।"

ভারতীয় শক্তিসাধনার লেখক এই মূল তত্ত্বটিকে তন্ত্রের দার্শনিক অংশে তো বটেই, তাহার প্রতিটি সাধনার মধ্যেও অভ্রান্তভাবে স্বচ্ছদৃষ্টিতে দেখিয়া ইহারই ভিত্তির উপর আলোচনার সৌধ গাঁথিয়াছেন। কেবলমাত্র সর্ববিধ প্রামাণ্য তন্ত্রশাস্ত্র হইতে সংগ্রহ করিয়া শক্তিসাধনার দার্শনিক তথ্য এবং সাধনার সর্ববিধ অঙ্গের বিস্তৃত বিবরণ দিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্র হইতে, মানবজাতির

ইতিহাস হইতে, মুদ্রা শিলালেখ এবং বিবিধ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হইতেও তথ্য সংগ্রহ করিয়া তিনি মাতৃ-আরাধনার উৎস-সন্ধানে প্রাগৈতিহাসিক যুগ পর্যন্ত গমন করিয়াছেন, সেখান হইতে শুরু করিয়া বর্তমান সময় পর্যন্ত শক্তিসাধনা-সম্পর্কে তথ্য যেখানে যাহা পাইয়াছেন তাহা ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন অধ্যায়ে সাজাইয়া গ্রন্থটিতে সুবিন্যস্ত করিয়াছেন।

"শিশুর যখন প্রথম কথা ফোটে তখন সাধারণতঃ যে শব্দটি তার মুখ দিয়ে বেরোয় সে মা।···সেই জন্যই জগতের প্রায় সব ভাষাতেই জননীকে বলে মা, আম্মা বা মাম্মা।" মানুষের এই পরম নির্ভরস্থল পরম স্নেহময়ী 'মা'-রূপেই জগৎস্রষ্টা ঈশ্বরকে আরাধনা করিয়াছে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশের মানুষ। গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন, ঋগ্বেদের 'অম্বা' এবং তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের 'অম্বিকা' সমার্থক; এই অম্বিকাই বিশ্বজননী, আমাদের মা, প্রাচীন মিশরে 'মা' বা 'মাউত', গ্রীস ও রোমে 'মাইয়া', ফ্রান্স ও স্পেনে 'মায়ে', ইংলণ্ডে 'মা-য় রাণী' নামে অভিহিতা। "৫০০ খৃ: এ রকম সময় থেকে খৃষ্টধর্মেই মাইয়া দেবী মা-র্-ইয়া [Maria—Ma(r)ia] এই নামে গৃহীত হয়েছেন। ইনিই মেডোনা।"

বেদে যে-সব দেবীর নাম পাওয়া যায় তন্মধ্যে কতকগুলিকে মহাশক্তিরই বিভিন্ন রূপ বলিয়া তন্ত্রে দেখা যায়—রাত্রি, মেধা, নির্ঋতি, সরস্বতী, শ্রী, লক্ষ্মী প্রভৃতি। ঋগ্বেদে সরস্বতীকে রণদেবীরূপেও দেখা যায় (৭।৩০৮, ৬।৬১।৫-৬)। "এদিকে বাক্ ও সরস্বতী মহাদেবীর অন্যতম আদিরূপ। দুর্গা মহাদেবীরই রূপভেদ।" দুর্গা যে সিংহবাহিনী, বলা যায় তাহারও মূল শতপথ ব্রাহ্মণে আছে। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে 'দুর্গা' নামই রহিয়াছে। কেনোপনিষদে হৈমবতী উমার কথাও আছে। 'কালী' নাম ঋগ্বেদে নাই, কিন্তু গ্রন্থকারের মতে 'রাত্রিসূক্ত' মা-কালীকেই স্মরণ করাইয়া দেয়।

এরূপ বহু প্রমাণ সহায়ে তন্ত্র যে বেদমূলা, গ্রন্থকার তাহা দেখাইয়াছেন। কেবল শ্রৌত-সাহিত্যে নয়, শ্রুতি পরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্য হইতেও তিনি মহাদেবীর আরাধনার প্রচুর তথ্য আহরণ ও গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

গ্রন্থটির প্রথম ছয়টি অধ্যায়ে প্রধানতঃ এইসব বিষয়ই আলোচিত হইয়াছে।

৭ম ও ৮ম অধ্যায়ে শিবতত্ত্ব ও শৈবদর্শন আলোচিত। শিবতত্ত্বের সঙ্গে শক্তিতত্ত্ব অভিন্ন-রূপে জড়িত—"যিনি শিব তিনিই দেবী, দেবী যিনি তিনিই শিব। এই উভয়ের অভেদ বুদ্ধিতেই দেবীকে শিবা বলা হয়।" শিব ও শিবা—ব্রহ্ম ও তাঁর শক্তি। শক্তি ও শক্তিমান অভেদ।

৯ম—১১শ অধ্যায়ের প্রসঙ্গ 'শক্তিরহস্য', 'সাধনা ও শাক্তদর্শন' এবং 'সাধনা'। এখানেই লেখক তন্ত্র ও বেদ হইতে প্রচুর উদ্ধৃতিসহ ভারতের প্রাণবাণীকে মূর্ত করিয়া তুলিয়াছেন। অদ্বয় সচ্চিদানন্দই চরম সত্য—তাহাই বিশ্ব-জননীরও স্বরূপ, আমাদেরও স্বরূপ। এই স্বরূপ-উপলব্ধিই আমাদের জীবনের পরম প্রাপ্তি, চরম লক্ষ্য। বেদের মতো তন্ত্রও বলিতেছেন, এই উপলব্ধিলাভের জন্যই সর্বশক্তি নিয়োগ কর। চলার পথে যে যেখানেই আছ, সেখান হইতেই চলা শুরু কর—তোমার সামর্থ্যানুসারে জীবনকে লক্ষ্যাভিমুখী কর। সামর্থ্যের তারতম্য অনুসারে সাধক ও সাধনাকে তন্ত্র প্রধনতঃ তিনটি ভাগে ভাগ করিয়াছে—দিব্যভাব, বীর-ভাব ও পশুভাব। পশু অর্থে প্রাণী। কামনা-

বাসনায় অতি বিজড়িত মানুষ তুমি? অদ্বৈত-তত্ত্ব ধারণা করিতে পার না? বেশ তো, এই অদ্বয় তত্ত্বকেই দেবীরূপে দেখ, মূর্তি গড়িয়া তাঁহার পূজা কর, ইহা তো তুমি পারিবে; মদ্য-মাংসাদি যাহা কিছু ভোগ করিতে চাও, মাকে নিবেদন করিয়া গ্রহণ কর। আর মূর্তিতে তাঁহার পূজা করিলেও পূজার সময় চিন্তা করিও, তোমার অন্তরস্থ অরূপ সত্তাকেই, তোমার স্বরূপ-কেই বাহিরে মূর্তিতে আনিয়া পূজা করিতেছ; তোমাকে কল্যাণপথে লইয়া যাইবার জন্যই মা তোমার ধারণাগম্য রূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন—"সাধকানাং হিতার্থায় অরূপা রূপধারিণী।" এভাবে প্রতি কর্মে মাকে অবলম্বন করিয়া চলিতে চলিতে ক্রমে মনকে একাগ্র করার শক্তি তোমার আসিবে, ভোগবাসনা কমিয়া আসিবে; তখন বীরভাবের সাধনা করিও। বীরভাবের সাধনা অর্থাৎ পঞ্চমকার—যাহা ভোগ করিবার জন্য মানুষের লালসা সর্বাধিক, যাহা সর্বাধিক প্রলোভনের বস্তু—তাহাই লইয়া তাহাতে মনকে সম্পূর্ণ অস্পৃষ্ট রাখিয়া মাকে চিন্তা করিবে। কামনার বস্তু হইতে, অথবা ভয় হইতে দূরে পলাইয়া থাকিয়া নয়, বীরের মত তাহার সম্মুখীন হইয়া তাহাকে জয় করিবে। পঞ্চমকার লইয়া সাধনার বা শবসাধনার ইহাই মূল কথা। গ্রন্থকার ওসব সাধনার আলোচনাকালে এই মূল ভাবটিকে সর্বত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এসব সাধনায় অনধিকারীর পতনের ভয়ও যে সমূহ, তাহাও দেখাইয়াছেন। দিব্যভাবের সাধনা ইহারও পরে।

এই অধ্যায়গুলিতে শাক্তদের দর্শন এবং বিভিন্ন সাধনা বিশদরূপে আলোচিত। দশমহা-বিদ্যা প্রভৃতির ধ্যান, পূজাবিধি প্রভৃতি 'সাধনা' অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট।

ইহার পর ১৭শ অধ্যায় পর্যন্ত সবই সাধনসংক্রান্ত, দীক্ষা, জপ, পূজা, প্রতীক ও প্রতিমাদি বিষয়েরই আলোচনা।

১৮শ অধ্যায়ে 'যোগ', কুণ্ডলিনী-শক্তি, ষট্‌চক্র প্রভৃতি তত্ত্ব আলোচিত।

১৯শ অধ্যায়ে তন্ত্রশাস্ত্র আলোচিত। বেদের সঙ্গে তন্ত্রের যে ভাবগত ঐক্য রহিয়াছে, গ্রন্থকার এখানেও তাহা দেখাইয়াছেন। তন্ত্রের বিভাগাদি, বিভিন্ন যুগের ও প্রদেশের তন্ত্রসাধনা, তন্ত্রসাধনার বিকৃতি প্রভৃতি এই অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে।

মোট কথা, তন্ত্রসাধনা গোপন সাধনা বলিয়া সাধারণের, এমনকি বহু শিক্ষিত ব্যক্তিরও এই সাধনার বিষয়ে "শুধু জানা নেই নয়, অনেকেই ভুল জানেন।" সেজন্য তন্ত্রসাধনাকে গোপন ভোগের ব্যবস্থা বলিয়াই অনেকে মনে করেন। 'শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা' পড়িলে সে ভ্রম দূর হইবে। আধুনিক যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ নারীমাত্রে মাতৃভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এবং কারণপান একেবারে না করিয়াও তন্ত্রের সর্ববিধ সাধনা ও তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিয়া তন্ত্রসাধনার যে দিব্য রূপটি আমাদের চোখের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন, গ্রন্থটি পাঠ করিলে সেই দিব্য ভাবের আভাসই পাঠক পাইবেন।

তন্ত্রবিষয়ক এরূপ সামগ্রিক আলোচনার গ্রন্থ বাংলা ভাষায় আর নাই। বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডারে ইহা একটি উজ্জ্বল রত্ন। ইহার ঔজ্জ্বল্যের মূলে গ্রন্থকারের পাণ্ডিত্যের গভীরতা এবং দীর্ঘকালের অনলস শ্রম রহিয়াছে নিঃসন্দেহ, কিন্তু সর্বাধিক পরিমাণে রহিয়াছে তাঁহার দৃষ্টির স্বচ্ছতা।

গ্রন্থটির বহুল প্রচার একান্ত কাম্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য

ওড়িশায় খরাত্রাণকার্য—ওড়িশায় **ঢেনকানল জেলায়** হিন্দোল, রাসোল ও খাজুরিয়াকাঁটা সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে দুঃস্থ-সেবাকার্যে গত ২২শে জুলাই (১৯৬৮) হইতে ১৮ই আগস্ট পর্যন্ত রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক ৫,৬৭০ কেজি চাল ও ২১,৫৫২ কেজি গম ৪,৪১০ ব্যক্তির মধ্যে বিতরণ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ৮৮ জন দুঃস্থকে কিছু নূতন ও পুরাতন বস্ত্রাদি দেওয়া হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে বন্যার্তসেবাঃ (১) **হুগলী জেলায়** আরামবাগ মহকুমায় ২নং ব্লকে গড়েরঘাট গ্রামে প্রধান সেবাকেন্দ্র স্থাপন করিয়া উক্ত অঞ্চলে বিভিন্ন সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে মিশন কর্তৃক বন্যাপীড়িত জনগণের মধ্যে ২৩শে জুলাই হইতে ১০ই আগস্ট পর্যন্ত ১৯,৭০১ কেজি চাল বিতরিত হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের সংখ্যা—১০২৯১।

(২) **মেদিনীপুর জেলায়**—সবং থানায় সাবড়া, চৌলকুড়ি ও নারায়ণবাঁধ অঞ্চলে এবং নন্দীগ্রাম থানায় ৪নং অঞ্চলে গত ১৬ই আগস্ট হইতে ২২শে আগস্ট পর্যন্ত মিশন কর্তৃক বন্যাপীড়িত জনগণকে ৫৭৫ কুইণ্টাল ৪১ কেজি খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করা হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত বন্যাপীড়িতদের সংখ্যা —১৮,৭২৪। মেদিনীপুর জেলায় ভগবানপুর ও ময়না থানা অঞ্চলে বন্যার্তসেবাকার্য চালানো হইতেছে। যোগাযোগের অসুবিধার দরুন এখনও সেবাকার্যের বিবরণী হস্তগত হয় নাই।

আসামে বন্যার্তসেবা—আসামের **কাছাড় জেলায়** হাইলাকান্দি মহকুমায় গত ১লা জুলাই হইতে ৬ই আগস্ট পর্যন্ত মিশন কর্তৃক ৯৭২ জন বন্যাপীড়িতকে ১০০ কেজি চাল ও ১,৮৭৫ কেজি গম দেওয়া হইয়াছে। ১৭টি পরিবারকে বীজধান ও গৃহনির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দিয়া সাহায্য করা হইয়াছে।

গুজরাটে বন্যার্তসেবা—**সুরাট** ও **ভাবনগর** অঞ্চলে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক সম্প্রতি বন্যার্তসেবাকার্য আরম্ভ করা হইয়াছে।

কার্যবিবরণী

পাটনা: রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের (পাটনা-৪) এপ্রিল ১৯৬৭ হইতে মার্চ ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দে আশ্রমটি রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্ত হয়। আশ্রমটির ৪৬তম বর্ষ পূর্ণ হইয়াছে। এই কেন্দ্রের কার্যাবলী প্রধানতঃ ত্রিধারায় পরিচালিত: শিক্ষা ও সংস্কৃতি, চিকিৎসা, ধর্ম।

আলোচ্য বর্ষে আশ্রমের ছাত্রবাসে (কেবল মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য) ১৯ জন বিদ্যার্থী ছিল, তন্মধ্যে ১৩ জন বিনা-খরচে এবং ৩ জন আংশিক খরচে থাকিবার সুযোগ লাভ করে। আশ্রম ছাত্রাবাসের ১৫ জন বিদ্যার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষা দিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে ১৩ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে।

স্বামী তুরীয়ানন্দ গ্রন্থাগার ও অবৈতনিক পাঠাগার পরিচালিত হইতেছে। গ্রন্থাগারের পুস্তকসংখ্যা ৮,০৭২; আলোচ্য বর্ষে ২০৬ খানি নূতন পুস্তক সংযোজিত হইয়াছে। পাঠাগারে ১০টি দৈনিক ও ৭০টি সাময়িক পত্রিকা লওয়া হয়। আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগার হইতে পঠনার্থে প্রদত্ত পুস্তকসংখ্যা ১৫,১৯০;

গড়ে পাঠকগণের দৈনিক উপস্থিতি ৬৩।

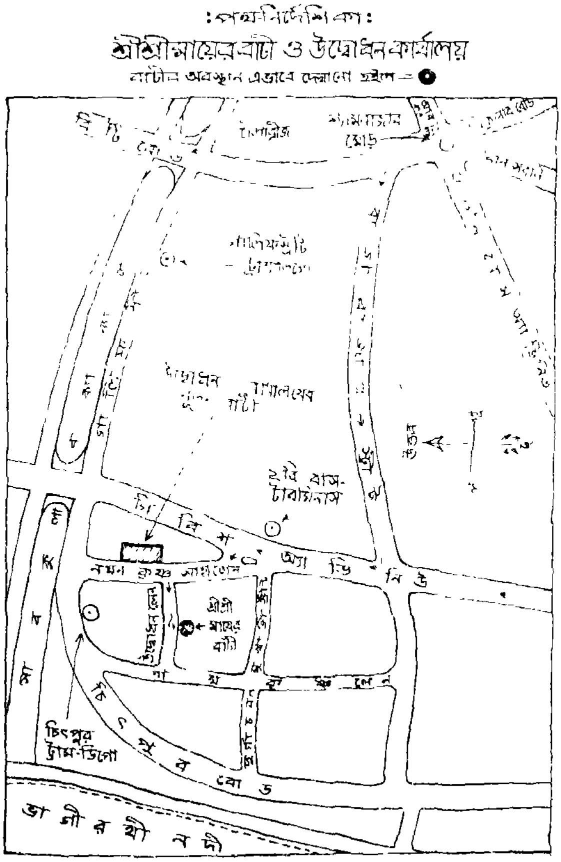
আলোচ্য বর্ষে নানাস্থানে ও আশ্রমে ধর্মালোচনার জন্য মোট ২১৬টি ক্লাস অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা, শ্রীশ্রীকালীপূজা ও শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজা এবং ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

আশ্রম কর্তৃক হোমিওপ্যাথিক ও অ্যালোপ্যাথিক উভয়বিধ চিকিৎসা-ব্যবস্থাই করা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়ে ৭৩,০০০ (নূতন ৭,৯৩২) জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে।

অ্যালোপ্যাথিক বিভাগে চিকিৎসিতের সংখ্যা ৯১,৩৪৩ ; তন্মধ্যে নূতন রোগী ১১,৭৯৬।

বিগত দুই বৎসর বিহারে অনাবৃষ্টিজনিত দুর্ভিক্ষে পাটনা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম দুঃস্থ-সেবাকার্যে উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। ২১.১২.৬৬ হইতে ৩১.১০.৬৭ পর্যন্ত সেবাকার্য সুষ্ঠুভাবে চালানো হইয়াছিল। গত বৎসর পাটনায় বন্যার্তত্রাণ-কার্যও উল্লেখযোগ্য।

উদ্বোধন কার্যালয়ের নূতন বাটী



১ উদ্বোধন লেনস্থ শ্রীশ্রীমায়ের বাটী ও উদ্বোধন কার্যালয়ের বর্তমান ভবনটির সন্নিকটে উদ্বোধন কার্যালয়ের নূতন বাটীর জন্য যে জমি ক্রয় করা হইয়াছিল, তাহার উপর বাটীর নির্মাণ-কার্য আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। ইতোমধ্যে বাটীর ভিত্তি ও ষ্টীল ফ্রেম নির্মিত (চারতলা পর্যন্ত) হইয়া গিয়াছে।

উদ্বোধন কার্যালয়ের বর্তমান ভবন (শ্রীশ্রীমায়ের বাটী) ও পরিকল্পিত নূতন বাটীর অবস্থান পার্শ্বে দেখানো হইল।

চিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দ
(পঞ্চসপ্ততিতম স্মৃতি-বার্ষিকী)

চিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক বক্তৃতার ৭৫তম বর্ষপূর্তি স্মরণে অদ্বৈত আশ্রম (৫ ডিহি এণ্টালী রোড, কলিকাতা) কর্তৃক কলিকাতায় রাজ্য-সরকারের তথ্যকেন্দ্রে (১।১ লোয়ার সারকুলার রোড) একটি আলোচনাসভা এবং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ও বেদান্ত সাহিত্যের একটি প্রদর্শনী আয়োজিত হয়। প্রদর্শনীটি ২০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত খোলা থাকিবে।

বিকাল ৬টার সময় সভা আরম্ভ হয়। মঙ্গলাচরণের পর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী গম্ভীরানন্দজী সকলকে সাদর সম্ভাষণ জানান। পরে রাজ্যপাল ধর্মবীর অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী ভাষণ দেন। তারপর অধ্যক্ষ অমিয়কুমার মজুমদার এবং সভাপতি ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের ভাষণান্তে অদ্বৈত আশ্রমের স্বামী স্মরণানন্দ সকলকে ধন্যবাদ জানাইলে সভার কার্য শেষ হয়। সভান্তে রাজ্যপাল ধর্মবীর প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন।

স্বামী গম্ভীরানন্দ তাঁহার স্বাগতভাষণে বলেন: আজ থেকে ঠিক ৭৫ বৎসর পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ অতীত ও বর্তমান ভাবধারার মিলন ঘটাইয়াছিলেন—বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি-সম্পন্ন, বিজ্ঞানের উন্নতিতে সমৃদ্ধ জড়বাদী পাশ্চাত্যের সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রাচীন ভারতের ভাবধারা পরিবেশন করিয়াছিলেন। ভারতীয় সংস্কৃতি ও আদর্শের বিজয়ের দিন সেটি। ভারতীয় জাতির গৌরবময় অতীত ও ভবিষ্যৎকে তিনি সুস্পষ্টরূপে চিত্রিত করিয়া আমাদের চোখের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন।

পৃথিবীর সব মানুষকে একসূত্রে বাঁধিতে চাহিয়াছিলেন তিনি। তাঁহার ভাবধারা সাহিত্যের মাধ্যমে স্বাভাবিকভাবেই জগতের সর্বত্র অনুপ্রবিষ্ট হইয়া চলিয়াছে। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় তাঁহার বাণী অনূদিত হইয়াছে। সংস্কৃতি ও ধর্মের ভিত্তিতে এক-পৃথিবী গঠনের প্রচেষ্টায় তাঁহার অবদান অনস্বীকার্য। কারণ তাঁহার বাণীর মধ্যে সকল জাতির পক্ষেই গ্রহণীয় মূল্যবান এবং স্থায়ী ভাবরাশি রহিয়া গিয়াছে।

প্রধান অতিথি রাজ্যপাল ধর্মবীর অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী ভাষণে বলেন: ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর চিকাগো ধর্মমহাসভায় বয়সে তরুণ, অথচ অতি প্রাচীন এক ধর্মের প্রতিনিধি স্বামী বিবেকানন্দ যে ভাষায় বক্তৃতা করেন, পৃথিবীর মানুষ সুদীর্ঘকাল সে ভাষা শোনে নাই। তাঁহার প্রথম সপ্রেম আহ্বানই শ্রোতৃ-মণ্ডলীকে আনন্দে বিহ্বল করে। তিনি বলিয়াছিলেন, "জগৎ চায় শান্তি ও সমন্বয়, বিভেদ ও ধ্বংস নহে।" স্বামীজীর ভাব—জীবন একটা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। তিনি বলিয়াছেন, তোমার জীবন মানবসেবায় উৎসর্গ কর; প্রথমে, যাঁহাদের দুঃখকষ্ট দূর করিতে চাও তাঁহাদের প্রয়োজন কি তাহা জানিয়া লও, পরে উহা মিটাইবার উপায় উদ্ভাবন কর, তার পর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া একাকী বা সঙ্ঘবদ্ধ-ভাবে মনেপ্রাণে সর্বক্ষণ তোমার সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া কাজে লাগ।

দুঃখের বিষয়, মানুষ প্রায়ই যাহা গড়ে, ভাঙে তদপেক্ষা অনেক বেশী। ভগবান জগৎ ও জীবন সৃষ্টি করিয়াছেন যাহাতে মানুষ নিজেকে ক্রম-উন্নত করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারে, পার্থিব জীবন হইতে দিব্য জীবনে, মৃত্যু হইতে অমৃতত্বে উন্নীত হইতে পারে। স্বামীজী এই উদ্দেশ্য-সাধনের পথই বিস্তৃততর করিয়াছেন, ইহা হইতেই শিক্ষা, চিন্তা, ত্যাগ ও সেবার মধ্য দিয়া কতকগুলি আদর্শ উদ্ভূত ও গৃহীত হইয়াছে।

ধ্বংসের পথ বহু আছে, কিন্তু গঠনের ও মানবজাতিকে বাঁচাইবার পথ একটিই—জলন্ত বিশ্বাস সহায়েই সে পথে চলা সম্ভব। মহত্ত্ব ও হীনতা, জ্ঞান ও অজ্ঞান, মিথ্যা ও সত্যের সমন্বয়েই মানুষ; বিশ্বাস ও অতন্দ্র প্রচেষ্টা সহায়ে মানুষ কিন্তু হীনতা, অজ্ঞান ও মিথ্যাকে পরিহার করিতে পারে। যে সাধনার ফলে ইহা করা যায়, তাহাকেই ধর্ম বলে। এ ধর্মের নাম যে যাহাই দিক না কেন, মূলতঃ ইহা একই। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, 'ঈশ্বরের বহু নাম, তাঁহাকে পাইবার পথও বহু। যে নামে যে রূপে তাঁহাকে চিন্তা করিবে, সেই নামে সেই রূপেই তিনি দেখা দিবেন।'

অনুদার ধর্ম হইল ঘৃণা সহানুভূতিহীনতা ও বিভেদের আলয়। প্রাণবন্ত ধর্ম, যথার্থ ধর্ম সর্বমানবের সাধারণ উদ্দেশ্য ও উন্নতির আদর্শে বিশ্বাসী। এরূপ ধর্মই বিশ্বজনীন ধর্ম, এরূপ ধর্মই মানুষকে পরস্পরের বুকের কাছে টানিয়া আনে, মানুষকে ভগবানের কাছে পৌঁছাইয়া দেয়।

মানুষ কি আছে তাহাতে নহে, মানুষ কি হইতে পারে তাহাতেই তাহার মহত্ত্ব। তাই আমাদের জীবনের সর্বোচ্চ আদর্শ হইল ভগবানলাভ। যে নিঃস্বার্থভাবে অনাসক্ত হইয়া অপরের সেবা করে, তাহার জীবনাদর্শ একত্বানুভূতিকেই স্পর্শ করে। ইহার সফলতায় সে বহুর মধ্যে একত্ব প্রত্যক্ষ করে, অমৃতত্ব লাভ করে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই অমৃতত্বলাভের, ভগবান লাভের উপায়রূপে অনাসক্ত হইয়া কর্ম করিতে বলিয়াছেন, 'সংসারে থাকিতে দোষ নেই, তবে সংসার যেন তোমার ভিতরে না ঢোকে।'

বেদান্ত কোন মানুষের জীবনানুভূতিকেই উপেক্ষা করে না। শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্তের বাণীকে বিজ্ঞান- ও শিল্প-সর্বস্ব, মানসিক দ্বন্দ্ব সমাকুল, সংঘর্ষ- ও ধ্বংস-উন্মুখ আধুনিক যুগের উপযোগী করিয়াই উপস্থাপিত করিয়াছেন। তাহা ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয়েরই কল্যাণকারী। তাই গত শতাব্দ ধরিয়া প্রচারিত এই বাস্তবতা ভিত্তিক ভাবধারার জন্য রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিকট জগৎ কৃতজ্ঞ ও ঋণী।

এখন, শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের বাণী-সম্বলিত গ্রন্থসঞ্চয় পরিদর্শনের প্রাক্কালে, একথা যেন আমরা স্মরণ করি—"ভাল হও এবং ভাল কর।"

অধ্যক্ষ অমিয় কুমার মজুমদার বলেন: ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের ভাষণদান একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা, ফরাসী বিপ্লব যতখানি গুরুত্বপূর্ণ, ততখানিই। ইতিহাসে দেখি, যখন তিনি পাশ্চাত্যে হিন্দু-ধর্মের কথা, মানবধর্মের কথা প্রচার করিতেছেন, তখন ইউরোপে চলিতেছে শিল্পবিপ্লবের ভূমিকা, সমাজবাদের চিন্তা কার্ল মার্কসের পুস্তকের মাধ্যমে ছড়াইতেছে,—বলা যায় ডগ্‌ম্যাটিক থিওলজীর মৃত্যু ঘটিতেছে, ভারতেও রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু হইয়াছে। বিশ্বের এই পরিস্থিতিতে তিনি মানবজাতিকে সম্মুখে অগ্রসর হইবার পথ দেখাইয়াছেন। আজ দেখি, তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী যুগকে অতিক্রম করিয়াই ঘোষিত।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার সভাপতির ভাষণে বলেন: স্বামী বিবেকানন্দ অজ্ঞাত অখ্যাত অবস্থায় ধর্মমহাসভায় যোগ দিয়াছিলেন। তবু সেখানে সমধিক খ্যাতি-লাভ করিয়াছিলেন তিনিই। চিকাগোর তৎকালীন পত্রিকাগুলি সে সাক্ষ্য বহন করিতেছে, ঘোষণা করিতেছে, তিনিই ধর্ম-মহাসভায় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, শ্রেষ্ঠ বক্তা। হিন্দুধর্ম ও ভারতীয় সভ্যতাকে পাশ্চাত্য জগতে তিনিই সম্মানের আসনে বসাইয়াছেন।

পাশ্চাত্যে তাঁহার প্রচারের ফলে ভারতীয় জাতির আত্মবিশ্বাস জাগিয়া উঠে। সেসময় জাতি একতাবদ্ধও ছিল না। স্বামী বিবেকানন্দই ভারতীয় জাতির স্রষ্টা। প্রাদেশিকতার গণ্ডীতে আবদ্ধ ও খণ্ডিত ভারতকে তিনিই ধর্মসূত্র দিয়া একত্রবদ্ধ, সংহত করিয়াছিলেন; তিনি বলিয়াও গিয়াছেন, ধর্মের বন্ধনেই আমাদের জাতিকে একত্রবদ্ধ করিতে হইবে। মিঃ প্রধান (মারাঠী) তাই বলিয়াছেন, বিবেকানন্দকেই ভারতীয় জাতির জনক বলা উচিত।

সভাগৃহ ও বিভিন্ন ভাষার এক হাজার পুস্তক সম্বলিত প্রদর্শনীগৃহ অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত করা হইয়াছিল।

বিবিধ সংবাদ

ইউরোপে প্রথম সংস্কৃত অনুবাদ

আব্রাহাম রগারিয়াস নামের একজন ১৬৫১ খৃষ্টাব্দে একখানি বই লেখেন এবং তখন কার কালের নিয়ম অনুসারে তার বই-এর নাম ছিলো বিশাল লম্বা। রগারিয়াস কারামণ্ডাল উপকূলে ১৬৩০ থেকে ১৬৪৭ খৃঃ পর্যন্ত প্রটেস্টান্ট যাজক ছিলেন এবং সেই সময় তিনি ভারতীয় ধর্ম এবং কৃষ্টির সঙ্গে পরিচিত হন। রগারিয়াস তাঁহার এই বই-এর সঙ্গে ভর্তৃহরির দুটি শতকের অনুবাদও সংযুক্ত করেন—বৈরাগ্যশতক এবং নীতিশতক। তাহার ফলে তিনি ইউরোপে মূল সংস্কৃতের প্রথম অনুবাদের প্রকাশক হন। রগরিয়াসের সংস্কৃত-জ্ঞান বিশেষ ছিল না বলিয়া সন্দেহ হয়; তাঁহার অনুবাদ আক্ষরিক হয় নাই। রগরিয়াসই প্রথম ইউরোপীয় এবং ওলন্দাজ, যিনি সংস্কৃত সাহিত্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। (প্রেস রিলীজ, রয়্যাল নেদারল্যাণ্ড এমব্যাসি)

বন্যার্তসেবা

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যুব সঙ্ঘ: গত ২৫শে আগস্ট অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডলের শাখা বাগবাজারস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যুব সঙ্ঘ হাওড়া জেলার অন্তর্গত পাচলা থানার গাববেড়িয়া, মেলো, উলু ও ধুনকি প্রভৃতি গ্রামে বন্যাবিধ্বস্ত অধিবাসীদের মধ্যে গম ও আটা, পাউরুটি, হাতেগড়া রুটি, ছোলা, বেবীফুড, রান্না-তরকারি, গুড় ও ১৫০০টি জামাকাপড় বিতরণ করিয়াছেন। এইদিন চারজন ডাক্তারসহ একটি মেডিক্যাল ইউনিট তাঁহাদের সঙ্গে যাইয়া ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও ঔষধাদির বিতরণ করেন। ইহা ছাড়া এই সঙ্ঘ মেদিনীপুরের বন্যার্তদের জন্য ১৬০ কেজি আটা, ৩৫ কেজি ছোলা, ১০ কেজি বেবীফুড, ৩৫০ খানি জামা-কাপড় এবং নগদ ৫০৲ টাকা পাঠাইয়া দিয়াছেন।

উদ্বোধন

দিব্য বাণী

প্রসূতে সংসারং জননি ভবতী পালয়তি চ
সমস্তং ক্ষিত্যাদি প্রলয়সময়ে সংহরতি চ।
অতস্ত্বং ধাতাঽসি ত্রিভুবনপতিঃ শ্রীপতিরহো
মহেশোঽপি প্রায়ঃ সকলমপি কিং স্তৌমি ভবতীম্॥১২

—দক্ষিণকালিকাস্তোত্রম্—মহাকাল

বিশ্ব সৃজিয়াছ, পালিছ স্নেহভরে,
প্রলয়-সমাগমে হাসিয়া
(নিখিল চরাচর যা দিয়ে গড়া সেই)
পঞ্চভূতাদিরে নাশিয়া
তুমিই বিশ্বের বিনাশ সাধিতেছ,
ত্রিলোক-জননি !—
বিশ্বপালনের সৃষ্টিবিনাশের
সাধনকারী যাঁরা দেবতা
তোমারই রূপ তাঁরা—তুমিই হরি, হর,
তুমিই প্রজাপতি বিধাতা !
হয়েছ সব তুমি ! তোমারে কোন্ স্তবে
তুষিব ভবানি !

ধরিত্রী কীলালং শুচিরপি সমীরোঽপি গগনং
ত্বমেকা কল্যাণী গিরিশরমণী কালি সকলম্।
স্তুতিঃ কা তে মাতর্নিজকরুণয়া মামগতিকং
প্রসন্না ত্বং ভূয়া ভবমনু ন ভূয়ান্মম জনুঃ ॥১৪

তুমিই ক্ষিতি তেজ সলিল বায়ু ব্যোম,
কল্যাণ-বিধায়িনী কালিকে !
গিরিশজায়া ! তুমি অদ্বিতীয়া তবু,
বিশ্ব চরাচর-ব্যাপিকে,
জগতে সব কিছু হইয়া বিরাজিছ,
বিশ্ব রূপিণি !
তোমার স্তুতিগান কী হতে পারে মা !
আপন করুণায় সদয়ে,
তুষ্টা হয়ে তুমি আমারে অগতিরে
কর মা বরদান, অভয়ে !
এই জনম শেষে আর না হয় যেন
জন্ম, তারিণি !—
এবারে চিরতরে মুক্ত ক'রে দিও,
মুক্তি-দায়িনি !

কথাপ্রসঙ্গে

'উদ্বোধন'-এর পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, গ্রাহক-গ্রাহিকা, বিজ্ঞাপনদাতা এবং শুভানুধ্যায়ী ও অনুরাগী সকলকেই আমরা ৺বিজয়ার শুভেচ্ছা ও প্রীতিসম্ভাষণ জানাইতেছি।

কয়েক দিন আমরা মহাশক্তির আরাধনায় ব্যাপৃত ছিলাম; আমাদের দেশে, বিশেষ করিয়া বাংলাদেশে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা সবচেয়ে বড় উৎসব।

আমাদের স্বরূপকেই উপাসক ও উপাস্য উভয়ই জানিয়া তাঁহাকেই মহাশক্তি জগজ্জননীরূপে প্রতিমা বা প্রতীকে আনিয়া পূজা করিতে হয় এবং পূজান্তে আবার হৃদয়ে ফিরাইয়া আনিতে হয়, ইহাই তাঁহার পূজাবিধি। তিনি আমাদের অন্তরেই রহিয়াছেন; আমাদের জ্ঞান, ইচ্ছা, কর্মশক্তি সবই তিনি। তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি শুভবুদ্ধিরূপে, শক্তিরূপে তিনি আমাদের প্রত্যেকের ভিতর প্রকাশিত হউন, প্রতিটি মানুষই তাঁহার মন্দির—এ-বোধরূপে আমাদের অন্তরে জাগ্রত হইয়া সেখানে তাঁহার পূজায় আমাদের নিয়োজিত করুন। কেবল বৎসরান্তে তিনদিন প্রতিমায় পূজা করিয়াই তাঁহার পূজা শেষ হয় না—"পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার"—জীবনের প্রতিক্ষণে ব্যষ্টি-ও সমষ্টি-গত সর্ববিধ অশুভ বৃত্তি ও কর্মের সঙ্গে সংগ্রামও তাঁহার পূজা, যথার্থ পূজা। সে-পূজায় *তিনি যেন আমাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ করেন।* এ-পূজায় আমরা ব্রতী হইলে যে আসুরিক ভাব আজ ভারতবর্ষরূপী তাঁহার সনাতন পূজামন্দিরকে অপবিত্র করিতে ব্যাপকভাবে সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে, তাঁহার কৃপায় তাহার বিনাশসাধনে আমরা সক্ষম হইবই—বিশ্ববাসী এ-মন্দিরে প্রসাদপ্রার্থী হইয়া সমাগত হইবে—শক্তির জন্য, অন্নের জন্য, আদর্শের জন্য আমাদের কারো দ্বারে কৃপাপ্রার্থী হইয়া যাইতে হইবে না।

শক্তির এই আরাধনা আমরা ভুলিয়াছি বলিয়াই আজ বহুক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে দুর্বলতা ও হীনমন্যতা মাথা তুলিতেছে। মহাশক্তির নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের এ বিভ্রান্তি কাটাইয়া দেন।

'মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে'

জীবনকে তো সকলেই ভালবাসে, কাজেই মৃত্যুকে বাহুপাশে বাঁধিতে যাইবে কেন মানুষ? অতি সাধারণভাবে দেখিলে তাহাই মনে হয় বটে, এবং সেজন্য অধিকাংশ মানুষই মৃত্যুকে এড়াইয়া চলিতে চায় ঠিকই, কিন্তু সত্য তো কাহারো চাওয়া-না-চাওয়ার উপর নির্ভরশীল নয়। জন্ম যতখানি সত্য, জীবন যতখানি সত্য, মৃত্যুও জগতে ঠিক ততখানিই সত্য, রূঢ় বাস্তব।

তবু মানুষ, প্রত্যেক প্রাণীই চিরদিনই সংগ্রাম চালাইতেছে এই মৃত্যুর বিরুদ্ধে। ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু যে ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া আমরা সংগ্রামে নামি, সেই ভিত্তিই মরণশীল বলিয়া এভাবে জয়ী আমরা হইতে পারি না।

কোন কোন মানুষ মৃত্যুকে জয় করিবার প্রচেষ্টায় সংগ্রামের জন্য অবলম্বনভূমি পরিবর্তন করিয়াছেন, এমন একটি কিছু আঁকড়াইয়া মৃত্যুর বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন যা অবিনাশী। তাঁহারাই মৃত্যুকে জয় করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই হাসিমুখে মৃত্যুকে বাহুপাশে বাঁধিতে পারিয়াছেন।

জন্ম-জীবন-মৃত্যু লইয়া যিনি খেলা করিতেছেন সেই জগজ্জননীর স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন শুধু তাঁহারাই। জননীর এই ভাঙ্গাগড়াকে তাঁহারা খেলা বলিয়াই জানিয়াছেন, যে-খেলা আসলে আমাদের স্বরূপকে স্পর্শও করিতে পারে না।

আমরা দেহমনবুদ্ধিকে আঁকড়াইয়া মৃত্যুর সহিত লড়াই করিতে চাই। কিন্তু এগুলি সবই একদা জাত বলিয়া মরণশীল। এ সবই মায়ের খেলনা। আমাদের দেহ স্থূল উপাদানে—যাহা দিয়া জগতের মাটি জল বায়ু শক্তি প্রভৃতি গঠিত ঠিক সেই উপাদানেই—গঠিত বলিয়া এবং তাহা একদা সৃষ্ট বলিয়া জগতের অন্যান্য স্থূল পদার্থগুলির মতো তাহার পরিবর্তন ও বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। জগতে কোন সৃষ্ট বস্তুই অবিনাশী নয়। কাজেই 'আমি দেহ' এ বোধ লইয়া, 'আমার মৃত্যু' বলিতে দেহের মৃত্যুকে ভাবিয়া অগ্রসর হইলে মৃত্যুকে জয় করা কখনো সম্ভব হইতে পারে না। সত্যদ্রষ্টাগণের, মৃত্যুঞ্জয়ী মহামানবগণের প্রত্যক্ষ অনুযায়ী আমাদের মনবুদ্ধিও দেহের মতো সৃষ্ট পদার্থ, জাগতিক স্থূল বস্তুগুলি যেসব উপাদানে গঠিত সেইসব উপাদানেই গঠিত; অবশ্য ঠিক সেই স্থূল উপাদান দিয়া নহে, সেই স্থূল উপাদানগুলিও যে সূক্ষ্ম উপাদানের সমবায়, সেই সূক্ষ্ম উপাদান দিয়া। সেজন্য দেহের তুলনায় মনবুদ্ধি সূক্ষ্ম। আর সূক্ষ্ম বলিয়াই স্থূল দেহের মতো অত সহজে সেগুলি বিনষ্ট হয় না। ইহাও সৃষ্ট জগতের একটি নিয়ম—যে জিনিস যত স্থূল, তাহাকে তত সহজে ভাঙ্গা যায়; যাহা যত বেশী সূক্ষ্ম, তাহাকে ভাঙ্গা তত অধিক কঠিন। এক টুকরা বরফকে আমরা সহজে আঘাত দিয়াই গুঁড়া করিতে পারি; কিন্তু জলকে ভাঙ্গিয়া হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পরমাণু করা তার চেয়ে অনেক বেশী কঠিন কাজ। পরমাণুকে ভাঙ্গা আরো কঠিন। এসবেরও, শক্তিরও যা উপাদান (বাহ্য ইন্দ্রিয়ের অগোচর তন্মাত্রা) তাকে ভাঙ্গা স্বভাবতই খুবই কঠিন কাজ। মন-বুদ্ধি, প্রাণশক্তি প্রভৃতি আপাত-অবিনাশী বস্তু দিয়া গঠিত সূক্ষ্ম দেহে সীমিত 'আমি'-বোধকে, দেহীকে, জীবাত্মাকে স্থূল দেহের তুলনায় সেজন্য আপেক্ষিকভাবে অমর বলা হইয়াছে। ইহা একটি স্থূল দেহের বিনাশের পর আবার একটি গঠন করিয়া লয়—যেমন জীর্ণ বসন ত্যাগ করিয়া মানুষ নূতন বসন পরিধান করে। কিন্তু এই সূক্ষ্ম দেহও বিনষ্ট হয়; আমরা যেমন আসলে স্থূল দেহ নই, তেমনি সূক্ষ্ম দেহও নই। এইটি যখন প্রত্যক্ষ করা যায়, তখনই আমরা কালীর—জগজ্জননীর—স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিতে পারি; অন্য ভাষায় নিজেদেরই স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিতে পারি—আমরা যে সর্वविध দেহ হইতে আলাদা, অমর সত্তা তাহা অতি স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিতে পারি। সত্যদ্রষ্টাগণের মতে, ঠিক যেভাবে আমরা জামাকাপড় নই বলিয়া বা গাড়ীতে চলিবার সময় নিজেকে গাড়ী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক বলিয়া বা গৃহে বাস করিবার সময় গৃহ হইতে নিজেকে সম্পূর্ণ আলাদা বলিয়া নিঃসংশয়ে অনুভব করি, সেইরূপ নিঃসংশয়েই নিজেকে দেহ হইতে, মনবুদ্ধি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক বলিয়া অনুভব করা যায়। এরূপ করিতে পারিলে কেবল তখনই মৃত্যুকে বাহুপাশে বাঁধা যায়। স্থূল দেহ হইতে নিজেকে আলাদা প্রত্যক্ষ করিলেই মৃত্যুভয় বলিয়া, আমার মৃত্যু বলিয়া তখন আর কিছুই থাকে না সত্য, কিন্তু সূক্ষ্মদেহে 'আমি'-বোধ থাকার জন্য দেহের মাধ্যমে বিষয়ভোগের ইচ্ছা থাকিয়া যায় বলিয়া জীবনের প্রতি আকর্ষণ থাকে, মৃত্যুকে ভয় না করিলেও তাহাকে বাহুপাশে বাঁধিতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু সূক্ষ্ম দেহেও 'আমি'-বোধ চলিয়া গেলে জীবনমৃত্যু দুই-ই আমাদের নিকট

সমান হইয়া দাঁড়ায়, দুই-ই অর্থহীন বোধ হয়; তখনই হাসিমুখে মৃত্যুকে বাহুপাশে বাঁধা সম্ভব হয়।

আবার এই উপলব্ধি-লাভের উপায়ও হইল মৃত্যুকে ভালবাসিতে, তাহাকে বাহুপাশে বাঁধিতে চাওয়া ও তাহার জন্য চেষ্টা করা—দেহ-মন-বুদ্ধির চাহিদাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া চলা।

মৃত্যুকে জয় করিতে হইলে, মৃত্যুরূপা মায়ের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিতে হইলে ইহা ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ আর নাই। মরণের জাল যতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত, তাহার সীমার বাহিরে যাইয়া দাঁড়াইতে হইবে; তাহার সীমার ভিতর যা-কিছুকে আমি বা আমার বলিয়া বোধ হয়—যাহার ভিত্তির উপর আমাদের 'স্বার্থ, সাধ, মান' প্রভৃতি মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়, যাহাকে অবলম্বন করিয়াই এসবের অস্তিত্ব, তাহা চূর্ণ করিয়া ফেলিতে হইবে। যাহা আমাদের নিকট অন্ধকারাবৃত, অবিশ্বাস্য বলিয়া বোধ হইতেছে, আমাদের দেহমনাতীত সেই অমর আনন্দময় সত্তার অস্তিত্ব এই পথেই তখন বিপুল আলোকোদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। নিজেদের সেই অমর সত্তাকে বা মা-কালীর স্বরূপকে জানা ছাড়া মৃত্যুকে জয় করার দ্বিতীয় আর কোন পথ নাই— নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।

এরূপ করিবার প্রচেষ্টাই মৃত্যুকে বাহুপাশে বাঁধা, যা কিছু মরণশীল বস্তুকে অজ্ঞানবশতঃ আমরা 'আমি' বলিয়া ভাবিতেছি এবং সেই ভাবনাকে দৃঢ় করিয়া তাহার উপর খেলাঘর নির্মাণ করিতেছি, তাহার সৃষ্টিতে পরিবর্তনে ও বিনাশে হাসিতেছি, কাঁদিতেছি, বিনষ্ট হইলাম বলিয়া আতঙ্কগ্রস্ত হইতেছি, সেই বস্তুকে, সেই খেলাঘরকে নিজের হাতে ভাঙ্গিয়া ফেলাই মৃত্যুকে বাহুপাশে বাঁধা।

মৃত্যুকে বাহুপাশে বাঁধার এই প্রচেষ্টাই মা-কালীর যথার্থ আরাধনা। সর্ববিধ ভগবদারাধনার ইহাই মূল কথা; জ্ঞান কর্ম ভক্তি যোগ প্রভৃতি সত্যলাভের বা ভগবানলাভের সর্ববিধ সাধনায় এই মৃত্যুকে বাহুপাশে বাঁধার কথা, সর্ববিধ মরণশীল পদার্থে 'আমি'-বোধকে ও তাহা হইতে উদ্ভূত স্বার্থপ্রচেষ্টাকে নির্মম হস্তে চূর্ণ করার কথাই বিভিন্ন ভাবে ও ভাষায়, এবং ইহাকে ধাপে ধাপে কার্যকরী করার জন্য ব্যক্তিবিশেষের সামর্থ্যের তারতম্যানুযায়ী বিভিন্ন মাত্রায় ব্যক্ত হইয়াছে মাত্র।

এই মৃত্যুকে বাহুপাশে বাঁধার বা অন্য ভাষায় সর্ববিধ স্বার্থকে বলি দিবার প্রচেষ্টা, দেহের মাধ্যমে, মনবুদ্ধির মাধ্যমে কাহারও বা কোনও কিছুর নিকট হইতে ভোগ-সুখ-মানাদি কোনও কিছু পাইবার আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিবার প্রচেষ্টা শুধু যে নিজের বা মা-কালীর বা ভগবানের স্বরূপ জানিবার উপায় তাহাই নহে, সমাজের, রাষ্ট্রের, সমগ্র মানবজাতির যথার্থ কল্যাণ-সাধনেরও ইহাই একমাত্র পথ। ইহা ছাড়া অপরের যথার্থ কল্যাণ কখনও করা যায় না। স্বামীজীর নির্দেশমত 'অহংবোধকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কাজ করা' এবং 'মৃত্যুকে বাহুপাশে বাঁধা' মূলতঃ একই কথা।

স্বামী সারদানন্দ বলিয়াছেন যে, কেহ যদি সর্বক্ষণ জপপূজাদি লইয়া থাকে অথচ মহাস্বার্থপর হয়, তবে সে ভগবান হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে; আর যদি কেহ ভগবানকে না মানিয়াও অপরের কল্যাণের জন্য স্বার্থ ত্যাগ করিয়া কাজ করে, সে ভগবানের দিকে আগাইয়াই চলিতেছে। কারণ, সে অজ্ঞাতসারে মৃত্যুকেই বাহুপাশে বাঁধিতেছে—দেহমনাশ্রিত 'আমি'র চাহিদা অস্বীকার করিতেছে। নিঃস্বার্থ সেবা তাই ভগবানলাভের সাধনা হইতে, মৃত্যুকে বাহুপাশে বাঁধা হইতে অভিন্ন।

যতখানি হউক, যে ভাবেই হউক মৃত্যুকে বাহুপাশে বাঁধিবার সাধনায় আমরা সফলতা লাভ করি, মৃত্যুরূপা মায়ের মঙ্গলময় রূপ ততখানিই সেভাবেই আমাদের নিকট প্রকট হইয়া উঠে। সর্ববিধ কল্যাণের মূলে যে স্বার্থহীনতা তাহাই যা কিছু মরণশীল অস্তিত্বকে আমি বা আমার বলিয়া আঁকড়াইয়া রহিয়াছি তাহা ত্যাগ করাই মৃত্যুকে ভালবাসা, মৃত্যুকে বাহুপাশে বাঁধা।

নারীপ্রগতি ও ভগিনী নিবেদিতা

সর্বদিকে ভারতের জাতীয় জীবনের জাগরণের জন্য ভগিনী নিবেদিতা জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য, রাজনীতি প্রভৃতি সর্ববিষয়েই ভারতের নিজস্ব ভাবাবলম্বনে জাতির পুনরুজ্জীবনের জন্য তাঁহার সহায়তা ও উৎসাহদান সর্বজনবিদিত।

তথাপি, তাঁহার সর্বোত্তম অবদান মনে হয় আধুনিক যুগের ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ জীবনে দেখানো। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাকে পাশ্চাত্য হইতে ধার করিয়া আনিয়াছিলেন ভারতের স্ত্রীশিক্ষার জন্যই। তখন বলিয়াছিলেন, ভারতে এখন এরূপ নারীর অভাব।

আমরা জানি, স্বামীজী আধুনিক ভারতে স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবের মিলন চাহিয়াছিলেন। ভারতীয় ভাবের ভিত্তির উপরই সে-জীবন গঠিত হইবে, পাশ্চাত্যের তেজ-বীর্য, কর্মদক্ষতা, শিল্প বিজ্ঞানাদির জ্ঞান প্রভৃতি শুভকারী বিষয়গুলির সংযোগ ঘটিবে সেখানে।

এই আদর্শ জীবনে দেখাইবার জন্য যাহা প্রয়োজন ছিল, তাহার সব কিছুই ছিল নিবেদিতার জীবনে। পাশ্চাত্য সমাজে তিনি জন্মিয়াছিলেন, সেখানেই তাঁহার শিক্ষা এবং কর্মজীবনেরও প্রাথমিক অংশ অতিবাহিত। তীক্ষ্ণধী, বিদুষী, যুক্তিপরায়ণা ছিলেন তিনি। পাশ্চাত্য সমাজের ভাল-মন্দ নিজে বিচার করিয়া বুঝিবার শক্তি ছিল তাঁহার। দেশপ্রেম, জনসেবা সম্বন্ধেও পারিবারিক জীবন হইতেই তিনি প্রেরণা পাইয়াছিলেন। ধর্মবিষয়েও তাঁহার বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে বিশ্লেষণী শক্তি ছিল অপূর্ব, ধর্মের যাহা মূল বস্তু—অনুভূতি, তাহা লাভের জন্য প্রয়োজনীয় পবিত্রতা, অসীম সাহসিকতা এবং স্বার্থত্যাগের ইচ্ছা এবং শক্তিও ছিল তাঁহার। পাশ্চাত্যের সব সদ্গুণগুলিরই অধিকারিণী এবং প্রাচ্যভাবগ্রহণের যোগ্য ক্ষেত্র ছিলেন তিনি স্বামী বিবেকানন্দের সহিত সাক্ষাতের প্রাক্কালে।

জাগতিক এবং অতীন্দ্রিয় সর্ববিধ বিষয় দর্শনে সক্ষম স্বামীজীর অবারিত দৃষ্টি তাই ভগিনী নিবেদিতার বুদ্ধি ও মনের সবটাই সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইয়াছিল; স্বামীজী বুঝিয়াছিলেন যে, প্রাচ্যভাবের সহিত এ জীবনের মিলন ঘটানো সম্ভব এবং তাহা হইলে তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত আধুনিক ভারতের আদর্শ নারীজীবন গঠিত হইবে, এবং সে-জীবন দিয়াই ভারতে স্ত্রীশিক্ষার কাজ শুরু করানো যাইবে।

নিবেদিতা ভারতে আসিবার পর কতখানি মনোযোগ দিয়া স্বামীজী নিবেদিতার চিত্তকে পুরোপুরি ভারতীয় করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা আমরা জানি। কেবল বৌদ্ধিক সীমায় থাকিয়া ইহা সম্ভব হয় নাই, স্বামীজীকে এজন্য নিজ অমিত শক্তিপ্রভাবে নিবেদিতার অনুভূতিকে অতীন্দ্রিয় রাজ্যে লইয়া যাইতে হইয়াছিল। স্বামীজী 'মিরাকেল' প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শক্তি সম্বন্ধে যে কথা বলিতেন—জড়জগতে মিরাকেল দেখানো তো কিছুই না, শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে

লোকের মনগুলিকে লইয়া কাদার তালের মতো তাহার পূর্বগঠন ভাঙ্গিয়া নতুন করিয়া গড়িয়া দিতেন, তাহার চেয়ে বড় মিরাকেল আর হয় না—স্বামীজী কর্তৃক নিবেদিতার মনের রূপান্তর ঘটানোর কথা ভাবিলে শ্রীরামকৃষ্ণের সেই শক্তির কথাই মনে পড়ে; ইহা অসম্ভবকে সম্ভব করা। পরবর্তীকালে নিবেদিতার রচনাগুলি যাঁহারাই পড়িয়াছেন, সকলেই জানেন নিবেদিতার মতো ভারতীয় ভাবের এত গভীরে প্রবেশ করিতে কয়জন ভারতীয়ই বা পারিয়াছেন।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবের এই আদর্শ-সমন্বয় নিবেদিতার জীবনে ঘটাইবার পর অবশ্য স্বামীজী তাঁহার কর্মজীবনের বিস্তারিত বিষয়ে কোন আদেশ কখনো করেন নাই—সেখানে অবাধ স্বাধীনতা দিয়াছিলেন। স্বামীজী জানিতেন, যন্ত্র প্রস্তুত হইলে 'মা' নিজেই তাহাকে চালাইবেন প্রয়োজনীয় লোককল্যাণসাধনে। স্বামীজীর ভাব নিবেদিতা যথাযথভাবেই গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। স্বামীজী যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষ্য, নিবেদিতাকে সেরূপ স্বামীজীর ভাষ্য বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

নিবেদিতার জীবনই আধুনিক যুগের নারী-প্রগতির দিশারী। বিশেষ করিয়া বর্তমান সময়ে এই জীবনের প্রতি ভারতীয় নারীগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া একান্ত প্রয়োজন। পাশ্চাত্য ভাব এখন প্রবলভাবে আমাদের জীবনে প্রবেশ করিতেছে, সমাজকে প্রবলভাবে নাড়া দিতেছে। প্রাচ্যের ঈশ্বরপরায়ণতা, সত্য ও পবিত্রতার দৃঢ়নিষ্ঠারূপ ভিত্তির উপর না দাঁড়াইয়া পাশ্চাত্য-ভাবপ্লাবনে নিজেদের ছাড়িয়া দিলে তাহার ফলে উভয় ভাবের মিলন কখনো ঘটিবে না, প্রাচ্য-ভাবের বিলুপ্তি ও পাশ্চাত্যভাবের বিজয়ই ঘটিবে। উহা কখনই ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ হইতে পারে না। উচ্চশিক্ষা এবং সমাজ-উন্নয়ন রাজনীতি প্রভৃতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রভৃতি যে সব কাজে ভারতের প্রগতিশীল স্ত্রীজাতি আজ অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন, নিবেদিতা নিজ জীবনে তাহার সব কিছুর সহিতই পরিচিত ছিলেন। তাঁহার কর্মজীবন যে উচ্চস্তরে ও বিভিন্ন দিকে প্রসারিত ছিল, তাহার কতটুকু অংশই বা তথাকথিত আধুনিক প্রগতিশীলাদের জীবন স্পর্শ করে? কিন্তু ইহার জন্য আধ্যাত্মিকতা, সত্যনিষ্ঠা এবং পবিত্রতা হইতে কখনো ঈষন্মাত্রও কি সরিয়া যাইতে হইয়াছিল তাঁহাকে?

স্ত্রীশিক্ষা, নারী-প্রগতি, সামাজিক প্রথার সংস্কার প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রেই আজ এটি যেন আমরা সর্বক্ষণ স্মরণ রাখি, সর্বক্ষণ নিবেদিতার জীবনকে দিশারীরূপে গ্রহণ করিয়া অগ্রসর হই। ইহাতেই ভারতের মাতৃজাতির যথার্থ প্রগতির পথ আমরা আলোকোদ্ভাসিত দেখিতে পাইব।

একজন পাশ্চাত্য নারী যদি পরিপূর্ণরূপে ভারতীয়ও হইতে পারেন, যে পাশ্চাত্য ভাবগুলিকে আমরা প্রগতির পথে গ্রহণ করিতে চাহিতেছি তাহার সবগুলিকে সর্বদা ঈশ্বরীয় ভাব, পবিত্রতা, সত্য ও সেবার ভাবে সর্বদা অনুরঞ্জিত করিয়া জীবনে দেখাইতে পারেন, একজন ভারতীয় রমণী তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি এই ভাবগুলিকে আঁকড়াইয়া থাকিয়া পাশ্চাত্যভাব গ্রহণ করিতে পারিবেন না কেন? উহা কি তুলনায় সহজসাধ্য নহে?

আবেদন

জলপাইগুড়ি জেলার বন্যাপীড়িত অঞ্চলে রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য

বন্যাবিধ্বস্ত জলপাইগুড়ি শহরের আশ্রমপাড়া, পিলখানা, নয়াবস্তী, রেসকোর্স ও নেপালী বস্তী অঞ্চলে এবং শহর হইতে ১৪ মাইল দূরবর্তী মণ্ডলঘাট এলাকায় রামকৃষ্ণ মিশনের ত্রাণকার্য বিপর্যয়ের অব্যবহিত পরেই আরম্ভ হইয়াছে। এই বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলগুলির মধ্যে মণ্ডলঘাট অঞ্চলটিই সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত। এই সব এলাকার বিপন্ন নরনারীদের দুরবস্থা অবর্ণনীয়; খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে উপযুক্ত পথ্যাদি ও চিকিৎসার প্রয়োজন মিটাইতে প্রচুর লোকবল ও অর্থ আবশ্যক। সহৃদয় জনসাধারণের নিকট এই কার্যে মুক্তহস্তে সাহায্যের জন্য আবেদন জানাইতেছি। সব রকম সাহায্য রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নিম্নলিখিত কেন্দ্রগুলিতে পাঠাইবেন; প্রতিটি সাহায্যই কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকৃত হইবে। চেক 'রামকৃষ্ণ মিশন' (RAMAKRISHNA MISSION) এই নামে লিখিবেন।

সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা:

১. রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা: হাওড়া

২. অদ্বৈত আশ্রম, ৫ ডিহি এণ্টালী রোড, কলিকাতা ১৪

৩. উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৩

৪. রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌স্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্ক, কলিকাতা ২৯

৬. রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পোঃ জলপাইগুড়ি, জেলা: জলপাইগুড়ি

স্বামী গম্ভীরানন্দ
সাধারণ সম্পাদক,
রামকৃষ্ণ মিশন

বেলুড় মঠ, হাওড়া,
১৬ই অক্টোবর, ১৯৬৮।

চরণচিহ্ন

ভগিনী নিবেদিতা*

[অনুবাদ : অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ]

মা গো ! তোমার চরণধ্বনি ওই শোনা যায়।
যুগ থেকে যুগান্তরে
ধরিত্রীর এখানে ওখানে
স্পর্শ করে
ধীরে অতি ধীরে
তোমার চরণপদ্মে ফুটে উঠছে
বিশ্রুত ইতিহাসের নগরী,
প্রাচীন শাস্ত্র, কবিতা, আর মন্দির
মহৎ সাধনা, ন্যায়ের সংগ্রাম।

মা গো ! কোথায় নিয়ে চলেছে
তোমার চরণচিহ্ন যত !
ওদের গভীরতম অর্থ
আমাদের বুঝতে দাও,
দাও সেই পরিব্যাপ্ত দিব্যদৃষ্টি,
আর মানব- ইতিহাসে
তুঙ্গতম মননের অধিকার।

মা গো ! কোথায় নিয়ে চলেছে ওরা,
তোমার চরণচিহ্ন যত !
আবির্ভূত হও, অয়ি, মুক্তিদাত্রী জননী আমার !
তোমারই সন্তান, তোমারই তো স্নেহনীড়ে
পালিত আমরা,
ওই চরণের পাদপীঠ হোক এ হৃদয়,
ভূম্যা দেবী, আমরা তো একান্ত তোমার।
কোন্ লক্ষ্যপথে চলেছে, মা গো !
তোমার চরণচিহ্ন যত !

---

* ভগিনী নিবেদিতার 'Foot-falls of Indian History' গ্রন্থের সূচনা-কবিতা 'The Foot-falls'

গৌড় দেশের ভৌগোলিক ইতিহাস

অধ্যাপক প্রণবকুমার ভট্টাচার্য

রিচার্ড হাক্‌লুট সাহেব একদা বলিয়াছিলেন, "Geographie and Chronologie are the Sunne and Moone, the right eye and left eye of History". যে সময় তিনি এই উক্তি করিয়াছিলেন তখনও হয়তো ইতিহাসের সহিত ভৌগোলিক পরিবেশের যে আত্মিক যোগ আছে, সেকথা অনেকেই অনুভব করিতে পারিতেন না। কিন্তু নূতন নূতন গবেষণার ফলে কালক্রমে ইহার সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে। কোন সাম্রাজ্য বা জাতির উত্থান-পতনের ইতিহাসের মধ্যে ভৌগোলিক পরিবেশ বা উপাদানের প্রভাব যে পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ-ভাবে কাজ করে সে বিষয়ে সন্দেহের আর অবকাশ নাই। এক কথায় বলিতে গেলে—ভৌগোলিক প্রভাবই যে-কোন দেশ বা জাতির ইতিহাসকে বহুল পরিমাণে প্রভাবিত করিয়া থাকে।

গৌড় বাংলাদেশের একটি জনপদবিশেষ। এই গৌড়-অঞ্চল বাংলাদেশের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া আছে। সুদূর প্রাচীন কাল হইতে মধ্যযুগ পর্যন্ত ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে গৌড়ভূমি স্বীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। এইভাবে চিন্তা করিলে গৌড়ভূমির ভৌগোলিক পরিবেশের তাৎপর্য স্বাভাবিক ভাবে আমাদের নিকট বিশেষ প্রকট হইয়া উঠে। কিন্তু বাংলাদেশের ইতিহাস সম্বন্ধে নূতন নূতন তথ্য উদ্‌ঘাটিত হইলেও প্রাচীন গৌড়ের ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে এখনও আমরা কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে সমর্থ হই নাই।

গৌড় নগরীর সম্বন্ধে Archaeological Survey of India, Annual Report, 1927-28-এ বলা হইয়াছে, 'There are reasons to believe that the city of Gaur (i e Gauḍa) was founded by some Pāla prince long prior to the Mahammadan occupation in the early 13th century'.

কিন্তু যে গৌড়ের কথা আমরা এত বিশদ-ভাবে শুনিতে পাই, প্রকৃতপক্ষে তাহার পত্তন হইয়াছিল মুসলমান আমলে।[১]

এই নগরীর বর্তমান ধ্বংসাবশেষ মালদহ শহরের দক্ষিণে শুকাইয়া যাওয়া গঙ্গার একটি খাতের নিকট (lat. 24°52′, long. 88°10′) অবস্থিত। অনেকে মনে করেন পূর্বে গঙ্গা এই নগরীর পূর্বপার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইত।[২] ষোড়শ শতকের শেষভাগে এই নগরী পরিত্যক্ত হয়, পরে অল্প সময়ের জন্য শাহ সুজা ইহার কিয়দংশের সংস্কারসাধন করেন। ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে ইউরোপীয় এক পর্যটকের নিকট ইহার এক নিখুঁত ছবি পাই।[৩] ১৬৮৩ খৃঃ অপর একজন ইউরোপীয়ের নিকট গৌড়ের ধ্বংসাবশেষের নিম্নলিখিত ছবিটি পাই:

'We spent 3 hours in seeing the ruins especially of the palace which has been··· · in my judgement considerably bigger and more beautiful than

---

১ cf. ..but its recorded history does not begin until the Muhammadan conquest of western and northern Bengal (Rarh and Varendra) by Muhammad-i-Bakhtiyar Khalji, the lieutenant of Qutbuddin Aibak of Delhi, in the year 599 of the Hijri, corresponding with 1202 A. D."

[Memoirs of Gaur and Pandua by Khan-shahib M. Abid Ali Khan, p. 15.]

২ Ibid., p. 41 fn.

৩ Vide Hobson-Jobson, S. V. Gour

the Grand Seignor's seraglio at Constantinople or any other palace that I have seen in Europe.'[৪]

সন্ধ্যাকর নন্দী-রচিত রামচরিতে আমরা রামপালের (আ: ১০৭৭—১১২০ খৃ:) প্রতিষ্ঠিত রামাবতী শহরের কথা জানিতে পারি। গঙ্গা এবং করতোয়া অথবা মহানন্দার মধ্যবর্তী স্থানে এই শহরের প্রতিষ্ঠা হয়। ইহার অবস্থানও ছিল গৌড় নগরীর নিকটে। রামাবতী শেষ পাল নৃপতিগণের অন্যতম রাজধানী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। রামাবতী শহরের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই যেন লক্ষ্মণাবতী নগরীর আবির্ভাব হয়। কিন্তু রামাবতী শহরটি সম্ভবত: আকবরের সময়েও বিদ্যমান ছিল। 'আকবর-নামায়' রামাবতীকে জন্নতাবাদ (বা গৌড়) সরকারের অন্যতম পরগণা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

লক্ষ্মণাবতী নামটি খুব সম্ভবত: সেন নৃপতি লক্ষ্মণসেনের (অ: ১১৮৯—১২০৬ খৃ:) নামানুকরণে রাখা হইয়াছিল।[৫] মুসলমান ঐতিহাসিকগণ ইহাকে লখ্‌নৌতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। লক্ষ্মণাবতী গৌড় নগরীরই অপর একটি নামবিশেষ।[৬] মেরুতুঙ্গের 'প্রবন্ধ-চিন্তামণি' পুস্তকে ইহাকে গৌড়দেশের রাজধানী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।[৭] রেণেল সাহেব বোধ হয় ভ্রমবশত: ইহাকে ৭৩০ খৃ: বাংলার রাজধানী বলিয়া দেখাইয়াছেন।[৮] সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, গৌড়নগরী ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহ মুসলমান আমলে যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধিলাভ করিলেও প্রাক্-মুসলমান যুগ হইতেই পূর্ব-ভারতে এইটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে।

পাণিনির (আ: খৃ: পূ: ৫ম শতক) 'অষ্টাধ্যায়ী'তে গৌড়পুর বলিয়া এক শহরের উল্লেখ আছে। ডঃ সুকুমার সেনের মতে পাণিনির সূত্রানুযায়ী অরিষ্টপুর এবং গৌড়পুরকে [Cf. 'অরিষ্ট-গৌড়-পূর্বে চ', (৬-২-১০০১)] পূর্ব-ভারতের বাহিরের অঞ্চল বলিয়া অনুমান করিতে হইবে।[৯] খৃ: পূ: পঞ্চম শতকে বাংলাদেশ আর্যসভ্যতার বাহিরে ছিল।[১০] সুতরাং পাণিনির আর্যাধ্যুষিত 'গৌড়পুর' বাংলার বাহিরে কোন বিশেষ শহরকেই নির্দেশ করিবে বলিয়া মনে হয়।

কানিংহাম সাহেব মনে করেন 'গৌড়' কথাটি 'গুড়' হইতে আসিয়াছে। গৌড় যার রাজধানী সেই দেশেও প্রচুর 'গুড়' উৎপন্ন হইত বলিয়া দেশটি 'গৌড়দেশ' বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল।[১১] তবে অধ্যাপক দীনেশ

---

৪ Ibid.

৫ মনোমোহন চক্রবর্তীর মতে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতেও লক্ষ্মণাবতীর অস্তিত্ব ছিল [*Vide* 'Notes on the Geography of old Bengal' by M. Chakravarty, J. A. S. B., 1903]

৬ এই নগরী বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল, যথা—
(a) গৌড়, (b) লক্ষ্মণাবতী, (c) নিবৃত্তি,
(d) লখ্‌নৌতি, (e) বিজয়পুর, ( ) পুণ্ড্রবর্ধন,
(g) বরেন্দ্র।

[See the Geographical Dictionary of Ancient and Mediaeval India by N. L. Dey, p. p. 233, 112.]

৭ Tawney: Merutunga's 'Prabandha Chintāmani', p. 181.

৮ Rennell's Memoir of a Map of Hindoostan, p. 55.

৯ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস: ১ম খণ্ড (২য় সংস্করণ) by সুকুমার সেন, p. 4.

১০ cf 'Solasa Mahājanapada' of Anguttara Nikaya

[H. C. Roy-Chowdhury: Political History of Ancient India (6th edition), p. 95]

১১ Vide Archaeological Survey Report, Vol. XV of Major-General Cunningham & also Khan M. Ali Khan, pp. 15-17, Memoirs of Gaur and Pandua

সরকারের মতে নগরীর নামানুসারে গৌড়দেশের নাম হইয়াছিল অথবা দেশের নামানুসারে রাজধানী শহরের নাম হইয়াছিল, একথা ঠিক করিয়া বলা যায় না।[১২] কিন্তু সপ্তম শতকে গৌড়-এর রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ। কর্ণসুবর্ণের উপকণ্ঠে ছিল হিউয়েন সাঙ্-বর্ণিত বিখ্যাত রক্তমৃত্তিকা মহাবিহার। রক্তমৃত্তিকার অবস্থিতি ১৯৬২ খৃঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ কর্তৃক মুর্শিদাবাদ-অন্তর্গত রাজবাড়ীভাঙা নামক স্থানে উৎখননের ফলে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ফলে কর্ণসুবর্ণ রাজধানীর "ভৌগোলিক অবস্থান ভাগীরথীর পশ্চিমতীরবর্তী মুর্শিদাবাদ জেলার রাঢ়ভূমির অন্তর্গত চিরুটি অঞ্চলেই" স্থিরীকৃত হইয়াছে।[১৩] অতএব, গৌড়নগরী সপ্তম শতকের পর সম্ভবতঃ পাল-যুগেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।[১৪] গঙ্গার প্রধান জলধারা যখন ভাগীরথীর পরিবর্তে মালদহের ভিতর দিয়া এবং গৌড়নগরীকে ইহার দক্ষিণ পার্শ্বে রাখিয়া প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করে, সেই সময়েই রাজধানী কর্ণসুবর্ণের পরিবর্তে গৌড়নগরীতে স্থানান্তরিত করা হয়। গঙ্গার গতি-পরিবর্তন সম্পর্কে অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদারের উক্তি এক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য :

"ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে রাজমহলের পাহাড় অতিক্রম করার পর গঙ্গানদীর স্রোত বর্তমান কালের অপেক্ষা অনেক উত্তর দিয়া প্রবাহিত হইত এবং বর্তমান মালদহের নিকটবর্তী প্রাচীন গৌড়নগর খুব সম্ভবতঃ ইহার দক্ষিণে অবস্থিত ছিল।"[১৫]

মুসলমান যুগের প্রারম্ভ হইতে অর্থাৎ মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার খল্‌জীর সময় হইতে শুরু করিয়া কাদার খান্-এর আমল পর্যন্ত লখ্‌নৌতি (বা গৌড়নগরী) রাজধানীরূপে বিদ্যমান ছিল। বাংলার রাজারা স্বাধীনতা লাভ করিবার পর রাজধানী ফিরুজাবাদে (বা পাণ্ডুয়াতে) স্থানান্তরিত করেন। ইহার কারণ সম্বন্ধে মনোমোহন চক্রবর্তী মহাশয় বলেন :

"The causes of this transfer are nowhere stated ; but it was obviously connected with the changes in the river-courses, making Lakhnauti unhealthy and uninhabitable. The various civil wars, with repeated plunderings of the city, might have hastened the transfer".[১৬]

পুনরায়, প্রথম মামুদ (১৪৪২-৫৯) রাজধানী ফিরুজাবাদ হইতে গৌড়-এ পরিবর্তন করেন। এই পরিবর্তনও বহুলাংশে ভৌগোলিক পরিবর্তনের জন্য দায়ী।

"After much fluctuation, the Ganges seems to have found a comparatively stable course on the west of the city, and its floods probably raised the level of the city on its eastern part. By embankments on the east and west, it became now practicable to make the city habitable ; and the deep stream flowing on the west must have greatly

---

১২ See D. C. Sircar, Studies in the Geography of Ancient and Mediaeval India, P. 111

১৩ "কর্ণসুবর্ণ" by সুধীররঞ্জন দাস

[ইতিহাস : বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৭৪, পৃঃ ১৮]

১৪ অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সরকারও এই মত সমর্থন করেন।

See Geography of Anc. & Med. India, pp. 110-122

১৫ বাংলা দেশের ইতিহাস—রমেশচন্দ্র মজুমদার, পৃঃ ৩

১৬ Vide M. Chakravarty's 'Notes on Gaur etc.'

[Journal & Proceedings of Asiatic Society of Bengal, Vol-V, 1909. No 7, pp.204-234]

facilitated trade. On the other hand, the river receded from Pandua and made it less accessible and more unhealthy. A change in the dynasty also facilitated the removal."[১৭]

যাহাই হউক, De Barros (১৫৫০ খৃ:) এবং Gastaldi (১৫৬১ খৃ:) এই দুইজনের অঙ্কিত মানচিত্রে গৌড়নগরীকে গঙ্গানদীর পশ্চিম পার্শ্বে দেখানো হইয়াছে।

সুলৈমান কররানী রাজধানী গৌড় হইতে কিছু দক্ষিণে ও পশ্চিমে 'তাণ্ডায়' স্থানান্তরিত করেন ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে। এই স্থান-পরিবর্তনের পশ্চাতে গঙ্গার গতি-পরিবর্তন এবং ফলে গৌড়ের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ যথাক্রমে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ কারণ বলিয়া মনে হয়।

সম্রাট আকবরের আমলে মুনিম খানই ছিলেন বাংলার প্রথম প্রদেশ-শাসক। তিনি ১৫৭৫ খৃ: রাজধানী পুনরায় তাণ্ডা হইতে গৌড়ে লইয়া আসেন, কিন্তু অত্যধিক বর্ষার ফলে গৌড়নগরীতে মহামারী দেখা দিলে কিছু দিনের মধ্যে রাজধানী আবার তাণ্ডায় ফিরাইয়া আনেন। ১৫৯৫ খৃ: রাজা মানসিং রাজধানী তাণ্ডা হইতে গঙ্গার অপর পার্শ্বে অর্থাৎ রাজ-মহলে লইয়া যান। নদীর গতি-পরিবর্তনই সম্ভবত: ইহার প্রধান কারণ। ইহার পর তাণ্ডার গুরুত্ব হ্রাস পাইতে থাকে। পরে ১৮৬৫ খৃ: বন্যায় শহরটি বিধ্বস্ত হয়।

১৬১২ খৃ: সুবাদার ইসলাম খান বাংলার রাজধানী সর্বপ্রথম ঢাকায় স্থানান্তরিত করেন। আফগান বিদ্রোহ-দমন ও আরাকান দস্যুগণের উপদ্রব-নিবারণই ছিল ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। কুমার শাহ সুজার আমলে রাজধানী সাময়িক-ভাবে পুনরায় রাজমহলে স্থাপিত হয়। ১৬৬০ খৃ: আরঙ্গজেবের আমলে বাংলার প্রথম শাসক মীরজুমলা রাজধানী শেষবারের মতো ঢাকায় প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭০৪ খৃ: মুর্শিদকুলী খান ঢাকা হইতে রাজধানী মুর্শিদাবাদে লইয়া আসেন এবং পলাশীযুদ্ধ পর্যন্ত মুর্শিদাবাদই প্রকৃতপক্ষে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজধানী ছিল। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের পর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে কলিকাতা বাংলাদেশ ও পরে ১৯১২ খৃ: পর্যন্ত বৃটিশ ভারতের রাজধানী-রূপে পরিগণিত হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে জনৈক প্রখ্যাত বাঙ্গালী কবি সমগ্র বাংলাদেশের অধিবাসিগণকে "গৌড়জন" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু অতীত যুগে গৌড়দেশের সীমা এত প্রসারিত ছিল না, পক্ষান্তরে মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্যে সীমিত ছিল। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্ তাঁহার বিবরণগুলির মধ্যে গৌড়দেশের কোন উল্লেখ করেন নাই। তিনি নৃপতি শশাঙ্কের রাজ্য ও রাজধানী 'কর্ণসুবর্ণ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বাণভট্টের 'হর্ষচরিতের' মধ্যে আমরা 'গৌড়াধিপতি' শশাঙ্কের উল্লেখ পাই। সুতরাং এই গৌড়াধি-পতির রাজধানী যে কর্ণসুবর্ণে ছিল, এটা আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি। হিউয়েন সাঙ্-বর্ণিত রক্তমৃত্তিকা সঙ্ঘারামটির অবস্থিতি মুর্শিদাবাদে আবিষ্কৃত হইয়াছে।[১৮] কর্ণসুবর্ণ রাজধানীটি ইহার পার্শ্বে অবস্থিত ছিল। হিউয়েন সাঙের বিবরণ অনুযায়ী এই কর্ণসুবর্ণ দেশটির পরিসীমা ছিল প্রায় ৭৩০ হইতে ৭৫০ মাইলের মতো।

হান্টার সাহেবের মতে গৌড় নামটি কোন নগরী অপেক্ষা কোন দেশকেই বিশেষরূপে

১৭ Ibid.

১৮ "কর্ণসুবর্ণ" by সুধীরঞ্জন দাস [ইতিহাস, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৪৭]

নির্দেশিত করে।[১৯] কিন্তু গৌড়দেশ বলিতে আমরা যাহাকে বুঝি তাহার ভৌগোলিক পরিসীমা ইতিহাসের কোন যুগেই সুনির্দিষ্ট ছিল না। পরন্তু প্রতি সময় প্রতি বিবরণে ইহার পরিবর্তিত অথবা পরিবর্জিত রূপই আমাদের নিকট প্রকট হইয়া উঠে।

কোন কোন ঐতিহাসিকগণের মতে 'ভবিষ্যপুরাণের' এক প্রক্ষিপ্ত অংশে গৌড়দেশের অবস্থিতির কথা উল্লিখিত হইয়াছে এবং ইহাকে গৌড়েশ অথবা গৌড়েশী দেবতার আবাসভূমি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই গৌড়দেশ পদ্মানদী ও বর্ধমান জেলার মধ্যে অবস্থিত।[২০] এই পুরাণেই গৌড়ভূমিকে পুণ্ড্র দেশের অন্তর্গত সপ্তদেশের অন্যতম বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে—যথা, (১) গৌড়, (২) বরেন্দ্র (মালদহ রাজসাহী বগুড়া অঞ্চল), (৩) নিবৃতি, (৪) সুহ্মা (অর্থাৎ রাঢ়), (৫) ঝারীখণ্ড (সাঁওতাল পরগণা, যাহা 'জাংগল' বা জঙ্গলাধ্যুষিত দেশ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে), (৬) বরাহভূমি (মানভূম জেলার অন্তর্গত) এবং (৭) বর্ধমান। পুনরায়, নিম্নবর্ণিত অঞ্চলগুলি গৌড়দেশের অন্তর্গত ছিল, যথা, (১) নবদ্বীপ (নদীয়া জেলা), (২) শান্তিপুর (নদীয়া জেলা), (৩) মৌলপত্তন (হুগলী জেলার মোল্লাই অঞ্চল) এবং (৪) কণ্টকপত্তন (বর্ধমান জেলার কাটোয়া অঞ্চল)। এইভাবে বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলাসহ নদীয়া, হুগলী ও বর্ধমান জেলার কিয়দংশকে আমরা গৌড়দেশের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারি। পুণ্ড্রদেশ এক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলা ছাড়াও বিহারের কিছু অঞ্চলকে ইঙ্গিত করিতেছে। অধ্যাপক সরকারের মতে 'নিবৃতি' রংপুর জেলার বর্ধনকোট অঞ্চল। কিন্তু 'ত্রিকাণ্ডশেষ' হইতে আমরা জানিতে পারি "পুণ্ড্রাঃ স্যু=বরেন্দ্রী গৌড়=নীবৃতি" অর্থাৎ গৌড় রাজ্যের ("নীবৃৎ") বরেন্দ্রীভূমিই পুণ্ড্রদেশ। সুতরাং গৌড়রাজ্য এস্থলে বৃহত্তর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অধ্যাপক সরকার মনে করেন যে ভবিষ্যপুরাণের উপাদান 'ত্রিকাণ্ডশেষ' হইতে ত্রুটিপূর্ণভাবে লওয়া হইয়াছে।

'শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে' লিখিত আছে—

বঙ্গদেশং সমারভ্য ভুবনেশান্তগং (গঃ) শিবে।
গৌড়দেশঃ সমাখ্যাতঃ সর্ববিদ্যাবিশারদঃ॥

(vs. 37)

অর্থাৎ বঙ্গদেশ হইতে ভুবনেশ্বর (বা উড়িষ্যা) পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলের নাম গৌড়দেশ। ঐ একই অংশে সমুদ্র হইতে ব্রহ্মপুত্রনদ পর্যন্ত বঙ্গদেশের বিস্তারের কথা বলা হইয়াছে। বাৎস্যায়নের কামসূত্রের টীকাকার যশোধর লিখিয়াছেন, "বঙ্গা লোহিত্যাৎ পূর্বেণ" অর্থাৎ বঙ্গদেশ ব্রহ্মপুত্রের পূর্বে অবস্থিত। সুতরাং একসময় বাংলার পূর্ব অংশ 'বঙ্গদেশ' এবং পশ্চিম অংশ যাহার বিস্তার ছিল উড়িষ্যা পর্যন্ত, 'গৌড়দেশ'—এই দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল, একথা মনে করা যাইতে পারে। হয়তো এই কারণেই মুসলমান ঐতিহাসিকগণ "গৌড় বঙ্গাল" অর্থাৎ গৌড়-বঙ্গ দেশের কথা প্রায়শই উল্লেখ করিয়াছেন।

কৌটিল্য-রচিত অর্থশাস্ত্রে (Chs. 32-33) বঙ্গ ও পুণ্ড্র-এর প্রস্তুত বস্ত্রাদি এবং গৌড়দেশের রজতের কথা উল্লেখ আছে। অর্থশাস্ত্রের রচনাকাল সাধারণভাবে খৃষ্টীয় ২য় বা ৩য় শতকে মনে করা হয়। চতুর্থ শতকে গৌড় সম্ভবতঃ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু

১৯ Hunter's Statistical Account of Bengal, Vol. VII. p. 51

২০ cf. " ...মানন্দা দক্ষভাগে বৰ্দ্ধমানস্য চোত্তরে।
গৌ...দেশঃ স বিজ্ঞেয়া গৌড়েশী যত্র তিষ্ঠতি।
[Vide Ms. No. 3582 of the Asiatic Society, Calcutta]

ষষ্ঠ শতকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর গৌড়ভূমিতে এক স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা হয়। এই সময়কার নৃপতিবর্গের মধ্যে ধর্মাদিত্য, গোপচন্দ্র এবং সমাচারদেবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সময় মৌখরিরাজ ঈশান বর্মণের সহিত গৌড়গণের এক যুদ্ধ হয়। হরহ লিপিতে[২১] বলা হইয়াছে যে, পরাজয়ের ফলে গৌড়জনগণ "সমুদ্রাশ্রয়" লইতে বাধ্য হয়। ইহা হইতে কেহ কেহ মনে করেন যে, গৌড়গণ সমুদ্রে যাতায়াত করিত। মালয়ে প্রাপ্ত রক্ত-মৃত্তিকার (গৌড়ের রাজধানীর সন্নিকটে) মহানাবিক বুদ্ধগুপ্তের শিলালিপি গৌড়জনের সমুদ্রে গতিবিধির কথা সমর্থন করে।[২২] কামরূপ নৃপতি ভাস্কর বর্মণের লিপিতেও গৌড়গণকে নৌ বিদ্যায় পারদর্শিরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।[২৩] সংহিতায় (বরাহমিহির-রচিত, খৃঃ ষষ্ঠ শতক) গৌড়ক (বা গৌড)-কে বাংলাদেশের অন্যতম অংশবিশেষ বলা হইয়াছে। অন্যান্য অংশগুলির মধ্যে আমরা পৌণ্ড্রক (বা পুণ্ড্রবর্ধন), তাম্রলিপ্তিক (বা তাম্রলিপ্তি), বঙ্গ, সমতট এবং বর্ধমান অঞ্চলের উল্লেখ দেখতে পাই। সপ্তম শতকে মহারাজাধিরাজ শশাঙ্ক গৌড়রাজ্যের পরিসীমা অনেক বর্ধিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারই সমসাময়িক হিউয়েন সাঙ্‌ বাংলাদেশে কর্ণসুবর্ণ (বা গৌড়রাজ্য) ছাড়াও পুণ্ড্রবর্ধন, সমতট এবং তাম্রলিপ্তির উল্লেখ করিয়াছেন। মুরারিকৃত 'অনর্ঘ রাঘবে' (খৃষ্টীয় অষ্টম শতক) চম্পানগরীকে গৌড়দিগের রাজধানীরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। 'আইন-ই-আকবরি'তে সম্ভবতঃ মদারণ সরকারে এই নগরীর উল্লেখ আছে। ইহা দামোদর নদের পশ্চিমপার্শ্বে বর্ধমান শহরের উত্তর পশ্চিম-প্রান্তে অবস্থিত ছিল।

'দিগ্‌বিজয়প্রকাশ' নামক গ্রন্থে রাঢ় ভূভাগের সীমারেখার বর্ণনা হইতে মনে হয় যে, রাঢ় অঞ্চল গৌড়ের দক্ষিণে, বীরভূমের পূর্বে এবং দামোদরের উত্তরে অবস্থিত ছিল। সুতরাং রাঢ় ভূভাগ গৌড় হইতে ভিন্ন। কিন্তু 'প্রবোধ-চন্দ্রোদয় নাটকে' (খৃষ্টীয় দশম শতক) রাঢ়াপুরী গৌড় দেশের প্রধান অংশ [cf. "গৌড়রাষ্ট্র-মনুত্তমং নিরুপমা তত্রাপি রাঢ়াপুরী"]।

ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ খৃষ্টাব্দে রচিত জৈন গ্রন্থমালায় লক্ষ্মণাবতী গৌড়ের অন্তর্গত। মুসলমান যুগের প্রারম্ভে (খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে) গৌড় ও লক্ষ্মণাবতী অভিন্ন। 'তবকাৎ-ই-নাসিরি' গ্রন্থে লিখিত আছে—"গঙ্গার ধারে লক্ষ্মণাবতী রাজ্যের দুইটি পক্ষ, তন্মধ্যে পশ্চিমাংশ 'রাল' এবং পূর্বাংশ 'বারিন্দ্‌' নামে পরিচিত। পশ্চিমাংশে 'লখ্‌নো' এবং পূর্বাংশে 'দেওকোট' অবস্থিত। রাঢ় ও বারিন্দ্‌ লক্ষ্মণাবতীরই অংশ।"

কালক্রমে গৌড়দেশ বলিতে কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলের পরিবর্তে পূর্ব ভারতে অবস্থিত দেশ-গুলির সমষ্টিগত নাম হিসাবে ব্যবহৃত হইত। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, দণ্ডীর 'কাব্যাদর্শে' (খৃষ্টীয় সপ্তম শতক) সংস্কৃত-সাহিত্যের প্রধান দ্বিবিধ রীতির (styles) মধ্যে গৌড়ীয় (বা প্রাচ্য) রীতিকে অন্যতম ধরা হইয়াছে। দণ্ডী গৌড়ীয় এবং বৈদর্ভ রীতিগুলির মধ্যে পার্থক্য দেখাইয়াছেন। ভারতের 'নাট্যশাস্ত্র' কাব্যাদর্শের পূর্বের রচনা

---

২১ ঈশান-বর্মণ মৌখরির কথা আমরা হরহলিপি (৫৫৪ খৃঃ) হইতে জানিতে পারি।
[See Epigraphia Indica. Vol. XIV, p. 7.]

২২ Chatterjee and Chakravarty, "India and Java", pt-II p. 7.

২৩ The Dubi Inscription of Bhaskaravarman.
[Epigraphia Indica, Vol. XXX. p. 293 ff.]

এবং সেই সময় গৌড়ীয় রীতি সম্যক্ বিকাশ-লাভ করে নাই। এই প্রসঙ্গে কীথ্ সাহেবের একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য—'...at the time of the Nātyaśāstra there had not developed the characteristics of the Gauḍa Style and that they emerged gradually with the development of poetry at the courts of princes of Bengal.'[২৪] অধ্যাপক সরকারের মতে 'Princes of Bengal' বলিতে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ এবং সপ্তম শতকের গৌড়নৃপতিগণকেই উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহাদের সময়ে গৌড়ের প্রবর্তিত রীতিই পূর্ব-ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলি কর্তৃক অনুকৃত হইয়াছিল এবং ফলে পূর্ব-ভারতীয় রীতিগুলি সাধারণ গৌড়রীতি বলিয়া অভিহিত হইয়াছিল।

পুনরায়, সাহিত্যের রীতির ন্যায় পূর্ব-ভারতীয় বর্ণমালাও গৌড়দেশের নামের সহিত যুক্ত হইয়াছিল। একাদশ শতকের প্রথমভাগে আলবেরুণি-রচিত গ্রন্থে[২৫] নিম্নলিখিত বর্ণমালার উল্লেখ আছে, যথা—

(১) সিদ্ধমাতৃকা (কাশ্মীর-বেনারস-কনৌজ অঞ্চলের)।

(২) নাগর (মালব অঞ্চলের)।

(৩-৫) অর্ধনাগরী, মালওয়ারী এবং সৈন্ধব (সিন্ধু অঞ্চলের)।

(৬-৯) কর্ণাট, আন্ধ্রী, দ্রাবিড়ী এবং লারী (যথাক্রমে কন্নাড়, অন্ধ্র, দ্রাবিড় এবং লাট অঞ্চলের)।

(১০) গৌড়ী (পূর্বদেশ অঞ্চলের) এবং

(১১) ভৈক্ষুকী (পূর্বদেশের উদনপুরের বৌদ্ধলিপি—উদনপুর সম্ভবতঃ পাটনা জেলায় উদণ্ডপুরের সহিত তুলনীয়)।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, পূর্ব-ভারতীয় যে লিপিমালাকে বুলার (Buhler) সাহেব "Proto-Bengali"—এই আখ্যা দিয়াছেন[২৬], তাহা একাদশ শতকের প্রারম্ভে গৌড়দেশের নামের সহিতই যুক্ত ছিল। অবশ্য আলবেরুণির বহুপূর্বে রচিত 'ললিত-বিস্তর' (Chinese translation in 308 A.D.) গ্রন্থে ৬৪টি লিপি-মালার কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু ইহার অনেকগুলিই কল্পিত বলিয়া মনে হয়। তবে পৃথকভাবে অঙ্গ-লিপি, বঙ্গ-লিপি, মগধ-লিপি, দ্রাবিড়-লিপি, কনাড়ি-লিপি, দক্ষিণ-লিপি, অপর-গৌড়াদি-লিপি ইত্যাদির উল্লেখ বিশেষ কৌতূহল-উদ্দীপক। অধ্যাপক সরকারের মতে "...the tendency towards the growth of special characteristics in the alphabets of Southern and Eastern India was noticed even in an earlier age"[২৭] —ইহাই সূচিত হইতেছে।

পরিশেষে, উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বাংলাদেশ ব্যতীত ভারতের অন্যান্য স্থানেও "গৌড়" নামধেয় কয়েকটি অঞ্চলের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। রামায়ণ ও বায়ুপুরাণে[২৮] বর্ণিত উত্তর-কোশলের অন্তর্গত এক গৌড়-দেশের উল্লেখ পাই। মৎস্য, কূর্ম ও লিঙ্গ-

---

২৪ Keith—A History of Sanskrit *Literature*. p. 60

২৫ Sachau—Alberuni's India, Vol. I, p. 173.

২৬ Indian Antiquary, Vol. XXXIII, App. p. 58

২৭ D. C. Sircar's Geography of Anc. & Med. India p. 119

২৮ Epigraphia Indica, Vol. XIII, p. 200 সিলিমপুর শিলালিপির আলোচনাকালে অধ্যাপক রাধা-গোবিন্দ বসাক রামায়ণ ও পুরাণ-বর্ণিত অংশগুলির কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

পুরাণের মধ্যে আমরা একটি পঙ্‌ক্তি পাই, যথা—"নির্মিতা যেন শ্রাবস্তী গৌড়দেশে দ্বিজোত্তমা (বা মহাপুরী)।" ইহা হইতে অধ্যাপক বসাক শ্রাবস্তীকে বাংলাদেশের কোন অঞ্চল বলিয়া মনে করেন।[২৯] অধ্যাপক প্রমোদ পালের মতে গৌড় বলিতে যদি আমরা উত্তর-কোশলের গৌড়ের কথা মনে করি, যাহাকে গণ্ড জেলা ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চল বিখ্যাত শ্রাবস্তী (বা অধুনা সাহেৎ-মাহেৎ) বলিয়াই মনে করিতে হইবে।[৩০]

স্কন্দপুরাণের সহ্যাদ্রিখণ্ডে ব্রাহ্মণদিগকে দুই-শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে, যথা—পঞ্চদ্রাবিড় এবং পঞ্চগৌড়। দক্ষিণ-ভারতীয় ব্রাহ্মণগণ যে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত ছিলেন, তাহা হইতেছে, (১) দ্রাবিড় (বা তামিল), (২) কর্ণাট, (৩) গুর্জর, (৪) মহারাষ্ট্র এবং (৫) তৈলঙ্গ[৩১]—ইহাদেরই সম্মিলিতভাবে বলা হইত পঞ্চ-দ্রাবিড়। এই বিভাগ হয়তো ভাষাগত পার্থক্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই করা হইয়াছিল, কিন্তু দক্ষিণ-ভারতীয় নৃপতিগণের নিকট পঞ্চদ্রাবিড়ের একচ্ছত্র নৃপতি হওয়ার একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষা সব সময়ই বিদ্যমান ছিল। এই উচ্চাকাঙ্ক্ষার একটি সার্থক রূপায়ণ দেখি একটি শিলালিপিতে,[৩২] যেখানে রাজেন্দ্র চোলকে "পঞ্চদ্রাবিড়েশ্বর" আখ্যায় ভূষিত করা হইয়াছে।

অনুরূপভাবে উত্তর-ভারতীয় ব্রাহ্মণগণকেও পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়। ইঁহারা হইতেছেন (১) সারস্বত (পূর্ব-পাঞ্জাবের সরস্বতী উপত্যকা অঞ্চলের সহিত সংশ্লিষ্ট), (২) কান্যকুব্জ, (৩) গৌড়, (৪) মৈথিল এবং (৫) উৎকল।[৩৩] পঞ্চগৌড়ের ধারণা উত্তর-ভারতে বেশ প্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত ছিল। হিউয়েন সাঙ্-এর উক্তি অনুযায়ী হর্ষবর্ধন বার বৎসর অক্লান্ত যুদ্ধবিগ্রহের পর "পঞ্চ ইণ্ডিসের" (Five Indies) নৃপতি হইয়াছিলেন। এই পঞ্চ ইণ্ডিসের অর্থোদ্ধার ঠিকমত করা না গেলেও হর্ষবর্ধনের রাজ্যসীমা দেখিয়া মনে হয় ইহা পঞ্চগৌড়কেই নির্দেশ করিতেছে। ৯২৬ খৃষ্টাব্দের এক শিলালিপিতে[৩৪] পঞ্চগৌড়ীয় অধিবাসীদের কথা বর্ণিত হইয়াছে। কল্‌হনের 'রাজতরঙ্গিণী'তে[৩৫] পঞ্চগৌড়ের উল্লেখ রহিয়াছে। কথিত আছে কাশ্মীরের রাজা জয়াপীড় পুণ্ড্র-বর্ধনের নৃপতি জয়ন্তকে "পঞ্চগৌড়ে"র সম্রাট হইতে সাহায্য করিয়াছিলেন।

গৌড় নামটি কোন কোন সময়ে সমগ্র উত্তর-ভারতের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইত। বিল্‌হন-বিরচিত 'ভোজপ্রবন্ধে' পরমার বংশের ভোজনৃপতিকে গৌড় ও দক্ষিণাপথের সম্রাট-রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।[৩৬] গৌড় এখানে সমগ্র উত্তর-ভারতের অর্থই বহন করিতেছে।

---

২৯ Ibid.

৩০ P. K. Paul : Early History of Bengal, p. 133.

৩১ The Sabdakalpadruma S. V. quotes the following verse from the Skanda Purāna in support of the list of five classes of Dravida Brāhmanas.

cf. "কর্ণাটাশ্চৈব তৈলঙ্গা (দ্রাবিড়া) গুর্জরা।
রাষ্ট্রবাসিনঃ।
অন্ধ্রশ্চ দ্রাবিড়াঃ পঞ্চ বিন্ধ্যদক্ষিণবাসিনঃ।"

৩২ South Indian Inscriptions, Vol. I. p. 113

৩৩ The Sabdakalpadruma, S. V. Gauda, quotes the following verse from the Skanda Purāna :

cf. সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা গৌড়মৈথিলিকোৎকলাঃ
পঞ্চগৌড়া ইতি খ্যাতা বিন্ধ্যস্যোত্তরবাসিনঃ।

৩৪ cf. Epigraphia Indica, Vol. XXXII,

৩৫ See Rājatarangini (clxa) 1150 A. D,) IV. 468.

৩৬ cf. পঞ্চাশৎ পঞ্চবর্ষাণি সপ্তমাসদিনত্রয়ম্।
ভোজরাজেন ভোক্তব্যঃ সগৌড়ো দক্ষিণাপথঃ।
(Bhojaprobandha, Calcutta ed. p. 3).

অধ্যাপক সরকার মনে করেন ভোজকে "চক্রবর্তী" নৃপতিরূপে উপস্থাপিত করিবার জন্যই এই সকল অতিরঞ্জিত বর্ণনার অবতারণা। "—Bhoja is represented as the lord of both the Chakravarti Kṣetras of the north and the south of India. ··· Here Bhoja merely claims to have been a Chakravarti which means nothing more than an imperial ruler of any part of India."[৩৭]

এইভাবে মনে হয় গৌড় ব্রাহ্মণগণ উত্তর-ভারতের বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া আছেন। উইলসন সাহেবের মতে পঞ্চগৌড়ের অন্যতম গৌড়দিগের আবাসস্থল ছিল দিল্লীসুবা হইতে পর্বত পর্যন্ত অঞ্চলসমূহে। এই গৌড় ব্রাহ্মণেরা নানাভাগে বিভক্ত ছিলেন, যথা—আধ-গৌড়, কৈথল-গৌড়, গুর্জর-গৌড়, সিধ-গৌড় প্রভৃতি প্রায় ৪২টি শাখায়। বাংলাদেশে ইহাদের কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায় না।[৩৮] ইহা ব্যতীত তিনি আরও দেখান[৩৯] যে দিল্লীতে এক শ্রেণীর কায়স্থ আছেন, যাঁদের গৌড়-কায়স্থ বলা হয়। ইহারা সম্ভবতঃ ত্রয়োদশ শতকে বাংলা হইতে আসিয়াছিলেন। রাজপুতগণের মধ্যে গৌড়-রাজপুত বলিয়া একটি শাখা আছে। উত্তর-পশ্চিম উত্তর-প্রদেশে ইহাদের অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। গৌড়তগা নামক অপর এক-শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে বসবাস করেন। গৌড়ঠাকুর নামক অন্য একটি রাজপুত-শাখা ফারাকাবাদে দেখিতে পাওয়া যায়। গৌড়তগাগণ মনে করেন যে, তাঁহাদের পূর্বপুরুষগণ রাজা জনমেজয় কর্তৃক বাংলাদেশ হইতে আনীত হইয়াছিলেন।

গৌড়দিগের আদি বাসস্থান কোথায় ছিল সে সম্বন্ধে নিশ্চিত করিয়া কিছু বলা যায় না। সারস্বতগণ (যাঁহারা উত্তর-পশ্চিম ভারতের সরস্বতীর উপকূলে বাস করিতেন) নিজেদের আদি গৌড় বলিয়া অভিহিত করেন।[৪০] কাহারো কাহারো মতে উত্তর-কোশলের গৌড়-ভূমি গৌড়গণের আদি নিবাস ছিল।[৪১] অধ্যাপক ভাণ্ডারকার[৪২] নাগর জাতির ইতিহাস-আলোচনা-প্রসঙ্গে "নাগর" নামধেয় প্রাচীন ভারতের এক জাতির কথা উল্লেখ করেন এবং তাঁহার মতে এই "নাগর" জাতিই কাল-ক্রমে ভারতের অন্যত্র ছড়াইয়া পড়ে। গৌড়-গণের সম্বন্ধে হয়তো একইভাবে বলা যায় যে, "গৌড়" নামক একটি প্রাচীন জাতি ভারতে বসবাস করিতেন। ধীরে ধীরে তাঁহারাই উত্তর-ভারতের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়েন এবং ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, রাজপুত ও গৌড়তগা সমাজে অনুপ্রবেশ করেন। এই মতবাদ কোন কোন ঐতি-হাসিকও স্বীকার করেন।[৪৩] ভারতের অন্যান্য স্থানের গৌড়গণ অপেক্ষা বাংলার গৌড়গণ বিশেষ করিয়া পাল-যুগে সর্বাপেক্ষা অধিক খ্যাতিসম্পন্ন হইয়াছিলেন। হয়তো এই কারণেই অন্যান্য স্থানের গৌড়গণ বাংলার গৌড়গণের সহিত নিজেদের সম্পর্ক স্থাপন করিতে প্রয়াসী হইতেন।

---

৩৭ Sircar : D. C. Geography of Ancient & Mediaeval India, p. 122.

৩৮ See Wilson's Glossary of Judicial and Revenue Terms : Under the Chapter "Brāhmana and Gaud".

৩৯ See Wilson's Indian Castes, Vol. II.

৪০ Ibid. Pp. 64-66

৪১ P. K. Paul : The Early History of Bengal, Pp. 131-36.

৪২ Prof. D. R. Bhandarkar's Nagar Brāhmanas and Kāyasthas of Bengal (Indian Antiquary, 1932, Pp. 41, 61)

৪৩ P. K. Paul The Early History of Bengal P. 136.

মিজো ও কাছাড় জেলার পাহাড়ী

স্বামী সুব্রানন্দ

আজকাল ভারতে আদিবাসীর ও অনুন্নত শ্রেণীর উন্নয়নের জন্ত বেশ সাড়া জেগেছে। সাড়া জেগেছে সরকারী-বেসরকারী উভয় দিক থেকেই। সমস্ত ভারতে এই পিছিয়ে-পড়া জাতির যে সংখ্যা কত তা বলা কঠিন। প্রত্যেক প্রদেশেই ওদের কিংবা পাহাড়ী জাতির বাসস্থান আছে। তন্মধ্যে বোধহয় আসামেই সর্বাধিক-সংখ্যক শ্রেণী বাস করে। "লোহিত সীমান্ত বিভাগ" থেকে আরম্ভ করে গারো পাহাড় পর্যন্ত এবং নেফা থেকে লুংলে পর্যন্ত কতইনা হিল-ট্রাইব্যাল, প্রেনট্রাইব্যাল ও অনুন্নত জাতির বাস।

আজ মিজো হিল ও কাছাড় জেলার এই সব জাতির সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক। এ দু'টো জেলারই পশ্চিম দিকে পূর্ব-পাকিস্তান, পূর্বে মণিপুর ও ব্রহ্মদেশ, উত্তরে উত্তর কাছাড় ও মিকির জেলা এবং দক্ষিণে ব্রহ্মদেশ। এ অঞ্চলের পাহাড়গুলো ঘনজঙ্গলাকীর্ণ, বিশেষত: মিজো ও নাগাপাহাড়। তাছাড়া উঁচু-নীচু এবং অসংখ্য নদী-নালা সমন্বিত। বহু স্থান শুধু দুর্গম নয়—অগম্যও। কাজেই এই স্থানের সত্য সংবাদ সরবরাহ করা সুকঠিন। যতদূর সম্ভব উচ্চ সরকারী কর্মচারীর চেষ্টাদ্বারা সংগৃহীত তথ্যই এই আলোচনায় প্রকাশিত হয়েছে।

যোগাযোগ-ব্যবস্থা অতিশয় শোচনীয়। কাছাড়ের সঙ্গে আসামের তথা ভারতের সংযোগ একটি রেলপথ আছে—৩২টি সুড়ং-এর ভেতর দিয়ে (অবশ্য ইহাও বারমাস চালু থাকে না এয়ারওয়ের মত), মিজো হিলের সঙ্গে তাও নেই। মিজোর সদর শহর আইজলের সহিত সুরমা উপত্যকার বিখ্যাত শহর শিলচরের যাতায়াতের একটি মাটির রাস্তা আছে। এ রাস্তাটি ভয়াবহ! এই ১২০ মাইল রাস্তা অতিক্রম করতে ৩ দিন থেকে ৭ দিন পর্যন্ত সময় লাগে কখনো কখনো। কাঁচা, কর্দমাক্ত, বালিময় এবং অতি সংকীর্ণ রাস্তা এটি। অতিশয় লজ্জার বিষয় যে আজ ২১।২২ বৎসর অতীত হ'ল আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি, কিন্তু পূর্ব সীমান্তের মত এত গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষত: মিজো হিলের মত জেলার সঙ্গে একটি রাস্তা এখনো তৈরি করা হয়ে উঠলো না। এই একমুখী সরু রাস্তায় সপ্তাহে এক-আধটি কনভয় যাতায়াত করে। আর তারই সঙ্গে থাকে অল্পসংখ্যক ট্রাক—যারা মাল ও যাত্রী বহন করে থাকে।

কাছাড ও মিজো পাহাড়ে প্রায় ১৭।১৮টি আদিবাসী জাতির বসতি আছে। যেমন—বর্মন, কাছাড়ী, মিকির, টিপরা, লুসাই, খাসিয়া, রিয়াং, কুকী, নাগা, মারপয়, পইতে, রাওতে, চাকমা, সাঁওতাল, মুর্মি ও কুর্মি প্রভৃতি। মিজোতে লোকসংখ্যা প্রায় পৌনে ৩ লক্ষ। তার মধ্যে লুসাই বা মিজোর সংখ্যা অধিক। তারা সকলেই খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী এবং ধর্ম সম্বন্ধে অতি গোঁড়া। লুসাই পাহাড়ে তাদের বসতি অধিক। তাছাড়া মণিপুর, কাছাড় এবং ত্রিপুরাতে আছে। শিক্ষিত শতকরা ৩০ জন (স্বজাতীয়দিগের মধ্যে শতকরা ৮৫ কিংবা ৯০)। উঁচু লম্বা গড়ন, ধারাল নাক-চোখ এবং রং পরিষ্কার। মেয়েরা অপেক্ষাকৃত বেঁটে। বেশ কর্মঠ। যুদ্ধবিশারদ জাতি। ভারত সরকারের সৈন্তবিভাগে তারা বিশিষ্ট স্থান দখল

করে আছে। সাধারণতঃ জুমচাষ-ই জীবিকা —চাকরি এবং ব্যবসাতে কিছুসংখ্যক লোক আছে। এখানে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, তাঁতে কাপড় বুনতে সমস্ত পাহাড়ী জাতি সিদ্ধহস্ত। মিজোরা বেশ আমোদপ্রিয়। বাহ্যিক আচার-ব্যবহার ভদ্র। পোশাক-পরিচ্ছদও পাশ্চাত্যদের অনুকরণে। খাদ্যাখাদ্যের ব্যাপারে তাদের নিজস্ব পদ্ধতি প্রচলিত। এ বিষয়ে শিক্ষিত, অশিক্ষিত, তিব্বতী, নাগা, মিসমী, মিজো সকলেই একরূপ। মিজো হিলে আর্থিক উন্নতিও এই সম্প্রদায়ের অধিক। তথাকথিত স্বাধীনতা-আন্দোলনে এই লুসাইগণ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত।

চাকমাদের আদি বাসস্থান চট্টগ্রাম, আরাকান প্রভৃতি সীমান্তদেশে। স্বাধীনতালাভের পর অন্যান্যদের মত তারাও চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। মিজো হিলে তারা সংখ্যায় প্রায় ২৫০০০। ধর্মে বৌদ্ধ। কিন্তু ঐ নামটি ছাড়া বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে অধিক কোন জ্ঞান তাদের আছে বলে মনে হয় না। শিক্ষিত শতকরা ৫ জন। নিরীহ এবং অতিশয় দরিদ্র। ঘাড়মোড়াতে উদ্বাস্তুদিগকে আর্থিক সাহায্য-দান করার সময় যতবার যত চাক্‌মা লোক দেখা গিয়েছে, সকলই অর্ধ-উলঙ্গ।

লাখের, লাওতে, পইতে, পয়, খাসিয়া প্রভৃতি জাতি চাকমাদের অনুরূপ। তবে তারা বৌদ্ধ নয়—খ্রীষ্টান। মিজো পাহাড়ে সংখ্যায় ৪০।৫০ হাজার। টিপরাগণ ওদের চেয়ে কিছুটা উন্নত হলেও লুসাই কিংবা মারদের সমকক্ষ নয়। সকলেই হিন্দু। ত্রিপুরাতে এ জাতি বেশ শিক্ষিত আছে। সেখানে তারা রাজবংশ। উচ্চ সরকারী পদে তাদের অনেকেই প্রতিষ্ঠিত। ভারতীয় সংস্কৃতিতেও তাদের যথেষ্ট দান আছে।

রিয়াংগণ শতকরা ২।৩ জন শিক্ষিত হয়েছে। সকলেই বৈষ্ণবধর্মে অনুরক্ত। মাথায় শিখা এবং গলায় মালা প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়। অতি দরিদ্র। ত্রিপুরাতে রিয়াং জাতিও আধুনিক সভ্যতার আলোক পেয়েছে। তাদের মধ্যে একজন মন্ত্রিপদেও অধিষ্ঠিত আছেন। মিজোতে প্রায় ১০ হাজার রিয়াং আছে।

মার ও কুকী মিজো ও কাছাড় জেলায় মিজোদের মতই প্রায়। আন্দোলনকারী মিজোদের সঙ্গে এই দুই সম্প্রদায় যুক্ত। তবে শিক্ষিতের সংখ্যা নগণ্য। বর্তমানে কাছাড়ের মারগণ দাবি করছে যে, তারা মঙ্গোলিয়ান। লুসাই বা মিজোদের সঙ্গে তাদের জাতিগত কোন সম্পর্ক নেই। এ নিয়ে একবার বেশ সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্যও হয়ে গিয়েছে। সবই খ্রীশ্চান। মার এবং কুকী কাছাড়ে যথেষ্ট, তবে সর্বাধিক মণিপুরে। কাছাড়ে দু'একটি পল্লী এখনও ধর্মান্তরিত হতে বাকী আছে। তারা আশুতোষ শিবের পূজা-অর্চনা নিজেদের পদ্ধতি অনুযায়ী কখনো কখনো করে। বর্তমানে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে।

কাছাড়ীদের পূর্বপুরুষ একদা কাছাড়ী রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। রাজধানী ছিল ডিমাপুর। তাঁরা ঘটোৎকচের বংশধর। বর্মনগণ অর্জুন-পুত্র রাজা বভ্রুবাহনের অধস্তন পুরুষ। রাজধানী কাছাড়ের চণ্ডীঘাট। এই বংশ-কাছাড়ে বহুকাল রাজত্ব করেছে। বর্তমানে তাদের পূর্বগৌরবের কিছুই অবশিষ্ট নেই। ভারত সরকারের উন্নয়নমূলক কার্যাবলীতে বর্মন এবং কাছাড়ী 'ট্রাইব্যাল' নামে অভিজ্ঞাত। তবে তার পূর্বে একটি বিশেষণ দেওয়া হয় "প্লেন।"

সমাজের উচ্চশ্রেণীর কিংবা সরকারের কোন পক্ষ থেকেই এতদিন পর্যন্ত এই অনুন্নত পাহাড়ী বা আদিবাসী জাতির উন্নয়নমূলক

ব্যবস্থা বিশেষ করা হয়নি। বরং ইংরেজগণ বাহ্যতঃ বেসরকারীভাবে তাদের যথেষ্ট সাহায্যাদি করেছেন—এবং এখনও করছেন। অশিক্ষিতদের শিক্ষা, রোগীদের চিকিৎসা এবং দরিদ্রের অর্থাদি সবই তাঁরা দিয়েছেন। আরো দিয়েছেন বেশভূষা, আচার-ব্যবহার। তাদের এই প্রচুর দানের কথা আদিবাসী তথা ভারতবাসী কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ রাখবে। কিন্তু এই অযাচিত দানের প্রায় সবই বিফল, কারণ ইহা একটি মাত্র উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। যত দিন যাচ্ছে ভারতবাসী ততই মর্মে মর্মে তার কুফল উপলব্ধি করছে। ভারতের বিরাট দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আজ ছিন্নভিন্ন - সর্বাঙ্গে রক্তসঞ্চালন প্রায় বন্ধ।

তবে দোষ-ত্রুটি আমাদেরও আছে বইকি যথেষ্ট। শত শত বৎসর যাবৎ অন্যান্য জাতির দ্বারা শাসিত বলেই হোক কিংবা অন্য যে কোন কারণেই হোক আমরা আমাদের দায়িত্বজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম। ৭০।৭৫ বৎসর পূর্বে যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দ জীমূতমন্দ্রে এবিষয়ে কত কথাই বলে গেছেন—আমাদের কর্তব্যজ্ঞান উদ্বুদ্ধ করবার জন্য। কিন্তু আমরা সচেতন হইনি। মোহনিদ্রা আমাদের ভঙ্গ হয়নি। তিনি বলেছিলেন—"যতদিন ভারতের কোটি কোটি লোক দারিদ্র্য ও অজ্ঞানান্ধকারে ডুবে রয়েছে, ততদিন তাদের পয়সায় শিক্ষিত অথচ যারা তাদের দিকে চেয়েও দেখছে না, এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমি দেশদ্রোহী বলে মনে করি।" বলেছিলেন এদের উন্নত করতে; বলেছিলেন, এরাই নূতন ভারত গড়বে। ত্রিকালজ্ঞ মুক্তপুরুষ স্বামীজীর সাবধানবাণী শুনলে আজ ভারতের এ অবস্থা হত না বলেই আমাদের বিশ্বাস। ঝোড়-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বতেই হোক বা কারখানাতেই হোক এই সমস্ত দীন দরিদ্র ও অশিক্ষিতদের প্রাপ্য যদি আমরা স্বেচ্ছায় প্রদান করতাম, তাহলে অটল জীবনীশক্তি ও সিংহসম বিক্রম নিয়ে তারা অনায়াসে নূতন অখণ্ড ভারত গড়ে তুলত। উন্নত অনুন্নত সকল শ্রেণী হাত ধরা-ধরি করে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ভারতের দিকে অগ্রসর হ'ত। স্বামীজী সর্বত্রই 'ভারত' কথাটি ব্যবহার করেছেন, আমরা ভারতকে নানাভাবে খণ্ড বিখণ্ড করছি। সত্যি তারা এখন জেগেছে—বেরুচ্ছে শুধু এখানে নয়, ভারত জুড়ে। তবে স্বাভাবিক ক্রমোন্নতির পথে নয়—পিচ্ছিল পথে, গড়ার পথে নয়—ধ্বংসের পথে।

সম্প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ভারত সরকারের অর্থসাহায্যে নেফাতে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে সেবাকার্যে নেমেছেন। কাছাড় জেলাতে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের শাখা আশ্রম শিলচর পাহাড়ীদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি-সাধনকল্পে সীমাবদ্ধ কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করেছেন, ঘাড়মোড়া নামক স্থানে মিজো উদ্বাস্তুদিগকে অর্থসাহয্যের ব্যবস্থা হয়েছে। গৃহীতাদের মধ্যে প্রায় সবই নিঃস্ব রিয়াং ও চাকমা। ঘাড়মোড়া থেকে মাত্র তিন মাইল দূরে ধলেশ্বরী নদীর পরপারে মিজো হিল। এই সব বাস্তুত্যাগীদের দুর্দশা বর্ণনাতীত। তাদের যেমন নেই বসবাসের স্থান, জুম চাষের স্থান, তেমন নেই পাহাড়ে জঙ্গলে খেটে খাবার সুযোগ সুবিধা। জঙ্গলের ফল মূল, ঘাস পাতা খেয়ে না খেয়ে অতি কষ্টে দিনাতিপাত করছে। শিক্ষা-দীক্ষা, চিকিৎসাদিলাভ তো বহু দূরের কথা। এই কর্মপদ্ধতিতে স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যেও আছে ৩,৪টি পুঞ্জী। দলিয়া হিল, সুবং, ফুলের তল ও দোয়ারবন্ধ প্রভৃতি। ইহারা জাতিতে মার ও কুকী এবং ধর্মে হিন্দু ও খৃষ্টান। তাদের চাষ আবাদ, পশুপালন, চিকিৎসা ও সর্বোপরি শিক্ষাদানের ব্যবস্থাদি করা হচ্ছে। শিক্ষাব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার যথোপযুক্ত সাহায্য প্রদান করছেন।

জাতীয় সংহতি কথাটি আজকাল প্রায়ই ব্যবহৃত হয়। এখানকার এই সব লোকগুলি যাতে নিজেদের সাংস্কৃতিক ও আর্থিক দিক থেকে ভারতের সঙ্গে এক বলে অনুভব করতে পারে, তার দিকে নজর না দিলে সংহতি আসবে কোথা থেকে

ইতিহাসের মহাসন্ধিক্ষণ ও শ্রীরামকৃষ্ণ

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত

যে মুক্তিসংগ্রাম আজকের মানুষ করছে তার ভিত্তি এই মানবতাবাদে। সেজন্য আজকের মুক্তিসংগ্রামে নেতৃত্ব শ্রীরামকৃষ্ণের—একথা আজকের বিভ্রান্ত তরুণ সমাজের সম্মুখে তুলে ধরা আমাদের বিশেষ দায়। আজকের যে মুক্তির স্বপ্ন ও সাধনা তা একটি যুগপ্রবণতা। তা কোন বিশেষ দেশে, তা বিশেষ কোন একটি দু'টি মানুষের চেতনায় ধরা দেয়নি। তা একই সময় বিভিন্ন দেশের লোকনায়কদের এবং চিন্তাবিদদের চেতনায় ধরা দিয়েছে। Marx ও Engels তাঁদের Communist Manifesto রচনা করেন '৮৫০ সালের কাছাকাছি। তার কিছুকাল পূর্বেই ভারতের রাজা রামমোহন রায় স্বাধীনভাবে পৃথিবীর সকল জাতির ইতিহাস অধ্যয়ন করে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হন—"পৃথিবীর প্রত্যেক জাতির মধ্যেই মুষ্টিমেয় কতকগুলি ক্ষমতাশালী লোক সেই দেশের অধিকাংশ লোকের উপর জুলুম করে; আর ঐ অত্যাচারিত প্রপীড়িত অধিকাংশ লোক ঐ মুষ্টিমেয় অত্যাচারী স্বদেশীয়দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। সুতরাং···প্রত্যেক জাতির মধ্যেই অত্যাচারী ও অত্যাচারিত লোক আছে। বস্তুতঃ কলহ হইতেছে আদর্শের, কলহ হইতেছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের, অবিচারের বিরুদ্ধে সুবিচারের, অত্যাচারের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার।" রামমোহন মার্কসের পূর্বেই পৃথিবীর প্রত্যেক জাতির মধ্যে অত্যাচারিত জনগণের মুক্তি-সংগ্রামের কথা ঘোষণা করেছিলেন।

রামমোহন যার ইঙ্গিত দিয়ে গেলেন, তাকে এক বৈজ্ঞানিক সমাজবাদে রূপ দিলেন বিবেকানন্দ। সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ তিনি উদ্ঘাটন করেছেন তাঁর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে। আগামী যুগের মুক্তি সংগ্রাম সম্বন্ধে নির্ভুল সিদ্ধান্ত দিয়ে 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থে তিনি বলেন—"এমন সময় আসিবে যখন শূদ্রত্বের সহিত শূদ্রগণের প্রাধান্য ঘটিবে।" 'পরিব্রাজক' গ্রন্থে এই ভবিষ্যৎ নূতন সমাজের রূপ আরও স্পষ্ট, যেখানে তিনি বলেছেন—"তোমরা (উচ্চ-বর্ণেরা) শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনা-ওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে।"

বিবেকানন্দের উত্তরসাধক শ্রীঅরবিন্দ। শ্রীঅরবিন্দও এ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট চিন্তা দিয়ে গিয়েছেন বিগত শতাব্দীর শেষভাগে। ১৮৯৩ সালে লেখা এক প্রবন্ধে তিনি বলেন, "The proletariat among us is sunk in ignorance and overwhelmed with distress. But with that distressed and ignorant proletariat···resides···our sole assurance of hope, our sole chance in the future." প্রায় অভ্রান্ত ভবিষ্যৎ দৃষ্টি প্রয়োগ করে এই প্রবন্ধে তিনি আরও ঘোষণা করেন—"অন্ধকারে আচ্ছন্ন এই proletariat দের মধ্য হইতে ভবিষ্যতে এক অতি ভয়ঙ্কর বিপ্লব (terrible, awful, bloody, disastrous) প্রধূমিত হইয়া উঠিবে।" অপর একটি প্রবন্ধে একই কথা

আরও তুলনাহীন ভাবে ব্যক্ত করলেন, "The waters of the great deep are being stirred, and the surging chaos of the primitive man over which our civilised societies are superimposed on a thin crust of convention, is being strangely and ominously agitated." সমুদ্রের গভীর তলদেশে যে আলোড়ন ঘটছে তারই ফলে কৃত্রিম সভ্য সমাজে বিপুল বিস্ফোরণ ঘটবে।

শ্রীঅরবিন্দ এইজন্য বিপ্লবপন্থায় বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু তিনি সবসাধারণের এই মুক্তি-সংগ্রামের জন্য দেশ, জাতি ও জাতীয় সংস্কৃতিকে বিসর্জন দেবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই, কারণ তাঁর প্রেরণা ও ধারণার মূলে ছিলেন রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ। তাঁর নিম্নলিখিত উক্তির মধ্যে তার প্রমাণ পাওয়া যায়—"যাঁহার পদস্পর্শ পৃথিবীতে সত্যযুগ আনয়ন করিয়াছে, যাঁহার স্পর্শে ধরণী সুখমগ্না, যাঁহার আবির্ভাবে বহুযুগসঞ্চিত তমোভাব বিদূরিত, যিনি পূর্ণ, যিনি যুগধর্মপ্রবর্তক, যিনি অতীত অবতার-গণের সমষ্টিস্বরূপ, তিনি ভবিষ্যৎ ভারত দেখেন নাই বা তৎসম্বন্ধে কিছু বলেন নাই, একথা আমরা বিশ্বাস করি না। আমাদের বিশ্বাস, যাহা তিনি মুখে বলেন নাই তাহা তিনি কার্যে করিয়া গিয়াছেন। তিনি ভবিষ্যৎ ভারতের প্রতিনিধিকে আপন সম্মুখে বসাইয়া গঠিত করিয়া গিয়াছেন। এই ভবিষ্যৎ ভারতের প্রতিনিধি স্বামী বিবেকানন্দ। অনেকে মনে করেন যে, স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশপ্রেমিকতা তাঁহার নিজের দান। কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহার স্বাদেশিকতা তাঁহার পরমপূজ্য-পাদ গুরুদেবেরই দান। তিনিও নিজের বলিয়া কিছুই দাবি করেন নাই। লোকগুরু তাঁহাকে যেভাবে গঠিত করিয়াছিলেন, তাহাই ভবিষ্যৎ ভারতকে গঠিত করিবার উৎকৃষ্ট পন্থা।" শ্রীঅরবিন্দের একথাগুলি থেকে সুস্পষ্ট যে, সমাজের গভীরে যে রূপান্তরের প্রক্রিয়া চলেছে, যে মানবিক অধিকার-প্রতিষ্ঠার দিকে প্রবণতা আধুনিক জগতের, আধুনিক ভারতে তার নেতৃত্ব শ্রীরামকৃষ্ণের। মনীষিমনে সেকথা সে প্রথম যুগেই উদ্ভাসিত হয়েছিল। কিন্তু তাঁর পন্থা অন্য। নূতন যুগে নূতন প্রথা-প্রতিষ্ঠান-সমূহের মধ্যে কি করে জাতীয় জীবনধারা অব্যাহত থাকবে তারও পথপ্রদর্শক তিনি। তার পরিচয় বিবেকানন্দের ব্যাখ্যায় পাওয়া যায়, বিবেকানন্দের মানসকন্যা নিবেদিতার ব্যাখ্যায় পাওয়া যায়। বিবেকানন্দের ব্যাখ্যাকে অনুসরণ করে নিবেদিতা তাকে যেরূপে প্রকাশ করেছেন তা এখানে উল্লেখ্য। নিবেদিতা তাঁর জোরালো ভাষায় বলছেন—"Does it matter that instead of offering worship, we are to turn henceforth with gifts of patient service, of food, of training, of know-ledge to those who are in sore need? If 'All that exists is One', then all paths alike are paths to that Oneness. Fighting is worship as good as praying. Labour is offering as acceptable as Ganges water. Study is austerity more costly and more precious than a fast. Mutual aid is better than any Puja."। পূজার বদলে মানবসেবা—নূতন যুগের এই নূতন ধর্ম আমাদের একই লক্ষ্যে উপনীত করবে।

সেইজন্য রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের চরণাশ্রিত নিবেদিতাকেও আমরা পেলাম বিপ্লবিরূপে। বিপ্লবী নিবেদিতা সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন—

"যখন বিপ্লব সম্বন্ধে কথা বলতেন, যেন তাঁর আত্মাই,—তাঁর খাঁটি স্বরূপ—বেরিয়ে আসত, তাঁর পুরো মন ও প্রাণ ভাষায় ব্যক্ত হত।" নিবেদিতাই ভারতে Trade-Unionism (শ্রমিক-সংগঠন)-এর আদি প্রচারক। ভারতে প্রথম Trade Union সংস্থা স্থাপিত হয় ১৯১৮ সালে, নিবেদিতার তিরোধান ১৯১১ সালে। তার পূর্বে তিনি Trade Union মতবাদ প্রচার করে গিয়েছেন। একটি নিপুণ আলোচনায় তিনি বলেন, "We are enterinng on a new period in which mutual aid, co-operation and self-organisation is to be motto." এবং তাঁর 'Hints on National Education' গ্রন্থে সুস্পষ্ট,—"Trade union, peasants' union, rate-payers' association, government employees' union"-এর নামোল্লেখ করে বলেছেন—"They would be useful agencies for fighting out most cases of oppression and corruption."—এসকল সংস্থা অত্যাচার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের সহায়ক সংস্থা। নিবেদিতা এই বিপ্লববাদ প্রচার করেছেন তাঁর অদ্বৈতবাদের দৃঢ়ভিত্তিভূমির উপর দাঁড়িয়ে। অতীতকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে নয়, অতীতকে সঙ্গে নিয়ে। অতীতের মালমসলা দিয়েই বর্তমানে বসে ভবিষ্যতের এক মানবতার মহানগরী নির্মাণ করতে চেয়েছেন।

আজ অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এসকল পূর্বসূরীদের সঙ্গে বর্তমান কালের তরুণ-সম্প্রদায় সংযোগ হারাতে বসেছেন। এ সংযোগ হারালে তাদের সংগ্রাম জয়যুক্ত হবে এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। আজ তাঁরা যে সংগ্রাম করছেন, তাকে তাদের হাতে যাঁরা তুলে দিয়ে গিয়েছেন, তাঁদের বিস্মৃত হওয়া দুর্ভাগ্যের—একথা তাঁদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া আমাদের বিশেষ দায়। শ্রীরামকৃষ্ণ সকল মানুষকে মনুষ্যত্বে অধিকার দিয়েছেন, তাঁর বাণীই তাঁর উত্তরাধিকারী শিষ্যমুখে উচ্চারিত—"কেউ ছোট নয়, কেউ তুচ্ছ নয়, কেউ পাপী নয়, সকলেরই বড় হবার এবং মহান হবার অনন্ত সম্ভাবনা আছে।" শ্রীরামকৃষ্ণ যে মুক্তির কথা বলেছেন তা সর্বাঙ্গীণ মুক্তির, বিবেকের বা ব্যক্তি-স্বাধীনতার বিনিময়ে কেনা সামাজিক বা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা তা নয়। মানুষের কল্পনায় আজ যে স্বাধীনতার ধারণা অধিষ্ঠিত, শেষোক্তরূপ সঙ্কীর্ণ স্বাধীনতা কখনও সে স্বাধীনতা নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ যে স্বাধীনতার কথা বলেছেন তা সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, সর্বোপরি তা বিবেকের স্বাধীনতা। আজ যদি এই স্বাধীনতার ধারণা আমরা হারিয়ে ফেলি, আবার কঠিন আয়াসে একে আমাদের ফিরে পেতে হবে। একথা অন্ততঃ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নাম যাঁরা গ্রহণ করেন, তাঁরা উপলব্ধি করুন। উপলব্ধি করে নিজেদের দায়-বহনে অগ্রসর হোন। আমরা আজ অনেক আদর্শের নাম লই, কার্যতঃ স্বার্থচর্চায় নিমগ্ন। বিবেকানন্দের অগ্নিসত্তার স্পর্শ লাভ না করে যারা কেবল তাঁর নাম লয়, তারা বিবেকানন্দের ভক্ত নয়। তাঁর ধর্ম ত্যাগ ও সেবা উদ্ভূত শক্তি। সুতরাং তাঁর নাম নিতে হলে এই শক্তিমন্ত্রে সঞ্জীবিত হতে হবে।

ভারতের জাতীয় ঐক্য

শ্রীসুখরঞ্জন চক্রবর্তী

একটি জাতীয় জীবনের সবচেয়ে বড় বিপর্যয় হলো পরস্পরকে বোঝার অক্ষমতা। যদি কোন জাতি সেই জাতিমধ্যস্থিত সকলকে সম্পূর্ণরূপে জানতে না পারে, বুঝতে না পারে তবে তার চেয়ে বড় লোকসান আর তার নেই। এ লোকসানের অঙ্ক ক্রমশঃ স্ফীতকায় হতে হতে একদিন এমন এক বিপদ এসে দাঁড়ায় যখন তা থেকে আর সেই জাতিকে কোনরকমেই বাঁচানো যায় না। কাজেই কোন জাতিকে সুগঠিত হতে হলে তার মধ্যকার এই অন্তরায়-সৃষ্টিকারী বিষয়-গুলিকে সম্পূর্ণরূপে অনুসন্ধান করতে হবে। তাকে বুঝতে হবে, তারপর প্রয়োজনমত তাকে সমূলে উৎপাটন করতে হবে।

অনেক সময় দেখা যায় অনেক বাহ্যিক কারণে জাতীয় সংহতি বিঘ্নিত হয়ে থাকে—ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা একটা জাতির মধ্যে বিরোধের ও বিভিন্নতার প্রাচীর তুলে দেয়। একদিন এই প্রাচীর-প্রবর্তনের প্রচণ্ড প্রত্যাঘাত সহ্য করতে হয়েছে সভ্যতার লীলাক্ষেত্র গ্রীসদেশকে। রাশিয়ারও সুদীর্ঘকালের অগ্রগতি অপেক্ষা করে দাঁড়িয়েছিল এই বিচ্ছিন্নতার জন্যই। ব্রিটেনের ইতিহাসেও আমরা অনুসন্ধান করেছি এই বাহ্যিক অনৈক্যের সূত্রগুলিকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোনদিন গ্রীস, রাশিয়া আর ব্রিটেন তাদের আভ্যন্তর বিচ্ছেদের গলি-উপগলিকে স্পষ্ট-রূপে প্রকাশ করে জাতীয় ঐক্যের মহান রাজপথকে পরিকীর্ণ করে দেয়নি। গ্রীস যখন পারস্যের সঙ্গে লড়াই করেছে, ডেলফির মন্দিরে পুজোপচার নিয়ে গেছে, অলিম্পিক খেলাতে মিলিত হয়েছে, গৌরব অনুভব করেছে হেলেনের বংশজাত বলে, তখন তাতে তার যে মহান জাতীয় সংহতি সংরক্ষিত হয়েছে তাতে কোন বাহ্যিক প্লাবন এসে আঘাত হানতে পারেনি। রাশিয়া যখন একটানা শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে, তারপর সেই সংগ্রামের শেষে তার বিস্ময়কর গঠনের কাজে হাত লাগিয়েছে তখন কি একবারও তার মনে হয়েছিল আজারবাইজানের সঙ্গে কাজাগিস্তানের বর্ণসঙ্কর ঘটেনি? কিংবা ব্রিটেন যখন সমস্ত দুনিয়ার উপর তার আধিপত্য বিস্তার করছিল তখন কি একবারও তার মনে হয়েছিল স্কটল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড আর গ্রেটব্রিটেনের সংহতি সুদৃঢ় হবার নয়? সম্ভবতঃ এ চিন্তা এদের কারোরই ছিল না। থাকলে পরে এদের উন্মেষ এমন বিপুলাকার হতে পারতো না কোনদিন। যাদের কোন উন্মেষ ঘটে না, তারাই ক্ষুদ্রত্বের জালে বাঁধা পড়ে, হাসাহাসি করে পরস্পরে। প্রবাহ বিলুপ্ত হলেই পঙ্ক জন্মে।

আজ দেখা যাচ্ছে ভারতবাসীর জীবনেও যেন এই প্রবাহ কমে আসছে। আমরা সম্মুখের টানে চলাকে স্থির করে দিয়ে পারিপার্শ্বিকের আন্দোলনেই বড় বেশী ব্যস্ত, বড় বেশী মুখর হয়ে পড়েছি। ফলে বিভেদের ও বিচ্ছিন্নতার ডাঙ্গা জেগে উঠেছে ইতস্ততঃ—আসামে অ-আসামীর নিধন ও বিতাড়ন, জব্বলপুরে বিগত দাঙ্গাহাঙ্গামা, কিছুদিন পূর্বের পাঞ্জাবী সুবার আন্দোলন আমাদের

কোন মহৎ প্রয়োজনে, কোন মহৎ উপলব্ধির প্রেরণা থেকে সংগঠিত হয়নি। এ কেবল পরস্পর পরস্পরকে না বোঝার মূঢ়তা থেকেই উদ্ভূত। আর যতদিন এই বোঝাবুঝিটা একটা সুস্থ সীমারেখায় উপস্থাপিত না হবে ততদিন এ ধরনের বিভেদমূলক বিপর্যয়ের হাত থেকে আমাদের কোন মুক্তি নেই, আত্মহননের কবল থেকে পরিত্রাণ নেই। তবে হতাশ হওয়াই একমাত্র বিধিলিপি বলে মেনে নিলেও চলবে না। আমরা বিশ্বাস করি ভারতবর্ষ নামক এত বড় একটা দেশ কখনই এই সাম্প্রতিক কলহকে চিরন্তন বলে মেনে নেবে না। দূর অতীতের দিকে তাকালেই দেখতে পাবো যে, এ ধরনের অনৈক্য ভারতবর্ষের ঐতিহ্য নয়। অনৈক্য-বিধায়ক এইসব ঘটনাই অত্যন্ত সাময়িক এবং অদূরদর্শিতা, অনুদারতা ও দুর্বলতা-প্রসূত।

আধ্যাত্মিক আবেদন

ভারতবর্ষের জাতীয় ঐক্যের পথে আপাত দৃশ্যমান অনেক বাধা রয়েছে। বহু ভাষা, বহু গোষ্ঠী ও বহু বর্ণ অধ্যুষিত এই দেশ। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সম্প্রীতি যেভাবে তিল তিল করে গড়ে উঠেছে তা' বোধহয় পৃথিবীর অন্য কোথাও গড়ে ওঠেনি। ভারতবর্ষের ঐক্যের মূলকথা হলো তার আধ্যাত্মিক আবেদন। আর সংস্কৃত ভাষা এই আবেদনকে সমগ্র ভারতে পরিবেশন করে এসেছে অতি প্রাচীন কাল থেকে। আমাদের প্রপিতামহরা ভারতবর্ষকে কল্পনা করেছেন এক বিরাট দেহ, অখণ্ড পুণ্যভূমিরূপে। ভারতভূমির উপলব্ধি তাঁরা দেবাত্মভূমির অনুভবে অবিচ্ছিন্ন করে তোলার জন্য প্রতিটি ধর্মানুষ্ঠানের পূর্বে অখণ্ড ভারতের কল্পনাকে মন্ত্রোচ্চারণের পবিত্র আবেগে সমৃদ্ধ করে তাই বলেছেন—

গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্মদে সিন্ধু-কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥

এই আধ্যাত্মিক আবেদন কেবলমাত্র নদনদী পাহাড় পর্বতকেই আচ্ছন্ন করে নয়, ভারতের বিভিন্ন নগরগুলিকে পর্যন্ত আমাদের মুনিঋষিরা ধর্মসাধনার মন্ত্রে একাত্ম করে গেঁথে দিয়েছেন :

অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ॥

শংকরাচার্য উত্তরে যোশীমঠ, দক্ষিণে শৃঙ্গেরী-মঠ, পূর্বে পুরী ও পশ্চিমে দ্বারকাকে সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থভূমিরূপে ঘোষণা করে ভারতের অখণ্ডতা-বোধকে সকল ভারতবাসীর চিত্তপ্রান্তে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন। বাহান্নটি পীঠস্থানের যে বিস্তৃতি সেই বিস্তৃতির মূলেও রয়েছে ভারতের অখণ্ডতাবোধ।

তা ছাড়া ভারতের সমাজজীবনে যে মাতৃতান্ত্রিক প্রভাব, জন্মভূমিকে মাতৃভূমি বলে উপলব্ধি, তার আবেদন অব্যাহত রয়েছে সর্বত্র—হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত। এই আধ্যাত্মিক উপলব্ধিই ভারতবর্ষকে সমস্ত বাহ্যিক অসংগতির পরপারে ঐক্যবদ্ধ রেখেছিল। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ভারতবিদ্যার ব্যাপক চর্চা হচ্ছে। ভারতবর্ষ সম্পর্কে বৈদেশিকদের আগ্রহ ক্রমশঃ তীব্রতর হচ্ছে, কিন্তু ভারতবর্ষে ব্যাপকভাবে ভারতীয় দর্শন ও ধর্মের চর্চা হচ্ছে বলে মনে হয় না। সংস্কৃত শিক্ষাকে শিক্ষাব্যবস্থা থেকে ক্রমশঃ পিছিয়ে দেওয়ার ফলে তা আরও কমে যাচ্ছে। আমাদের বেদ, পুরাণ, উপনিষদ্ ইত্যাদি প্রাচীন শাস্ত্রের মধ্যে যে ঐক্যের সুর একদা ভোরের ভৈরবী শুনিয়েছিল তা' সন্ধ্যার পূরবীতে বিলুপ্ত হবার পূর্বেই পশ্চিমের মত্ত সুরের তান লেগে সুর

কেটে গেছে একদিন। কিন্তু আজ ভারতবর্ষকে আবার সেই হারানো সুরের সন্ধান করে অস্থরা আর সঞ্চারীকে নিয়ে একটা পরিপূর্ণ ঐকতান গড়ে তুলতে হবে। মনে হয় এর সহায়তার জন্য অন্ততঃ আগের মতো স্কুলের সীমাপর্যন্ত সংস্কৃত শিক্ষাকে আবশ্যিক রাখা একান্ত প্রয়োজন; কেবলমাত্র যন্ত্রশিল্পের অভ্যুত্থানে এত বড় একটা দেশ, এত বড় একটা সভ্যতা দৃঢ়তর হবে বলে মনে হয় না। একে বাঁচাতে গেলে, ভারতের জাতীয় ঐক্য দৃঢ়তর করতে হলে তার একদা যা ছিল তাকেও প্রতিটি মানুষের চিত্তপ্রান্তে সহজ সরল ভাবে পৌঁছে দিতে হবে।

পঞ্চায়েতী সমাজব্যবস্থা

ভারতের সমাজজীবনে পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা সকল প্রকার উত্থান-পতনের মধ্যেও ভারতের গ্রামজীবনকে সুগঠিত করেছিল। ভারতের বহু রাজ্য এবং রাষ্ট্রের উত্থান-পতন ঘটেছে, কিন্তু ভারতবাসীর মনে কখনো অখণ্ড ভারতীয়তা-বোধের বিলুপ্তি ঘটেনি। পঞ্চায়েতী সমাজ-ব্যবস্থারও অবসান ঘটেনি। আজও দেখা যায় ভারতবর্ষের অসংখ্য গ্রাম্য সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করছে পঞ্চায়েতী সমাজব্যবস্থা। আজ তাই ভারতীয় ঐক্যকে যদি দৃঢ়তর করতে হয় তবে একদা যে পঞ্চায়েতী সমাজব্যবস্থা ভারতের গ্রামগুলিকে একত্র করেছিল তাকেই অটুট রাখতে হবে। এই ব্যবস্থায় যদি কোন সুমঙ্গল দেখা না যায় তখনই পাশ্চাত্য ধরনের সরকার-প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন উঠছে। কিন্তু তার আগে নয়। কেননা এই পঞ্চায়েতী সমাজব্যবস্থাই রক্তবহা ধমনীর মতন সমস্ত ভারতবর্ষের গ্রাম্য জীবনকে সজীব ও সরস করে রাখবে বলে আমরা মনে করি।

সকল ভাষার সম-উন্নয়ন

ভারতবর্ষের ঐক্যপ্রতিষ্ঠার সবচেয়ে বড় বাধা হলো ভাষা। কিন্তু মনোভঙ্গিমা যদি স্বচ্ছ থাকে, উদার হয় তবে ঐ ভাষাগত বাধাকেও বাধা বলে মনে হবার কোন যথার্থ হেতু নেই। কেবল কোন একটি ভাষার আনুকূল্য বিধান করে কখনো কোন দেশ দৃঢ়তর হতে পারে বলে মনে হয় না। সেজন্য সকল ভাষারই সম-উন্নয়ন প্রয়োজন। তা ছাড়া আর এক দিগন্ত থেকে যে রব উঠেছে ভাষাভিত্তিক রাজ্য-পুনর্গঠনের, তাকেও ব্যক্তিগতভাবে শ্রদ্ধেয় বলে মানতে পারি না। কেননা তাতে করে গোষ্ঠীচিন্তা ও ক্ষুদ্র স্বাদেশিকতাই প্রাধান্য লাভ করবে। এর পিছনে ভারতের যে জনপ্রিয় নেতারই ইচ্ছা থাক না কেন, তাকে কোনদিন সুস্থ এবং সুদূরপ্রসারী চিন্তার নিদর্শন বলে গ্রহণ করা যায় না। যায় না তাকে গ্রহণ করা কোনদিন তিমিরবিদারী উদার অভ্যুদয়-সৃষ্টিকারী আলোকবর্তিকা বলে, কারণ ভাষা নিয়ে একপেশে জাতি-সমর্থনের রক্তাক্ত ইতিহাস আমাদের স্মৃতিপটে এখনো লেখা আছে। ভাষাগত সংখ্যালঘুদের জন্য গঠিত যে কমিশন রয়েছে, বলতে বাধ্য হচ্ছি, তাকে নির্বিকার দর্শকের ভূমিকা মাত্র না নিয়ে আরও সক্রিয় হতে হবে। রাজ্যভাষা-প্রসারের নামে সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের সুযোগ অবশ্য রুদ্ধ না করে আরও অবারিত করার চেষ্টা হচ্ছে। আসাম, বোম্বাই, বিহার, উড়িষ্যা প্রভৃতি রাজ্যে বাংলাভাষা-ভাষী লোক বহুল পরিমাণে থাকা সত্ত্বেও আজ সেখানে এই ভাষাশিক্ষার তেমন সুযোগ নেই, এই দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি।

রাষ্ট্রভাষারূপে হিন্দীভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে উগ্রতাকে অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হবে। এ ব্যাপারে আমাদের রাষ্ট্রনায়কদের যেন কোন প্রকারের অনুদার এবং সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী না থাকে।

পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়ন

ভারতীয় ঐক্যের আর একটি প্রয়োজনীয় অভিধা হলো পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়ন। অনেকে হয়তো বলবেন এর জন্য তো সরকার তপশিলী সম্প্রদায় ও জাতির জন্য সংরক্ষিত অধিকার মেনে নিয়েছেন কিন্তু ওটাই যথেষ্ট ব্যবস্থা বলে অন্ততঃ মনে করতে পারি না। পারি না এই কারণে যে, তাতে বর্ণবিভাগ এবং বংশকৌলিন্যকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে প্রকারান্তরে। সুবিধাবাদী দলগুলি জাতিভেদপ্রথাকে তীব্রতর করে জাতিবৈরিতার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছে। এভাবে কোন সমস্যার সমাধান হতে পারে না। এর জন্য সরকারকে আরও সক্রিয় হয়ে পিছিয়ে-পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য একটি সমীক্ষাদল গঠন করা এবং তাদের সামাজিক, আর্থিক ও শিক্ষাগত উন্নয়নের পরিকল্পনার মাধ্যমে আরও পাকাপোক্ত করে গড়ে তোলাই উচিত। এই পথেই তাদের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন সম্ভব। তা ছাড়া এতাবৎ সরকার তপশিলী জাতি ও সম্প্রদায়ের অধিকার-সংরক্ষণের যে ব্যবস্থা করেছেন, সেই পথে কিছু অতিরিক্ত ভিক্ষা ছাড়া অন্য কিছুই জুটবে না বলেই মনে করি। একটি জনসম্প্রদায়কে তাতে চিরকাল কোণঠাসা করে রেখে বুঝতে এবং ভাবতে দেওয়া হবে যে তারা যথেষ্ট যোগ্য নয় এবং তাদের সমস্ত কিছু ভাল মন্দ কোন অপেক্ষাকৃত ভাল এবং ক্ষমতাবান প্রভুর হাতেই নির্ভরশীল। এ মনোভাব অবিলম্বে বর্জন করতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন হলে বলতে হবে, ভিক্ষায়াং ন কর্তব্যম্।

সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান

ভারতীয় ঐক্যের মূলসূত্র যার উপরে সবচেয়ে বেশী নির্ভর করছে বলে মনে করি তা হলো সংস্কৃতির আদান-প্রদান। ভারতের জাতীয় সংহতি এবং ঐক্যপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গীর কার্যকারিতাই রয়েছে সবচেয়ে বেশী। সর্বভারতীয় শিক্ষানীতি, আদর্শব্যবস্থা ও পরিভাষার সমস্যা-সমাধান, প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতের প্রতিটি ভাষায় শিক্ষা ও উচ্চতম ডিগ্রিলাভের ব্যবস্থাকরণ, প্রাদেশিক অধ্যাপকবিনিময় এবং অন্যান্যভাবে আন্তঃপ্রাদেশিক শিক্ষাব্যবস্থার সমন্বয় ও সহযোগিতা ভারতীয় সংহতিবিধানের এক অনিবার্য যোগসূত্র। প্রতি রাজ্যে সর্বভারতীয় সমস্ত ভাষায় সাহিত্যচর্চা, তর্জমা ও অন্যান্য সমন্বয় ও সহযোগিতার ব্যাপক ও কার্যকরী ব্যবস্থা করা এবং শিল্পকলা কৃষ্টি ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ভাববিনিময় এবং পরস্পরকে সমৃদ্ধ করবার সুযোগদান সর্বভারতীয় মনোভাবকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলার জন্যে একান্ত প্রয়োজন। নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের মতন আমার মনে হয় যদি অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষারও সর্বভারতীয় স্তরের সাহিত্যসম্মেলনের ব্যবস্থা করা হয় তাহলে বোধ হয় আমাদের জাতীয় সংহতি আরও শক্তিশালী হবার পথ খুঁজে পাবে। এর সঙ্গে সঙ্গে ভারতের যেকোন ভাষার শ্রেষ্ঠ শিল্প ও সাহিত্য সম্পর্কে অন্য ভাষার অনুবাদের মধ্য দিয়ে পরিচিত করতে হবে। অবশ্যই অনুবাদকর্মে বহুবিধ প্রতিবন্ধক আছে। কিন্তু তা বলে হাত গুটিয়ে পিছিয়ে থাকলে চলবে না। এ ব্যাপারে যে-কেউই

অগ্রবর্তী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন। প্রসঙ্গতঃ কলকাতায় হিন্দী ভাষার তরুণতর কবিদের একটি পত্রিকা এবং বাংলাভাষার সমজাতীয় দুইটি পত্রিকাকে অভিনন্দন জানাবো। হয়তো এমন আরও পত্র-পত্রিকা অন্য ভাষায়ও আছে। কিন্তু তার খোঁজ সিনেমা এবং যৌন-আবেদনমূলক পত্রিকার অরণ্য হতে খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ জন্য সরকারের কঠোর দমন আইন থাকা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি। সঙ্গে সঙ্গে নিখিল ভারতীয় সংহতিকে দৃঢ়তর করবার কাজে ব্যাপৃত পত্র পত্রিকাগুলিকে সক্রিয়ভাবে সহায়তা-সম্পাদনকেও সরকারী কর্মের আবশ্যকীয় অভিধা বলেই আবেদন রাখছি।

সর্বশ্রেণীর ব্যক্তিদের ভারতদর্শনের ব্যাপক সুযোগদান

ভারতের জাতীয় ঐক্য সুদৃঢ় হবে যদি এক অঞ্চলের অধিবাসী অন্য অঞ্চলের অধিবাসীদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা করতে পারে। অর্থাৎ প্রতিটি ভারতবাসী যদি গ্রন্থজগতের নির্ধারিত গণ্ডি পেরিয়ে, ভূগোল-ইতিহাস-লব্ধ জ্ঞানের বাইরে ভারতবর্ষের প্রতিটি অঞ্চলকে একবার অন্ততঃ চোখে দেখবার সুযোগ পায়, তাহলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এক প্রদেশের সঙ্গে অন্য প্রদেশের আত্মিক সম্মেলন হতে বেশী বেগ পেতে হবে না। তাহলে অনেক ভুল বোঝা-বুঝির অবসান হবে। এ জন্য তীর্থযাত্রীদের তো বটেই, সর্বশ্রেণীর ব্যক্তিদের ভারত-দর্শনের ব্যাপক ও সহজসাধ্য সুযোগদানের ব্যবস্থা করা কেন্দ্রীয় সরকারের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। প্রাচীনকালে তীর্থদর্শন ছিল ধর্মপালনের এক বিশেষ অনুজ্ঞা। এই তীর্থভ্রমণের মাধ্যমে জনগণের মনে গড়ে উঠত অখণ্ড জাতীয়তা ও ভারতীয়তাবোধ। আধুনিক ভারতবর্ষেও সহজসাধ্য ব্যাপক ভারতদর্শনের সুযোগের মাধ্যমে ভারতীয় অনুভূতি গড়ে তোলার চেষ্টায় সরকার পক্ষকেই অবিলম্বে তৎপরতা গ্রহণ করতে হবে।

ভারতের জাতীয় ঐক্যের হয়তো আরও অসংখ্য দিক আছে। সুধীজন ও অনুসন্ধিৎসু মহল অবশ্যই সেগুলির অনুসন্ধান করবেন। আমি কেবল আলোচনার সূত্রপাত করলাম মাত্র. কারণ বর্তমানে আমরা ভারতবাসীরা এত বেশী পরচিন্তায় মগ্ন যে. নিজের মুখোমুখি হবার মতন সামান্যতম কর্তব্যবোধটুকুও আমরা পালন করতে চাইছি না। কেবল অন্যের আলোকাভিসারের দিকে দৃষ্টি। অথচ আমরা নিজেরা যে ক্রমাগত ডুবছি স্বখাত সলিলে সেদিকে কিছুমাত্রও খেয়াল নেই।

প্রতীক্ষা

শ্রীকানাইলাল সামন্ত

অরুণোজ্জ্বল তব রূপখানি
ঢাকা কুহেলিকা আঁধারে ;
ধ্যানতুলি দিয়া কিছুতে পারি না
আঁকিতে হৃদয় মাঝারে।
বাঁশরী হইতে সুর সীমাহারা
ঝরি' ঝরি' পড়ে অবিরল ধারা,
পবন বহিয়া আনে সে প্রসাদে
ওপার হইতে এপারে।
নিশিদিন আমি বসে থাকি তীরে,
পলকবিহীন নয়নে,
বিরাম ভুলেছে হিয়াশিশু মোর
সেই ঝরা-সুর চয়নে।
আকুলতা মরে শুভক্ষণ খুঁজি'
কুহেলিকা এই কাটি' গেল বুঝি,
এই বুঝি তব নবারুণ-কণা
করুণা করিল আমারে।

মানবসেবায় নিবেদিতা

প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা

সাতান্ন বছর আগে ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর ভগিনী নিবেদিতা দেহত্যাগ করেন। কিন্তু যে জীবন মহৎ, অসাধারণ, মৃত্যু তাকে নিঃশেষ করতে পারে না। সে কালজয়ী, অবিনশ্বর। মানব-হৃদয়ে তার স্মৃতি চির-অম্লান। তাই দীর্ঘদিনের ব্যবধানেও ভগিনী নিবেদিতাকে আমরা ভুলতে পারিনি। তাঁকে স্মরণ করে তাঁর পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে আমরা ধন্য হই। তাঁর অপূর্ব আত্মত্যাগ আজও আমাদের উদ্বুদ্ধ করে।

ভগিনী নিবেদিতার চরিত্র ছিল অনন্য-সাধারণ। তাঁর প্রতিভা ছিল সর্বতোমুখী। শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, বিপ্লবী, স্বদেশ-সেবক—সকলেই তাঁর মধ্যে নিজ নিজ জীবনা-দর্শের পূর্ণ অভিব্যক্তি দেখে মুগ্ধ হতেন। জীবনের উদ্দেশ্য-সাধনে তাঁর কাছে সাহায্য ও প্রেরণা লাভ করে কৃতজ্ঞ হতেন। তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য, বুদ্ধিমত্তা ও প্রবল ব্যক্তিত্ব সকলের কাছে বিস্ময়ের কারণ ছিল, কিন্তু তিনি যে ভারতবাসীর অন্তরের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন, ভারতবাসী যে তাঁকে আত্মীয়বোধে হৃদয়ের ভালবাসা দিয়েছিল, তার মূলে ছিল তাঁর গভীর মানবতাবোধ।

জীবনের প্রথম থেকেই তাঁর হৃদয়ে জনসেবার আকাঙ্ক্ষা ছিল। তাই যে মুহূর্তে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে আহ্বান করলেন, 'হে মহাপ্রাণ, জাগো! জগৎ যন্ত্রণায় দগ্ধ হচ্ছে, তোমার কি নিদ্রা সাজে?' সেই মুহূর্তে তাঁর মহাপ্রাণ ব্যক্তিগত সকল বাধা-বন্ধন উপেক্ষা করে আত্মোৎসর্গের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দ এই বিদেশিনীকে উৎসর্গ করেছিলেন তাঁর মহিমময় মাতৃভূমি ভারতবর্ষের সেবায়। আর নিজেকে সর্বতোভাবে সেই সেবায় নিবেদন করে মার্গারেট নোবল তাঁর 'নিবেদিতা' নাম সার্থক করেছিলেন। নিবেদিতার ছিল প্রবল বিচার-বুদ্ধি, যার ফলে কোন মত বা পথ নির্বিচারে গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে ছিল একেবারেই অসম্ভব, তেমনি নিঃসংশয়ে সত্য ও আদর্শ বলে যা বুঝতেন, তার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করবার মত মনোবল তাঁর ছিল। আর সেজন্যই স্বজন স্বদেশ প্রতিষ্ঠা সমস্তই অকাতরে বিসর্জন দেওয়া তাঁর পক্ষে সহজ হয়েছিল।

আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যে মানব-সেবা, তার সঙ্গে পার্থক্য আছে নিছক সমাজ-সেবার। প্রথমটির উদ্দেশ্য চিত্তের বিশুদ্ধি-সম্পাদন, সেখানে লোকচক্ষুর অন্তরালে নীরব সেবার দ্বারা দেবতারই পূজা করা হয়, বিভিন্ন রূপে সকল নরনারীর মধ্যে যে দেবতার প্রকাশ। সে সেবায় আড়ম্বর নেই, সংবাদপত্রে তার ঘোষণা হয় না। নিজের নাম জাহিরের বিন্দুমাত্র প্রচেষ্টা সেখানে থাকে না।

সেবার এই গভীর তাৎপর্য নিবেদিতা গভীর-ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি যে কেবল কর্মীর সকল অহঙ্কার বিসর্জন দিয়েছিলেন তা নয়, তাঁর শরীর মন আশৈশব অভ্যাস সবই হাসিমুখে ত্যাগ করেছিলেন।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে নিবেদিতা যখন প্রথম এদেশে আসেন তখন তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষের

নারীজাতির সেবা। সেই উদ্দেশ্যে তিনি বাগবাজার পল্লীর এক সংকীর্ণ গলির মধ্যে মেয়েদের জন্য একটি ক্ষুদ্র বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু সেবাব্রতীর কাজ কি কোন বাঁধা-ধরা নির্দিষ্ট পথ ধরে চলে? তাই ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় প্লেগ দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল নিবেদিতাকে ভীত সন্ত্রস্ত জনগণের মধ্যে যেন সেবা ও করুণার প্রতিমূর্তি। আশ্চর্য, প্লেগের মত সংক্রামক রোগ আর তার প্রতিরোধ-কাজে নিযুক্ত সদ্য-আগত একজন শ্বেতাঙ্গী মহিলা! নিবেদিতা কেবল প্লেগ-নিবারণ-কাজের পরিচালনা করতেন মনে করলে ভুল হবে। বাগবাজারে প্রতি বস্তীতে জীর্ণ অস্বাস্থ্যকর কুটিরে রোগগ্রস্ত ব্যক্তির পাশে তাঁকে উপবিষ্ট দেখা যেত। নিজের প্রাণের মমতা উপেক্ষা করে একটি প্লেগাক্রান্ত শিশুকে দুদিন ধরে মার মত শুশ্রূষা করেন। তাঁরই স্নেহতপ্ত কোলে শিশুটির মৃত্যু হয়। সেদিন জনসাধারণ জেনেছিল নিবেদিতা তাঁদের পরমাত্মীয়া।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে পূর্ববঙ্গে যখন ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, তখনও বিন্দুমাত্র নিজের জন্য চিন্তা না করে তিনি অবিলম্বে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অঞ্চলে উপস্থিত হন। সেখানে নৌকায় করে বাড়ী বাড়ী ঘুরে বেড়াতেন। দরিদ্র কৃষক-ঘরের মেয়েদের ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখ ও ঘর-সংসারের কথা গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। যথাসাধ্য তাদের সাহায্যের ব্যবস্থা করতেন। সেদিন সেই সেবাকার্যে তিনি আর কোন নারীকে সহকর্মিরূপে পেয়েছিলেন বলে আমাদের জানা নেই। বস্তুতঃ দেশের যে-কোন বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য তিনি সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন, অন্য কারোর অপেক্ষা রাখতেন না। তাঁর গভীর মানবতাবোধ স্বতঃস্ফূর্ত হৃদয়বত্তায় সঙ্গে পরিচিত অপরিচিত সকলের সুখ-দুঃখের অংশগ্রহণে উন্মুখ হয়ে থাকত। তাঁর এই সেবা ছিল নিতান্ত সহজাত। এর মধ্যে জোর করে অথবা লোক দেখিয়ে কিছু করবার প্রয়াস ছিল না। যে অজ্ঞ অশিক্ষিত জনসাধারণের সঙ্গে তিনি স্বেচ্ছায় নিজের ভাগ্য গ্রথিত করেছিলেন, তাদের সঙ্গে তাঁর হৃদয়ের সংযোগ ঘটেছিল। তাই দেখা যেত, যারা পীড়িত আর্ত অসহায় তাদের একেবারে অতি নিকটে সমব্যথীর মত গিয়ে দাঁড়াতেন। স্পর্শ বাঁচিয়ে দূর থেকে কিছু সাহায্য করে কর্তব্য শেষ করতেন না। বাগবাজার পল্লীর স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার ভার তিনি সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ক্ষুদ্র গৃহদ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল। সে গৃহে যেমন তখনকার শ্রেষ্ঠ মনীষিবৃন্দ ও পদস্থ ব্যক্তিগণের সমাগম ঘটতো, তেমনি নিতান্ত সাধারণ ব্যক্তিও যে-কোন সময়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসে তাঁর কর্মের বিঘ্ন ঘটাতেন। আলাপের পর তাঁর কাছ থেকে হয় আর্থিক সাহায্য, নতুবা পত্রিকার জন্য কোন লেখা, অথবা কোন পদস্থ ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য সুপারিশ-পত্র প্রভৃতি সংগ্রহ করতেন। খুব কম লোকেই তাঁকে সাহায্য করেছেন অর্থ বা সাহায্য দিয়ে। তিনি অবশ্য কখনো প্রতিদানের আশা রাখতেন না। যেমনভাবে বৈজ্ঞানিকশ্রেষ্ঠ জগদীশচন্দ্র বসুর বিজ্ঞান-সাধনায় প্রতিদিন অনলসভাবে সাহায্য করেছেন ঠিক তেমনভাবেই অতি নগণ্য ব্যক্তির দাবিও হাসিমুখে পূরণ করতেন।

বাগবাজার পল্লীর সংকীর্ণ গলির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত তাঁর ক্ষুদ্র বিদ্যালয়টি তাঁর অপূর্ব সেবার আর একটি নিদর্শন। মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থায় কিছুমাত্র সাহায্য করতে পেরে তিনি নিজেকেই ধন্য মনে করতেন। কত ভাবেই না মেয়েদের

প্রতি তাঁর স্নেহ প্রকাশ পেত! যেদিন গ্রীষ্মের বা পূজার ছুটি ঘোষণা হত, সেদিন তিনি মেয়েদের জলযোগ করাতেন। ছোট ছোট শালপাতার ঠোঙ্গায় ফল মিষ্টি সাজিয়ে একটি ঝুড়িতে ঐগুলি তুলে একে একে মেয়েদের পরিবেশন করতেন। আবার খাওয়া শেষ হলে মেয়েরা ঠোঙ্গা ফেলবে বলে নিজেই ঝুড়ি হাতে দাঁড়িয়ে থাকতেন। এই ভাবে ক্ষুদ্র অতিথিদের সেবা হত। দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাট ঘটনার মধ্য দিয়েই কি অন্তরের মহত্ত্ব প্রকাশ পায় না? যে-সব মেয়ে অল্প বয়সে বিধবা, তাদের প্রতি স্নেহ-ভালবাসায় তাঁর হৃদয় পূর্ণ ছিল। কোন মেয়ের মুখ শুকনো দেখলে তৎক্ষণাৎ কাছে ডেকে কারণ অনুসন্ধান করতেন। হিন্দু ব্রাহ্মণ-কায়স্থ ঘরের বিধবা মেয়েদের আহারাদি ব্যাপার সহজ ছিল না। কতদিন অনেকে না খেয়েই স্কুলে আসত। তিনি ঠিক বুঝতে পেরে খাওয়াবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করতেন। দু-একটি ঐরূপ অল্পবয়স্কা মেয়েকে একাদশীর দিন কাছে বসিয়ে মিষ্টান্নাদি খাওয়াতেন। নিজের জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি পয়সাও ব্যয় করতে তিনি কুণ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু মাসান্তে কত অনাথা, দুঃখিনী বিধবা তাঁর কাছে অর্থ-সাহায্য পেতেন। বিদ্যালয়ের কোন কোন দুঃস্থ ছাত্রীকে খামের ভেতর সামান্য কিছু অর্থ পুরে গোপনে দিয়ে তাড়াতাড়ি চলে যেতেন, পাছে তাদের আত্ম-সম্মান ক্ষুণ্ণ হয়। সে দানের পরিমাণ ক্ষুদ্র, কিন্তু আন্তরিকতা অসামান্য।

জীবন সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় তাঁরই একটি ক্ষুদ্র রচনায় পাওয়া যায়—'আমি যেন স্মরণ রাখি, ঈশ্বরের জন্য পরম ব্যাকুলতাই জীবনের গভীর অর্থ। তিনিই আমার প্রিয়তম। আমার প্রিয়তমের কোন অভাব নেই; তথাপি তিনি মানুষের অভাবের বেশ ধরে আসেন, যাতে আমি তাঁর সেবার সুযোগ পাই। তাঁর ক্ষুধা নেই, তথাপি তিনি প্রার্থী হয়ে আসেন, যাতে আমি তাঁকে আহার দিতে পারি। তিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাতের অভিলাষ করেন, যাতে আমি রুদ্ধদ্বার খুলে তাঁকে আশ্রয় দিতে পারি। তিনি ক্লান্তি প্রকাশ করেন, শুধু আমি যেন তাঁর বিশ্রামের ব্যবস্থা করতে পারি।'

আশ্চর্য মনে হয়—মানবসেবার অর্থ কী গভীর! স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, 'দাতা গ্রহীতার কাছে নতজানু হয়ে তাকে সেবা বা পূজা নেবার জন্য করজোড়ে প্রার্থনা জানাক, তার অনুমতি ভিক্ষা করুক। সেবার সৌভাগ্য ও অধিকার দিচ্ছে বলে সেবক সেব্যের কাছে কৃতজ্ঞ হোক।'

বস্তুতঃ স্বামী বিবেকানন্দের কাছে যে ত্যাগ ও সেবার মন্ত্রে তাঁর দীক্ষা, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সে ব্রত তিনি পালন করে গেছেন। ভারতবর্ষের প্রতি নিবেদিতার যে অনুরাগ—তার সেবার জন্য যে দারিদ্র্য অর্ধাশন ও সর্বপ্রকার স্বার্থত্যাগ—তাকেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন সতীর দুশ্চর তপস্যা। এই আত্মনিবেদনের উৎস ছিল ভালবাসা। নিবেদিতা ভারতবর্ষকে ভালবেসে-ছিলেন,—ভালবেসেছিলেন তার অশিক্ষিত, দরিদ্র, কুসংস্কারান্ধ নরনারীকে—জনসাধারণকে। সে ভালবাসা সাধারণ দেশপ্রীতির বহু ঊর্ধ্বে। সেই নিঃস্বার্থ ভালবাসা, সেই উচ্চ সেবাদর্শ আমাদের জাতীয় জীবনকে একান্তভাবে উদ্বুদ্ধ করুক—এই প্রার্থনা।*

---

* আকাশবাণীর সৌজন্যে

স্বামীজী-মানসে গঙ্গা

অধ্যাপক অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বামীজীর অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন মানসে গঙ্গা যে কতরূপে প্রতিভাত হয়েছেন তা' বলে শেষ করা যায় না। এ প্রসঙ্গে আমরা দেখি, তিনি একাধারে প্রকৃতিপ্রেমিক, মাতৃভক্ত এবং মুক্তির নিষ্ঠাবান পূজারী, আবার একই সঙ্গে পরিহাসনিপুণ ও ভাবগম্ভীর। বহুরশ্মির এই অভূতপূর্ব সংমিশ্রণ তাঁর গঙ্গা-ভাবনাকে এক দুর্লঙ্ঘ্য সমৃদ্ধির শিখরে স্থাপিত এবং উদ্‌ভাসিত করেছে।

স্বামীজীর 'পরিব্রাজক' পুস্তকটিতে (যা' প্রথম প্রকাশিত হয় 'বিলাতযাত্রীর পত্র' এই নামে 'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রথম দুই বৎসরে) গঙ্গার সর্বাধিক উল্লেখ আমরা পাই। তাঁর দ্বিতীয়বার পশ্চিমযাত্রাকে কেন্দ্র করে এ পুস্তক রচিত—সঙ্গে ছিলেন স্বামী তুরীয়ানন্দ এবং ভগিনী নিবেদিতা। 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা'র অন্যত্রও গঙ্গার উল্লেখ পাওয়া যায়; কিন্তু এত অধিক পরিমাণে নয়। 'পরিব্রাজক' বইটির 'গঙ্গার শোভা ও বাঙলার রূপ' শিরোনামায় যে লেখাটি আছে, তার দীপ্তি আজও অম্লান। বোধ করি, নিসর্গ-বর্ণনা, বাস্তবসমস্যা, ইতিহাস-সচেতনতা এবং হৃদয়াবেগের এমন আশ্চর্য কুশল রচনা বাঙলা সাহিত্যে আর খুব বেশী নেই। বিশুদ্ধ রম্য রচনার আদর্শও হয়তো এর মধ্যে পাওয়া যাবে। বিচিত্র চিন্তার এক অনবদ্য সমারোহ পাঠকের হৃদয়মনকে মুগ্ধ ও তৃপ্ত করে। কিছু উদ্ধৃতি দিলেই বিষয়টি বোঝানো সহজ হবে মনে হয়।

প্রথমতঃ নিসর্গ-বর্ণনার কথাই ধরা যাক। স্বামীজীর সংবেদনশীল কবিমনের একটি সুন্দর প্রকাশ—"হৃষীকেশের গঙ্গা মনে আছে? সেই নির্মল নীলাভ জল—যার মধ্যে দশ হাত গভীরের মাছের পাখনা গোনা যায়, সেই অপূর্ব সুস্বাদু হিমশীতল 'গাঙ্গ্যং বারি মনোহারি' আর সেই অদ্ভুত 'হর হর হর' তরঙ্গোত্থ ধ্বনি, সামনে গিরিনির্ঝরের 'হর হর' প্রতিধ্বনি, সেই বিপিনে বাস, মাধুকরী ভিক্ষা, গঙ্গাগর্ভে ক্ষুদ্র দ্বীপাকার শিলাখণ্ডে ভোজন, করপুটে অঞ্জলি অঞ্জলি সেই জলপান, চারিদিকে কণপ্রত্যাশী মৎস্যকুলের নির্ভয় বিচরণ। সে গঙ্গাজলপ্রীতি, গঙ্গার মহিমা, সে গাঙ্গ্যবারির বৈরাগ্যপ্রদ স্পর্শ, সে হিমালয়বাহিনী গঙ্গা, শ্রীনগর, টিহিরি, উত্তরকাশী, গঙ্গোত্রী, তোমাদের কেউ কেউ গোমুখী পর্যন্ত দেখেছ।" (বাণী ও রচনা—৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬১)।

চলতি ভাষায় এমন মনোহারী নিসর্গ-বর্ণনা স্বামীজীর পূর্বে বাঙলা ভাষায় আর কেউ লিখেছেন কিনা জানি না; তবে এমন স্বয়ংসম্পূর্ণ, সাবলীল, হৃদয়স্পর্শী গঙ্গা-মাহাত্ম্য বিশেষ রচিত হয়নি বলেই মনে হয়। নিজের পরিব্রাজক-জীবনের অভিজ্ঞতার একটি অন্তরঙ্গ প্রকাশও এখানে লক্ষ্য করা যায়। হৃষীকেশ থেকে গোমুখী (গঙ্গার উৎপত্তিস্থল) পর্যন্ত গঙ্গার যে বৈশিষ্ট্যগুলি পথিকচিত্তকে নিবিড়ভাবে আকর্ষণ করে, তার একটি অতি সংক্ষিপ্ত অথচ অতি স্পষ্ট ছবি এটি।

নিসর্গ-বর্ণনার আরো একটি নমুনা নেওয়া যাক, ঐ একই পুস্তক 'পরিব্রাজক' থেকে—"আর আমাদের গঙ্গার কিনার—বিদেশ থেকে না এলে, ডায়মণ্ডহারবারের মুখ দিয়ে না গঙ্গায়

প্রবেশ করলে সে বোঝা যায় না। সে নীল নীল আকাশ, তার কোলে কালো মেঘ, তার কোলে সাদাটে মেঘ, সোনালী কিনারাদার, তার নীচে ঝোপ-ঝোপ তাল-নারিকেল-খেজুরের মাথা বাতাসে যেন লক্ষ লক্ষ চামরের মতো হেলছে, তার নীচে ফিকে ঘন ঈষৎ পীতাভ, একটু কালো মেশানো—ইত্যাদি হরেক রকম সবুজের কাঁড়ি ঢালা আঁব-নিচু-জাম-কাঁঠাল—পাতাই পাতা—গাছ ডাল পালা আর দেখা যাচ্চে না, আশে পাশে ঝাড়-ঝাড় বাঁশ হেলছে, দুলছে, আর সকলের নীচে—যার কাছে ইয়ারকান্দী ইরানী তুর্কিস্তানি গালচে-দুলচে কোথায় হার মেনে যায়! সেই ঘাস, যতদূর চাও—সেই শ্যাম-শ্যাম ঘাস, কে যেন ছেঁটে-ছুঁটে ঠিক ক'রে রেখেছে; জলের কিনারা পর্যন্ত সেই ঘাস; গঙ্গার মৃদুমন্দ হিল্লোল যে অবধি জমিকে ঢেকেছে, যে অবধি অল্প অল্প লীলাময় ধাক্কা দিচ্চে, সে অবধি ঘাসে আঁটা। আবার তার নীচে আমাদের গঙ্গাজল। আবার পায়ের নীচে থেকে দেখ, ক্রমে উপরে যাও, উপর উপর মাথার উপর পর্যন্ত, একটি রেখার মধ্যে এত রঙের খেলা! একটি রঙে এত রকমারি, আর কোথাও দেখেছ? বলি, রঙের নেশা ধরেছে কখন কি—যে রঙের নেশায় পতঙ্গ আগুনে পুড়ে মরে, মৌমাছি ফুলের গারদে অনাহারে মরে?" (বাণী ও রচনা—৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা—৬৩ ৬৪)।

স্বামীজীর কবিমনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রকাশ এই পঙ্‌ক্তিগুলির মধ্যে বিধৃত হয়ে আছে। গঙ্গাতীরের শোভাকে ছবির মতো ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি দক্ষ চিত্রশিল্পীর ন্যায়। ভাষাতে একটা গোটা ছবিকে এভাবে চোখের সামনে তুলে ধরা একমাত্র প্রতিভাবান লেখকের পক্ষেই সম্ভব। এমন বর্ণাঢ্য, ব্যঞ্জনাময়, সম্পূর্ণ বস্তুনিষ্ঠ চিত্র দরদী প্রাণের স্পর্শ পেয়ে সম্পূর্ণ একখানি কবিতা হয়ে উঠেছে। এক অপূর্ব চিত্রকল্প পাঠকমনকে মুগ্ধ ও অভিভূত করে ফেলে। গঙ্গাতীরের সৌন্দর্য কয়েকটি-মাত্র কথায়, যেমন—'শ্যাম-শ্যাম ঘাস', 'যেন লক্ষ লক্ষ চামরের মতো', অথবা 'একটি রেখার মধ্যে এত রঙের খেলা', 'সোনালী কিনারাদার' ইত্যাদির মধ্যে যেমন ফুটে উঠেছে তা' দীর্ঘ কয়েকপাতা জুড়ে বর্ণনা দিলেও ফুটে উঠতো কিনা সন্দেহ। রচনাশৈলীর সংহতি ও দৃঢ়সংবদ্ধ সংযম তাই ন্যূনতম শব্দযোজনায় দীর্ঘতম ও গভীরতম প্রভাব মনের উপর ফেলে।

গঙ্গার মোহনারও একটি সংক্ষিপ্ত অথচ সামগ্রিক চিত্র এ প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা যেতে পারে—"এইবার জাহাজ সমুদ্রে প'ড়ল।... এইখানে ধলায় কালোয় মেশামেশি, প্রয়াগের কিছু ভাব যেন সর্বত্র দুর্লভ হ'লেও 'গঙ্গাদ্বারে প্রয়াগে চ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে।' তবে এ জায়গা বলে ঠিক গঙ্গার মুখ নয়। যা হোক আমি নমস্কার করি, 'সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখং' ব'লে।

কি সুন্দর! সামনে যতদূর দৃষ্টি যায়, ঘন নীলজল তরঙ্গায়িত, ফেনিল, বায়ুর সঙ্গে তালে তালে নাচ্চে। পেছনে আমাদের গঙ্গাজল, সেই বিভূতিভূষণা, সেই 'গঙ্গাফেন-সিতা জটা পশুপতেঃ'। সে জল অপেক্ষাকৃত স্থির। সামনে মধ্যবর্তী রেখা। জাহাজ একবার সাদা জলের, একবার কালো জলের উপর উঠছে। ঐ সাদা জল শেষ হ'য়ে গেল। এবার খালি নীলাম্বু, সামনে পেছনে আশে পাশে খালি নীল নীল নীল জল, খালি তরঙ্গভঙ্গ। নীলকেশ, নীলকান্ত অঙ্গ-আভা, নীল পট্টবাস পরিধান।" (বাণী ও রচনা—৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা—৬৪-৬৫)।

গঙ্গা যেখানে সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে তার এমনই বর্ণনা এটি যে, পাঠকের মনে সমুদ্রের নীলের ছোঁয়া লেগে যায়; কিন্তু গঙ্গা নিজেকে হারিয়ে গিয়েও হারিয়ে যান না। একই শব্দের ('নীল') পুনরাবৃত্তি শ্রবণপীড়াদায়ক না হয়ে বঙ্গোপসাগরের ঘননীলকে পাঠকমানসে নিবিড়ভাবে মুদ্রিত করে দেয়।

এই তো গেল নিসর্গ-বর্ণনার দিক আর গঙ্গাকে আশ্রয় করে স্বামীজীর কবি-মানসের প্রকাশ। কিন্তু ভাবুকতা তাঁর ইতিহাস-সচেতনতা ও বাস্তববোধকে কখনই আচ্ছন্ন করে ফেলে না, তার পরিচয়ও এর পরেই মেলে। কল্পনা ও বাস্তবের এক মণিকাঞ্চনযোগ তাঁর রচনাকে এক মহিমময় মাধুর্যে মণ্ডিত করে। তার পরিচয় পাবো আমরা নিম্নের উদ্ধৃতিগুলোর মধ্যে। স্বামীজী-মানসকে স্বামীজীর ভাষাতেই ঠিক ঠিক ধরা যাবে বলে দীর্ঘ হলেও পূর্ণ উদ্ধৃতি দেওয়াই প্রয়োজন মনে হয়—"আর আমাদের মনে রাখা উচিত যে, পৃথিবীর সকল প্রধান ধর্মই অতি পুরাতন, তাহাদের একটিও বর্তমান কালে গঠিত হয় নাই এবং পৃথিবীর প্রত্যেক ধর্মই গঙ্গা ও ইউফ্রেটিস নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে, একটিও প্রধান ধর্ম ইউরোপ বা আমেরিকায় উদ্ভূত হয় নাই—একটিও নয়; প্রত্যেক ধর্মই এশিয়া-সম্ভূত এবং তাহাও আবার পৃথিবীর ঐ অংশটুকুর মধ্যে।" (বাণী ও রচনা—৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৭৬)

"জম্বুদ্বীপের তামাম সভ্যতা—সমতল ক্ষেত্রে, বড় বড় নদীর উপর, অতি উর্বর ভূমিতে উৎপন্ন—ইয়ংচিকিয়ং, গঙ্গা, সিন্ধু, ইউফ্রেটিস-তীর। এ সকল সভ্যতারই আদি ভিত্তি চাষবাস। এ সকল সভ্যতাই দেবতাপ্রধান। আর ইউরোপের এ সকল সভ্যতাই প্রায় পাহাড়ে, না হয় সমুদ্রময় দেশে জন্মেছে—ডাকাত আর বোম্বেটে এ সভ্যতার ভিত্তি, এতে অসুরভাব অধিক।" (বাণী ও রচনা—৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা—২০৪)

মনুষ্যসভ্যতা ও প্রধান ধর্মসমূহের উৎপত্তি-স্থলের ইতিহাস-নির্ভর উক্তি। এবিষয়ে গবেষণার সুযোগ এখনও বিস্তর রয়েছে মনে হয়। ইউরোপের ইতিহাসে প্রায় নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধবিগ্রহ এবং বর্তমান সভ্যতার সংকট শ্রেণী-সংগ্রামের সাহায্যে যেমন ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে, তেমনই দৈব-আসুর সংগ্রাম বলেও চিহ্নিত হতে পারে। কোন্ ব্যাখ্যা নির্ভুল, তা' কালের কষ্টিপাথরে বিচার হবে। কেন পৃথিবীর প্রধান ধর্মগুলোর উৎপত্তি একটা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের মধ্যেই হয়েছে, তার সম্পর্কে অনুসন্ধান যথোপযুক্তভাবে হয়নি বলেই জানা আছে। সুতরাং স্বামীজীর পূর্বোদ্ধৃত উক্তির যথেষ্ট তাৎপর্য এখনও আছে।

"গঙ্গার শোভা ও বাঙলার রূপ' নিবন্ধের মধ্যেই বাঙলা দেশের ভৌগোলিক গঠনেরও খুব সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে। এই ব-দ্বীপটির গঠন কিভাবে হয়েছে তার সম্পর্কে স্বামীজী লিখছেন—"যেটুকু অল্প জল ছিল, সেটুকু মা গঙ্গা হিমালয় গুঁড়িয়ে পশ্চিম ধুয়ে এনে, বুজিয়ে জমি ক'রে নিয়েছেন। সে জমি আমাদের বাঙলা দেশ। বাঙলা দেশ আর বড় এগুচ্চেন না, ঐ সোঁদরবন পর্যন্ত।" (বাণী ও রচনা—৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা—৮২)

ঐ একই নিবন্ধের অন্যত্র গঙ্গার দ্বিধাবিভক্ত ও ভাগীরথী-মুখের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা পাচ্ছি, যেমন—"এত বড় পদ্মা ছেড়ে গঙ্গার মাহাত্ম্য হুগলি নামক ধারায় কেন বর্তমান, তার কারণ অনেকে বলেন যে, ভাগীরথী-মুখই গঙ্গার প্রধান এবং আদি জল-ধারা। পরে গঙ্গা পদ্মা-মুখ ক'রে বেরিয়ে

গেছেন। ঐ প্রকার 'টলিজ নালা' নামক খালও আদিগঙ্গা হয়ে গঙ্গার প্রাচীন স্রোত ছিল। কবিকঙ্কণ পোতবণিক-নায়ককে ঐ পথেই সিংহল দ্বীপে নিয়ে গেছেন। পূর্বে ত্রিবেণী পর্যন্ত বড় বড় জাহাজ অনায়াসে প্রবেশ ক'রত। সপ্তগ্রাম নামক প্রাচীন বন্দর এই ত্রিবেণী ঘাটের কিঞ্চিৎ দূরেই সরস্বতীর উপর ছিল। অতি প্রাচীন কাল হতেই এই সপ্তগ্রাম বঙ্গদেশের বহির্বাণিজ্যের প্রধান বন্দর।" (বাণী ও রচনা—৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা—৬৬)

ইতিহাস-সচেতনতা ও প্রাচীন বাঙলা-সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় দুই-ই এই উদ্ধৃতিতে সুপরিস্ফুট। কিন্তু এ প্রসঙ্গে তিনি এমন একটি বাস্তব সমস্যাকে তুলে ধরেছেন, যা' এখনও ক'লকাতা বন্দরের ভবিষ্যৎ এবং শুধু বাঙালা দেশ নয়, সমগ্র উত্তর এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের উপর কালো ছায়া বিস্তার করে আছে। সেটি হচ্ছে গঙ্গার ক্রমশঃ মজে যাওয়ার সমস্যা। এ সমস্যাকে বাঙালা ভাষাতে বিশদভাবে তুলে-ধরার নজীরও বোধ হয় স্বামীজীর 'পরিব্রাজক' বই-এতেই প্রথম মেলে—"ক্রমে সরস্বতীর মুখ বন্ধ হ'তে লাগলো। ১৫৩৭ খৃঃ ঐ মুখ এত বুজে এসেছে যে, পোর্তুগীজেরা আপনাদের জাহাজ আসবার জন্যে কতদূর নীচে গিয়ে গঙ্গার উপর স্থান নিল। উহাই পরে বিখ্যাত হুগলি-নগর। ১৬শ শতাব্দীর প্রারম্ভ হতেই স্বদেশী বিদেশী সওদাগরেরা গঙ্গায় চড়া পড়বার ভয়ে ব্যাকুল; কিন্তু হ'লে কি হবে; মানুষের বিদ্যাবুদ্ধি আজও বড় একটা কিছু ক'রে উঠতে পারেনি। মা গঙ্গা ক্রমশই বুজে আসছেন। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে এক ফরাসী পাদ্রী লিখছেন, সুতির কাছে ভাগীরথী-মুখ সে সময়ে বুজে গিয়েছিল। অন্ধকূপের হলওয়েল—মুর্শিদাবাদ যাবার রাস্তায় শান্তিপুরে জল ছিল না ব'লে ছোট নৌকা নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। ১৭৯৭ খৃঃ অব্দে কাপ্তেন কোলব্রুক সাহেব লিখছেন যে, গ্রীষ্মকালে ভাগীরথী আর জলাঙ্গী নদীতে নৌকা চলে না। ১৮২২ থেকে ১৮৮৪ পর্যন্ত গরমিকালে ভাগীরথীতে নৌকার সমাগম বন্ধ ছিল। ইহার মধ্যে ২৪ বৎসর দুই বা তিন ফিট জল ছিল। খৃষ্টাব্দের ১৭ শতাব্দীতে ওলন্দাজেরা হুগলির এক মাইল নীচে চুঁচড়ায় বাণিজ্যস্থান করলে; ফরাসীরা আরও পরে এসে তার আরও নীচে চন্দননগর স্থাপন করলে। জার্মান অস্টেণ্ড কোম্পানি ১৭২৩ খৃঃ অব্দে চন্দননগরের পাঁচ মাইল নীচে অপর পারে বাঁকীপুর নাম জায়গায় আড়ত খুললে। ১৬১৬ খৃঃ অব্দে দিনেমারেরা চন্দননগর হ'তে আট মাইল দূরে শ্রীরামপুরে আড়ত করলে। তারপর ইংরেজরা কলকেতা বসালেন আরও নীচে। পূর্বোক্ত সমস্ত জায়গায়ই আর জাহাজ যেতে পারে না। কলকেতা এখনও খোলা, তবে 'পরেই বা কি হয়' এই ভাবনা সকলের।" (বাণী ও রচনা —৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা— ৬৬ ৬৭)

দীর্ঘ সত্তর বছর পূর্বেও গঙ্গার ক্রমশঃ বুজে যাওয়ার সমস্যা সম্পর্কে তিনি এত সচেতন ছিলেন ভাবলে আশ্চর্য লাগে। ইতিহাসের উপর তাঁর দখলও এখানে লক্ষণীয়। গঙ্গার পারে যে-সমস্ত বন্দর এককালে গড়ে উঠেছিল এবং যাদের সঙ্গে সামুদ্রিক পোতের সরাসরি যোগ ছিল, তাদের সামুদ্রিক বন্দর হিসেবে ক্রমাবলুপ্তির কারণ খুব অল্প পরিধির মধ্যে স্বচ্ছভাবে বর্ণিত হয়েছে। 'ইতিহাস' বিষয়টির প্রতি তাঁর যে আজন্ম নিষ্ঠা ছিল, তার পরিচয়ও এখানে মেলে।

ঐ একই প্রসঙ্গে আবার লিখছেন একটু ভিন্ন সুরে—"তবে শান্তিপুরের কাছাকাছি

পর্যন্ত গঙ্গায় যে গরমিকালেও এত জল থাকে, তার এক বিচিত্র কারণ আছে। উপরের ধারা বন্ধপ্রায় হলেও রাশীকৃত জল মাটির মধ্য দিয়ে চুইয়ে গঙ্গায় এসে পড়ে। গঙ্গার খাদ এখনও পাড়ের জমি হ'তে অনেক নীচু। যদি ঐ খাদ ক্রমে মাটি বসে উঁচু হয়ে উঠে, তা হলেই মুশকিল। আর এক ভয়ের কিংবদন্তী আছে; কলকাতার কাছেও মা গঙ্গা ভূমিকম্প বা অন্য কারণে মধ্যে মধ্যে এমন শুকিয়ে গেছেন যে, মানুষে হেঁটে পার হয়েছে। ১৭৭০ খৃঃ অব্দে নাকি ঐ রকম হয়েছিল। আর এক রিপোর্টে পাওয়া যাওয়া যায় যে, ১৭৩৪ খৃঃ অব্দের ৯ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার দুপুর বেলায় ভাঁটার সময় গঙ্গা একদম শুকিয়ে গেলেন। ঠিক বারবেলায় এইটে ঘটলে কি হ'ত, তোমরাই বিচার কর—গঙ্গা বোধ হয় আর ফিরতেন না।" (বাণী ও রচনা—৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৭)

গুরুগম্ভীর আলোচনার মধ্যেও বৈঠকী মেজাজ মিশিয়ে দেবার নিপুণতা এখানে লক্ষণীয়। 'বারবেলা' নিয়ে ঠাট্টা তাই বেমানান মনে হয় না, বরং গঙ্গার শুকিয়ে যাওয়ার সমস্যাকে আমাদের কল্পনায় ভালো করে গেঁথে দেয়।

বাঙলা দেশে গঙ্গার মুখে আরো দুটি ভয়ের কথা তিনি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। সেই ভয় এখনও ভয়ই থেকে গেছে, দূর হয়নি। ভয় দুটির বর্ণনা নিম্নরূপ—"বিশেষ কলকাতার ন্যায় বাণিজ্যবহুল বন্দর, আর গঙ্গার ন্যায় নদী। ……আমাদের গঙ্গার মুখে দুটি প্রধান ভয়: একটি বজবজের কাছে জেমস ও মেরী নামক চোরা বালি, দ্বিতীয়টি ডায়মণ্ড হারবারের মুখে চড়া।" (বাণী ও রচনা—৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬১)

"এই তো গেল উপরের কথা। নীচে মহাভয়—'জেমস আর মেরী' চড়া। পূর্বে দামোদর নদ কলকাতার ৩০ মাইল উপরে গঙ্গায় এসে পড়ত, এখন কালের বিচিত্র গতিতে তিনি ৩১ মাইলের উপর দক্ষিণে এসে হাজির। তার প্রায় ছ মাইল নীচে রূপনারায়ণ জল ঢালছেন, মণিকাঞ্চনযোগে তাঁরা তো হুড়মুড়িয়ে আসুন, কিন্তু এ কাদা ধোয় কে? কাজেই রাশীকৃত বালি। সে স্তূপ কখন এখানে, কখন ওখানে, কখন একটু শক্ত, কখন বা নরম হচ্চেন। সে ভয়ের সীমা কি! দিনরাত তার মাপজোখ হচ্ছে, একটু অন্যমনস্ক হলেই—দিনকতক মাপজোখ ভুললেই, জাহাজের সর্বনাশ। সে চড়ায় ছুঁতে না ছুঁতেই অমনি উলটে ফেলা, না হয় সোজাসুজিই গ্রাস!! এমনও হয়েছে, মস্ত তিন-মাস্তুল জাহাজ লাগবার আধঘণ্টা বাদেই খালি একটু মাস্তুল-মাত্র জেগে রইলেন। এ চড়া দামোদর-রূপনারায়ণের মুখই বটেন। দামোদর এখন সাঁওতালি গাঁয়ে তত রাজি নন, জাহাজ স্টীমার প্রভৃতি চাটনি রকমে নিচ্চেন। ১৮৭৭ খৃঃ কলকাতা থেকে 'কাউন্টি অফ স্টারলিং' নামক এক জাহাজে ১৪৪৪ টন গম বোঝাই নিয়ে যাচ্ছিল। ঐ বিকট চড়ায় যেমন লাগা আর তার আট মিনিটের মধ্যেই 'খোঁজ খবর নাহি পাই।' ১৮৭৪ খৃঃ ২৪০০ টন বোঝাই একটি স্টীমারের ছ মিনিটের মধ্যে ঐ দশা হয়। ধন্য মা তোমার মুখ! আমরা যে ভালয় ভালয় পেরিয়ে এসেছি, প্রণাম করি।" (বাণী ও রচনা—৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৭-৬৮)

এমন কি গত বছরও (১৯৬৭ খৃঃ) অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে। গঙ্গার চড়াতে ৮০০০ টন ব্রহ্মদেশীয় চাল-বোঝাই একটি জাহাজ ডুবি হয়েছে। যে ভয় সত্তর বছর পূর্বে ছিল তা এখনও রয়েছে, হয়তো তার অবস্থান-ভূমির কিছু রদবদল হয়েছে। কারুর কারুর মতে ফরাক্কা

বাঁধ-পরিকল্পনা রূপায়িত না হলে আগামী ২৫ বছরের মধ্যেই গঙ্গামুখ বন্ধ হয়ে যাবে এবং কলকাতা বন্দরও আর থাকবে না। ঐ পরিকল্পনার শম্বুকগতি স্বামীজীর পূর্বোক্ত রচনাকেই বারংবার স্মরণ করিয়ে দেয়। তাঁর সাবধনতার বাণী এখনও খুব গ্রাহ্য হয়নি মনে হয়। ইতিহাসের খুঁটিনাটি আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রতিক মৌল সমস্যার প্রকৃতি-নির্ধারণের এক অপূর্ব কুশলতা তাঁর ছিল। তাঁর বাস্তব-বোধ কত গভীরভাবে তাঁকে সমস্যা-সচেতন করে তুলত তার প্রমাণও এখানে মেলে। আবার এরই মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে তাঁর হাস্যোচ্ছল রসিক মন গঙ্গামাতাকে নিয়ে রসিকতা ('ধন্য মা তোমার মুখ!') করতে দ্বিধা করেনি। অতি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাতেও স্বামীজীর এই স্বকীয়তা আমরা বারবার লক্ষ্য করি।

এবার স্বামীজীর গঙ্গাভাবনার আর একটি দিক্ দেখা যাক্। এটিকে তাঁর ধর্মপ্রাণতার দিক্ বলতে পারি। কী এক অচ্ছেদ্য নাড়ীর টান বাঙ্গলা দেশের বহু মনীষীই গঙ্গামায়ের সঙ্গে অনুভব করেছেন। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর 'ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে', রবীন্দ্রনাথের স্টীমারযাত্রা ও গঙ্গাতীরের বর্ণনা, কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'পতিত-উদ্ধারিণী গঙ্গে', অথবা কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি' কোন্ বঙ্গসন্তান না পড়েছেন? সর্বত্রই সদৃশ গঙ্গানুভূতির ও গঙ্গাপ্রীতির পরিচয় পাই, 'পরিব্রাজক'-এর থেকেই আবার উদ্ধৃত করা যাক—"কিন্তু আমাদের কর্দমাবিলা, হর-গাত্রবিঘর্ষণশুভ্রা, সহস্রপোতবক্ষা এ কলকাতার গঙ্গায় কি এক টান আছে তা ভোলবার নয়। সে কি স্বদেশপ্রিয়তা বা বাল্যসংস্কার কে জানে? হিন্দুর সঙ্গে মায়ের সঙ্গে এ কি সম্বন্ধ!—কুসংস্কার কি? —হবে! গঙ্গা গঙ্গা ক'রে জন্ম কাটায়, গঙ্গাজলে মরে, দূর দূরান্তের লোক গঙ্গাজল নিয়ে যায়, তাম্রপাত্রে যত্ন ক'রে রাখে, পাল-পার্বণে বিন্দু বিন্দু পান করে। রাজারাজড়ারা ঘড়া পুরে রাখে, কত অর্থ ব্যয় ক'রে গঙ্গোত্রীর জল রামেশ্বরের উপর নিয়ে গিয়ে চড়ায়; হিন্দু বিদেশে যায়—রেঙ্গুন, জাভা, হংকং, জাঞ্জিবার, মাডাগাস্কর, সুয়েজ, এডেন, মাল্টা—সঙ্গে গঙ্গাজল, সঙ্গে গীতা। গীতা গঙ্গা—হিঁদুর হিঁদুয়ানি। গেল বারে আমিও একটু নিয়ে গিয়েছিলুম—কি জানি, বাগে পেলেই এক-আধ বিন্দু পান করতাম। পান করলেই কিন্তু সে পাশ্চাত্য জনস্রোতের মধ্যে, সভ্যতার কল্লোলের মধ্যে, সে কোটি কোটি মানবের উন্মত্তপ্রায় দ্রুতপদসঞ্চারের মধ্যে মন যেন স্থির হয়ে যেত! সে জনস্রোত, সে রজোগুণের আস্ফালন, সে পদে পদে প্রতিদ্বন্দ্বি-সংঘর্ষ, সে বিলাসক্ষেত্র, অমরাবতীসম প্যারিস, লণ্ডন, নিউইয়র্ক, বার্লিন, রোম, সব লোপ হয়ে যেত, আর শুনতাম—সেই 'হর্ হর্ হর্', দেখতাম—সেই হিমালয়ক্রোড়স্থ বিজন বিপিন, আর কল্লোলিনী সুরতরঙ্গিণী যেন হৃদয়ে মস্তকে শিরায় শিরায় সঞ্চার করছেন, আর গর্জে গর্জে ডাকছেন—'হর্ হর্ হর্!!'" (বাণী ও রচনা—ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬১-৬২)

হৃদয়াবেগ ও ধর্মপ্রাণতার এক হরগৌরী-মিলন আমরা এখানে লক্ষ্য করি। স্বামীজী বাহিরে অদ্বৈতবাদী, ভিতরে ভক্ত—একথা যে কতখানি সত্য তা' তাঁর গঙ্গাভাবনায় পরিস্ফুট। তাঁর আবাল্য সংস্কার, মাতৃভক্তি, ব্যক্তিগত ভাবতন্ময়তা এবং স্বাদেশিকতা তাঁর শুদ্ধজ্ঞান-বিচারী বৈদান্তিক সত্তার উপরে প্রাধান্য পেয়েছে এখানে। তাঁর ব্যক্তিত্বের এই বিশিষ্ট দিকটি চিঠি-পত্রেই বিশেষভাবে উদ্ঘাটিত। 'পরিব্রাজক'ও চিঠির আকারেই প্রথম লেখা হয়।

তাঁর ব্যক্তিত্বের আরো একটি অতি আকর্ষণীয় দিক্ এ উপলক্ষ্যে আমাদের নজরে আসে সেটি তাঁর পরিহাস-নিপুণতা (স্বামীজীকে নাকি কোন এক পাশ্চাত্য শিষ্যা একদা জিজ্ঞেস করেছিলেন—"আচ্ছা স্বামীজী! আপনি কি শুধু সভায় বক্তৃতা করার সময় ছাড়া আর কখনো গম্ভীর হতে পারেন না?" তখন নাকি তিনি মুহূর্তের মধ্যে খুব গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলেছিলেন—"না, না, যখন পেটব্যথা করে তখন আমি তো খুব গম্ভীর হয়ে যাই!")। নিম্নের উদ্ধৃতি দুটি প্রমাণস্বরূপ উপস্থাপিত করা গেল—"এবার তোমরাও পাঠিয়েছ দেখছি মাকে মান্দ্রাজের জন্য। কিন্তু একটা কি অদ্ভুত পাত্রের মধ্যে মাকে প্রবেশ করিয়েছ, ভায়া। তু-ভায়া বাল্যব্রহ্মচারী 'জলন্নিব ব্রহ্মময়েন তেজসা'; ছিলেন 'নমো ব্রহ্মণে', হয়েছেন 'নমো নারায়ণায়' (বাপ, রক্ষা আছে!), তাই বুঝি ভায়ার হস্তে ব্রহ্মার কমণ্ডলু ছেড়ে মায়ের বদ্‌নায় প্রবেশ। যা হোক, খানিক রাত্রে উঠে দেখি, মায়ের সেই বৃহৎ বদ্‌নাকার কমণ্ডলুর মধ্যে অবস্থানটা অসহ্য হয়ে উঠেছে। সেটা ভেদ ক'রে মা বেরুবার চেষ্টা করছেন। ভাবলুম সর্বনাশ, এইখানেই যদি হিমাচল-ভেদ, ঐরাবত-ভাসান, জহ্নুর কুটীর ভাঙা প্রভৃতি পর্বাভিনয় হয় তো— গেছি। স্তব স্তুতি অনেক করলুম, মাকে অনেক বুঝিয়ে বললুম—মা! একটু থাক, কাল মান্দ্রাজে নেমে যা করবার হয় কোরো, সে দেশে হস্তী অপেক্ষাও সূক্ষ্মবুদ্ধি অনেক আছেন, সকলেরই প্রায় জহ্নুর কুটীর, আর ঐ যে চক্‌চকে কামানো টিকিওয়ালা মাথাগুলি, ওগুলি সব প্রায় শিলাখণ্ডে তৈয়ারি, হিমাচল তো ওর কাছে মাখম, যত পারো ভেঙো, এখন একটু অপেক্ষা কর। উঁহু; মা কি শোনে! তখন এক বুদ্ধি ঠাওরালুম, বললুম—মা দেখ, ঐ যে পাগড়ি-মাথায় জামা-গায়ে চাকরগুলি জাহাজে এদিক ওদিক করছে,...আর ঐ যারা ঘরদোর সাফ ক'রে ফিরছে,...যদি কথা না শোনো তো ওদের ডেকে তোমায় ছুঁইয়ে দিইছি আর কি! তাতেও যদি শান্ত না হও, তোমায় এক্ষুনি বাপের বাড়ী পাঠাব; ঐ যে ঘরটি দেখছ, ওর মধ্যে বন্ধ ক'রে দিলেই তুমি বাপের বাড়ীর দশা পাবে, আর তোমার ডাক হাঁক সব যাবে, জমে একখানি পাথর হয়ে থাকতে হবে। তখন বেটী শান্ত হয়। বলি, শুধু দেবতা কেন, মানুষেরও ঐ দশা—ভক্ত পেলেই ঘাড়ে চড়ে বসেন।" (বাণী ও রচনা—৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬২-৬৩)

জাহাজের দোলায় পাত্রের মধ্যে জল ছল্‌কে উঠার এক আশ্চর্য সরস বর্ণনা। গঙ্গা সম্বন্ধে পৌরাণিক কাহিনীসমূহের, মান্দ্রাজে বর্ণভেদ-প্রাবল্যের ও গণদারিদ্র্যের এবং জাহাজের কর্মচারীদের ও হিমঘরের বর্ণনা, গঙ্গার হিমালয়ে উৎপত্তির (বাপের বাড়ী) এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ এই পরিহাস-রচনাটিতে পাই। সবটা মিলিয়ে কিন্তু একটা অপূর্ব আনন্দানুভূতি মনে জেগে উঠে। বাঙলা দেশে মায়ের সঙ্গে ছেলের যে স্বচ্ছন্দ নিবিড় মমতার সম্পর্ক, তা' এই গঙ্গা-বর্ণনাকে আশ্রয় করে ফুটে উঠেছে।

গুরুভাইদের স্বামীজী কেমন খোলাখুলি-ভাবে কথা বলতেন, তার নমুনাও এখানেই পাওয়া যায়। অন্তরঙ্গ যারা, তাদের সঙ্গে ব্যবহারে কোন কোন ক্ষেত্রে মাত্রাধিক্য ঘটলেও বিড়ম্বনা ঘটে না। তারই দৃষ্টান্ত নীচের উদ্ধৃতিটিতে—"তু-ভায়া বললেন, 'মশায়! পাঁটা মানা উচিত মাকে'; আমিও বলি, 'তথাস্তু, একদিন কেন ভায়া প্রত্যহ!' পরদিন তু-ভায়া আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'মশায়, তার কি হ'ল?' সেদিন আর জবাব দিলুম না।

তার পরদিন আবার জিজ্ঞাসা করতেই খাবার সময় তু-ভায়াকে দেখিয়ে দিলুম, পাঁটা মানার দৌড়টা কতদূর চলছে। ভায়া কিছু বিস্মিত হয়ে বললেন, 'ও তো আপনি খাচ্চেন।' তখন অনেক যত্ন ক'রে বোঝাতে হ'ল যে—কোন গঙ্গাহীন দেশে নাকি কলকাতার এক ছেলে শ্বশুরবাড়ী যায়। সেথায় খাবার সময় চারিদিকে ঢাকঢোল হাজির; আর শাশুড়ীর বেজায় জেদ, 'আগে একটু দুধ খাও।' জামাই ঠাওরালে বুঝি দেশাচার, দুধের বাটিতে যেই চুমুকটি দেওয়া—অমনি চারিদিকে ঢাক-ঢোল বেজে ওঠা। তখন তার শাশুড়ী আনন্দাশ্রুপরিপ্লুতা হয়ে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ ক'রে বললে—'বাবা! তুমি আজ পুত্রের কাজ করলে, এই তোমার পেটে গঙ্গাজল আছে, আর দুধের মধ্যে ছিল তোমার শ্বশুরের অস্থি গুঁড়া করা—শ্বশুর গঙ্গা পেলেন।' অতএব হে ভাই! আমি কলকেতার মানুষ এবং জাহাজে পাঁটার ছড়াছড়ি, ক্রমাগত মা গঙ্গায় পাঁটা চড়ছে, তুমি কিছুমাত্র চিন্তিত হ'য়ো না। ভায়া যে গম্ভীরপ্রকৃতি, বক্তৃতাটা কোথায় দাঁড়াল—বোঝা গেল না।" (বাণী ও রচনা—৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৮-৬৯)

বোধ হয় পত্রাকারে লিখিত বলেই (উদ্বোধনের প্রথম সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের কাছে) এত ঘনিষ্ঠ মানবিক চিত্র ফুটে উঠেছে। স্বামীজী অসাধারণ পরিহাসনিপুণ ছিলেন। এই নিপুণতা আবার সবচেয়ে বেশী লক্ষ্য করা যায় ঘরোয়া বৈঠকের মধ্যে, যেখানে প্রাণখুলে হাসা যায় এবং লাগাম ছেড়ে কথা বলা যায়। একারণেই স্বামীজীর গুরুভাইদের কাছে চিঠিগুলি আমাদের সবচেয়ে বেশী মুগ্ধ করে। কথায় কথায় হাসির ফোয়ারা ছোটানো, নিজেকে নিয়ে ও গুরুভাইদের নিয়ে নানান্ হাল্কা রসিকতা করায় তিনি ছিলেন স্বভাবসিদ্ধ। 'পরিব্রাজকে' তাই দেখতে পাচ্ছি গঙ্গাকে উপলক্ষ্য করে স্বামী তুরীয়ানন্দের (তু-ভায়া) সঙ্গে তিনি প্রাণখোলা রসিকতা করছেন। অন্যান্য গুরুভাইরাও তা' থেকে বাদ পড়ছেন না—'বদ্‌নাকৃতি' আধারে গঙ্গাজল-প্রেরণকে কেন্দ্র করে। এ পরিহাসে উচ্ছলতা আছে, কিন্তু চাপল্য নেই। মানুষ স্বামীজীকে আমাদের বাঙলাদেশের ঘরের মানুষ বলেই মনে হয়। ধর্ম, দর্শন ও সাধনার উত্তুঙ্গ শিখরে আরূঢ় থেকেও এভাবে একেবারে সহজ সাধারণ মানুষের স্তরে নেমে আসা অসাধারণ আত্মপ্রত্যয় ও মানবপ্রেমিকতারই লক্ষণ।

আর একটি উদ্ধৃতি দিয়েই এ নিবন্ধ শেষ ক'রব—"হুঁ, বলি—এই বেলা এ গঙ্গা-মা'র শোভা যা দেখবার দেখে নাও, আর বড় একটা কিছু থাকছে না। দৈত্য-দানবের হাতে পড়ে এ সব যাবে। ঐ ঘাসের জায়গায় উঠবেন—ইঁটের পাঁজা, আর নামবেন ইঁট-খোলার গর্তকুল। যেখানে গঙ্গার ছোট ছোট ঢেউগুলি ঘাসের সঙ্গে খেলা করছে, সেখানে দাঁড়াবেন পাট-বোঝাই ফ্ল্যাট, আর সেই গাধাবোট; আর ঐ তাল-তমাল-আঁব-নিচুর রঙ, ঐ নীল আকাশ, মেঘের বাহার—ওসব কি আর দেখতে পাবে? দেখবে—পাথুরে কয়লার ধোঁয়া আর তার মাঝে মাঝে ভূতের মতো অস্পষ্ট দাঁড়িয়ে আছেন কলের চিমনি!!!" (বাণী ও রচনা—৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা—৬৪)।

ভবিষ্যচিন্তার এ এক আশ্চর্য প্রকাশ। কল্পনায় ভবিষ্যৎ বাস্তবকে চিত্রণ করতেও স্বামীজী যে দক্ষ ছিলেন তার পরিচয় এখানে পাই। গঙ্গার উভয় তীর বরাবর শিল্পের ক্রমবর্ধমান পত্তন এবং গঙ্গাতীরের স্বাভাবিক সৌন্দর্যের ভবিষ্যৎ অবলুপ্তি দু-একটি আঁচড়েই সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি।

স্বামীজীর গঙ্গাভাবনা তার ব্যাপ্তি ও সমৃদ্ধি, মাধুর্য ও গাম্ভীর্য নিয়ে আমাদের মনে এক মহীয়সী মূর্তিতে ফুটে ওঠে; পাঠকের চিত্ত এক অনাহত ছন্দে অনুরণিত হতে থাকে। এক বিস্ময়কর, সর্বগ চিত্তের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পাঠকহৃদয় শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ে, ভক্তি ও আনন্দে আপ্লুত হয়।

শ্রীশ্রীকালী

স্বামী জীবানন্দ

ব্রহ্ম ও শক্তি

যদি নেতি নেতি ক'রে বিচার করা যায়—আমি শরীর নই, মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকার এ-সবও নই, আমার রাগ দ্বেষ মোহ ইত্যাদি নেই, তবে যা থাকে তা অশব্দ অস্পর্শ অরূপ অব্যয় অখণ্ড সচ্চিদানন্দ—'শান্তং শিবমদ্বৈতম্।'

'সকল উড়িয়া যায় করিলে বিচার।
অবস্তু জগৎ জীব ব্রহ্মবস্তু সার॥
কিন্তু এক কথা হেথা শুন বিবরণ।
শক্তির রাজ্যেতে তুমি কর্মী যতক্ষণ॥
ধ্যান চিন্তা কর্ম আদি শক্তির ভিতরে।
শক্তি বিনা কর্ম কেহ করিতে না পারে॥
শক্তির এলাকা পারে তাহার গমন।
মন লয়ে সমাধিস্থ হয় যেই জন॥'[১]

উদ্ধৃত অংশটি থেকে বোঝা যায়, স্থূল-সূক্ষ্ম-ভেদে ক্ষুদ্রতম থেকে বৃহত্তম সমস্ত কর্মই শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, 'শক্তি না মানলে জগৎ মিথ্যা হয়ে যায়; আমি, তুমি, ঘর, বাড়ী, পরিবার—সব মিথ্যা। ঐ আদ্যাশক্তি আছেন ব'লে জগৎ দাঁড়িয়ে আছে।'[২]

'যিনিই ব্রহ্ম তিনিই আদ্যাশক্তি।' শ্রীরামকৃষ্ণ একটি সুন্দর গল্পের মাধ্যমে বিষয়টি বুঝিয়েছেন: "একজন রাজা বলেছিল, 'আমায় এক কথায় জ্ঞান দিতে হবে।' যোগী বললে, 'আচ্ছা, তুমি এক কথাতেই জ্ঞান পাবে।' খানিকক্ষণ পরে রাজার কাছে হঠাৎ একজন যাদুকর এসে উপস্থিত। রাজা দেখলে, সে এসে কেবল দুটা আঙুল ঘোরাচ্ছে, আর বলছে—'রাজা, এই দেখ।' রাজা অবাক্ হয়ে দেখছে। খানিকক্ষণ পরে দেখে দুটা আঙুল একটা আঙুল হয়ে গেছে! যাদুকর একটা আঙুল ঘোরাতে ঘোরাতে বলছে—'রাজা এই দেখ, রাজা এই দেখ।' অর্থাৎ ব্রহ্ম আর আদ্যাশক্তি প্রথম দুটা বোধ হয়। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান হলে আর দুটা থাকে না। অভেদ। এক! যে একের দুই নাই! অদ্বৈতম্।"[৩]

ব্রহ্ম ও শক্তির অভেদত্ব শ্রীরামকৃষ্ণের বিভিন্ন উপমায় পরিস্ফুট: 'ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। যেমন অগ্নি আর তার দাহিকা-শক্তি। অগ্নি ভাবলেই দাহিকা-শক্তি ভাবতে হয়। দুগ্ধ ও দুগ্ধের ধবলত্ব। জল আর তার হিমশক্তি।'[৪]

চিন্ময়, অদ্বিতীয়, নিষ্কল, নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনার অধিকারী অতি বিরল। তাই উপাসকদের ধ্যান-পূজাদির জন্য ব্রহ্ম নিজেই স্থূলরূপ গ্রহণ করেন।

'চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥'

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ইত্যাদি পুরুষ-দেবতার মূর্তিতে নির্গুণ ব্রহ্ম যেমন গুণযুক্ত হন, তেমনি নানা দেবী-মূর্তিতেও তিনি গুণময়ী হন।

কালী নির্গুণ ব্রহ্মের সগুণ দেবী-মূর্তি। কলয়তি ভক্ষয়তি বিনাশয়তি সর্বমেতৎ শুভাশুভমিতি কালী। যিনি সমস্ত শুভাশুভ বিনষ্ট ক'রে অপার আনন্দ দান করেন তিনি কালী।

---

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি, পৃষ্ঠা ৪৩৪
২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৪।১।২
৩ তদেব, ৪।৬।৩
৪ তদেব, ৩।৬।৪

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, 'আদ্যাশক্তি লীলাময়ী; সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন। তাঁরই নাম কালী। কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী। একই বস্তু, যখন তিনি নিষ্ক্রিয়—সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কোন কাজ করছেন না—এই কথা যখন ভাবি, তখন তাঁকে ব্রহ্ম ব'লে কই। যখন তিনি এই সব কার্য করেন, তখন তাঁকে কালী বলি, শক্তি বলি।'[৫]

বেদে যাঁকে ব্রহ্ম বলেছেন, তাঁকেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন—আদ্যাশক্তি, কালী, মা।

মা-কালীর রূপ

মা-কালীর মূর্তিতে সারল্য ও কাঠিন্যের অপূর্ব সমাবেশ! মা বরাভয়করা, করুণাময়ী অথচ ভয়ঙ্করা। মায়ের ভীমা ভৈরবী মূর্তি, তাই রুদ্রভাবটিই বেশী প্রকট। বাহিরে ভীষণা, ভিতরে কিন্তু অন্তঃসলিলা করুণার ফল্গুধারা!

মা-কালীর বাহিরের রুদ্ররূপটি শ্রীশ্রীচণ্ডীতে এইভাবে বর্ণিত :

'বিচিত্রখট্বাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা।
দ্বীপিচর্মপরীধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা॥
অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা।
নিমগ্নারক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্‌মুখা॥' ৭।৭,৮

শ্রীশ্রীকালীপূজায় 'করালবদনাং ঘোরাম্' ইত্যাদি ধ্যান-মন্ত্রে দেবী কালিকার যে-রূপ সাধকের চিত্তকমল উদ্ভাসিত করে, তার ভাবটি নিম্নরূপ :

দেবী দক্ষিণাকালিকার বদন অতি ভয়ঙ্কর, আকৃতিও ভীষণ। তিনি আলুলায়িত-কুন্তলা, চতুর্ভুজা, দিব্যরূপিণী। তাঁর গলদেশে মুণ্ডমালা; বামভাগের অধোহস্তে সদ্যশ্ছিন্ন নরমুণ্ড ও ঊর্ধ্বহস্তে খড়্গ; দক্ষিণভাগের অধোহস্তে অভয়মুদ্রা ও ঊর্ধ্বহস্তে বরমুদ্রা। তাঁর দেহের বর্ণ ঘনমেঘের ন্যায় গাঢ় নীল। দেবী দিগম্বরী।...তাঁর ঘন কেশকলাপ দক্ষিণভাগে লম্বমান। পদতলে স্বয়ং মহেশ্বর শবরূপে পতিত রয়েছেন।...দেবীর মুখপদ্ম সুপ্রসন্ন ও হাস্যযুক্ত।

মায়ের কালো রূপ। কিন্তু সাধক গেয়েছেন—

'শ্যামা মা কি আমার কালো রে।
লোকে বলে কালী কালো,
মন তো বলে না কালো রে!'
'নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও-রূপরাশি।
তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরিগুহাবাসী॥'

আমাদের মনে কালিমা রয়েছে ব'লেই বুঝি আমরা মাকে কালো দেখি। চিত্ত শুদ্ধ হ'লে, মনের মলিনতা দূর হ'লে সাধক অতি কাছে পায় মাকে, মায়ের ভীষণ রূপকে ভয় না ক'রে ঠিক ঠিক জানতে পারে তাঁকে—আর মায়ের রূপের আলোকচ্ছটায় চতুর্দিক উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন : 'কালী কি কালো? দূরে তাই কালো, জানতে পারলে আর কালো নয়। আকাশ দূর থেকে নীলবর্ণ। কাছে ছাখো কোন রঙই নাই। সমুদ্রের জল দূর থেকে নীল, কাছে গিয়ে হাতে তুলে ছাখো, কোন রঙ নাই।'[৬] 'কালীরূপ কি শ্যামরূপ চৌদ্দ পোয়া কেন? দূরে ব'লে। দূরে ব'লে সূর্য ছোট দেখায়। কাছে যাও তখন এত বৃহৎ দেখাবে যে ধারণা করতে পারবে না।'[৭]

কালী জগজ্জননী। মাতৃমূর্তি, তাই সৃষ্টির প্রতীক। হস্তে বরাভয়, তাই পালনের প্রতীক।

৫ তদেব, ১।২।৪

৬ তদেব, ১।২।৪

৭ তদেব, ১।৩।৫

আবার খড়্গাধারিণী, তাই বিনাশেরও প্রতীক। একাধারে সৃষ্টি-পালন-ও সংহারের মূর্তি! মা যে সৃষ্টিকর্ত্রী, পালয়িত্রী ও সংহর্ত্রী তা শ্রীরামকৃষ্ণদেব দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

মায়ের চিত্তে কৃপা ও সমরনিষ্ঠুরতা! 'চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা ত্বয্যেব দেবি ভুবনত্রয়েঽপি।'[৮]

স্বামী বিবেকানন্দ মা-কালীর ভীমা ভয়ঙ্করী মূর্তি 'Kali the Mother' কবিতায় পরিস্ফুট করেছেন।

কালী-তত্ত্ব

'কালী আদ্যাশক্তি, মহামায়া; দশমহাবিদ্যার একটি রূপ।

কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা॥
বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
এতা দশমহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ॥'

প্রজাপতি-দক্ষের যজ্ঞে যাবার জন্য সতী শিবের নিকট এই দশমহাবিদ্যার রূপ প্রকটিত ক'রে অনুমতি লাভ করেন।

দেবীভাগবতে ব্যাসদেব রাজা জনমেজয়কে মহামায়ার স্বরূপ বলেছেন:

'যথা নটো রঙ্গগতো নানারূপো ভবত্যসৌ।
একরূপস্বভাবোঽপি লোকরঞ্জনহেতবে॥
তথৈবা দেবকার্যার্থমরূপাপি স্বলীলয়া।
করোতি বহুরূপাণি নির্গুণা সগুণানি চ॥'

৫।১৮।৪৮,৫৯

—নটের রূপ এক হলেও যেমন লোকরঞ্জনের জন্য রঙ্গস্থলে সে নানারূপে দর্শন দেয়, সেইরূপ এই নির্গুণা দেবী নিরাকারা হয়েও দেবতাদের কার্যসম্পাদনের জন্য স্বলীলায় সত্ত্বাদিগুণসমন্বিত নানা রূপ ধারণ করেন।

৮ শ্রীশ্রীচণ্ডী, ৪।২২

যিনি সদা নির্গুণা, নিত্যা, অপরিণামী ও মঙ্গলরূপিণী এবং যিনি ধ্যানগম্যা, বিশ্বাধারা ও তুরীয়ারূপে সংস্থিতা, তাঁর সাত্ত্বিকী রাজসী ও তামসী শক্তিই যথাক্রমে মহাসরস্বতী, মহালক্ষ্মী ও মহাকালী।

'নির্গুণা যা সদা নিত্যা ব্যাপিকাঽবিকৃতা শিবা।
যোগগম্যাঽখিলাধারা তুরীয়া যা চ সংস্থিতা॥
তস্যাস্তু সাত্ত্বিকী শক্তিঃ রাজসী তামসী তথা।
মহালক্ষ্মীঃ সরস্বতী মহাকালীতি তাঃ স্ত্রিয়ঃ॥'[৯]

সমস্ত শক্তিই একই শক্তির বিভিন্ন রূপ। শক্তিতে স্বগত স্বজাতীয় ও বিজাতীয় কোন ভেদ নেই। আপাতপ্রতীয়মান ভেদ বাস্তব নয়। দেবী স্বয়ং বলেছেন—'একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।'[১০] আরও বলেছেন: 'আমি জগৎ থেকে পৃথক্ নই, জগৎও আমি ছাড়া নয়। আমি ও জগৎ শক্তিতঃ অভেদ ব'লে মদতিরিক্তা দ্বিতীয়া আর কে থাকতে পারে? যেমন দধি দুগ্ধময় এবং এক দুগ্ধই দধিরূপে পরিণত, তদ্রূপ একা আমিই জগন্ময়ী এবং জগৎও মন্ময়।'

'জগতো নাহমন্যা স্যাং স্যাৎ মদন্যৎ জগৎ চ ন।
জগতো মম চাপ্যৈক্যাৎ ব্যক্তিরন্যা
ততোঽস্তি কা॥
অহং চ জগতী চৈকা জগতী মন্ময়ী মতা।
দুগ্ধাৎ দধি চাপ্যেকং দধি দুগ্ধময়ং মতম্॥'

কালীর গর্ভে অনন্ত বিশ্বের, অনন্ত জীবের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান নিহিত। কালীই বিশ্বের বীজাধার। মা সচ্চিদানন্দময়ী, চিন্ময়ী, সর্বময়ী, ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপিণী, সর্বশক্তিময়ী।

কালীরূপের বিচিত্র প্রকাশের কথা শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: 'তিনি নানাভাবে লীলা করছেন। তিনিই মহাকালী, নিত্যকালী,

৯ দেবীভাগবতম্, ১।২।১৯, ২০
১০ শ্রীশ্রীচণ্ডী, ১০।৫

শ্মশানকালী, রক্ষাকালী, শ্যামাকালী। মহাকালী, নিত্যকালীর কথা তন্ত্রে আছে। যখন সৃষ্টি হয় নাই; চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবী ছিল না, নিবিড় আঁধার, তখন কেবল মা নিরাকারা মহাকালী—মহাকালের সঙ্গে বিরাজ করছিলেন। শ্যামাকালীর অনেকটা কোমল ভাব—বরাভয়-দায়িনী। গৃহস্থ-বাড়িতে তাঁরই পূজা হয়। যখন মহামারী, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি হয়, রক্ষাকালী পূজা করতে হয়। শ্মশানকালীর সংহারমূর্তি। শব, শিবা, ডাকিনী, যোগিনী মধ্যে, শ্মশানের উপর থাকেন। রুধিরধারা, গলায় মুণ্ডমালা, কটিতে নরহস্তের কোমর-বন্ধ। যখন জগৎ নাশ হয়, মহাপ্রলয় হয়, তখন মা সৃষ্টির বীজসকল কুড়িয়ে রাখেন।··· মা ব্রহ্মময়ী সৃষ্টিনাশের পর ঐ রকম সব বীজ কুড়িয়ে রাখেন। সৃষ্টির পর আদ্যাশক্তি জগতের ভিতরেই থাকেন। জগৎ প্রসব করেন আবার জগতের মধ্যে থাকেন।'[১১]

সেই সচ্চিদানন্দরূপিণী মহামায়া পরাশক্তি অরূপা হয়েও ভক্তগণকে কৃপা করবার জন্য রূপ ধারণ করেন।

'সেয়ং শক্তির্মহামায়া সচ্চিদানন্দরূপিণী।
রূপং বিভর্ত্যরূপা চ ভক্তানুগ্রহহেতবে॥'

মা-কালীর বিচিত্র লীলা

জগজ্জননী মহাশক্তি শ্রীশ্রীকালী যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাবিগ্রহকে যন্ত্র ক'রে বিচিত্র লীলা করেছিলেন, যাঁরা 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ' পাঠ করেছেন ও তাঁর পুণ্য জীবন অনুধ্যান করেছেন তাঁরা এ বিষয় অবগত আছেন। মা তাঁকে যেমন বলিয়েছিলেন, তিনি তেমনি বলেছিলেন; যেমন করিয়েছিলেন, তিনি তেমনি করেছিলেন; যেমন চালিয়েছিলেন, তিনি তেমনি চলেছিলেন। তিনি যন্ত্র, মা যন্ত্রী। শ্রীরামকৃষ্ণের ভিতরে থেকে মা-ই 'কথামৃত' পরিবেশন করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী যুগকল্যাণে সেই আদ্যাশক্তিরই বাণী। শুধু তাই নয়, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নরলীলার সাঙ্গোপাঙ্গ ভক্তবৃন্দ তাঁকে সাক্ষাৎ কালীরূপেও দর্শন করেছিলেন। শ্যামপুকুরে ভক্তবৃন্দ তাঁকে কালীরূপে দর্শন ক'রে তাঁর পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিয়েছিলেন। আবার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসঙ্গিনী যুগপাত্রী শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীকেও কোন কোন বিরল সাধক কালীরূপে দর্শন করেছিলেন। সারদাদেবী শ্রীরামকৃষ্ণ-কর্তৃক মহাশক্তিরূপে পূজিতা হয়েছিলেন। শ্রীশ্রীমা-ও শ্রীশ্রীঠাকুরকে যে মহাশক্তি কালিকা রূপেই দেখতেন তা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাবসানের সময় তাঁর উক্তি থেকেই জানা যায়। বস্তুতঃ শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীসারদাদেবীর শরীর অবলম্বন ক'রে আদ্যাশক্তি মা-কালীরই অভিনব লীলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

শুধু তাই নয়, যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যেও সেই একই মহাশক্তির লীলা চলেছিল। কাশীপুর উদ্যানবাটীতে স্বামীজীর ভিতর শ্রীরামকৃষ্ণদেব সমস্ত শক্তি সঞ্চারিত করেছিলেন। পতিতপাবন শ্রীশ্রীঠাকুরের, বিশ্বমাতা শ্রীসারদাদেবীর ও যুগপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দের শরীর-অবলম্বনে যুগপ্রয়োজনে সমস্ত বিশ্বের কল্যাণে একই মহাশক্তির বিচিত্র লীলা! পৃথক্ পৃথক্ শরীর, কিন্তু ভিতরে একই শক্তির—সেই মহামায়ার খেলা!

মা-কালীকে মানবার পূর্বে স্বামীজীর মনের অবস্থা কিরূপ ছিল তা তাঁর নিজের কথায় আমরা জানতে পারি:

'কালী ও কালীর সর্বপ্রকার কার্যকলাপকে

---

১১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১।২।৪

আমি কতই না অবজ্ঞা করিয়াছি! আমার ছ বছরের মানসিক দ্বন্দ্বের কারণ ছিল এই যে, আমি তাঁহাকে মানিতাম না। কিন্তু অবশেষে তাঁহাকে আমায় মানিতে হইয়াছে। রামকৃষ্ণ পরমহংস আমাকে তাঁহার কাছে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন এবং এখন আমার বিশ্বাস যে, সব কিছুতেই মা-কালী আমায় পরিচালিত করিতেছেন এবং তাঁহার যা ইচ্ছা, তাই আমার দ্বারা করাইয়া লইতেছেন।…মা (কালী) আমাকে তাঁহার ক্রীতদাস করিয়া লইলেন।'[১২]

স্বামীজী ভগিনী নিবেদিতাকে মা-কালীর ভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। ভারতমাতার সেবাযজ্ঞে উৎসর্গীকৃতপ্রাণা নিবেদিতার বহুমুখী কর্মজীবনে সেই ভাব সুপরিস্ফুট।

উপসংহার

স্বামীজী বলেছেন: 'মৃত্যু বা কালীকে উপাসনা করিতে সাহস পায় কয়জন? এস আমরা মৃত্যুর উপাসনা করি। আমরা যেন ভীষণকে ভীষণ জানিয়াই আলিঙ্গন করি—তাহাকে যেন কোমলতর হইতে অনুরোধ না করি, আমরা যেন দুঃখের জন্যই দুঃখকে বরণ করি'।[১৩]

মা-কালীর ভীমা ভয়ঙ্করী মূর্তিকে ভালবাসলে সংসারের দুঃখকষ্ট জ্বালাযন্ত্রণা দুর্ভিক্ষ মহামারী মৃত্যুর মধ্যেও সাধক ভয় না পেয়ে সকলের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে পারেন, মৃত্যুর মধ্যেও তাঁর অলক্ষ্য হস্ত রয়েছে এটি ধারণা করতে ভুল হয় না। কিন্তু মায়ের শুধু ক্ষেমঙ্করী করুণাময়ী মূর্তির উপাসনারত সাধকের দুঃখ-অশান্তিতে তাঁকে স্মরণে রাখা কঠিন হয়। যিনি ভীমা ভয়ঙ্করীর উপাসক, তিনিই করুণাময়ীর কৃপালাভের যথার্থ অধিকারী।

মা শ্মশানবাসিনী। শ্মশান তাঁর প্রিয়। কঠোর বৈরাগ্যের সাধনায় মনের কামনা-বাসনা পুড়ে ছাই হয়ে গেলে হৃদয় শ্মশানে পরিণত হবে, আর সেখানে হবে মায়ের নিত্যবিলাস।

মাতৃ-কৃপালাভের যোগ্য হবার জন্য সকলের প্রতি যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের প্রাণস্পর্শী আকুল আহ্বান:

'জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন,
ভয় কি তোমার সাজে?
দুঃখভার, এ ভব-ঈশ্বর, মন্দির তাহার
প্রেতভূমি চিতামাঝে॥
পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয়
তাহা না ডরাক তোমা।
চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান,
নাচুক তাহাতে শ্যামা॥'[১৪]

১২ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১০।২৮৭-২৮৮

১৩ তদেব ১০।২৮৯

১৪ তদেব, ৬।২৭১

সমালোচনা

শ্রীশ্রীমায়ের বাটী ও উদ্বোধন কার্যালয়ঃ প্রকাশক: স্বামী নিত্যস্বরূপানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১, উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩; পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৪ + ৪; মূল্য ২৫ পয়সা।

'শ্রীশ্রীমায়ের বাটী' শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীর কাছে মহাতীর্থস্বরূপ। 'উদ্বোধন'-পত্রিকা নবভারতের প্রাণশক্তির পুনরুজ্জীবনের মহান্ স্বপ্ন-অবলম্বনে স্বামী বিবেকানন্দের অন্যতম সাহিত্যিক প্রয়াসের নিদর্শন। এই প্রকাশনা-কেন্দ্র থেকে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রধানতঃ বাংলা গ্রন্থাবলী এবং কিছু পরিমাণে ইংরেজী গ্রন্থ নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে। শ্রীশ্রীমা, স্বামী সারদানন্দজী প্রভৃতির পুণ্য-পদধূলিবিজড়িত এই ভবন বাংলা ভাষায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্যের প্রাণকেন্দ্র। 'উদ্বোধন'-পত্রিকার সম্পাদকগোষ্ঠীতে রয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিকর স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ ও স্বামী সারদানন্দ, তাছাড়া স্বামী শুদ্ধানন্দ প্রমুখ বিশ্রুতকীর্তি সাধক ও সাহিত্যিকবৃন্দ। ১৩০৫ সাল থেকে যাত্রারম্ভ করে 'উদ্বোধন'-পত্রিকা এ বৎসর ৭০তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। বাংলা পত্রপত্রিকার ইতিহাসে খুব কম পত্রিকাই এত দীর্ঘকাল স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে। যে জাগ্রতচৈতন্যের বৈদ্যুতিক প্রভাব স্বামীজীর ব্যক্তিত্বের প্রধান লক্ষণ, 'উদ্বোধন'-পত্রিকার নামকরণে এবং আদর্শ-নির্ণয়ে (উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত) তারই আর এক পরিচয়। প্রাচ্যের প্রজ্ঞা ও পাশ্চাত্যের কর্মকুশলতা—এ দুয়ের সম্মেলনে বিশ্বসভ্যতার 'এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ'—এই মূল বক্তব্যই উদ্বোধনের জীবন-বেদ হয়ে উঠুক, এই ছিল স্বামীজীর আশা। সুদীর্ঘ যাত্রাপথে 'উদ্বোধন'-পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী যথাসাধ্য এই আদর্শ অন্তরে রেখেই নিষ্ঠাভরে আপনাদের ব্রত উদ্‌যাপন করে গেছেন। তবে বাংলা সাহিত্যে 'উদ্বোধনে'র সর্বশ্রেষ্ঠ দান স্বামীজীর মৌলিক বাংলা রচনাবলী—সাধু ও চলতি দুই শ্রেণীর গদ্যরচনা এবং কবিতা।

স্বামীজীর রাজযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, চিকাগো-বক্তৃতা প্রমুখ গ্রন্থাবলী যে উদ্বোধন কার্যালয় থেকেই বাংলায় প্রথম প্রকাশিত হয়, সেকথা বিবেকানন্দ-সাহিত্যের দিক থেকে বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। এই প্রথম যুগের যাবতীয় অনুবাদের জন্য স্বামী শুদ্ধানন্দজীর কাছে সমগ্র বাঙ্গালী জাতিই কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ।

'উদ্বোধন কার্যালয়ের নিজস্ব ভবন'-পরিচ্ছেদে শ্রীশ্রীমায়ের নিজস্ব বাটী-নির্মাণের প্রয়োজন উপলক্ষ্যে বাংলা সাহিত্যের আর একটি অমর গ্রন্থরচনার ইতিহাস আমরা পাই—স্বামী সারদানন্দজীর পাঁচখণ্ডে লেখা 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'। শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য-জীবনের শেষ এগারো বৎসরের স্মৃতিবিজড়িত এ ভবন মানবপ্রাণের অনন্ত তীর্থযাত্রার অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্মৃতিস্বাক্ষর।

নানা দিক থেকেই এমন একখানি সুলিখিত 'শ্রীশ্রীমায়ের বাটী ও উদ্বোধন-কার্যালয়ে'র ইতিহাস-গ্রন্থের প্রয়োজন ছিল। এই পুস্তিকাটি আরও একটু বিস্তৃত আকারে পরিবর্ধিত হলে পাঠক-সাধারণের আগ্রহ আরো বেশী মেটাতে পারবে। কিন্তু স্বল্পসীমায় মহত্তম আদর্শের যে সংহত পরিচয় এ পুস্তিকায় ফুটে উঠেছে, সেজন্য এ পুস্তিকার লেখক ও প্রকাশক আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন।

—প্রণবরঞ্জন ঘোষ

শ্রীশ্রীচতুর্দশ দেবতার পাঁচালী—শ্রীরবীন্দ্রনাথ দাশ। প্রকাশক: শ্রীসাধনচন্দ্র দাশ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা। পৃষ্ঠা ১৫ ; মূল্য ৫০ পয়সা।

ত্রিপুরার মহারাজার কুলদেবতা শ্রীশ্রীচতুর্দশ দেবতা ত্রিপুরাবাসিগণ কর্তৃক শ্রদ্ধাভক্তিভরে পূজিত হন। চতুর্দশ দেবতার নাম: শিব, উমা, হরি, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ, ব্রহ্মা, পৃথিবী, সমুদ্র, গঙ্গা, অগ্নি, কন্দর্প, হিমালয়।

পাঁচালী-পুস্তিকাখানির বিন্যাস-পারিপাট্য ও ভক্তিরসাভিব্যক্তি ভক্তগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। আগরতলা মহাফেজখানায় সংরক্ষিত হস্তলিখিত পুরাতন পুস্তকের তত্ত্বানুসরণে শ্রীশ্রীচতুর্দশ দেবতার ধ্যানমন্ত্রগুলি পুস্তিকাটিতে সন্নিবেশিত হওয়ায় ইহার মর্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

স্মরণী (১৯৬৮)—রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম, রহড়া, ২৪ পরগণা।

রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমে গত ১৫ই হইতে ২১শে এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মজয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে পূর্ব পূর্ব বৎসরের মতো 'স্মরণী' প্রকাশিত হইয়াছে।

এবারকার স্মরণীর বৈশিষ্ট্য—লেখাগুলির প্রায় সবই সময়োপযোগী। 'শিক্ষার্থী জন: নব সমীক্ষা' লেখাটি বর্তমান ছাত্রসমাজের বিচিত্র নীতি ও মনোভাবের জন্য দায়ী কাহারা—এ বিষয়ে ঔৎসুক্য জাগায়। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রচনা: রামকৃষ্ণকে যেমনটি বুঝেছি, অরূপ সাধনায় রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ, সাহিত্য ও সাহিত্যিক, মার্টিন লুথার কিং: মহাপ্রয়াণে (কবিতা)।

আশ্রম (১৯শ খণ্ড, ১৩৭৪)—রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম, রহড়া, ২৪ পরগণা। পৃষ্ঠা—৭১।

বিভিন্ন বিষয়-অবলম্বনে বাংলা ও ইংরেজীতে মোট ২৮টি সুচিন্তিত ও সুমুদ্রিত রচনাসম্ভারে সজ্জিত হইয়া এবারকার 'আশ্রম' পত্রিকাখানি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। 'বাংলা গদ্যের সেবক: তিন মিশনারী মনীষী' লেখাটিতে নূতনত্বের আস্বাদ পাওয়া যায়। 'যত মত তত পথ' কবিতাটি বেশ ভাল লাগিল। আশ্রম সংবাদে আশ্রম-পরিচালিত প্রাক্-বুনিয়াদী বিদ্যালয়, নিম্ন-বুনিয়াদী বিদ্যালয়, বহুমুখী বিদ্যালয়, নিম্ন-বুনিয়াদী শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, স্নাতকোত্তর বুনিয়াদী শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, জেলা গ্রন্থাগার ও অন্যান্য সমাজশিক্ষাকেন্দ্রের সারা বৎসরের কর্মধারা বিজ্ঞাপিত।

সন্দীপন (অষ্টম সংখ্যা: ১৯৬৮), রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষণমন্দির, বেলুড় মঠ, হাওড়া। পৃষ্ঠা ৮৪ + ২৮।

পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় শিক্ষণমন্দিরের সুসম্পাদিত পত্রিকাখানি আকর্ষণীয় হইয়াছে। ২০টি বাংলা, ৯টি ইংরেজী ও একটি সংস্কৃত লেখায় পত্রিকাটি অলঙ্কৃত। 'আমাদের কথা'য় শিক্ষণ-মন্দিরের সারা বৎসরের কর্মচিত্র পরিস্ফুট।

Pauskura Banamali College Souvenir (1966-67), P. 30.

পাঁশকুড়া বনমালী কলেজের স্মরণিকাটি পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। পত্রিকার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

Unity of India—A Symposium (1968)—Sri Ramakrishna Seva Sangha., Jagannath Nagar, Ranchi, P. 52

যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে ভারতের ঐক্য কিরূপে স্থাপিত হইতে পারে, সেবিষয়ে অবহিত হইবার জন্য বর্তমান সময়ে স্মরণিকাটির আত্মপ্রকাশ বিশেষভাবে অভিনন্দনযোগ্য। কয়েকটি সুচিন্তিত উচ্চ-কোটির রচনা দ্বারা পত্রিকাটি সমৃদ্ধ।

ভগিনী নিবেদিতার জীবনী ও বাণী—ব্রহ্মচারী অরূপচৈতন্য। প্রকাশক: শ্রীধনঞ্জয় প্রামাণিক, অশোক প্রকাশন, এ ৬২ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। পৃষ্ঠা ৩৪৪; মূল্য ৭·৫০।

বিদেশিনী হইয়াও যিনি ভারতবর্ষকে মনে প্রাণে ভালবাসিয়াছিলেন এবং ভারতমাতার সেবায় নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, সেই মহীয়সী ভগিনী নিবেদিতার বিরাট কর্মময় জীবনের সঙ্গে ভারতবাসীমাত্রেরই পরিচিত হওয়া অবশ্যকর্তব্য। ভগিনী নিবেদিতার মহৎ জীবন ও কর্মধারার একটি সুন্দর ছবি আঁকা হইয়াছে এই গ্রন্থে। নিবেদিতা তাঁহার গুরুদেব যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি এবং ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ও বিশ্বজননী শ্রীশ্রীসারদাদেবীর প্রতি যে অসীম ভক্তি-শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন, তাহা পরিস্ফুট করিবার প্রচেষ্টা পুস্তকখানিতে দৃষ্ট হয়। সহজ ও সুষম ভাষা-রীতির জন্য নিবেদিতার অনিন্দ্যসুন্দর জীবনী সুখপাঠ্য হইয়াছে। গ্রন্থখানি পাঠ করিলে ভাস্বর চরিত্রের একটি সামগ্রিক রূপ চিত্তপটে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। শেষাংশে ভগিনী নিবেদিতা-রচিত গ্রন্থাবলীর পরিচিতি, নিবেদিতার প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের আশীর্বাণী, নিবেদিতার উদ্দেশ্যে মনীবিবৃন্দের শ্রদ্ধাঞ্জলি এবং সর্বশেষে নিবেদিতার জীবনের ঘটনাপঞ্জী সন্নিবেশিত হওয়ায় গ্রন্থখানির মূল্য ও আকর্ষণ বাড়িয়াছে। কাগজ, মুদ্রণ ও বাঁধাই সুন্দর।

শ্রীমদ্ভাগবতম্ (মূল, অনুবাদ, টীকা ও ব্যাখ্যা সহ দশম স্কন্ধ—দ্বিতীয় খণ্ড)—মহানামব্রত ব্রহ্মচারী। প্রকাশক: ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার, অন্নদা নিয়োগী লেন, কলিকাতা ৩। পৃষ্ঠা ৩১৬+১১; মূল্য ৮·৫০।

শ্রীব্যাসদেবের মহাদান শ্রীমদ্ভাগবত। শ্রীমদ্ভাগবতে যে অমৃত জীবনলাভের অমোঘ পথনির্দেশ আছে তাহা অসংখ্য মানুষকে আধ্যাত্মিকতার পথে আকর্ষণ করিয়াছে ও করিতেছে। দ্বাদশটি স্কন্ধ-বিশিষ্ট ভাগবত-গ্রন্থের দশম স্কন্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইতে সমগ্র লীলা বর্ণিত।

ভাষা ও ভাবে সুসমৃদ্ধ বিরাট ভাগবত-গ্রন্থের মর্মার্থ সম্যক্ উপলব্ধি করা অত্যন্ত আয়াসসাধ্য; ভাগবত অধিগত করিতে হইলে সংস্কৃতশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি প্রয়োজন। প্রচলিত কথা আছে যে, ভাগবতে পণ্ডিতদের পরীক্ষা। আলোচ্য গ্রন্থে সুধী গ্রন্থকারের পাণ্ডিত্যের সহিত মননশীলতার মণিকাঞ্চন-সংযোগের মতো পরিচয় মেলে। 'ফেলালব' নামক গ্রন্থকারের সহজ সরল ও সারগর্ভ নিজস্ব ব্যাখ্যায় এই পরিচয় বিদ্যমান। শ্রীশ্রীধরস্বামী-কৃত সুপ্রসিদ্ধ টীকা-সংবলিত এই গ্রন্থে শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের একোনত্রিংশ হইতে একোনচত্বারিংশ অধ্যায় পর্যন্ত দেওয়া হইয়াছে। ভক্তবৃন্দ গ্রন্থখানি পাঠ করিলে বিশেষ উপকৃত হইবেন। জনসাধারণ ইহা পাঠ করিয়া ভাগবতের মাধুর্য উপলব্ধি করিয়া সমগ্র ভাগবতপাঠের জন্য আগ্রহান্বিত হইবেন। উৎকৃষ্ট কাগজে পরিচ্ছন্ন মুদ্রণ ও সুন্দর বাঁধাই।

আচার্য সংলাপ (প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়)—শ্রীঅধীরকুমার সরকার কর্তৃক সংগৃহীত। প্রকাশক: স্বামী শুদ্ধানন্দ গিরি, সম্পাদক, সৎসঙ্গ মিশন, সেবায়তন (ঝাড়গ্রাম), জেলা মেদিনীপুর। পৃষ্ঠা ৫৬ ও ৭০; মূল্য প্রতিখণ্ড এক টাকা।

শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দ গিরি মহারাজের সহিত ধর্মবিষয়ে কথোপকথন পুস্তক-দুইটিতে সন্নিবেশিত। সংলাপের মাধ্যমে সাধন-বিষয়ক অনেক উপদেশ সরলভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে যোগবাশিষ্ঠ, শিবসংহিতা, ভগবদ্-গীতা, গোরক্ষসংহিতা, পাতঞ্জল যোগসূত্র, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, ঘেরণ্ডসংহিতা, দেবীভাগবত ও অষ্টাবক্রসংহিতা হইতে উপযুক্ত উদ্ধৃতির মর্মানুবাদ দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা

বেলুড় মঠে ভাবগম্ভীর পরিবেশে যথোপযুক্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে মৃন্ময়ী প্রতিমায় জগজ্জননী শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর অর্চনা বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত পঞ্জিকামতে ২৮শে সেপ্টেম্বর সপ্তমী হইতে ১লা অক্টোবর দশমী পর্যন্ত চারদিন অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

পূজার কয়দিন আবহাওয়া সুন্দর থাকায় প্রত্যেক দিনই পূজা-ও প্রতিমাদর্শনের জন্য প্রচুর ভক্তসমাগম হইয়াছিল। মহাষ্টমীর দিন ১২,০০০ ভক্তকে হাতে হাতে অন্নপ্রসাদ দেওয়া হয়।

শাখাকেন্দ্রে শ্রীশ্রীদুর্গোৎসব

এই বৎসর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নিম্নলিখিত কেন্দ্রসমূহে মৃন্ময়ী প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছে: আসানসোল, করিমগঞ্জ, জলপাইগুড়ি, জয়রামবাটী, জামসেদপুর, ঢাকা, দিনাজপুর, নারায়ণগঞ্জ, পাটনা, বারাণসী (অদ্বৈত আশ্রম), বোম্বাই, মালদহ, মেদিনীপুর, রহড়া, শিলং, শিলচর, শেলা (চেরাপুঞ্জী, খাসি হিল)।

বেলুড় মঠে সাধুসম্মেলন

বেলুড় মঠে গত ১০ই অক্টোবর হইতে ১২ই অক্টোবর পর্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী সাধু-সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এবং ভারতেতর দেশে অবস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কেন্দ্রগুলি হইতে বহু সাধু আসিয়া এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন

বেলুড় মঠে গত ১৩ই অক্টোবর বিকাল সাড়ে-তিনটার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর সভাপতিত্বে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের ৫৯তম বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন হয়। মঙ্গলাচরণ, উদ্বোধন-সঙ্গীত প্রভৃতির পর রামকৃষ্ণ মিশনের সহ-সম্পাদক স্বামী ভূতেশানন্দ মিশনের ১৯৬৭-'৬৮ সালের গভর্নিং বডি-র কার্যবিষয়ক রিপোর্ট পাঠ করেন (ইহার বিস্তৃত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল)। পরে অন্যান্য অনুষ্ঠানান্তে শ্রীকালীপদ সেন ও স্বামী পুণ্যানন্দ দেশের বর্তমান পরিস্থিতি-উদ্ভূত মিশনের সমস্যাগুলির সমাধানে মিশনের গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী সভ্যগণের কর্তব্য-বিষয়ে আলোচনা করিবার পর সভাপতি স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী ভাষণ দেন। তিনি বলেন:

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, ধর্মের সংস্থাপন ও অধর্মের বিনাশের জন্য ভগবান যুগে যুগে আবির্ভূত হন। বর্তমান যুগে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আবির্ভূত হইয়াছিলেন এই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্যই। তাঁহাদের বাণী ও আদর্শ জগৎকে শান্তির পথ দেখাইবে। আমাদের কাজ এই আদর্শকে ধরিয়া রাখা, জীবনে ফুটাইয়া তোলা, প্রচার করা। ইহার জন্য আমাদের অশেষ দুঃখবরণও করিতে হইতে পারে, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের সহায়ক রহিয়াছেন, সর্বাবস্থায় এই বিশ্বাস অটুট রাখিয়া আদর্শকে ধরিয়া থাকিয়া আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে।

রামকৃষ্ণ মিশনের ১৯৬৭-'৬৮ সালের কার্য-বিবরণী

এতদিন পর্যন্ত আমাদের কার্যবিবরণীতে কেবল রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যাবলীর বিবৃতি দেওয়ারই প্রথা চলিয়া আসিতেছিল, সম-গোত্রীয় প্রতিষ্ঠান রামকৃষ্ণ মঠের কার্যবিবরণ ইহাতে থাকিত না; অথচ রামকৃষ্ণ মঠের কার্যাবলী রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যাবলীর সমজাতীয় এবং পরিমাণেও কম নহে। দুটি প্রতিষ্ঠান কার্যও করে মিলিতভাবে। মিশনের বাৎসরিক রিপোর্ট-এ উভয় প্রতিষ্ঠানেরই বিবরণ দেওয়া হয়। বস্তুতঃ সাধারণের ধারণা রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন একই প্রতিষ্ঠান; মিশনের কার্য-বিবরণীর সঙ্গে মাঝে মাঝে মঠের কার্যবিবরণী সংযুক্ত না করিলে এ দুটি প্রতিষ্ঠানের কার্য সম্বন্ধে বহু লোকের ধারণা পরিষ্কার নাও হইতে পারে ভাবিয়া এবার পূর্বোক্ত প্রথার সামান্য ব্যতিক্রম করা গেল।

মিশনের সভ্যসংখ্যা

১৯৬৮ সালের ৩১শে মার্চ রামকৃষ্ণ মিশনে ৬৮৯ জন সভ্য ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে ৩৩৬ জন গৃহস্থ এবং ৩৫৩ জন সন্ন্যাসী। গভীর দুঃখের বিষয়, আলোচ্য বর্ষে ২জন গৃহস্থ ও ২জন সন্ন্যাসী সভ্য দেহত্যাগ করিয়াছেন।

কর্ম-প্রসার

আমাদের আর একটি বছর অতিক্রম করিতে হইল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়াই। যাহার ফলে বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে কর্মক্ষেত্রে বহু স্থানে আমাদের কর্মিগণের সহিত মতভেদ ও ছাত্র-আন্দোলনের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে; বিহার ও তামিলনাদ প্রদেশেও ইহার আঁচ কিছু লাগিয়াছে। ফলে গভর্নিং বডি-কে বর্তমান কেন্দ্রগুলির অভ্যন্তরে ও বাহিরে কর্মপ্রসার-বিষয়ে খুবই সাবধানে অগ্রসর হইতে হইয়াছে। তবে পূর্বে আরব্ধ কর্মের ও কয়েকটি ক্ষেত্রে স্বাভাবিক উন্নতির জন্য কিছুটা প্রসার করিতেই হইয়াছে। রায়পুরস্থ বিবেকানন্দ আশ্রমটিকে গত ৮.৪.৬৮ তারিখে রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে; গত দুই বৎসর ধরিয়া এ বিষয়ে আইনসংক্রান্ত আলোচনাদি চলিতেছিল। গৌহাটির আশ্রমটিকেও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে; আইনসংক্রান্ত বিষয়গুলির নিষ্পত্তি হইলেই উহা করা হইবে।

আলোচ্য বর্ষে নূতন গৃহনির্মাণও কিছু হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে বেলুড়ে মিশনের ডিস্‌পেন্‌সারী ভবনটির দোতলা, ভুবনেশ্বরে বিবেকানন্দ স্কুলগৃহ, দেওঘরে একটি নূতন বাস-গৃহ, মাদ্রাজে বিবেকানন্দ কলেজের লাইব্রেরী ভবন, কানপুরে 'বিবেকানন্দ সেন্টিনারী মেমোরিয়াল লাইব্রেরী' ভবন, নরেন্দ্রপুরে 'বিবেকানন্দ সেন্টিনারী হল' এবং জামসেদপুরে ভগিনী নিবেদিতা উচ্চ-মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের 'বায়োলজি ব্লক' নির্মিত হইয়াছে।

মঠ-কেন্দ্রগুলির মধ্যে কলিকাতায় বাগবাজারস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে (উদ্বোধনে) একটি নূতন গৃহের নির্মাণকার্য আরম্ভ হইয়াছে; মাদ্রাজ মঠে 'রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী প্রাইমারী স্কুলের জন্য একটি ভবন নির্মিত হইয়াছে, এবং ডিস্‌পেন্‌সারী-ভবনের সম্প্রসারণের জন্য ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে; উটাকামণ্ড মঠে স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য জে. কে. গুড্‌উইনের স্মৃতি-স্তম্ভ নির্মিত হইয়াছে; মহীশূর আশ্রমে বেদান্ত কলেজের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে; ব্যাঙ্গালোর

আশ্রমে 'বিবেকানন্দ সেন্টিনারী মেমোরিয়াল' ভবনের উদ্বোধন হইয়া গিয়াছে; বৃন্দাবন আশ্রমে একটি মন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। মঠের প্রধান কেন্দ্র বেলুড় মঠ পুরাতন মঠবাটীর সংস্কারের কাজ আরম্ভ ও একটি বিশ্রামাগার নির্মাণ করিয়াছে এবং উত্তরকাশীতে সঙ্ঘের সাধুদের তপস্যার জন্য একটি কুটিরও নির্মাণ করিয়াছে।

কেন্দ্রসমূহ ও কার্যধারা

প্রধান কেন্দ্র (বেলুড়) ছাড়া ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে মিশনের ৭১টি কেন্দ্র ছিল। তন্মধ্যে পূর্বপাকিস্তানে ছিল ৭টি এবং ব্রহ্ম, ফ্রান্স, ফিজি, সিঙ্গাপুর, সিংহল ও মরিশাসে একটি করিয়া; বাকী ৫৮টি ভারতে। এই সংখ্যার মধ্যে ৬৩টি মঠ-কেন্দ্র ধরা হয় নাই। মঠ-কেন্দ্রগুলির মধ্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ১০টি, পূর্বপাকিস্তানে ৮টি; সুইজারল্যাণ্ড, ইংলণ্ড ও আরজেনটিনায় একটি করিয়া এবং বাকী ৪২টি ভারতে অবস্থিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত ও তাঁহার জীবনে আচরিত বৈদান্তিক সত্যসমূহের ভিত্তিতে মিশনের নিঃস্বার্থ সেবামূলক কার্যাবলী অনুষ্ঠিত হয়। মিশনের বিভিন্নমুখী কার্যধারার প্রধানতঃ পাঁচটি বিভাগ: (১) সেবাকার্য (Relief), (২) চিকিৎসা, (৩) শিক্ষা, (৪) সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রসার, (৫) গ্রামাঞ্চলে ও উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলে জনকল্যাণকর কার্য।

মঠকেন্দ্রগুলির বিশেষ কার্য জনসাধারণের মধ্যে ধর্মভাববৃদ্ধির সহায়তা করা; তাহা হইলেও সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও কেন্দ্রগুলি প্রভূত পরিমাণ কর্ম করিয়াছে। মঠ ও মিশন উভয়েরই রাজনীতির সহিত কোন সংস্রব নাই। আলোচ্য বর্ষে বিরুদ্ধ ভাবধারা ও পরিবেশে, এমনকি হিংসাত্মক পরিস্থিতির মধ্যেও কেন্দ্রগুলিকে কাজ করিতে হইয়াছে।

(১) **সেবাকার্য:** বিভিন্ন দুর্বিপাকে পীড়িত দেশবাসীর মধ্যে সারা বৎসর ধরিয়াই মিশন কর্তৃক সেবাকার্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বিহারে খরা-পীড়িত অঞ্চলে সেবাকার্য শুরু করা হয় ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দে এবং তাহা ১৯৬৭ খৃ: পর্যন্ত চালাইয়া যাওয়া হয়। উত্তরপ্রদেশে খরাত্রাণকার্য আরম্ভ হয় মির্জাপুর জেলায় এবং বান্দা জেলায়; এই কার্য শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলায় খরাপীড়িত অঞ্চলে ১৯৬৭ খৃ: জুন মাসে সেবাকার্য আরম্ভ করা হয়। ১৯৬৭ খৃ: আগস্টে মালদহ জেলায় ইহা সম্প্রসারিত হয়। উত্তরপ্রদেশের খরাত্রাণকার্য ১৯৬৭ খৃ: সেপ্টেম্বরে শেষ করা হয় এবং এই মাসেই বিহারে ও পশ্চিমবঙ্গে কার্যের গুরুত্ব কমিতে থাকে; ১৯৬৭ খৃ: অক্টোবরে খরাত্রাণকার্যের সমাপ্তি ঘটে। এই সময়েই ১৯৬৭ খৃ: অক্টোবরে মিশন পশ্চিমবঙ্গে মেদিনীপুর জেলায় বন্যার্ত-সেবাকার্য আরম্ভ করে। এই সময়ে বিহারের রাঁচিতে দাঙ্গা-বিধ্বস্ত জনগণের মধ্যে সাধারণভাবে সেবাকার্য আরম্ভ করা হয়। মেদিনীপুর বন্যার্তসেবা শেষ হয় ১৯৬৭ খৃ: নভেম্বরের শেষে। এই মাসেই মিশনের দিল্লীকেন্দ্র যমুনা-বন্যার্তত্রাণকার্য আরম্ভ করে এবং প্রধান কেন্দ্র বেলুড় কর্তৃক ওড়িশায় বাত্যা-বিপর্যস্ত জনগণের মধ্যে সেবাকার্য শুরু করা হয় এবং ইহা ১৯৬৮ খৃ: মে পর্যন্ত চলে। ১৯৬৭ খৃ: ডিসেম্বরে বোম্বাই কেন্দ্র মহারাষ্ট্রে কয়নানগরে ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত জনগণের মধ্যে সেবাকার্য শুরু করে।

উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশন খরাপীড়িত অঞ্চলে সেবাকার্যের জন্য অর্থসাহায্য এবং দ্রব্যাদি ভারত সরকার ও রাজ্যসরকারের নিকট হইতে যথেষ্ট পরিমাণে পাইয়াছে। সহৃদয় জনসাধারণের নিকট হইতে এই সেবাকার্যে অর্থ, বস্ত্রাদি ও অন্যান্য দ্রব্য নানাভাবে সাহায্যরূপে আসিয়াছে। অনেকে স্বেচ্ছাসেবকরূপেও খরাত্রাণকার্যে যোগ দেন। কানাডা হইতে গুঁড়া দুধ ও ঔষধপত্র প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে। সমস্ত রাজ্যে খরাত্রাণকার্যে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ৯,৭৮,৮৪৭'৩৮ টাকা (১৯৬৬-৬৭ খৃষ্টাব্দে এই কার্যে ব্যয়িত ২,৭৫,৬৩২'২১ টাকা ইহার অন্তর্ভুক্ত)। মেদিনীপুর-বন্যার্তসেবায় ৩,০৫,১৪০'৭২ টাকা এবং ওড়িশা সাইক্লোন রিলিফে ১২,৮৪৮'৪৯ টাকা ব্যয় করা হয়। এই সকল সেবাকার্যে বিতরিত খাদ্যদ্রব্যাদির পরিমাণ—২,৩৯৮ টন ৭ কুইন্টাল। ইহা ছাড়া ৫৪ টন ১১ কুইন্টাল ৪২ কেজি মিল্ক-পাউডার, ৯১,২৯১ খানি নূতন বস্ত্রাদি ও শিশুদের পোশাক, ১৭,৫০৯টি কম্বল এবং ৫,০০৪টি এনামেলের বাসন বিতরিত হয়।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, মিশনের স্থায়ী কেন্দ্রগুলি কর্তৃক স্ব-স্ব অঞ্চলে স্থানীয় দরিদ্র জনসাধারণকে অর্থ ও দ্রব্যাদি দ্বারা নিয়মিত ভাবে সাহায্য করা হইয়াছে। সেবাকার্যে প্রধান কেন্দ্র প্রভূত অংশ গ্রহণ করিয়াছে। প্রধান কেন্দ্র শাখাকেন্দ্রগুলির কাজ প্রধানতঃ নিয়ন্ত্রণ করিলেও, প্রধান কেন্দ্র হইতে দরিদ্র ছাত্রগণকে ও দুঃস্থ পরিবারবর্গকে সাহায্য করা হয়। প্রধান কেন্দ্র হইতে নিয়মিতভাবে ১৪০টি পরিবারকে এবং ১২৩ জন ছাত্রকে (সিন্ধু উদ্বাস্তদের লইয়া) আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত একটি বিদ্যালয়, ২৬৯টি পরিবার এবং ১৩ জন ছাত্র সাময়িকভাবে সাহায্য পাইয়াছে। এই সাহায্যের মোট পরিমাণ—২৮,৯০৭'৭৫ টাকা।

(২) **চিকিৎসা:** ভারত ও পাকিস্তানের অধিকাংশ কেন্দ্র-কর্তৃক জাতিধর্মনির্বিশেষে পীড়িত জনসাধারণের সেবাকল্পে অনেকগুলি হাসপাতাল ও ডিস্পেন্সারী পরিচালিত হয়। আলোচ্য বর্ষে মিশনের হাসপাতালগুলিতে অন্তর্বিভাগে মোট শয্যা-সংখ্যা ছিল ৯৯৫, এগুলিতে ১৮,৫৬০ জন রোগী চিকিৎসার জন্য ছিল। ৫১টি ডিস্পেন্সারীতে বহির্বিভাগে পুরাতন রোগীসহ মোট ২৪,৮৪,৯৪৫ জন রোগী চিকিৎসা লাভ করে। ডুঙ্গরি-রাঁচি স্যানাটোরিয়াম এবং নিউদিল্লী-স্থিত ক্যারলবাগ হাসপাতাল কেবল যক্ষ্মা রোগীদের জন্য। কলিকাতা সেবাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃক একটি নার্স ট্রেনিং স্কুল পরিচালিত হয়; ইহার দুইটি বিভাগ: সিনিয়র ও জুনিয়র।

মঠকেন্দ্রগুলিতে ইনডোর হাসপাতালে ৫,৮৩৩ জন (পুরাতন রোগীসহ) রোগী চিকিৎসিত হয়; আউটডোরে চিকিৎসিতের সংখ্যা ৫,৪০,৪২৩। ত্রিবান্দ্রাম হাসপাতালে মানসিক রোগের চিকিৎসার জন্য একটি বিভাগ এবং একটি নার্স ট্রেনিং স্কুল আছে।

মঠ ও মিশন কেন্দ্রগুলিতে সাধারণতঃ অ্যালোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা-ব্যবস্থা আছে; কোন কোন কেন্দ্রে আয়ুর্বেদিক মতেও চিকিৎসা-ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে।

(৩) **শিক্ষা:** আলোচ্য বর্ষে মিশন কর্তৃক নিম্নলিখিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালিত হইয়াছে:

৫টি মহাবিদ্যালয়, ২টি বি.টি. কলেজ, একটি স্নাতকোত্তর বেসিক ট্রেনিং কলেজ, একটি প্রাক্-

বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ৬টি জুনিয়র বেসিক ট্রেনিং স্কুল ও কলেজ, একটি শারীর-শিক্ষা কলেজ, একটি গ্রামীণ-শিক্ষা কলেজ, একটি কৃষি-শিক্ষা বিদ্যালয়, ৪টি ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুল (পলিটেকনিক), ১৪টি জুনিয়র টেকনিক্যাল ও ইণ্ডাস্ট্রিয়াল স্কুল, ৭৯টি ছাত্রাবাস, অনাথাশ্রম প্রভৃতি, ৩টি চতুষ্পাঠী, ৩৪টি বহুমুখী উচ্চতর মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১৪০টি অন্যান্য বিদ্যালয়, ৩৪টি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র অথবা কমিউনিটি সেণ্টার, একটি পরিষেবিকা শিক্ষণকেন্দ্র, একটি অন্ধ ছাত্রদের বিদ্যালয়, একটি দিবা-ছাত্রাবাস এবং একটি বিভিন্ন ভাষা শিক্ষার স্কুল।

মিশনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৬৫,৩২৪, তন্মধ্যে ছাত্র ৪৮,৬১২ এবং ছাত্রী ১৬,৭১২।

মঠকেন্দ্রগুলি কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষায়তন-সমূহের মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৫,৮৬৬, তন্মধ্যে ছাত্র ৩,৪২৮ এবং ছাত্রী ২,৪৩৮।

(৪) **সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রসার :** উল্লেখযোগ্য যে, মিশনের এই কর্মবিভাগে বহুসংখ্যক গ্রন্থাগার, পাঠাগার, সাময়িক প্রদর্শনী, উৎসবাদি, চলচ্চিত্র ও ম্যাজিক ল্যানটার্ন প্রদর্শন, সেমিনারি প্রভৃতির মাধ্যমে সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শ জনগণের মধ্যে বিস্তার লাভ করিতেছে। কয়েকটি কেন্দ্রে পুস্তকাদি-প্রকাশনের মাধ্যমেও ইহা করা হইয়া থাকে। এই কার্যে কলিকাতা ইনষ্টিট্যুট অব কালচারের নাম সবিশেষ উল্লেখ-যোগ্য ও গৌরবময়। সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শ প্রসারের ক্ষেত্রে মঠকেন্দ্রগুলি কর্তৃক যে বিপুল ও বিরাট কার্যাবলী অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহা উল্লেখ করা হইল না, কারণ সেগুলির নির্বাচিত কর্মক্ষেত্র প্রধানতঃ এই বিভাগেই। বহু পুস্তক-প্রকাশন-বিভাগ ও মন্দির প্রভৃতি মঠকেন্দ্রগুলি কর্তৃক পরিচালিত হয়, তদুপরি বক্তৃতা-সফর, শাস্ত্রালোচনা, ক্লাস প্রভৃতি দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে ধর্মভাব ও আধ্যাত্মিক আদর্শ বিস্তার করা হইয়া থাকে।

(৫) **গ্রামাঞ্চলে ও উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলে জনকল্যাণকর কার্য :** রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্রগুলি সবই শহরাঞ্চলে স্থাপিত এবং সেগুলি কেবল উচ্চশ্রেণী ও মধ্য-বিত্তদের জন্যই—সাধারণের মধ্যে এইরূপ একটি ধারণা জন্মিয়াছে; ইহা অপেক্ষা ভ্রান্ত ধারণা আর কিছুই হইতে পারে না; ইহার নিরসন প্রয়োজন।

রামকৃষ্ণ মিশনের অন্ততঃ ৯টি বড় কেন্দ্র গ্রামাঞ্চলেই অবস্থিত এবং এই কেন্দ্রগুলির পরিচালনাধীন বহু উপকেন্দ্রও আছে। এগুলি জনসাধারণের সেবায় নিরত থাকিয়া আলোচ্য বর্ষে ১২৮টি বিদ্যালয় পরিচালনা করিয়াছে; তন্মধ্যে ৬টি বহুমুখী বিদ্যালয়, ৩টি মাধ্যমিক, ৩৩টি সিনিয়র বেসিক, জুনিয়র বেসিক ও মধ্য-ইংরেজী, ৪৯টি প্রাথমিক এবং বয়স্কদের জন্য ৩৭টি নৈশ বিদ্যালয়। ১৩টি দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালিত হইয়াছে, ৩টি ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার ২৪টি গ্রামে কাজ করিয়াছে। ১২১টি দুগ্ধ-বিতরণকেন্দ্র, ৫টি অডিও-ভিসুয়াল ইউনিট, ৮টি কমিউনিটি সেণ্টার, ৪টি বৃত্তি-শিক্ষা কেন্দ্র আছে। কৃষিমেলা প্রভৃতিও পরিচালিত হয়। ইহা ছাড়া শিলং কেন্দ্রের একটি ভ্রাম্যমাণ দাতব্য অ্যালোপ্যাথিক ডিস্পেন্সারীর মাধ্যমে খাসি পাহাড় অঞ্চলে নিয়মিতভাবে ৩০টি গ্রাম জুড়িয়া আলোচ্য সময়ে ১৫,৫২৪ জন রোগীর চিকিৎসা করা হইয়াছে। কামারপুকুর মিশন কেন্দ্র

কর্তৃক একটি সংস্কৃত চতুষ্পাঠী পরিচালিত হইয়াছে। আসামে নেফা কেন্দ্রে উদ্দীপনার সহিত শি ‑ও সং ‌তমূলক কার্য আরম্ভ করা হ‹য়াছে ‌ং এই কার্য গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণ কর্তৃক সম ‌ৃত হইতেছে।

লক্ষণীয় যে, মিশনের শহরাঞ্চলের চিকিৎসা-কেন্দ্র ও বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র নরনারী চিকিৎসার সুযোগ লাভ করিতেছে এবং সহস্র সহস্র দরিদ্র ছাত্র অর্থ-সাহায্য অথবা বিনা-ব্যয়ে থাকিবার ও শিক্ষা-লাভের সুযোগ পাইতেছে। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, মিশন কর্তৃক প্রায় প্রতি বৎসরই আর্তত্রাণ-সেবাকার্য (Relief) করা হয় এবং এই সেবা-কার্যের মাধমে সহস্র সহস্র দুঃস্থ ও বিপন্ন ব্যক্তি সাহায্য লাভ করে।

রামকৃষ্ণ মিশনের বর্তমান সেবাকার্য

ওড়িশায় খরত্রাণকার্য—ওড়িশায় **ঢেনকানল জেলায়** হিন্দোল সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে দুঃস্থ-সেবাকার্যে গত ১৯শে আগস্ট (১৯৬৮ খৃঃ) হইতে ১৩ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক ৪,৬০০ ব্যক্তির মধ্যে ৪,২৯৯ কেজি চাল ও ৩১,৪৪৮ কেজি গম বিতরণ করা হইয়াছে। দুঃস্থগণকে ৩,৮৪৮ খানি নূতন ধুতি ও শাড়ী এবং ৪৯টি পুরাতন পোশাক দেওয়া হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে বন্যার্তসেবা : (১) হুগলা জেলায় আরামবাগ মহকুমায় গড়েরঘাট সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে মিশন কর্তৃক বন্যাপীড়িত জনগণের মধ্যে গত ১১ই আগস্ট হইতে ২রা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১,৩০,২৭৭ কেজি চাল বিতরিত হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা—২১,৯৬৭।

(২) মেদিনীপুর জেলায়—সবং, নন্দীগ্রাম, ভগবানপুর ও ময়না থানার ১২টি অঞ্চলে গত ২৩শে আগস্ট হইতে ২১শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মিশন কর্তৃক ৮৬,০৮৭ কেজি চাল ও ১,৬০,৪৮৭ কেজি গম বিতরণ করা হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত বন্যার্তদের সংখ্যা—২৮,৯৮৭।

(৩) জলপাইগুড়ি জেলায়—সম্প্রতি বন্যার যে ধ্বংসলীলা হইয়া গিয়াছে তাহার অব্যবহিত পরেই রামকৃষ্ণ মিশন জলপাইগুড়ি শহরের কয়েকটি অঞ্চলে এবং শহর হইতে ১৪ মাইল দূরবর্তী মঙ্গলকোট এলাকায় সেবাকার্য আরম্ভ করিয়াছে।

আসামে বন্যার্তসেবা : (১) কামরূপ বন্যার্ত-সেবাকার্যে শিলং আশ্রম কর্তৃক বরমা সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে ১,০ ০ কেজি চাল, ৫০০ কেজি ডাল এবং ২৭০টি জামা কাপড় বিতরণ করা হয়।

(২) হাইলাকান্দি : বন্যার্ত-সেবাকার্যে-গত ৭ই আগস্ট হইতে ১৪ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৯,২২৫ কেজি আটা ৫০৪ ব্যক্তিকে দেওয়া হয়। ৫৬টি গৃহ নির্মিত হইয়াছে এবং ৭৭টি পরিবারকে বীজ-ধান দেওয়া হইয়াছে। ৩৩১ খানি ধুতি ও শাড়ী দান করা হয়।

গুজরাটে বন্যার্ত-ত্রাণকার্য—সুরাট ও ভাবনগর জেলায় রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক বন্যা-পীড়িতদিগের পুনর্বাসনের জন্য ব্যাপকভাবে কুটীরনির্মাণ-কার্য আরম্ভ হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

চিকিৎসা-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার

ভারতীয় অধ্যাপক হরগোবিন্দ খোরানা চিকিৎসাবিজ্ঞানে ১৯৬৮ সালের নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন। একই সঙ্গে অধ্যাপক রবার্ট হোলি এবং অধ্যাপক মার্শাল নীরেমবার্গও এই পুরস্কার লাভ করিয়াছেন।

জীববিদ্যার একটি মৌলিক সমস্যা, 'ইণ্টার-প্রিটেশন অব দি জেনেটিক কোড এণ্ড ইট্স ফাংশন ইন প্রোটিন সিনথিসিস'-এর গবেষণায় সফলকাম হইয়া ইঁহারা এই পুরস্কার পাইয়াছেন। পুরস্কার হিসাবে ইঁহারা ৫ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা পাইবেন।

রবীন্দ্রনাথ ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে সাহিত্যে, এবং সি. ভি. রমণ ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে পদার্থবিজ্ঞানে এই পুরস্কার পাইয়াছিলেন।

অধ্যাপক খোরানা ১৯২২ খৃষ্টাব্দে মধ্য-প্রদেশের রায়পুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার ছাত্রজীবন অতিবাহিত হয় লাহোরে। পরে তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য ইংলণ্ডে যান এবং উচ্চশিক্ষালাভান্তে ভারতে ফিরিয়া আসেন। ভারতবর্ষে গবেষণা করিবার জন্য মনোমত সুযোগ না পাইয়া পরে তিনি আমেরিকায় যাইয়া সেখানকার নাগরিকত্ব গ্রহণ করিয়া সেখানে কাজ করিতে থাকেন। বর্তমানে তিনি উইস্কন্সিন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা-বিভাগের ডিরেক্টর।

অধ্যাপক খোরানার সঙ্গে আরো যে দুইজন নোবেল পুরস্কার পাইলেন, তাঁহারাও আমেরিকার নাগরিক। অধ্যাপক হোলির জন্ম ১৯২২ খৃষ্টাব্দে, ইলিনয়সে; বর্তমানে তিনি কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত যুক্ত। অধ্যাপক নিরেমবার্গের জন্ম ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে, নিউ ইয়র্কে; বর্তমানে তিনি মেরিল্যাণ্ডের ন্যাশন্যাল হার্ট ইনষ্টিট্যুটের সহিত সংযুক্ত।

উদ্বোধন

দিব্য বাণী

মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্বিকারঃ কর্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥ ২৬
রাগী কর্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্তা রাজসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ২৭
অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্তা তামস উচ্যতে ॥ ২৮

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—১৮শ অধ্যায়

কর্মফলে অনাসক্ত, কর্তৃত্বের স্পৃহাহীন, ইচ্ছাশক্তিমান—ধৃতিমান,
কর্মেতে উৎসাহী যেই, সাফল্যে যে নহে ফুল্ল, অসাফল্যে থাকে যে অম্লান—
সেজন সাত্ত্বিক কর্তা ।
ফলাকাঙ্ক্ষী যেই জন, বাসনা-জর্জর চিত্ত যার,
লোভ-হিংসা-ভরা মন, আনন্দে যে উদ্বেলিত কর্মে সিদ্ধি আসিবার পর,
অসিদ্ধিতে মুহ্যমান—সেজন রাজস কর্তা ।
মন যার নহেক সংযত,
অমার্জিত বুদ্ধি যার, শঠতা স্বভাব যার, জানে না যে হইতে বিনত,
স্বার্থবশে যেই জন দ্বিধাহীন চিত্ত নিয়ে অপরের বৃত্তিনাশ করে—
সেজন তামস কর্তা—দীর্ঘসূত্রী—কোন কাজ সময়ে সে করিতে না পারে ।

(তম ধায় মৃত্যু পানে, রজ সে বন্ধন আনে ; সত্ত্বগুণ করিয়া আশ্রয়
কর্মরত হয় যেই, সর্বগুণপারে সেই অমৃতধামের পানে ধায় ।)

কথাপ্রসঙ্গে

ভগিনী নিবেদিতা—জাতির পুনর্জাগরণে

পথ নির্বাচন

ভারতীয় জাতির পুনর্জাগরণকল্পে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করার আকুল প্রচেষ্টাই ভগিনী নিবেদিতার কর্ম-জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। ইহার জন্য নিজের বলিতে যাহা কিছু, সবই তিনি উৎসর্গ করিয়াছিলেন। স্বামীজীর ইচ্ছাধারাকে নিজের মধ্যে অবাধে প্রবাহিত হইতে দিবার জন্য নিজেকে সর্বদা প্রস্তুত রাখা ছাড়া জীবন-প্রচেষ্টা বলিতে আর কোন কিছুই তাঁহার ছিল না।

স্বামীজীর যে আদর্শগুলিকে তিনি বাস্তবে রূপায়িত করিতে চাহিয়াছিলেন তাহাদের অন্যতম হইল: দেশবাসীকে বীরের মত নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে, অক্লান্তভাবে কর্মতৎপর হইতে হইবে—স্বার্থ বিসর্জন দিয়া এবং কর্মকে ভগবানের পূজা জ্ঞান করিয়া। তিনি স্থির বিশ্বাসে জানিতেন, ইহা ছাড়া জাতির উন্নতি অসম্ভব। ভারতীয়তার পুনর্জাগরণ বলিতে—প্রত্যেক কর্মক্ষেত্রে, কেবল 'সাধুর আবাসে' নহে, ত্যাগ ও সেবার ভাবের পুনরুজ্জীবনই তিনি বুঝিতেন।

মিস ম্যাকলাউডকে একটি পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন, "হাজার হাজার শিষ্য যোগাড় করতাম, যদি পারতাম! ভবিষ্যতে আত্মত্যাগে সমর্থ সেই হাজার হাজার আত্মাকে হাটে-বাজারে, বিদ্যালয়ে, লেবরেটরীতে, ষ্টুডিওতে ছড়িয়ে দিতাম শিষ্যরূপে······"

কয়েকজন শিষ্য করিতে চাহিয়াছিলেন—মন্ত্রশিষ্য নয়, স্বামীজীর আদর্শে দীক্ষিত, বিপুল শক্তির উৎস সংযমে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত এবং সর্ববিধ স্বার্থত্যাগে সদাপ্রস্তুত একদল মানুষ।

তিনি জানিতেন, ভারতের মানুষ তখন কেবল উচ্চ আদর্শের চিন্তা এবং আদর্শকে ভালবাসিতে পারিলেই মহত্ত্বের চরম হইল ভাবিত, উহাকে কর্ম-রূপায়িত করার চেষ্টা তাহাদের প্রায় ছিলই না। অথচ কেবল আদর্শকে ভালবাসা নয়, জীবনে উহার বাস্তব রূপায়ণ ছাড়া কোন জাতি কখনো উন্নত হইতে পারে না। তাছাড়া ভারতীয় জাতি যে ভিত্তির উপর জাগিয়া দাঁড়াইতে পারিবে সেই ধর্ম সম্বন্ধেই, নিবেদিতা বলিয়াছেন, তখন 'ভাল' লোকেরাও উদাসীন—যখন ধর্মের প্লাবন বহাইয়া দিবার কথা তখন তাঁহারা অন্য জিনিস লইয়াই ব্যস্ত।

ধর্মই ভিত্তি

জাতির প্রতিটি ব্যক্তির কর্মের সমষ্টিই জাতীয় সম্পদ; প্রত্যেক ব্যক্তি অক্লান্তভাবে কর্মরত না হইলে জাতির উন্নতি হয় না, ইহা সকলেই জানি। যে-জাতির জনগণ স্বেচ্ছায় ইহাতে ব্রতী হইয়াছে, এমনকি যে জাতি জোর করিয়াও তাহার জনগণকে ইহাতে ব্রতী করিয়াছে, তাহারাই জাগতিক উন্নতির শিখরে উঠিয়াছে বা উঠিতেছে।

জাতীয় উন্নতির জন্য এটি একটি অনিবার্য দিক সন্দেহ নাই। কিন্তু জাতির উন্নতিকল্পে স্বেচ্ছায় স্বার্থত্যাগ করিয়া কর্ম করা এবং অনিচ্ছায় বাধ্য হইয়া কর্ম করার মধ্যে জাতির সম্পদ-উৎপাদন বিষয়ে পার্থক্য না থাকিলেও উহার নিরাপত্তার দিক দিয়া দেখিলে প্রথমটিতে নিরাপত্তা সুদৃঢ় হয়, দ্বিতীয়টিতে তাহা অনিশ্চিত। ব্যষ্টিকে লইয়াই সমষ্টি। ব্যষ্টির মনের মধ্যে কোনওরূপ অসন্তোষ, তাহা যত প্রচ্ছন্নই হউক, সমষ্টির নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক; 'তরবারির দ্বারা' উহাকে যতই দমিত করিয়া রাখা যাউক না কেন,

সুযোগ পাইলে উহার বিস্ফোরণ ঘটিবেই এবং সে সুযোগ আসেও। সেজন্য জাতিকে প্রচণ্ডভাবে কর্মরত করার সঙ্গে সঙ্গে উহার মধ্যে অপরের কল্যাণের জন্য স্বেচ্ছায় স্বার্থত্যাগী হওয়ার মনোভাব সঞ্চারিত করার প্রয়োজনও আছে। বিশেষ করিয়া ভারতীয় জাতির পক্ষে, যে জাতি ত্যাগ ও সেবাকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়াই হাজার হাজার বছর ধরিয়া বাঁচিয়া আছে।

কিন্তু স্বার্থত্যাগ ও সেবা—এই কথাগুলি শুনিতে যতই গালভরা হউক না কেন, এগুলিকে জীবনে বাস্তব করিয়া তোলা অতি দুরূহ কাজ। কেন মানুষ স্বার্থত্যাগ করিবে? আপাতদৃষ্টিতে যে-জীবনকে জন্মমৃত্যু-সীমিত, অতি অল্প কয়েকদিনের জন্য বলিয়া মনে হয়, জন্মের পূর্বে বা মৃত্যুর পরে যাহার কোন অস্তিত্বই থাকে না বলিয়া মনে হয়, তাহাকে যে-কোনওরূপে হউক সর্বাধিক পরিমাণ ভোগে ভরাইয়া তোলাই অর্থাৎ যথাসম্ভব স্বার্থপর হওয়াই, নিজের সেবা করাই তো মানুষের কর্তব্য। যেটুকু স্বার্থত্যাগ না করিলে সমাজ বা রাষ্ট্র চাপিয়া ধরে, বাধ্য হইয়া সেটুকু অবশ্য করিতেই হয়। সত্যই যদি তাহাকে স্বার্থত্যাগে উদ্বুদ্ধ করিতে হয়, তাহা হইলে তাহার যে মৃত্যুঞ্জয়ী সত্তা আছে এবং স্বার্থত্যাগ যে সেই সত্তাকেই প্রকট করিয়া তোলে, ইহাতে বিশ্বাস জন্মাইতে হইবে। কিন্তু তাহাতেও হইবে না, মৃত্যুর পরে আমার কি হইবে না হইবে (যাহা অপ্রত্যক্ষ) তাহার জন্য এই প্রত্যক্ষ জীবনের সুখকে মানুষ বিসর্জন দিতে চাহিবে কেন—বিশেষ করিয়া এই ঘোর বাস্তববাদী, আধুনিক যুগে? তাই অপরের জন্য স্বার্থত্যাগকল্পে মানুষকে এমন একটা প্রত্যক্ষ অবলম্বন দিতে হইবে যাহা এ জীবনেই স্বার্থসিদ্ধির আনন্দ অপেক্ষা অধিকতর আনন্দপ্রদ হয়। যাহা তাহা দিতে পারে, তাহাই ধর্ম। সেখানে 'ঈশ্বর' শব্দটি থাকুক বা না থাকুক, কিছুই যায় আসে না। যাহা কিছু আমাদের 'আমি' বোধকে বিস্তৃততর ক্ষেত্রে প্রসারিত করে, তাহাই ধর্ম। ইহাই ক্রমে আমাদের অনন্তে লইয়া যায় এবং আমাদের 'আমি'কে অনন্তপ্রসারিত করিয়া দেয়। এই পথে স্বদেশবাসীতে ও আমাতে, ক্রমে সমগ্র মানবজাতিতে ও আমাতে, সমস্ত প্রাণীতে ও আমাতে এবং পরিশেষে সবকিছুতে ও আমাতে একত্ব-বুদ্ধি আনিয়া দেয়—যে-একত্ব অমর ও আনন্দময় অস্তিত্ব। তখনই অপরের কল্যাণে ও আমার কল্যাণে কোন পার্থক্যবোধ থাকে না। তাই ধর্মকে অবলম্বন না করিলে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থপর হওয়া যায় না।

এই পথে লক্ষ্যলাভ করার লোকের সংখ্যা খুবই কম সন্দেহ নাই, কিন্তু মানুষ যতখানি এপথে অগ্রসর হয়, তাহার নিঃস্বার্থপরতা ক্রমে ততখানিই।

হৃদয়ের দ্বার, অনুভূতির দ্বার খুলিয়া এ পথে প্রবেশ করিতে হয়। যুক্তিবিচার প্রভৃতি বুদ্ধিবৃত্তি নয়, স্নেহ প্রেম প্রভৃতি হৃদয়বৃত্তিই এপথে মানুষকে চালায় সর্বত্রই—যে নামই ইহার বিকাশের পথকে দিই না কেন।

এই ধর্ম বলিতে কতকগুলি অনুষ্ঠানমাত্র বুঝায় না; এ বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি যেন আমরা স্মরণ রাখি—মানুষের অন্তরস্থ দেবত্বের, জ্ঞানের, শক্তির বিকাশের নামই ধর্ম—"আত্মবিদ্যা—ঐ কথা বললেই যে জটাজুট, দণ্ড, কমণ্ডলু ও গিরিগুহা মনে আসে, আমার বক্তব্য তা নয়।"

প্রাচীন আদর্শেরই নব রূপায়ণ

কর্মের সহিত এই ধর্মসাধনাকে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত করিয়া রাখাই ভারতের জাতীয় আদর্শ। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে গীতায় তাহাই শিখাইয়াছেন। আমাদের জাতীয় জীবনের আদর্শে তাহাই ওতপ্রোত। ধর্মই আমাদের জাতীয় জীবনের সর্ববিধ বিকাশের প্রধান প্রেরণা। কালবশে যথার্থ ধর্ম এবং কর্মতৎপরতা দুই-ই আমরা হারাইয়াছিলাম বলিয়াই আমাদের এই অবনতি। স্বামী বিবেকানন্দ এ দিকটিতে জাতির উন্নতিকল্পে যাহা চাহিয়াছিলেন, নিবেদিতা তাহাই বাস্তবে রূপায়িত করিতে চাহিয়াছিলেন সর্বসাধারণের কর্মক্ষেত্রে। অনুমান করা বোধ হয় অযৌক্তিক নয় যে, ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা স্বামী বিবেকানন্দ নিবেদিতার ভবিষ্যৎ কর্মক্ষেত্র প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাকে সন্ন্যাসদীক্ষা দেন নাই, ব্রহ্মচর্যদীক্ষা দিয়াছিলেন। ইহা লইয়া নিবেদিতার মনেও যে প্রশ্ন জাগে নাই, তাহা নহে। স্বামীজী স্থূল-শরীরে থাকাকালেই বিভিন্নশ্রেণীর লোকের সহিত নিবেদিতা যখন মেলামেশা করিতেছিলেন, তখন তাহা স্বামীজীর অভিপ্রেত কি না জিজ্ঞাসা করিলে স্বামীজী অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্মতিই দিয়াছেন। নিবেদিতার ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতির বিস্তারিত বিষয়ে তিনি পূর্ণ স্বাধীনতাও দিয়াছিলেন। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর সংখ্যা চিরদিনই জাতির জনগণের অনুপাতে অল্প; তাঁহারাই জাতির প্রাণধারার ধারক হইলেও তাঁহাদের আদর্শ কখনও সর্বসাধারণের আদর্শ হইতে পারে না। অথচ আদর্শের এই সর্বোচ্চ লক্ষ্য হইতে যতদূরেই থাকুক না কেন, সর্ব-সাধারণকে এই সর্বত্যাগের লক্ষ্যেই দৃষ্টি স্থির রাখিয়া অগ্রসর হইতে হইবে, শুধু আমাদের জাতির উন্নতির জন্যই নয়, ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যও। ধর্মকে অবলম্বন করিয়া স্বার্থ বিসর্জন দিয়া কাজ করিবার প্রচেষ্টা জাতি ও ব্যক্তিকে সমভাবেই উন্নতির পথে লইয়া যায়, যাহা আর কোন আদর্শ ই করিতে পারে না।

জাতীয় জীবনের ব্যাধি

বর্তমান সময়ে আমাদের জাতীয় জীবনে একটি মারাত্মক রোগের জীবাণু প্রবেশ করিয়াছে—সর্ব ক্ষেত্রে কম কাজ করিবার প্রচেষ্টা। যেরূপ বাঞ্ছিত, ছাত্রগণ বিদ্যাভ্যাসে সেরূপ শ্রম করেন না; আফিসে, কারখানায়, ক্ষেতখামারে কর্মিগণ সেরূপ পরিশ্রম করেন না। ইহা জাতীয় উন্নতির পরিপন্থী; প্রত্যেক ব্যক্তির শ্রম যদি কম হয়, জাতির সম্পদ—অর্থ নৈতিক, বৌদ্ধিক, সাংস্কৃতিক, সর্ববিষয়েই কমিয়া যাইবে।

অক্লান্ত শ্রম ছাড়া কোন জাতি বা কোন ব্যক্তি কি পার্থিব, কি বৌদ্ধিক, কি আধ্যাত্মিক বিষয়ে উন্নত হইতে পারে না।

এ বিষয়ে আমাদের প্রত্যেকেরই অত্যন্ত সজাগ হইবার এবং ইহার প্রতিকারের জন্য কার্যকর উপায় অবলম্বনের সময় আসিয়াছে।

স্বামীজীর এই বাণী দুটি আমরা যেন ভুলিয়া না যাই—"চালাকি দ্বারা কোন মহৎ কার্য হয় না" এবং "ভারতমাতা সহস্র সন্তান বলি চাহেন—ভুলিও না পশু নয়, মানুষ।" অমানুষও প্রচণ্ড কর্মতৎপর হইতে পারে; আমরা যাহাতে কর্মতৎপর হইবার সঙ্গে সঙ্গে 'মানুষ'ও হইতে পারি, সেদিকে দৃষ্টি রাখাও বিশেষ প্রয়োজন।

অক্লান্তকর্মা, পবিত্রচেতা, দেশমাতৃকার চরণে আত্মবলিদানে সদাপ্রস্তুত একদল 'মানুষ'ই তৈয়ারী করিতে চাহিয়াছিলেন নিবেদিতা, যাহাদের ভাব ক্রমশঃ ছড়াইয়া যাইবে সমগ্র জাতির প্রাণে।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

বিজ্ঞানভিক্ষু

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী সন্তানগণের মধ্যে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ অন্যতম। শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের সন্ন্যাসী সন্তানগণের বাহিরের আচরণা-দিতে প্রত্যেকের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য থাকিলেও সকলেরই অন্তরে সর্বভাবময় শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। শ্রীভগবানের, সর্বভাবময় শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশে উত্থিত অন্তরের প্রতিটি আন্তরিক স্পন্দনই ইঁহাদের হৃদয়ে প্রতিস্পন্দন তুলিত। জনৈক ভগবদ্‌ভক্ত আকুল প্রাণে অধ্যাত্মজীবনের কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরের জন্য শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন; জানাইবার পদ্ধতি হইল, প্রশ্নগুলি শ্রীভগবানকে যেন পত্র লিখিতেছেন, এভাবে লিখিয়া সেগুলি শ্রীকৃষ্ণের ছবির নীচে রাখিয়া দিতেন। শ্রীকৃষ্ণকেই তখন তিনি আরাধনা করিতেন, তখনও শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানগণের সংস্পর্শে আসেন নাই, এমনকি তাঁহাদের 'spiritual aristro-crat' ভাবিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদের সহিত মিশিতে আগ্রহীও ছিলেন না কিন্তু স্বামী প্রেমানন্দ একদিন তাঁহাকে নিজেই ডাকাইয়া আনিয়া পত্রাকারে শ্রীভগবানের উদ্দেশে প্রেরিত সব প্রশ্নগুলিরই উত্তর দিয়াছিলেন, কিছু জিজ্ঞাসা করিবার পূর্বেই। স্বামী শিবানন্দ একবার ইঁহাকেই (ভক্তটি তখন শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগ দিয়াছেন) শ্রীরামকৃষ্ণচরণে নিবেদিত একটি প্রার্থনার উত্তর দিয়াছিলেন, ভক্তটি প্রার্থনান্তে ঠাকুরঘর হইতে নামিবার পরেই, কিছু বলিবার পূর্বেই। কিরূপে তিনি সে প্রার্থনার কথা টের পাইলেন তাহা জিজ্ঞাসা করিলে স্বামী শিবানন্দ স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছিলেন যে, সেতারাদি বাদ্যযন্ত্রে যেমন কোন একটি তারে আঘাত করিলেই সেই পর্দায় বাঁধা সব তারগুলি ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে, তাঁহাদেরও সেইরূপ। বাবুরাম মহারাজও একবার স্পষ্ট বলিয়াছিলেন, 'বাবুরাম অনেক-কাল এ শরীর থেকে চলে গেছে, এখন সেখানে যিনি আছেন, তিনি ঠাকুর।'

স্বামী বিজ্ঞানানন্দের জীবনেও অনুরূপ একটি ঘটনার কথা আমরা জানি। জনৈক যুবকের স্বামী অখণ্ডানন্দের নিকট দীক্ষাগ্রহণের জন্য আন্তরিক ইচ্ছা সত্ত্বেও ঘটনাচক্রে তাহা হইয়া উঠে নাই। স্বামী অখণ্ডানন্দের দেহত্যাগের পর যুবকটির মনে দারুণ আঘাত লাগে, শ্রীরামকৃষ্ণের উপর খুবই অভিমান হয়; স্থির করে যে আর দীক্ষাই লইবে না। পরে একদিন বেলুড় মঠে আসিয়া ঠাকুরঘরে প্রণাম করিবার সময় এই অভিমান তাহার হৃদয়ে আবার উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। স্বামী বিজ্ঞানানন্দ তখন এলাহাবাদ হইতে মঠে আসিয়াছিলেন। তিনি সেবককে বলেন, 'ঠাকুরঘর থেকে যে ছেলেটি এখন নামছে, তাকে ডেকে নিয়ে এস।' যুবকটি যখন বেলুড় মঠের পুরাতন ঠাকুরঘর হইতে সিঁড়ি দিয়া নামিতেছে, সেবকটি তাহাকে বিজ্ঞানানন্দজীর ডাকার কথা বলিলেন। যুবকটি তো কিছুতেই যাইবে না, কারণ তাহাকে ডাকার কোন কারণই নাই, সে যে মঠে আসিয়াছে, তাহাই তো বিজ্ঞানানন্দজী জানেন না! কিন্তু সেবকটি তাহাকে একরকম ধরিয়াই লইয়া গেলেন। বিজ্ঞানানন্দজী সেদিন অসীম স্নেহভরে যুবকটির অভিমান ভাঙাইয়া অযাচিত-

ভাবে তাঁহাকে দীক্ষা দিয়াছিলেন। যুবকটি পরে আমাদের বলিয়াছিল, 'যখন তিনি মন্ত্র বলিতেছেন, কিভাবে কি করিতে হইবে দেখাইয়া দিতেছেন, তখনও আমি কিছু না শুনিয়া, কিছু না করিয়া গুম হইয়া বসিয়াছিলাম।' বলিয়াছিল যে, মা যেমন অবুঝ অভিমানী সন্তানকে শান্ত করে, যেন মায়েরই সব দায়, তিনিও সেদিন সেভাবে তাহাকে শান্ত করিয়াছিলেন। আর একজন যুবক একদিন বিজ্ঞানানন্দজীর জন্য তাঁহারই আদেশমত কিছু দুধ ও মাছ লইয়া বেলুড় মঠে গিয়াছিল। উহা রান্না করিয়া তাঁহাকে দিবার পূর্বে যথারীতি শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিবেদন করা হইল; কিন্তু তাঁহার শরীর সেদিন খুবই খারাপ থাকায় তিনি আর উহা খান নাই। যুবকটি তাহা জানিত, তথাপি বিকালে প্রণামান্তে সে জিজ্ঞাসা করিল, তাঁহার জন্য আনীত দ্রব্য তিনি খাইয়াছেন কি না, তখন তিনি প্রসন্ন হাস্যে বলিলেন, "হ্যাঁ, খেয়েছি।" উত্তর শুনিয়া যুবকটির সব গুলাইয়া গেল, হতভম্ব হইয়া ভাবিল, এ কি বলিলেন! মিথ্যা কথা তো ইঁহাদের মুখে কখনো উচ্চারিত হইতে পারে না! চকিতে যুবকটির মনে চিন্তা উঠিল, তবে কি ঠাকুরের খাওয়াতেই তাঁহারও খাওয়া হইয়াছে? ঠাকুরের সঙ্গে তিনি যে অভেদ—এই সত্যই কি স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন? চিন্তাটি সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই তিনি হাসিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতে যুবকটির চিত্তে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁহার অভেদত্ব চিরতরে দৃঢ়াঙ্কিত হইয়া যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণেরই বিভিন্ন মূর্তি ছিলেন তাঁহার সন্ন্যাসী সন্তানগণ, তবে তাঁহাদের আচরণে শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তটিই প্রকট হইতেন অধিকাংশ সময়; তাঁহার সহিত যিনি অভেদ, বাহিরে তাঁহার প্রকাশ ঘটিত কোন বিশেষ দুর্লভ শুভক্ষণেই। শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজের সম্বন্ধে যে কথা বলিতেন, 'এর ভেতর দুটি আছে, একটি মা-কালী এবং অপরটি তাঁর ভক্ত,' মনে হয় তাঁহার সন্ন্যাসী সন্তানগণের সকলের পক্ষেই পূর্বোক্ত ভাবে সে কথা প্রযোজ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত যখন, তখন তাঁহারা নিজে যেন কিছুই না, শ্রীরামকৃষ্ণই সব, যা করার তিনিই করেন; এমন কি দীক্ষার মাধ্যমে কৃপা করিয়া হাতে ধরিয়া ভবসাগরের পারে শ্রীভগবানের চরণপ্রান্তে লইয়া যাইবার যে কাজ—তাহাও তাঁহারা করেন না, করেন শ্রীরামকৃষ্ণ। স্বামী বিজ্ঞানানন্দ বলিতেন, দীক্ষা দেওয়া মানে শিষ্যকে ঠাকুরের কাছে পৌঁছাইয়া দেওয়া। বেলুড় মঠে তাঁহার অবস্থানকালে একদিন দুইজন দীক্ষাপ্রার্থী আসিলে মঠের জনৈক ব্রহ্মচারী বিজ্ঞানানন্দজীর নিকট তাঁহাদের প্রার্থনার কথা বলিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "দীক্ষা তো আমি দিই না, ভাই। তবে যদি বল ঠাকুরের কাছে পৌঁছে দিতে হবে, তাহলে হয়ে যাবে, এক্ষুনি হয়ে যাবে।"

অতি সীমিত দৃষ্টিশক্তিতে স্বামী বিজ্ঞানানন্দের অন্তরের রূপ ইহার বেশী আর কিছু ধরা পড়ে না: শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে, অনন্তের সঙ্গে সদা একীভূত একটি সত্তা, অথচ তাহারই পাশাপাশি রহিয়াছে একটি ভক্ত সত্তা যেটি জীবের প্রতি অপার করুণায় বিগলিত, সেখানে প্রত্যেক ভক্তের শ্রীভগবানকে কেন্দ্র করা প্রতিটি হৃদয়স্পন্দনই প্রতিস্পন্দিত হয়, যাহা মায়ের চেয়েও অধিক ব্যাকুলতা লইয়া সে স্পন্দনের প্রত্যুত্তর দেয়।

বাহিরে তিনি অতি গম্ভীর প্রকৃতির ছিলেন, কিন্তু মাঝে মাঝে যখন সে গাম্ভীর্যের আবরণ সরিয়া যাইত তখন হাস্যপরিহাস-মুখর তাঁহাকে

নিজেরই সমবয়সী বন্ধু বলিয়াও কখন কখন মনে হইত—অতি আপনার জন, যার চেয়ে আপনার আর কেহ নাই। তখন একটি জীবনের গগনস্পর্শী উচ্চতা ও অপরটির নিম্নতার মধ্যে যে বিপুল ব্যবধান, তাহা তিনি সত্য সত্যই সাময়িকভাবে সম্পূর্ণরূপে অপসারিত করিয়া দিতেন।

ছাত্র- ও কর্ম-জীবন

স্বামী বিজ্ঞানানন্দের পূর্বনাম হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। পিতা তারকনাথ চট্টোপাধ্যায়ের আদি বাসস্থান বেলঘরিয়া। এটোয়াতে তিনি কর্ম করিতেন; সেইখানেই ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর শুক্রবার বৈকুণ্ঠ-চতুর্দশী তিথিতে হরিপ্রসন্ন জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁহার বিদ্যারম্ভ হয় কাশীর বাঙ্গালীটোলায় অবস্থিত নসীরাম সরকারের পাঠশালায়; দুই বৎসর পরে বেলঘরিয়ায় পৈতৃকভবনে ফিরিয়া আসেন। কলিকাতার হেয়ার স্কুল হইতে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে এণ্ট্রান্স এবং সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ হইতে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে এফ. এ. পাশ করিবার পর পাটনা কলেজ হইতে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে তিনি বি. এ. এবং পুনা 'কলেজ অব সায়েন্স' হইতে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেন।

বেলঘরিয়ায় থাকাকালে বাল্যেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। পাটনা কলেজে পড়িবার সময় তিনি বাঁকিপুরে থাকিতেন।

ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় পাশ করিবার পর ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি গাজীপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ারের পদে চাকরি গ্রহণ করেন। গাজীপুরের পর বুন্দেলশহর, মীরাট এবং এটোয়াতে তিনি কাজ করিয়াছেন। এটোয়াতে থাকাকালীনই তিনি চাকরি ত্যাগ করিয়া আলমবাজারে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগদান করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সমীপে

"তখন আমি বেলঘরেতে থাকি— স্কুলের প্রথম কিংবা দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ি। সারদাদের বাড়ী খেলা করছি, বেলা চারটে হবে। পরনে ধুতিমাত্র। একজন সঙ্গী এসে বললে, 'তোরা পরমহংস দেখতে যাবি?' আমরা গুলকুট খেলছিলাম। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোথায় সে পরমহংস?' 'এই তো দেওয়ানদের বাড়ীতে', সে বললে।...তখনই সবাই চললাম পরমহংস দেখতে।"

—এই প্রথম দর্শন (?)। তিনি তখন বালক, কিন্তু আশ্চর্য হইতে হয় এই দর্শনের বর্ণনায়; যাহা কোন বয়স্ক, ধর্মসাধনায় খুব উন্নত ব্যক্তির পক্ষে হয়ত দেখা সম্ভব, তাহাই তিনি দেখিয়াছিলেন—'দেখি ··· ঠাকুর দাঁড়িয়ে আছেন।··· ঐ সময় আর একটা ব্যাপার যা দেখেছিলাম তা আমার চিরদিন মনে থাকবে। ঠাকুরের মেরুদণ্ড, নীচ থেকে মাথা পর্যন্ত, একটা মোটা দড়ির মত ফুলে উঠেছে। আর মাথার দিকে যে শক্তি উঠছে—তা যেন সাপের মত ফণা-বিস্তার করে আনন্দে হেলছে দুলছে।"

বেলঘরিয়ায় আরও একবার তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছিলেন—কেশব সেনের বেলঘরিয়ার তপোবনে। শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া প্রথম দর্শন করেন সেণ্ট-জেভিয়ার্স কলেজে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িবার সময়। সহপাঠী শরৎচন্দ্র (স্বামী সারদানন্দ) ও বরদা পালের সহিত এইদিন নৌকা করিয়া দক্ষিণেশ্বরে যান। ঠাকুর তখন কলিকাতায় মণি মল্লিকের বাটী যাইবার জন্য প্রস্তুত, তাই সামান্য কথবার্তার পর তাঁহাদের মণি মল্লিকের বাটী যাইতে বলেন। "এইরূপ ঠাকুরকে দর্শন করিতে পাঁচ ছয় বার দক্ষিণেশ্বরে যাই। দু-একবার রাত্রেও সেখানে ছিলাম।···

একবার রাত্রে যখন ছিলাম, গিরিশবাবু তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে আসেন (বকলমা দিবার দিন)। মহাপুরুষ মহারাজের সঙ্গেও প্রথম সাক্ষাৎ ঐ সময় কোন একদিন হয়েছিল।" "আমি শেষ যে রাত্রে দক্ষিণেশ্বরে ছিলাম—সে রাত্রেই ঠাকুরের গলায় ব্যথা আরম্ভ হয়।" কাশীপুরেও একবার তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছিলেন।

যেটুকু জানা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত তাঁহার দর্শন স্বল্পসংখ্যক দিনই হইয়াছে। কিন্তু যাহা পাইবার ইহারই মধ্যে সব পাইয়াছিলেন। একদিন ধ্যান হয় না শুনিয়া তাঁহার জিহ্বায় আঙুল দিয়া কি যেন লিখিয়া দেন। সেই হইতেই তাঁহার গভীর ধ্যান হইতে থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "ছাখ্, মেয়েমানুষের দিক মাড়াসনি। খুব সাবধানে থাকবি। সংসারের আঁচটিও যেন গায়ে না লাগে। ·· তোকে একথা কেন বলছি জানিস? তোরা হলি মায়ের লোক; তাঁর অনেক কাজ তোদের করতে হবে। কাকে ঠোকরানো ফল মায়ের পূজোয় লাগে না রে!" ঠাকুরের এই উপদেশ তিনি মন্ত্র বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বামী শিবানন্দ একদা বলিয়াছিলেন যে, বিজ্ঞানানন্দজীর এলাহাবাদ আশ্রমে স্ত্রী-মাছির পর্যন্ত ঢুকিবার হুকুম নাই! তাই বলিয়া স্বামী বিজ্ঞানানন্দ স্ত্রীলোককে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন না, বলিতেন, "তাঁদের খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখবে। মন্দিরে (বেলুড় মঠে) যে মা আছেন, তাঁদের ঠিক তেমনি মনে করবে।"

"আমাকে ভাবাবস্থায় খুবই আদর করে বলেছিলেন, 'আমি চোদ্দ বৎসর বনে ছিলাম।' একদিন বলেছিলেন, 'আমার ধনুর্বাণ কই?" শ্রীরামকৃষ্ণ যে পূর্বে শ্রীকৃষ্ণরূপেও অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, একথা প্রথম দিন শুনিয়া বিজ্ঞান-মহারাজ কথাটি বিশ্বাস করেন নাই; বৃন্দাবনের গোপীদের ব্যাপার তিনি ভাল বুঝিতেন না। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজে সমাধিস্থ হইয়া ও তাঁহাকে উচ্চ ভাবভূমিতে তুলিয়া সেদিন প্রত্যক্ষ অনুভূতি সহায়ে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা সম্বন্ধে অতি উচ্চ ধারণা তাঁহার চিত্তে মুদ্রিত করিয়া দেন।

'যে রাম, যে কৃষ্ণ, সেই এ শরীরে রামকৃষ্ণ' —একথা যেদিন শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে প্রথম শোনেন, সেদিন ভাবিয়াছিলেন, "তা একটু আবোল-তাবোল বললেই বা, লোকটি তো ভাল!" পুঁথিগত জ্ঞান-প্রসঙ্গে বিজ্ঞানানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, "মশাই, আপনি কি জানেন? এ সব বই (কেন্ট, হেগেল প্রভৃতি) পড়েছেন?" শ্রীরামকৃষ্ণদেব উত্তরে বলেন, "তুই কি বলছিস্? বইটই সব ফেলে রাখ। বইতে জ্ঞান নেই, ওগুলো অবিদ্যা।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব একদিন তাঁহাকে বলেন, "ঈশ্বর সাকার ও নিরাকার—আবার সাকার নিরাকারের পারেও বটেন।" শুনিয়া বিজ্ঞানানন্দ বলিলেন, "ঈশ্বর যদি সাকার হন, তাহলে এই যে তক্তাপোশ এটিও কি ঈশ্বর?" ঠাকুর তখন বলেন, "হ্যাঁ এই তক্তাপোশও ঈশ্বর—এই ঘটি বাটি ঈশ্বর, এই দেয়াল ঈশ্বর—যা কিছু আছে সবই ঈশ্বর।" বিজ্ঞানানন্দ বলিয়াছেন, "একথা শুনিয়া আমার ভিতরটা যেন জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল—ব্রহ্মজ্যোতিঃ দেখা দিল।"

পরবর্তী কালে তিনি নিজ জীবনে ঈশ্বরের সাকার রূপের ও নিরাকার স্বরূপের বহু প্রত্যক্ষ উপলব্ধির কথা বলিয়া গিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-সমীপে তাঁহার স্বল্পকাল অবস্থানের মধ্যেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীকৃষ্ণের লীলা দর্শন, ব্রহ্মজ্যোতিঃ দর্শন প্রভৃতি করাইয়া তাঁহার অন্তরে এই আনন্দময় অতীন্দ্রিয় জগতের দ্বার নিজহস্তে খুলিয়া দিয়া গিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগকালে তিনি নিকটে ছিলেন না, বাঁকিপুরে থাকিয়া পাটনা কলেজে পড়িতেন। যে রাত্রে শ্রীরামকৃষ্ণদেব দেহত্যাগ করেন, সেই রাত্রে তিনি দেখেন, ঠাকুর সশরীরে সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। পরদিন সংবাদপত্রে তাঁহার দেহত্যাগের সংবাদ পান। (ক্রমশঃ)

দেবাদিদেব মহাদেবের কাহিনী*

ভগিনী নিবেদিতা

[অনুবাদ : অধ্যাপক শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ]

বিজন বনে, নির্জন কোণটিতে, পৃথিবীর সব মানুষ-জন আর তাদের কলরব থেকে দূরে, অনেক দূরে দেবাদিদেব মহাদেবের প্রিয় স্থান। ধনসম্পদ, লোকজন কিছুই তাঁর নেই। তবু একবার তাঁকে দেখলে আর ভোলা যায় না। শুভ্র ভস্মে বিভূষিত তাঁর তনু। পরনে তাঁর সন্ন্যাসী-পরিব্রাজকের গৈরিক। শিরে তাঁর উচ্চচূড় জটাজুট। একহাতে ভিক্ষাপাত্র, আর একহাতে দীর্ঘ ত্রিশূল। বেলা দ্বিপ্রহরে কখনো বা তিনি দোর থেকে দোরে ভিক্ষা করে বেড়ান।

হিমালয়ের তুষারশৃঙ্গের উচ্চতম চূড়ায় তিনি সমাসীন। মৌন—না, না, মৌনতা তাঁকে ঘিরে রয়েছে। এক অনন্ত ধ্যানে তিনি সমাহিত। গিরিশিখরের প্রান্ত বেয়ে নতুন চাঁদ যখন তাঁর ললাটের কাছটিতে দেখা দেয়, ভক্তদের তখন মনে হয়, এ যেন শিবেরই অন্তর থেকে উৎসারিত আলো, সে আলো তো বাইরের আলো নয়; জ্যোতির্ময় তিনি, তাঁর কোনো ছায়া পড়ে না!

এমনি নীরব গম্ভীরতায় আবৃত মানস-সরোবরের উর্ধ্বে শিবালয় কৈলাস; সেই কৈলাসের স্তরে স্তরে বিসারিত মনোরাজ্যের গহনতম লোকে দেবাদিদেব মহাদেবের অধিষ্ঠান। তাঁর প্রতিটি নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে জগতের উদয়-বিলয়। তবু দেবাদিদেবের নিজস্ব বলতে কিছুই নেই; তাঁর সৃষ্টির কোনো কিছুই তাঁকে আকর্ষণ করতে পারে না; রাজত্ব, পিতৃত্ব, বৈভব, ক্ষমতা—কোনো কিছুতেই তাঁর প্রয়োজন নেই। একটি মাত্র তাঁর আকাঙ্ক্ষা—অন্তরের অন্ধকার বিনাশ ক'রে আলোর আগমনী ধ্বনিত করা। একদা তিনি এমন গভীর ধ্যানে ডুবে গিয়েছিলেন যে, ধ্যান থেকে যখন ব্যুত্থিত হলেন, তখন দেখলেন বিশ্বজগৎ অন্তর্হিত, শুধু একাকী তিনি সর্বচরাচরের হৃদয়কেন্দ্রটিতে দণ্ডায়মান। একথা অনুভব ক'রে অন্তর্লোকের সেই মহাশূন্যতায় তিনি উত্তানহস্তে নৃত্যরত হয়ে পরমানন্দে গেয়েছিলেন, "ব্যোম! ব্যোম!" দেবাদিদেবের এই নৃত্যই ভারতীয় সংহারনৃত্য বা প্রলয়-তাণ্ডব। তাই তো তাঁর পূজামন্ত্রে ধ্বনিত "ব্যোম! ব্যোম! হর! হর!"

মহাদেবের মুখশ্রীই সব সংশয়ের উর্ধ্বে তাঁর স্বরূপকে প্রকাশিত করে। ওই জ্ঞানঘন জ্যোতির্ময়ের একটি করুণাপ্রসন্ন নেত্রপাতই যথেষ্ট, আর কখনো আমরা ভুলতে পারবো না যে, যাঁকে দেখেছি, তিনিই শিব স্বয়ং। মহাদেব যে কখনো ক্রুদ্ধ হয়েছেন, একথা ভাবাই যায় না। 'রজতগিরিনিভ' শিব কেবল দুটি জিনিস লক্ষ্য করেন মানুষের মধ্যে—অন্তর্দৃষ্টি আর অন্তর্দৃষ্টির অভাব। আমাদের যা কিছু ভ্রান্তি, যা কিছু পাপ, তিনি কেবল তার মূল কারণটি আমাদের কাছে তুলে ধরেন, যেন আর আমরা অন্ধকারে না ঘুরে মরি। অমল করুণাবিগ্রহ তিনি—যাঁর মধ্যে কোথাও এতটুকু মালিন্যের ছায়া পর্যন্ত নেই।

---

* ভগিনী নিবেদিতার 'Cradle Tales of Hinduism' গ্রন্থের 'The Story of Siva, the Great God' রচনার অনুবাদ।

জাগতিক বিষয়ে তিনি একেবারে সরল, পুজোর জন্য কিছুই তিনি চান না, আর বড়ো সহজে তাঁকে ভোলানো যায়। কিছু বেলপাতা, একটু জল, আর এক মুঠোরও কম চাল—যে ভাবেই তাঁকে দেওয়া হোক না কেন, তিনি গ্রহণ করবেন। ব্যথিতের অশ্রুবারি তাঁর কাছে অনেক সময় পবিত্র পূজার বারি-রূপে দেখা দিয়েছে। একদা রাত্রিকালে তিনি কোন রাজ-শিবিরে প্রহরারত। এমন সময় শত্রুদল এসে তাঁকে আক্রমণ করলো, এমনকি হত্যায় উদ্যত হলো। কিন্তু এই দুষ্টদলের হাতে ছিল বেল-কাঠের লাঠি। সেই লাঠি দিয়ে ওরা যত তাঁকে মারে, তত প্রসন্ন হয়ে তিনি সে-আঘাত পূজারূপে গ্রহণ করেন, আর ওদের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করেন।

যারা অভাগা, অনাথ, শুধু তারাই তাঁর একান্ত কাছটিতে ঠাঁই পায়। একটিমাত্র ভৃত্য তাঁর, সে হলো ভক্তবর নন্দী। ঘোড়া বা হাতী নয়, তাঁর বাহন এক বৃদ্ধ বৃষভ। যে-সাপকে সবাই বর্জন করেছে, সেই সাপকেই তিনি কুণ্ডলায়িতরূপে কণ্ঠভূষণ করেছেন। যতো বিকৃতদেহ, খঞ্জ, কুব্জ, তির্যকনেত্র মানুষ—এরাই তাঁর আপনার জন। কারণ দারিদ্র্য, নিঃসঙ্গতা, ব্যধিগ্রস্ততা—এ সবই তাঁর কাছে পৌঁছানোর সহজ অনুমতিপত্র। আর নিজে যিনি কারুর কাছে কখনো কিছুই চান না, কোনো প্রতিদানের আশা না রেখে যিনি সবাইকে শুধু দিয়েই যান, পশুপতি যিনি আন্তরিক শরণাগত কাউকে কখনো ফিরিয়ে দেন না, শুধুমাত্র ব্যাকুল অন্তরের প্রার্থনায় আমাদেরই একান্ত প্রয়োজনে নিজেকে তিনি নিঃশেষে বিলিয়ে দেন।

তবু, শুধুমাত্র এই রূপ ধরেই শিব আমাদের কাছে আসেন না। পরমজ্ঞান ও আমাদের মাঝখানে যা এসে দাঁড়ায়, মাঝে মাঝে তা বচনাতীতভাবে প্রিয়। সময় যখন আসন্ন, অজ্ঞান-বিনাশন মহাদেব তখন অসিহস্তে উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের চোখের সামনে সেই প্রিয়জনকে বিনাশ করবেন। ললাটনেত্রে তাঁর দিব্যদৃষ্টি, যে দৃষ্টিতে নিমেষে মুছে যায় সব হীনতা আর ভণ্ডামি। যা কিছু অসত্য, তাকে তিনি এই তৃতীয় নয়নের দৃষ্টিতে পলকে ভস্মীভূত করে দিতে পারেন। জাগতিক বিষয়ে তিনি যত বোকাই হোন না কেন, আধ্যাত্মিক বিষয়ে কেউ তাঁকে কোনদিন ঠকাতে পারবে না। তাই তাঁর এই রোষদীপ্ত মূর্তিকে বলা হয় রুদ্র। যুগে যুগান্তে মানুষ তাঁর উদ্দেশে বন্দনা করছে, 'মধুরং মধুরাণাং, ভীষণং ভীষণানাম্।'

এই তো দেবাদিদেব মহাদেবের কাহিনী। তবু মানবের অধ্যাত্মপ্রজ্ঞার অর্ধেক ধারণামাত্র এ কাহিনীতে প্রকাশিত। দুদিক থেকে আমরা ভগবৎসত্যকে দেখে থাকি। একদিকে, অন্তর্দৃষ্টি—ভারতীয় পরিভাষায় 'জ্ঞানম্'। এই জ্ঞানেরই চরম প্রকাশ শিব বা মহাদেব। আবার কেউ কেউ ঈশ্বরকে অনুভব করেন চারপাশের এই বিশ্বে গতি, শক্তি ও সৌন্দর্য-রূপে। একটিকে ছাড়া আর একটিকে ভাবাই যায় না। তাই মহাদেবের নিত্যসহচরী মহাশক্তি, আদ্যা প্রকৃতি। মহাশক্তির যে-সব ছবি আঁকা হয়, বা তাঁর সম্বন্ধে যে-সব গল্প শোনা যায়, তা হলো সতী, উমা আর মহামরণের কথা। তিনি শুভ্রা, স্বর্ণাভা, গৌরী—তুষারশিখরে উদয়সূর্যের আলোকসম্পাত। 'শিব'রূপে সর্বজনবন্দিত সেই দেবাদিদেব মহাদেব বা অধ্যাত্মপ্রজ্ঞার সহধর্মিণী ও উপাসিকা-রূপে কৈলাসে এই উমার নিত্য অধিষ্ঠান।

মহাপুরুষ মহারাজের স্মৃতি *

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের প্রথম দর্শনলাভ করিয়াছিলাম বেলুড় মঠে, ১৯২৫ সালের শিবরাত্রির দিন বিকালবেলায়। প্রায় এগারো মাস কাল তিনি দক্ষিণ ভারত এবং বোম্বাই প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করিয়া মঠে মাত্র কয়েক দিন আগে ফিরিয়াছেন। অনেক দিন মঠে ছিলেন না; কাজেই বহু ভক্ত খুব ব্যাকুলতা লইয়া ঐদিন তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। আমরা কতিপয় কলেজের ছাত্র একসঙ্গে গিয়াছিলাম। একজন এম-এ ক্লাসের ছাত্র শ্রীশ্রীমহাপুরুষজীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। তাঁহার নিকট মহাপুরুষ মহারাজের সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিয়াছিলাম। তিনি পরে মঠের সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন।

সকলে গঙ্গার ধারের বারান্দায় বসিয়া এবং দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছেন, কখন মহারাজ নীচে নামিবেন। আমার তরুণ মনে খুব আশা ও প্রতীক্ষা জাগিয়া রহিয়াছে। ইহার আগে বহু সাধুর দর্শন পাইয়াছি—কিন্তু আজ, একটু পরেই শ্রীশ্রীঠাকুরের একজন অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ মহারাজকে দেখিতে পাইব। না জানি তিনি কেমন! শুনিয়াছিলাম তিনি বৃদ্ধ। বৃদ্ধ সন্ন্যাসী তো আরও কয়েকজনকে দেখিয়াছি। ইনি কি ধরনের বৃদ্ধ? এই সব চিন্তা বালক-মনে আনাগোনা করিতেছিল।

সহসা দরজা খুলিয়া গেল—গঙ্গার ধারের ছোট ঘরটির পূর্বমুখী দরজা। মহাপুরুষ মহারাজ হাসিমুখে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন, সকলকে দেখিয়া আনন্দ-ধ্বনি করিলেন, পরে বারান্দার বড় বেঞ্চিটিতে গঙ্গার দিকে মুখ করিয়া বসিয়া ভক্তদিগের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার দীর্ঘ আকৃতি, প্রশান্ত সতেজ মূর্তি এবং আনন্দপূর্ণ কথাবার্তা আমার হৃদয়কে বড়ই আকৃষ্ট করিল। ভক্তেরা একে একে প্রণাম করিতেছিলেন। পূর্বোক্ত বন্ধুর সহিত আমিও প্রণাম করিলাম। আমরা শিবরাত্রির উপবাস করিয়াছি শুনিয়া মহাপুরুষজী বাঃ বাঃ বলিয়া প্রশংসা করিলেন। পরে সকলকে বলিতে লাগিলেন, "আজ শিবরাত্রি, পুণ্যদিন। এখানে সারারাত পুজো হবে, ভজন-নৃত্যাদি হবে, কত আনন্দ করবে সকলে।" ভাবে মাতোহারা হইয়া যেন কথাগুলি বলিতে-ছিলেন। আমি ভাবিলাম এই জন্যই তাঁহার নাম শিবানন্দ। একটু পরে তাঁহার সেবক তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন বিকালে তাঁহার কিছু খাইবার সময় হইয়াছে। অমনি মহা-পুরুষজী হাসিয়া বলিলেন, "ঠিক, ঠিক, কিছু খেতে হবে তো।" সকলকে বলিলেন, "তোমরা বোসো একটু, আমি একটু কিছু খেয়ে আসছি।" তাঁহার এই দ্বিধাসঙ্কোচহীন বালকের মতো ব্যবহার আমাকে তখন খুব মুগ্ধ করিয়াছিল, মনে পড়ে।

ফাল্গুন ও চৈত্র গেল। বৈশাখ মাসে তিনি কৃপা করিয়া মন্ত্রদীক্ষা দিলেন। সেই সময়কার

* 'শিবানন্দ-স্মৃতি-সংগ্রহ' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি হইতে

একটি উপদেশের গভীর তাৎপর্য যত দিন যাইতেছে ততই হৃদয়ঙ্গম হইতেছে। বলিয়াছিলেন, "বাবা, ঠাকুরের পায়ে সব সমর্পণ ক'রে দাও—যা কিছু আছে সব।" মনে পড়ে খুব জোর দিয়া 'সব' কথাটি বলিয়াছিলেন। সারা জীবনের আধ্যাত্মিক সাধনা—ভগবানের চরণে নিজের বলিতে যাহা কিছু সব একটির পর একটি সমর্পণ করিয়া দেওয়া ছাড়া যে আর কিছু নয়, এইটিই যেন তিনি নির্দেশ করিয়াছিলেন।

মনে পড়ে, কয়েক বৎসর পর একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "মুক্তির জন্য আকাঙ্ক্ষা করা ভাল, না চিরকাল তাঁহার ভক্ত হইয়া থাকার জন্য?" তিনি প্রথমে বলিলেন, "যেমন তোমার রুচি। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। যদি চাও যে মৃত্যুর পরও তাঁর সান্নিধ্যে তাঁর দাস হয়ে থাকবে তো তাই হবে; আর যদি চাও দেহান্তে একেবারে তাঁতে লয় হয়ে যাবে তো তাই ঘটবে। তবে এ বিষয়ে নিজের কোনও ইচ্ছা না রেখে তাঁর উপর নির্ভর ক'রে থাকাই সর্বোত্তম। তিনি যেমন ভাল বুঝবেন তেমনটি করুন—এই মনোভাবই শ্রেষ্ঠ।"

তাঁহার নিকট একবার শুনিয়াছিলাম যে, জ্ঞানপথের সাধক যদি ভগবানের শরণাগত হইয়া তাঁহার নিকট জ্ঞানের জন্য প্রার্থনা করেন তো তাঁহার কৃপায় তিনি উহা সহজে লাভ করিতে পারেন। আমি নিজের চেষ্টায় জ্ঞান লাভ করিব—এরূপ অভিমান ভাল নয়, তাহাতে অনেক সময়ে পথভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

১৯২৫ সালের ডিসেম্বরে পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের জন্মদিনে তাঁহার দুই গুরুভ্রাতা স্বামী সারদানন্দজী ও স্বামী অভেদানন্দজীর সহিত তাঁহাকে একসঙ্গে মঠে দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। উহা হৃদয়ে অবিস্মরণীয় আনন্দ-স্মৃতিরূপে জাগিয়া আছে। পূজনীয় শরৎ মহারাজ ও পূজনীয় কালী মহারাজ দুপুরে মঠে আসিলেন। স্বামী অভেদানন্দজী তাঁহার একজন ব্রহ্মচারী শিষ্যকে মহাপুরুষজীর সহিত পরিচয় করাইয়া দিতে গিয়া বলিলেন, "এর নাম—চৈতন্য।" মহাপুরুষজীর সেই দিন বড় মাতোয়ারা ভাব। অমনি বলিয়া উঠিলেন, "এখন আর পৃথক্ চৈতন্য দেখি না, সব এক চৈতন্য।" মঠের ভিতরদিককার বেঞ্চে উঠানের দিকে মুখ করিয়া তিন জনে বসিলেন। মহাপুরুষজীকে একটি নূতন তুলার জামা পরানো হইয়াছিল। শরৎ মহারাজের হাতে লাঠি ছিল। একজন ফটো লইয়াছিলেন। আশেপাশে অনেক ভক্ত দাঁড়াইয়া। এই ফটোটি কোনও কোনও বইতে ছাপা হইয়াছে।

যতদূর স্মরণে আসে, বোধ করি এই বৎসরই পূজ্যপাদ প্রেমানন্দ মহারাজের জন্মদিনে বিকালবেলায় মঠে গঙ্গার ধারের বারান্দায় মহাপুরুষ মহারাজের উপস্থিতিতে একটি আলোচনা-সভা হইয়াছিল। মহাপুরুষজী বেঞ্চে উপবিষ্ট। সাধু ও ভক্তেরা বারান্দায় মাদুর পাতিয়া তাঁহার পদতলে ও পাশে বসিয়াছিলেন। স্বামী প্রেমানন্দজীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিয়াছিলেন এমন কয়েকজন সাধু পর পর তাঁহার কথা বলিতে লাগিলেন। মহাপুরুষজী স্থির হইয়া নিবিষ্ট মনে শুনিতেছিলেন। ললিত মহারাজ (স্বামী কমলেশ্বরানন্দ) খুব ভাবের সহিত যখন বাবুরাম মহারাজের ভালবাসার কথা বলিতেছিলেন তখন মহাপুরুষজীকে বেশ ভাবাবিষ্ট মনে হইল। তাহার পর ললিত মহারাজ কোনও একটি উৎসবে বাবুরাম মহারাজের মাতোয়ারা ভাবের বর্ণনা করিতে করিতে বলিলেন, "বাবুরাম মহারাজ হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে মহাপুরুষ মহারাজকে

আলিঙ্গন ক'রে বললেন, 'এই আমাদের শিব, জীবন্ত শিব' এবং মহাপুরুষকে নিয়ে নাচতে লাগলেন।" নিজের সম্বন্ধে এই স্মৃতিকথা শুনিয়া মহাপুরুষজী একটু হাসিলেন। বাবুরাম মহারাজ সম্বন্ধে এই সকল আলোচনা যখন চলিতেছে তখন একবার মহাপুরুষজী চারিপাশে তাকাইয়া তাঁহার অনৈক সন্ন্যাসী সেবককে দেখিতে না পাইয়া বলিলেন, "— কোথায়? তাকে ডাক। এই সব সুন্দর কথা হচ্ছে।" সেবকটিকে ডাকিয়া আনা হইল। মহাপুরুষজী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় ছিলে? বাবুরাম মহারাজের সম্বন্ধে কত কথা হচ্ছে। কোথায় এসব শুনতে পাবে? বসে শোন।" আলোচনা হইয়া গেলে যেসব সাধু বাবুরাম মহারাজের স্মৃতিকথা বলিয়াছিলেন তাঁহাদের সকলের দিকে মহাপুরুষজী খুব স্নেহভরে তাকাইতে লাগিলেন। ললিত মহারাজের পিঠ চাপড়াইয়া খুব আশীর্বাদ করিলেন।

১৯২৭ সালের ২২শে ফেব্রুআরি মহাপুরুষ মহারাজ দক্ষিণ ভারত, বোম্বাই ও নাগপুর ভ্রমণ শেষ করিয়া প্রায় দশ মাস পরে মঠে ফিরিয়াছেন। ২৬শে ফেব্রুআরি কলেজের ছুটি ছিল বলিয়া আমরা তিনজন ছাত্রবন্ধু তাঁহাকে দর্শন করিতে বিকালে মঠে গিয়াছিলাম। তিনি দোতলার বারান্দায় চেয়ারে বসিয়াছিলেন। একজন ভদ্রলোক কাছে উপবিষ্ট। ভদ্রলোকটি বলিলেন, "আপনার ১৯শে তারিখে আসার কথা ছিল।"

মহাপুরুষজী। কি জানি, বাপু, অত জানি না। ২২শে তারিখে এসে পৌছেছি—এই মাত্র জানি।

উক্ত ভদ্রলোক মহাপুরুষ মহারাজের জন্মস্থান বারাসতের কথা পাড়িলেন। মহাপুরুষ মহারাজ বলিলেন, "কি জানি, বাপু, আমার কিছু মনে নেই। অনেক বছর হয়ে গেছে।…ঐ বাড়ির একটি মেয়ে, বিধবা এসেছিল। বড় দুরবস্থা। একখানি কাপড় আর ক'টি টাকা দেওয়া গেল। তা সে অপর সবাই যেমন আসে তেমনই। মমত্ববুদ্ধি ঠাকুরের কৃপায় নেই। ঠাকুর আমাদের মন উদার ক'রে দিয়েছেন। এখন বসুধৈব কুটুম্বকম্। আপন-পর-ভেদ নেই। সবাই সমান। গরীব দুঃখী যে কেউ আসে, সাধ্যমত আমরা সাহায্য করি। যেখানে দুঃখ, যেখানে কষ্ট, সেখানেই আমরা যথাসাধ্য প্রতীকার করবার চেষ্টা করি। ভেদাভেদ নেই।… মানুষের কি সাধ্য আছে জগতের দুঃখ দূর করে। জগৎ তো দুঃখময়। চিরকাল দুঃখ থাকবে। মাঝে মাঝে এক একজন মহাপুরুষ আসেন, আর কতকটা দুঃখ কমে যায়। আবার আসে। আগমাপায়ী। আসছে, যাচ্ছে। বুদ্ধদেব এলেন, মানুষের কতকটা দুঃখ দূর হল। আবার কিছুকাল পরে পূর্বাবস্থা। যেমন পানা-পুকুরের পানা। ঠেলে দাও, কতকটা জায়গা পরিষ্কার হয়ে যায়। আবার কিছুক্ষণ পরে পানায় ভরে ফেলে। এ যুগে ঠাকুর এসেছেন, পানা কেটে যাচ্ছে, কতকটা দুঃখ দূর হয়ে যাচ্ছে। আবার কালে পানা বুঁজে যাবে।"

১৯২৭ সালের ১৬ই মার্চ মঠে গিয়া পরমারাধ্য মহাপুরুষজীর নিকট কিয়ৎক্ষণ বসিয়াছিলাম। পূর্বে একদিন তিনি বলিয়া ছিলেন, "এখানে এসে চুপ ক'রে বসে থেকো না। কিছু জিজ্ঞেস করবে।" তাই এই দিন তাঁহাকে দু-একটি প্রশ্ন করিয়াছিলাম। কথা-প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, "'দয়া কর, দয়া কর; প্রভু, দয়া কর'—এইটি সর্বদা বলতে হবে। এই সাধন—এই সব। 'দয়া কর'। তিনি যদি দয়া ক'রে সব বুঝিয়ে দেন তবেই হয়।"

পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ ১৯শে আগস্ট (১৯২৭) দেহত্যাগ করেন। এই ঘটনা পূজনীয় মহাপুরুষজীর দেহমনে কি প্রবল ধাক্কা দিয়াছিল তাহার বিশদ বিবরণ 'মহাপুরুষ শিবানন্দ' গ্রন্থে স্বামী অপূর্বানন্দজী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মহাপুরুষজীর স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। চিকিৎসকগণের পরামর্শে তিনি কিছুদিনের জন্য বিশ্রাম ও বায়ুপরিবর্তনের উদ্দেশ্যে মধুপুর যান এবং তথা হইতে কাশী। কাশীতে আড়াই মাস ছিলেন। পাটনা হইয়া বেলুড় মঠে ফিরিলেন ১৯শে ফেব্রুআরি (১৯২৮)। মনে পড়ে, হাওড়া স্টেশনে আমরা কয়েকজন বন্ধু গিয়াছিলাম। তাঁহার সংবর্ধনার জন্য বহু সাধু ও ভক্তের সমাগম হইয়াছিল। স্টেশন প্লাটফর্মে যেন আনন্দের হাট।

দুই দিন পর (২১শে ফেব্রুআরি) কলেজের পর সোজা মঠে গিয়াছিলাম। প্রায় পাঁচ মাস মহারাজ মঠে ছিলেন না। সেজন্য প্রত্যহই বহু ভক্ত ব্যাকুলপ্রাণে তাঁহাকে দর্শন করিতে মঠে আসিতেছেন। অনেক দীক্ষার্থীও আছেন। মহাপুরুষজীর ঘরে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বসিলাম। কয়েকজন ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। একটি ভদ্রলোক তাঁহার সহিত কথা বলিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, "কুলগুরুর নিকট দীক্ষা নিয়েছি, কিন্তু তাতে তৃপ্তি পাই-নি। আপনার নিকট নেব।" মহাপুরুষজী হাসিয়া বলিলেন, "দীক্ষা তো দু'বার হয় না। দীক্ষা হয়েছে, বেশ তো। আবার কেন?" ভক্তটি পীড়াপীড়ি করায় বলিলেন, "ইষ্টের তো পরিবর্তন হবার জো নেই। ও তো ঠাকুরেরই এক রূপ। তবে মন্ত্রটা modify (ঈষৎ পরিবর্তন) ক'রে দিতে পারব। তা বেশ, এস।"

একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, "পাটনায় কি খুব দীক্ষার ভিড় হয়েছিল?"

মহাপুরুষজী। হাঁ। এই সব যতই দেখছি ততই ঠাকুরের মহিমা অনুভব করছি। আমাদের কে চেনে, কে শোনে? তাঁরই তো মহিমা।

কথাপ্রসঙ্গে আরও বলিলেন, "অবতারতত্ত্ব বড় সূক্ষ্ম। পূর্ণব্রহ্ম ভগবান একটি মানুষ হয়ে আসেন। তাঁর তো কোনও কামনা নেই। 'নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি।'* শুধু লোককল্যাণকামী হয়ে তিনি আসেন। নইলে তাঁর কি দরকার?"

জনৈক ভক্ত মহাপুরুষজীর একটি শিষ্যার কঠিন পীড়ার সংবাদ দিলেন। বলিলেন, "বাঁচবার কোন আশা নাই। তবে এ সময় আপনার আশীর্বাদ জানালে বড় সুখী হত।" মহাপুরুষজী বলিলেন, "হাঁ, হাঁ, আমার আশীর্বাদ জানাবে। সর্বদাই তো আশীর্বাদ করছি।"

১৯২৮ সালের ৯ই মার্চ লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের মৃত্যু উপলক্ষে কলেজের ছুটি ছিল। বিকালে মঠে মহাপুরুষজীকে প্রণাম করিতে গিয়া দেখি জনৈক বিধবা মহিলা তাঁহাকে বলিতেছেন, "দীক্ষা নিতে এসেছি।" মহাপুরুজী প্রথমে বলিলেন, "বৈশাখ মাসে চেষ্টা কোরো, এখন হবে না; শরীর বড় খারাপ।" পরে কিছু কথা-বার্তার পর বলিলেন, "সামনের সপ্তাহে এস।" মহিলাটি বলিলেন, "জীবনে বড় দুঃখ কষ্ট পেয়েছি।"

মহাপুরুষজী। সংসারে সুখ নেই, মা। যদি থাকে তো সে অতি সামান্য, যেমন মেঘের কোলে মাঝে মাঝে একটু বিদ্যুৎ চমকায় তেমনি।

আমাদের দিকে চাহিয়া মহাপুরুষজী বলিলেন, "এই উপমাটি বিদ্যাসাগর মশায়ের কাছ থেকে পেয়েছিলাম পঞ্চাশ বৎসর আগে।"

---

* আমার অপ্রাপ্ত কিছু নাই, প্রাপ্তব্যও কিছু নাই —তবুও কর্মে নিরত রহিয়াছি। গীতা—৩।২২

জনৈক খঞ্জ ভদ্রলোক কিসের জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছিলেন। মহাপুরুষজী তাঁহাকে বলিলেন, "ঠাকুরের ভাব নাও, আর মাকে ডাকো। তোমার কালীতে বিশ্বাস। তাঁকেই ডাকো। তাতেই হবে। তবে ঠাকুরের ভাবের সাহায্য নিতে হবে। তিনি যুগাবতার।"

ভদ্রলোকটি সুখী হইলেন না। বলিলেন, "আরও যেন কিছু আছে। আপনি লুকাচ্ছেন।"

মহাপুরুষজী। সে কি! লুকাব কেন? মিথ্যাকথা বলা তো আমার অভ্যাস নয়। চুরি জোচ্চুরি করব কেন? যা সত্য তোমার কল্যাণের জন্য বলছি। এক একজনের সংস্কারানুযায়ী তো বলতে হবে। যা প্রাণে উঠছে তাই তো বলছি।

পূর্বোক্ত বিধবা মহিলাটি দীক্ষার জন্য কি আয়োজন করিতে হইবে জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাপুরুষজী বলিলেন, "কিছু না। কেবল চাই প্রাণ। প্রাণ আনতে পারবে, মা? আর দক্ষিণা? তা একটা হরীতকী আনলেই চলবে। ঠাকুরের দরবারে ও-সব কিছু নেই। চাই কেবল প্রাণ।"

১৯৩০ সালের বৈশাখী পূর্ণিমার দিন মঠে যোগ দিলাম। পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ আশীর্বাদ করিলেন। প্রথম প্রথম যখনই মনে ভয় বা সংশয় আসিয়াছে তিনি অভয় ও আশ্বাস দিয়া মনকে সতেজ করিয়া দিয়াছেন। একদিন বলিলেন, "কোন ভয় সংশয় নেই। বি এসসি পাস করেছ না হয় এম এসসি পাস করবে—তাতে তোমার হবে কি? তার চেয়ে সেই সময়টা এই দিকেই দাও। সংসার-বাসনা নেই যখন তখন আর কি? সংসার-বাসনা থাকলে সে এক। খুব ধ্যান কর, প্রার্থনা কর। ঠিক হবে—কোন ভয় নেই, কোন সংশয় নেই।"

মঠে যোগদান করিবার কিছুদিন পরে মঠের সংস্কৃত বিদ্যালয়ে শাস্ত্রাদি পাঠ করিবার সুযোগ হইল। উপনিষদে ওঁকার-মহিমার কথা পড়িয়া একদিন শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজজীকে প্রশ্ন করিয়া বসিলাম, "জ্ঞানের ভাবে চিন্তা করবার সময় ইষ্টমন্ত্র জপ না ক'রে শুধু ওঁকার জপ করা চলে কি?" তিনি বলিলেন—'হাঁ, বেশ তো। সেই ওঁকারই তো ভগবান। ঠাকুরকে ওঁকার-ভাবে চিন্তা করবে। কোনও আপত্তি নেই।" কয়েক দিন পর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি! ওঁকার জপ করছো?" বলিলাম, "হাঁ, মাঝে মাঝে।" তিনি হাসিয়া বলিলেন, "বেশ, বেশ, করো।" আরও কয়েক দিন পর তিনি একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি! ওঁকার করছো?"

আমি। হাঁ।

তিনি। বেশ, বেশ, বেশ।

আমি। মহারাজ, ওঁকার করতে করতে শরীর আড়ষ্ট হয়ে গিয়ে বড় ভয় হয়।

তিনি। ঐ রকম যখন হয় তখন তাঁর কাছে প্রার্থনা করবে, 'হে ঠাকুর, তুমিই ওঁকার-স্বরূপ। আমি যাতে ঠিক পথে চলে যাই তাই কর। যাতে ঠিক বস্তু—যা সেই জ্ঞান বা ভক্তি (সেই একই বস্তু)—লাভ করতে পারি তাই কর। এই রকম খুব প্রার্থনা করবে।

* *

পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজকে সকালে তাঁহার ঘরে যখন সাধু-ব্রহ্মচারীরা প্রণাম করিতে যাইতেন তখন তথায় একটি আনন্দের মেলা বসিয়া যাইত। কী প্রেম, সহানুভূতি ও মমতা লইয়া তিনি সকলকে অভ্যর্থনা ও আশীর্বাদ করিতেন! কত না আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গ, ত্যাগ বৈরাগ্য জ্ঞান ভক্তির উদ্দীপনাময় আলোচনা সকলে শুনিতে পাইতেন! তাঁহার শরীর তখন অত্যন্ত দুর্বল, প্রায় চলচ্ছক্তিহীন—একদিকে

ব্লাডপ্রেসার অপর দিকে হাঁপানি—কিন্তু তাঁহার মুখে চোখে কী অপার্থিক দীপ্তি সর্বদা জ্বল্ জ্বল্ করিত! মনে হইত তাঁহার ঘরে সকল তীর্থ সমবেত, তাঁহার মূর্তির মধ্যে ব্যাস-বশিষ্ঠাদি তত্ত্বদ্রষ্টা ঋষিরা বাস করিতেছেন, তাঁহার কথার মধ্যে সনাতন ভারতবর্ষের প্রখ্যাত আচার্য ও সন্তমণ্ডলীর কণ্ঠস্বর শোনা যাইতেছে। তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কিয়ৎক্ষণ কাছে দাঁড়াইয়া তাঁহার মধু-নিস্যন্দী কণ্ঠস্বর শুনিয়া হৃদয় ভরপুর হইয়া যাইত। কত আশা, কত সাহস, কত উৎসাহ তিনি সকলকে দিতেন! সত্যই মনে হইত আমাদের কোনও ভয় নাই—আধ্যাত্মিক আদর্শ দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট।

নিজের সম্বন্ধে তাঁহার নিরভিমান ভাব ছিল বাস্তবিকই দেখিবার মতো। সর্বদা ঠাকুর, ঠাকুর ও মা, মা করিতেন। সকল শক্তি তাঁহাদের, সকল কর্তৃত্ব তাঁহাদের, তিনি কেহ নন। আবার বলিতেন—স্বামীজী, স্বামীজী, মহারাজ, মহারাজ।

একদিন মহাপুরুষজী সকালে দ্বিতলের বারান্দায় বেড়াইতে বেড়াইতে স্বামীজীর ঘরের ভিতর ঢুকিয়াছেন। দেওয়ালে টাঙানো স্বামীজীর চেয়ারে উপবিষ্ট বড় ফটোটির কাছে গিয়া বলিলেন, "আহা, কি চেহারা! যেন রাজা!" পরে দেওয়ালে একটি গ্রুপ ফটোর দিকে নজর পড়িল (যাহাতে স্বামীজী, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ প্রভৃতির সঙ্গে বসিয়া আছেন, মহাপুরুষজীও উহাতে আছেন।)। বলিলেন, "ওঃ অনেক দিনের ফটো।" উহাতে নিজের চেহারা দেখিয়া খুব হাসিতে লাগিলেন।

১৯৩০ সালের কয়েক মাস স্বামী অচলানন্দজী (কেদার বাবা) বেলুড় মঠে ছিলেন। একদিন তিনি প্রণাম করিতে আসিয়াছেন। মহাপুরুষজী জোড় হাত করিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। বলিলেন, "কেদার বাবা, কৃপা কর।" আবার বলিলেন, "কেদার বাবা, আশীর্বাদ কর যেন ঠাকুরের পায়ে শুদ্ধা ভক্তি হয়।" কেদার বাবা করজোড়ে বলিলেন, "এ কি বলছেন, মহারাজ?"

মহাপুরুষজী। আমিও তোমায় আশীর্বাদ করছি। তুমিও কর। আদান-প্রদান। (হাস্য)

কেদার বাবা। মহারাজ, আপনি তো পরিপূর্ণ হয়ে আছেন।

মহাপুরুষজী। কে বললে তোমায়? এ রাজ্যে কি পূর্ণতা আছে? পূর্ণতা সেইখানে (সমাধিতে)।

সকালে তাঁহার ঘরে সাধু-ব্রহ্মচারীদের ঐ জমায়েতে স্ফূর্তি এবং আমোদও বড় কম হইত না। কখনো কখনো সাধুদের সহিত বালকের ন্যায় তিনি কত আনন্দ করিতেন। ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বরে মঠে একটি সাইকেল কেনা হইয়াছিল। মঠের ডিস্পেন্সারীর ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার-সন্ন্যাসী একদিন প্রণাম করিতে আসিলে মহাপুরুষ মহারাজ তাঁহাকে বলিলেন, "এই যে সাইকেল কেনা হল—৭৩টি টাকা, তোমাকেই এই টাকা দিতে হবে। তোমাদের ডিস্পেন্সারীর কাজেই তো সাইকেল বেশী লাগে।"

সন্ন্যাসী-সাধু বলিলেন, "আমার কিছু নেই, মহারাজ। তবে লোকদের বোলব।"

মহাপুরুষ মহারাজ। হাঁ, টাকাটা আদায় ক'রে দাও। এই আমি একটাকা দিচ্ছি।

ইহা বলিয়া তিনি নিজ হাতে বাক্স হইতে একটি টাকা লইয়া উক্ত সন্ন্যাসীর হাতে দিলেন এবং হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "যারা যারা সাইকেলে চড়বে সকলকে দিতে হবে এক এক টাকা ক'রে।"

১৯৩০ সালে দুর্গাপূজার কয়েক দিন আগে হইতেই প্রত্যুষে মহাপুরুষজী নিজে অতি মধুর স্বরে আগমনী গাহিতেন। "যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী" ইত্যাদি। জনৈক সেবককে হারমোনিয়ম আনিয়া তাঁহার গানের সঙ্গে বাজাইতে বলিতেন। একটু বেলায় পূজনীয় নির্বাণানন্দজী ও চিদানন্দজী (গোঁসাই মহারাজ) প্রত্যহ তাঁহার ঘরে বা দোতলার অফিসঘরে আগমনী সঙ্গীত করিতেন। মহাপুরুষজী শুনিয়া খুশী হইতেন। একদিন নির্বাণানন্দজী প্রণাম করিতে গেলে বলিলেন, "আহা! সূর্যি, কি বলব, তুমি কী চমৎকার গান শোনাচ্ছ! কত আনন্দ দিচ্ছ! মহারাজ তোমায় বলেছিলেন, 'ব্রহ্মজ্ঞ হয়ে যাবি'। ও-সব হয়ে যাবে আলবত।"

পূজার সময় একদিন সন্ধ্যায় হঠাৎ ইলেকট্রিক লাইট ফিউজ করে। আমি স্বামীজীর ঘরে সেবকের কাজ করিতাম। ঐ ঘরে মোমবাতি জ্বালাইয়া দিয়া আসিতে আমার দেরি হয়। মহাপুরুষজী উহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। খুব ধমক দিয়া আমাকে বলিলেন, "কোথায় ছিলে এতক্ষণ? এই discipline (নিয়মানুবর্তিতা) শেখা হয়েছে! Responsibility (দায়িত্ব) জ্ঞান নেই! বি. এসসি, এম. এসসি কিছু নয়। কখন থেকে স্বামীজীর ঘর অন্ধকার হয়ে আছে। স্বামীজী থাকলে কি বলতেন? তাঁর বেলায় এমন চলতো?" বড়ই লজ্জিত হইলাম। পরের দিন সকালে প্রণাম করিতে গেলে বলিলেন, "কালকে বকেছি, আরও বকব।"

আমি বলিলাম, "বড় অন্যায় হয়ে গিয়েছে, মহারাজ।" তিনি ভবিষ্যতে খুব হুঁশিয়ার হইয়া স্বামীজীর ঘরে সেবার কাজ করিতে বলিলেন। তাহার পর হাসিয়া সেবককে বলিলেন, "দাও ওকে ভাল ক'রে সন্দেশ খাইয়ে। বকেছি।"

আমি বলিলাম, "সে কি, মহারাজ? আপনাদের বকা যে আশীর্বাদ।"

তিনি বলিলেন, "হাঁ। আচ্ছা—যা, সন্দেশ খা।"

দুর্ভাগ্যক্রমে ইহার ঠিক তিন-চার দিন পরে সন্ধ্যার আগে স্বামীজীর ঘরের জানালা বন্ধ করিতে দেরি করিয়া ফেলিলাম। মহাপুরুষজী বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসিয়াছিলেন। সেবককে দিয়া আমাকে ডাকাইলেন। কাছে গেলে বলিলেন, "তোমার কি বাইরে কোথাও তপস্যা করতে যাওয়ার ইচ্ছা আছে?" আমি বলিলাম, "না"।

তিনি। নেই? তাই জিজ্ঞেস করছিলাম।

বোধ হয় খুব জোর একটি ধমক দিবার ইচ্ছায় ঐরূপ ভাবে কথা আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমার কাঁচুমাচু ভাব দেখিয়া দয়া হইল। কথা ঘুরাইয়া আমাকে তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি পড়ছো আজকাল?"

আমি বলিলাম, "ছান্দোগ্য, মুণ্ডক, বেদান্তসার।"

তিনি। বেশ। ভক্তি বজায় থাকে তো? এই সব পড়তে পড়তে একেবারে শুষ্ক না হয়ে যায়।

আমি বলিলাম, "আজ্ঞে, চেষ্টা করি।"

মঠের প্রাচীন সন্ন্যাসীরা মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করিতে আসিলে তাঁহাদিগকে তিনি বিশেষ সমাদর ও প্রীতির সহিত অভ্যর্থনা করিতেন এবং তাঁহাদিগের সহিত গভীর আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গ এবং মঠ ও মিশনের আদর্শ, কর্মপ্রণালী সম্বন্ধে নানা কথা চলিত। নিম্নে কয়েকটি ঘটনা ও কথোপকথন লিপিবদ্ধ করিলাম।

একদিন সকালে (১৪।১০।৩০) স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ প্রণাম করিতে আসিয়াছেন। তিনি মহাপুরুষজীর শরীরের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাপুরুষজী বলিলেন, "এ সব আছেই। রোগ ইত্যাদি আগমাপায়ী। আগম (উৎপত্তি) আছে, অপায় (বিনাশ) আছে। ও হোক। জ্ঞান ভক্তি ঠিক থাক। আর কেন? এ শরীরের দ্বারা যা হবার তা হয়েছে।"

বিশুদ্ধানন্দজী। মহারাজ, যতদিন আপনাদের শরীর থাকে ততদিনই আমাদের কল্যাণ। একটু কাছে এলে কত শান্তি হয়! আপনারা যেমন ঠাকুরকে যাতে তাঁর শরীর থাকে এই প্রার্থনা জানিয়েছিলেন, আমরাও তা করতে পারি না কি?

মহাপুরুষজী। তোমরা বেঁচে থাকো। এ শরীরে আর কেন? তোমাদের দ্বারা ঠাকুরের কত কাজ হবে!

আর একদিন সকালে (২০।১০।৩০) স্বামী মাধবানন্দজীর সহিত শ্রীশ্রীঠাকুরের তন্ত্রসাধনা সম্বন্ধে কথা হইতেছিল। ক্রমে আরও অনেক সাধু উপস্থিত হইলেন। নানা কথার পর মহাপুরুষজী সকলের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "দেখ, তোমাদের সকলকে বলছি, ঠাকুরের ভাব অতি শুদ্ধ ভাব। Purity, purity, purity (পবিত্রতা, পবিত্রতা, পবিত্রতা)। এই আদর্শ হতে কখনো যেন স্খলন না হয়।"

পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ বার বার বলিতেন তাঁহার গুরু-অভিমান নাই। এই সঙ্ঘে গুরু হইলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। তিনি তাঁহার ভৃত্য ও সেবক মাত্র। তাঁহার কাজ—ধর্মপিপাসু ব্যক্তিকে ঠাকুরের নিকট সমর্পণ করা মাত্র। একটি ঘটনা এখানে লিপিবদ্ধ হইতেছে। পূর্ব-বঙ্গ হইতে জনৈক ব্রহ্মচারী (ইনি ব্রাহ্মণসন্তান, মঠের আনুষ্ঠানিক ব্রহ্মচারী না হইলেও ব্রহ্মচারীর ন্যায় জীবন যাপন করিতেন এবং ফরিদপুর জেলায় একটি গ্রামে একটি আশ্রম স্থাপন করিয়া সাধনভজন এবং লোকসেবা করিতেন) মহাপুরুষ মহারাজেরই মন্ত্রদীক্ষিত—মঠে আসিয়া একবার আছেন। তিনি একদিন সকালে মহাপুরুষজীকে প্রণাম করিতে আসিলে মহাপুরুষ মহারাজ হঠাৎ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই কার চেলা?"

ব্রহ্মচারীটি থতমত খাইয়া বলিলেন, "আজ্ঞে, আপনার কাছ থেকেই তো দীক্ষা নিয়েছি।"

মহাপুরুষজীর মুখ খুব ভাব-গম্ভীর হইয়া উঠিল। উদ্দীপনার সহিত নিজের বুক দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন--"এখানকার? তা আমি কিছু জানি না। আমি, বাবা, ঠাকুরের হাতে সব দিয়ে দিয়েছি। নিজে কিছু রাখি না। গুরু—এসব অভিমান আমাদের কিছুমাত্র নেই। মহারাজ, শরৎ মহারাজ, আমাদের সকলেরই এই রকম। * * * তোদের কিছু ভয় নেই। ঠাকুর রয়েছেন—সব দেখবেন। মুক্তি ফুক্তি সব হয়ে যাবে। আমাদের একটু দরকার হয়—বলি দিয়ে দেওয়া—নাম মাত্র। আমরা তো ঠাকুরের পাদপদ্ম ছুঁয়েছি। বলে দি—এঁকে ডাকো, ইনি ভগবান। যে মানবে তার হবে।"

আর একটি ঘটনা। কাশী সেবাশ্রমের একজন ব্রহ্মচারী মঠে আসিয়াছে। মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করিলে তিনি বলিলেন, "কিছুতেই তোকে মনে করতে পারছি না।" ব্রহ্মচারীটি অনেক বুঝাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু মহাপুরুষজীর মনে পড়িল না। তখন তিনি বলিলেন, "থাক, তুই যেই হোস্ না কেন, তোর খুব ভক্তি বিশ্বাস হোক 'whoever you may be."

একবৎসর শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথিপূজার পূর্ব-রাত্রে একটি দুঃস্বপ্ন দেখিয়া ভোরে মন বড় খারাপ হইয়া গেল। হৃদয় বড় ব্যাকুল। খুব সকালে শ্রীশ্রীমহাপুরুষজীকে প্রণাম করিতে গেলাম। ঘরে আর কেহ ছিল না। তিনি চেয়ারে বসিয়া "নর্মদা হর হর, নর্মদা হর হর"—নাম করিতেছিলেন। আমি প্রণাম করিলে তিনি যুক্তকর দেখাইয়া ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিলেন ঠাকুরঘরে গিয়াছি কিনা। হাঁ, বলিলাম। তাহার পর কাতরভাবে প্রার্থনা করিলাম, "মহারাজ, আজ তাঁর জন্মতিথি। আশীর্বাদ করুন যেন ভক্তি বিশ্বাস হয়।"

তিনি। হাঁ, খুব। আজ তাঁর জন্মতিথি। আজ যে তাঁকে ডাকবে তারই হবে। শুধু তোর কেন?

তাহার পর বলিলেন, "খুব 'নর্মদা হর হর' নাম করবি। ওদেশে নর্মদার খুব মাহাত্ম্য বিশ্বাস করে। বলে—গঙ্গার চেয়েও নাকি বেশী মাহাত্ম্য। আমরা অত বলি না। তবে সমান সমান বলি। আর খুব শুদ্ধ ভাব। শিবশক্তি এক সাথে।"

মহাপুরুষ মহারাজ সারা দিন খুব চড়া ভাবে ছিলেন, আনন্দে মাতোয়ারা। যে আসিয়াছিল তাহারই সহিত দেখা করিয়াছিলেন। যে চাহিয়াছিল তাহাকেই দীক্ষা দিয়াছিলেন। রাত্রে খুব ক্লান্ত হইয়া পড়েন। সেবক শরীরের কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়াছিলেন, "তুই তো আচ্ছা বোকা। আজ ভগবানের জন্মদিন। আজ শরীর টরীর?"

স্বামী শিবানন্দ-স্মরণে

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

জ্যোতির ভিতর ছিলে জানি না কোথায়
তপনের মাঝে কিংবা স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায়।
জানি না কেমনে হয়ে করুণার ধারা
ধরণীর বুকে এলে সুরধুনী-পারা।
রামকৃষ্ণময় হয়ে রামকৃষ্ণ নাম
শুনায়ে আনিলে টানি মর্ত্যে স্বর্গধাম।
ত্যাগের মুরতি তুমি, কঠোর সাধন
করিলে সাধিতে শুধু বিশ্বের কল্যাণ।
কাতর প্রার্থনা প্রভু করি বার বার
শরণাগতের লহ কোটি নমস্কার॥

স্বামী বিবেকানন্দ ও নারী-সমাজ

অধ্যক্ষ নিখিলরঞ্জন রায়

স্বামী বিবেকানন্দের মহান ভারত-স্বপ্নের বাস্তবায়নে পুরুষ ও নারীর সমমূল্য অবদান। মানব-সমাজের দু'টি অংশ, পুরুষ ও নারী। আকাশপথে সঞ্চরণশীল পক্ষীর যেমন দু'টি ডানার উপর অপরিহার্য নির্ভর, ঠিক তেমনি জাতীয় পুনরুজ্জীবন ও প্রগতির পক্ষেও নারী-পুরুষের সমোন্নতি প্রয়োজন। একজনকে অবনত করে রেখে অন্যজনের উদ্‌গমন অসম্ভব। ভারতপ্রেমী স্বামী বিবেকানন্দ বারবার তাই দেশের উন্নয়নের কথায় স্ত্রীসমাজের শিক্ষা, কুসংস্কারমুক্তি ও স্বাধীনতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন, কেননা ভারতের অধঃপতনের মূলে অন্যান্য বহু কারণের অন্যতম নারীসমাজের হীন অবস্থা। সুদীর্ঘকাল ভারতীয় সমাজে নারী উপেক্ষিতা, নির্যাতিতা ও বঞ্চিতা হয়ে আসছিল। নানা গ্লানিযুক্ত সমাজব্যবস্থায় নারীর স্বাধীন সত্তা ছিল অস্বীকৃত।

ভারতীয় নারীসমাজকে শিক্ষা ও স্বাধীনতার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার চিন্তা ও পরিকল্পনা ছিল স্বামীজীর অন্তরের সুগভীর আকুলতা। কি পন্থায় নারী আপন ভাগ্যজয়ে সফলকামা হতে পারে, স্বামীজীর বাণী সে বিষয়ে অতি সুন্দর নির্দেশ দেয়। ভারতীয় নারীর আদর্শ-বিষয়ক বিবেকানন্দের ভাষণ, প্রবন্ধ ও চিঠিপত্র ইত্যাদি অতি প্রাণস্পর্শী ও প্রেরণাপ্রদ। তারই কিয়দংশের পুনরাবৃত্তি বর্তমান নিবন্ধের উপজীব্য।

১৮৯৫ সাল। আজ থেকে তিয়াত্তর বৎসর আগের কথা। স্বামীজী তখন আমেরিকায়। নিউইয়র্কের শহরতলী ব্রুক্‌লিনে আয়োজিত এক বিদ্বজ্জন-সভায় স্বামীজী ভারতীয় নারীর আদর্শ বিষয়ে এক মনোজ্ঞ ও তথ্যসমৃদ্ধ ভাষণ দিয়েছিলেন। তদানীন্তন ভারতীয় সমাজের অনগ্রসর অবস্থা এবং বিশেষ করে স্ত্রীসমাজের শিক্ষাহীনতা, অবরোধ-প্রথা ও কুসংস্কার-প্রবণতা সম্বন্ধে নানারূপ বিকৃত এবং বিসদৃশ কাহিনী পাশ্চাত্য দেশসমূহে প্রচারিত হত। খৃষ্টান মিশনারীগণ ছিল এ অপকর্মের প্রধান উদ্যোক্তা।

অজ্ঞ ও অধঃপতিত ভারতীয়দিগকে পবিত্র খৃষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করার প্রয়াসে এরূপ অপপ্রচার খুবই সাহায্য করত। ভারতীয় সমাজের এরূপ বিকৃত চিত্রায়ণ আজও অবধি একেবারে বন্ধ হয়নি। স্বামীজী প্রথমেই শ্রোতৃমণ্ডলীকে এ-জাতীয় উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপপ্রচার সম্পর্কে সতর্ক করে দিলেন। একটি ঘরোয়া উপমার আশ্রয় নিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্যকে স্পষ্টতর করে তুললেন। আপেল বৃক্ষের তলদেশে পড়ে থাকে সহজলভ্য পচা বা আধপচা আপেল। কিন্তু সে পচা আপেল যেমন আপেলের প্রকৃত সুস্বাদ ও সুগন্ধের পরিচয় বহন করে না, তেমনি উদ্দেশ্যমূলক অথবা অজ্ঞতাপ্রসূত কাহিনীও কোন দেশ, জাতি বা সমাজের চরিত্র-চিত্রের পরিচায়ক হতে পারে না। কোন দেশ, জাতি বা সমাজকে সঠিক বুঝতে হ'লে তার ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন, সামাজিক রীতিনীতি ও সংস্কার ইত্যাদির অন্তরঙ্গ পরিচয় নিতে হয়। ভারতের প্রাচীন সমাজে নারীর স্থান নির্দেশ করতে গিয়ে বৈদিক সাহিত্যের উল্লেখ করলেন তিনি। 'সহধর্মিণী' বৈদিক সাহিত্যে

একটি বহুল-ব্যবহৃত শব্দ। পরিবারভিত্তিক বৈদিক সমাজের প্রতি গৃহেই থাকত যজ্ঞবেদী। বিবাহকালে সে যজ্ঞবেদীর উপর অগ্নি প্রজ্বালিত হত। সে অগ্নিশিখা অনির্বাণ রাখা হত বিবাহিত দম্পতির একজনের লোকান্তর না ঘটা অবধি। স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে যুগ্মভাবে সে অগ্নিকুণ্ডে আহুতি দান করতেন এবং উপাসনা করতেন দেবতার। এ ছিল গার্হস্থ্য ধর্মপালনের অবশ্যপালনীয় অনুষ্ঠান। উভয়ের সাহচর্য ভিন্ন প্রার্থনাদিও অবিধেয় গণ্য হত। অবিবাহিত পুরুষ কখনও পৌরোহিত্যে বৃত হতে পারতেন না। আর্যেতর এবং আর্য-অধ্যুষিত তদানীন্তন দুনিয়ার সর্বত্র—প্রাচীন গ্রীস, রোম, ইরান ইত্যাদি দেশে এ প্রথার ব্যাপক প্রচলন দেখা যায়। কিন্তু কালক্রমে উদ্ভব হল এক পেশাদার পুরোহিত-সম্প্রদায়ের এবং তারই ফলে স্বামী-স্ত্রীর সহপৌরোহিত্য-প্রথার বিলুপ্তি ঘটে। বহুলপ্রচলিত এই প্রথার প্রথম ব্যতিক্রম ঘটেছিল প্রাচীন অ্যাসিরীয় সমাজে। প্রাচীন অ্যাসিরীয় এবং ব্যাবিলনীয় সমাজ-ব্যবস্থায় স্ত্রীলোকের সামাজিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়, স্ত্রী-স্বাধীনতা সঙ্কুচিত হয়। কিন্তু ভারতীয় আর্য-সমাজে বহুদিন পর্যন্ত স্ত্রীপুরুষের সমানাধিকার স্বীকৃত হয়ে আসছিল। বৈদিক সাহিত্যে এর বহু দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়। ব্যক্তিগত জীবনে কি স্ত্রী কি পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই পবিত্রতা-পালনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হত। আর্য বালক এবং বালিকা উভয়কেই শিক্ষালাভের জন্য গুরুগৃহে পাঠানো হত, এবং সেখানে থাকতে হত বিশ থেকে ত্রিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত। শিক্ষাকালীন জীবনে পালন করতে হত কঠোরতম পবিত্রতা। এর ব্যতিক্রমে ভোগ করতে হত দণ্ড। অত্যধিক নিষ্ঠা ও কঠোরতার সঙ্গেই ব্যক্তিগত জীবনে পবিত্রতা ছিল অবশ্য-পালনীয়।

পরবর্তী যুগে রাজপুত রমণীর জহরব্রত এবং হিন্দু পতিব্রতার স্বেচ্ছা-সহমরণ ব্যক্তিগত জীবনে কঠোর পবিত্রতা-পালনেরই প্রতিধ্বনি।

শিক্ষা ও মননশীলনতার তুলাদণ্ডেও প্রাচীন আর্যসমাজে স্ত্রী-পুরুষের ওজন সমান পরিগণিত হত। ব্রহ্মবিদ্ ও ব্রহ্মবাদিনী উভয়েই উচ্চ চিন্তা ও ধ্যানধারণায় মূল্যবান অবদান জুগিয়েছেন। বৈদিক সূক্তের অনেকগুলি স্ত্রী-ঋষির রচনা। বৈদিক ও ঔপনিষদিক ভাব-সম্পদের অনেক অংশ স্ত্রী-ঋষির সৃষ্টি। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য হিন্দু-সংহিতার অন্যতম প্রবক্তা। তৎপত্নী মৈত্রেয়ী দেবী স্ত্রী-ঋষিকুলের অন্যতমা।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে দেখি, যাজ্ঞবল্ক্য মুনি সন্ন্যাসগ্রহণে উদ্যোগী হয়ে প্রথমে ভার্যা মৈত্রেয়ীকে তাঁর সঙ্কল্প জ্ঞাপন করলেন, এবং অনুরোধ করলেন তাঁর ভাগের গোধন ও জমিজমা ইত্যাদির দায়িত্ব গ্রহণ করতে। বিদুষী মৈত্রেয়ীর উত্তর: "যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্…।" এ কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় যে, বিদ্যা ও জ্ঞান-অনুশীলনে প্রাচীন ভারতে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই ছিলেন সমান অগ্রণী। কিন্তু এ-অবস্থার বিষম অবনতি ঘটল বৌদ্ধযুগে। এই সময় থেকে মারাত্মক ও বৈষম্যমূলক অনুশাসনে নারীর স্থান নির্দিষ্ট হল অধিকারবিহীন ও উপেক্ষিত পশ্চাদ্ভূমিতে। নারীকে দায়ী করা হল পুরুষের যাবতীয় দৌর্বল্য ও দুর্ভোগের জন্য। তারও পরবর্তীকালীন ইতিহাস ভারতের সহস্রবর্ষব্যাপী পতন ও পরাধীনতার দুঃখময় ইতিহাস। কালক্রমে সে অন্ধকার যবনিকা আবার যেদিন অপসারিত হল, সেদিন সবিস্ময়ে লক্ষ্য করা গেল

যে, অধঃপতিত জাতির অর্ধাংশই সম্পূর্ণ পঙ্গু ও প্রাণস্পন্দনহীন হয়ে পড়েছে। গতিহারা সমাজ জীর্ণ লোকাচারের সহস্র বাঁধনে আজ আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। তাই জাতির অর্ধাংশ স্ত্রীজাতির শিক্ষা ও মুক্তির কথাই সর্বাগ্রে ভাবলেন নবভারতের পথিকৃৎ—রাজা রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ প্রভৃতি।

'যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে, রমন্তে তত্র দেবতাঃ'। —স্বামীজীর লেখায় বারবার এ কয়টি কথার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

ভারতের নবজাগরণ এবং নবজীবন-চর্যার তাগিদেই নারীসমাজের উপর ন্যস্ত দায়-দায়িত্বের কথা সযত্ন চিন্তার দাবি রাখে। ভারতীয় নারী আবার কি উপায়ে এবং কোন্ পথ অবলম্বন করে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিতা হতে পারে? এ প্রশ্নের একটা অতি সহজ ও সারবান উত্তর মেলে স্বামীজীর চিন্তায় ও কথায়। 'কর্মযোগ' গ্রন্থে আছে এর সুস্পষ্ট নির্দেশঃ সনিষ্ঠ কর্তব্যসাধনের মধ্য দিয়েই সাধারণ মানুষ অসাধারণ শক্তি-অর্জনে সমর্থ হয়। কর্তব্যের কোন উঁচু নীচু, বড় ছোট, ভাল মন্দ ভেদাভেদ নেই। যিনি তথাকথিত নীচু কাজ করেন তিনি প্রকৃতই নীচু নন। আর তথাকথিত উঁচু বা বড় কাজ দ্বারা কর্তার মহত্ত্ব প্রমাণিত হয় না। সংসারে ও সমাজে পেশা- বা বৃত্তিবিশেষের উচ্চ নীচ শ্রেণীকরণ একান্তই কৃত্রিম, সুতরাং অযৌক্তিক। স্বামীজী বলছেন:

"There is no use in grumbling nature's adjustment. He who does the lower work is not necessarily a lower being. No man is to be judged by the mere nature of his duties, but all should be judged by the manner in which they perform them."

রাজা বা রাষ্ট্রপ্রধান বা অনুরূপ উচ্চপদাসীন ব্যক্তির প্রকৃত মূল্যায়নও হবে তাঁর উপরে ন্যস্ত কর্তব্যপালনের উৎকর্ষ-বিচারে, তার পদমর্যাদার মাপকাঠিতে কদাচ নয়। নগণ্য মেথর-ধাঙরের কর্তব্যপরায়ণতাই তার সামাজিক মান-মর্যাদার মাপকাঠি হওয়া উচিত। উচ্চনীচের মধ্যে এই কৃত্রিম ভেদাভেদের এবং সমুদয় সামাজিক অন্যায় ও অসাম্যের তীব্র নিন্দা করেছেন সাম্যবাদী বিবেকানন্দ। রেনাসাঁ যুগের অন্যতম পথিকৃৎ মাইকেল এঞ্জেলোর উক্তি:

> "Trifles make perfection
> And perfection is no trifles."

ছোট হোক, বড় হোক কাজমাত্রেই সমমূল্যের, যদি কর্তা নিষ্ঠার সঙ্গে সে-কাজ সম্পন্ন করেন। চরিতকার লুই ফিশার লক্ষ্য করেছিলেন গান্ধীজীর চরিত্রের এই বিশেষ গুণটি।

প্রাক্-স্বাধীনতা-পর্বে দিল্লীতে চলেছে উচ্চ পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক আলোচনা—ভারতের ভাগ্য-নির্ধারণ। ক্রীপস্ মিশন, ক্যাবিনেট মিশন-সংক্রান্ত উচ্চ-মহলের রাজনৈতিক আলোচনায় যোগ দিচ্ছেন গান্ধীজী। গান্ধীজীই এসব আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। সারাদিন এবং দিনের পর দিন চলেছে অন্তহীন কর্ম-ব্যস্ততা। অপরাহ্ণে গান্ধী মহারাজ ফিরে আসছেন হরিজন-পল্লীতে। যথারীতি পরিচর্যা করছেন স্বহস্ত-রোপিত মটর-চারাগুলির। তাই লুই ফিশার মন্তব্য করেছেন: To him politics was not too big nor pea-nut too small. কর্তব্য-

কর্মমাত্রেই সমজ্ঞান প্রকৃত যোগীর লক্ষণ। এরূপ সমদর্শন ও সমজ্ঞান সহজসাধ্য না হলেও সম্ভব। স্বামীজীর সারগর্ভ কথাগুলি স্মরণ করি :

"Duty is seldom sweet. It is only when love greases its wheels that it runs smoothly ; it is a continuous friction otherwise. How else could parents do their duties to their children, husbands to their wives and vice-versa ?"

সপ্রেম কর্তব্যপালনের ভিতর দিয়ে মানুষ শুধু অপরিসীম শক্তিরই অধিকারী হয় না, আপন সার্থকতার পথও খুঁজে পায়। স্বামীজী-কথিত একটি সুন্দর উপাখ্যানে এই সহজ সত্যের সমর্থন পাওয়া যায়।

এক নবীন সন্ন্যাসী দীর্ঘ দিন নির্জন অরণ্যে বৃক্ষমূলে তপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন। একদিন তপস্যান্তে বৃক্ষমূলে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। সেই সময় উর্ধ্বে বৃক্ষশাখায় কলহযুক্ত এক বক ও বায়সের ডানার ঝটপটানিতে কতকগুলি শুষ্ক পত্রপল্লব ও স্খলিত পালক সন্ন্যাসীর মাথার উপর এসে পড়ল। সন্ন্যাসী ভারি কুপিত হলেন। ক্রুদ্ধ সন্ন্যাসী উপরের দিকে তাকিয়ে বক ও বায়সের কাণ্ড লক্ষ্য করলেন। কিন্তু কী আশ্চর্য! সন্ন্যাসীর রোষদৃষ্টিতে মুহূর্তমধ্যে সেই বক ও বায়স পুড়ে ছাই হয়ে গেল! সন্ন্যাসী স্তম্ভিত হলেন। বুঝতে পারলেন যে, তিনি তপস্যায় সিদ্ধকাম হয়েছেন, অর্জন করেছেন এক অলৌকিক শক্তি। তারপর অরণ্য হতে নির্গত হয়ে লোকালয়ে প্রবেশ করলেন।

এক গৃহস্থের দুয়ারে দাঁড়িয়ে ভিক্ষা কামনা করলেন। গৃহদ্বারে কাউকে দেখতে না পেয়ে উচ্চৈঃস্বরে তাঁর ইচ্ছা জ্ঞাপন করলেন। তখন ভিতর থেকে নারীকণ্ঠে উত্তর এল, "সন্ন্যাসী ঠাকুর, দয়া করে একটু অপেক্ষা করুন। বিশেষ কর্তব্যে নিযুক্ত আছি, হাতের কাজটুকু সেরেই আপনার কাছে আসছি।" এ নেপথ্য উক্তিতে সন্ন্যাসী ক্রুদ্ধ হলেন, মনে মনে ভাবলেন, এক অতি সামান্যা রমণীর কী আস্পর্ধা! আমার প্রতি এ অবজ্ঞা অমার্জনীয় অপরাধ, এর সমুচিত শাস্তি একে অবশ্যই পেতে হবে। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অন্দর থেকে আবার আওয়াজ এল, "সন্ন্যাসী ঠাকুর, ক্রুদ্ধ হবেন না, এখানে বক-বায়সেরা থাকে না। আপনার তপঃশক্তির প্রভাবে এখানে কেউ দগ্ধ হবে না। আপনি শান্ত হউন, ধৈর্য ধারণ করুন। অনতিবিলম্বেই আমি আপনার যথাযোগ্য পরিচর্যায় রত হব।"

সন্ন্যাসীর আকাশছোঁয়া দম্ভ মুহূর্তে ধুলিসাৎ হয়ে গেল। কে এই অসামান্যা অন্তর্যামিণী—তপঃসিদ্ধ সন্ন্যাসীর অহঙ্কার চূর্ণ করে দিয়েছে! আরও কিছুক্ষণ পরে সেই গৃহস্থবধূ বাইরে এসে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করে যথাযোগ্য সম্ভাষণাদি জানালেন। বিস্মিত তপস্বী রমণীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "মা, আপনি কে? আপনার তপঃ-শক্তি অসাধারণ। আপনি কি অন্তর্যামিণী?" রমণী সবিনয়ে বললেন, "ঠাকুর, আমি অতি সাধারণ নারী, তপস্যা আমি করি না। আমি গৃহস্থবধূ মাত্র। অসুস্থ স্বামীর সেবায় ব্যস্ত ছিলাম, তাই সত্বর আপনার সম্মুখে আসতে পারিনি। আমায় ক্ষমা করুন।" সন্ন্যাসীর আকিঞ্চনে বধূটি আরও বললেন, "স্বামিসেবাই পরম ধর্ম, এবং সেই ধর্মই আমি কায়মনোবাক্যে পালন করি। আর সেই ধর্ম অর্থাৎ কর্তব্য-পালনই আমার যাবতীয় সুখ, শান্তি, শক্তি ও সার্থকতার উৎস। অন্য যোগসাধনা বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

যদি এর চাইতেও নিগূঢ়তর বিষয় সম্বন্ধে কিছু জানবার অভিলাষ থাকে, তা হ'লে

অদূরবর্তী শহরে আছে এক পশুমাংস-বিক্রেতা ব্যাধ, তার কাছে আরও অনেক কিছু জানতে পারেন।" সন্ন্যাসী আবার নিষ্ক্রান্ত হলেন। যথাসময়ে পূর্বকথিত ধর্মব্যাধের সঙ্গে হল সাক্ষাৎ। ব্যাধ বাজারে বসে নানা পশুমাংস বিক্রয় করছিল। এই ঘৃণ্য ব্যাধের প্রতি সন্ন্যাসী স্বভাবতই প্রথমে প্রসন্ন হতে পারেননি। কিন্তু এ-ক্ষেত্রেও সেই ব্যাধ সন্ন্যাসীর আগমনের উদ্দেশ্যটি ব্যক্ত করে সন্ন্যাসীকে রীতিমত অবাক্ করে দিল। তারপর ব্যাধ তার কর্তব্য কাজ পুরোপুরি নিষ্পন্ন করে সন্ন্যাসী ঠাকুরকে সঙ্গে নিয়ে গৃহে ফিরে গেল, এবং স্বহস্তে বৃদ্ধ পিতা-মাতার স্নান-আহার ইত্যাদির যথাযোগ্য ব্যবস্থা ক'রে সন্ন্যাসিপ্রবরের পরিচর্যা সম্পন্ন করল। কর্তব্যপালনই প্রকৃত ধর্মসাধন—এ কথাই সন্ন্যাসী বুঝে গেলেন ধর্মব্যাধের আচরণে। অনাসক্ত কর্মযোগের এক সহজ সরল ব্যাখ্যা নিহিত আছে স্বামীজী-কথিত এই আখ্যান দু'টিতে। ধর্মব্যাধের কাহিনী এবং ব্যাধোক্ত কর্মযোগতত্ত্ব লিপিবদ্ধ আছে মহাভারতের 'ব্যাধগীতা' অধ্যায়ে। উচ্চ-নীচ, বড়-ছোট ভেদাভেদ নির্বিশেষে কর্তব্যপালনের মহিমা ও মাহাত্ম্য-প্রচারই এ আখ্যান দু'টির উদ্দেশ্য। গৃহস্থবধূর স্বামিসেবা এবং সর্বজনঘৃণ্য কশাইয়ের পিতৃমাতৃভক্তি নিষ্কাম কর্মযোগের অনবদ্য দৃষ্টান্ত। নিষ্কাম, অনাসক্ত কর্মের কথা শাস্ত্রে বিঘোষিত, কিন্তু অনাসক্ত ভাবে কর্মপালন বড় সহজ কথা নয়। কাজ কর, অথচ কাজের ফলাফলে নিস্পৃহ, নিরাসক্ত হও—এ অতি দুষ্কর ব্রত। স্বামীজীর নির্দেশ অতি সরল ও সুন্দর। যখন যে কাজটি করবে তখন তাতেই সমস্ত মন প্রাণ নিবিষ্ট কর, তার আগে ও পরের দিকে তাকাবার প্রয়োজন নাই। সভামঞ্চে বক্তার চিন্তা ও চেষ্টা প্রযুক্ত হোক তার ভাষণের বিষয়বস্তু এবং বাচনভঙ্গীর উপর। শ্রোতৃমণ্ডলীর সপ্রশংস করতালিধ্বনির প্রতি উদাসীনতা এবং ধিক্কারধ্বনির প্রতিও নিরুদ্বিগ্নতা নিরাসক্ত কর্মযোগের একটা প্রাথমিক অভ্যাস। একলব্যের একাগ্রতা নিয়ে কৃত যে-কোন তুচ্ছ কর্মও সুন্দর এবং মহিমোজ্জ্বল হয়ে উঠে। আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক জীবনের ঘরোয়া পরিবেশেও ছড়িয়ে রয়েছে শত শত সুযোগ। কবি Newman-এর কথাগুলি স্মরণীয়:

"Keep thou my feet: I donot ask to see
The distant scene; One step enough
for me."

গীতোক্ত বাণীরই ইহা প্রতিধ্বনি:

মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্বিকারঃ কর্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে॥

আমি করেছি বলে যিনি জাহির করেন না, যাঁর ধৈর্য ও উৎসাহ আছে এবং যাঁর কাছে সাফল্য ও অসাফল্য দুই-ই সমান—তিনিই সাত্ত্বিক কর্তা।

আজ ভারতীয় নারীসমাজের কাছে এসেছে বিচিত্র ও বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রের দুর্নিবার আহ্বান। শুধু গার্হস্থ্য জীবনের দুরূহ কর্তব্য-পালনেই নয়; শিক্ষা, শিল্প, সমাজসেবা, প্রশাসন, প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রেই নারীসমাজের সক্রিয় সহযোগিতা আজ অপরিহার্য। বিপুল জনসমাজের অর্ধাংশকে বাদ দিয়ে জাতিগঠনের যে-কোন পরিকল্পনাই আকাশকুসুমমাত্র। বিপুল কর্মযজ্ঞে ভারত-নারীর ভূমিকা গভীর তাৎপর্য-পূর্ণ। ভারতের নারীজাগরণের মধ্য দিয়ে স্বামীজী-ঘোষিত মহান আদর্শেরই রূপায়ণ কাম্য, যে আদর্শ বিবেকানন্দ তুলে ধরেছিলেন তাঁর মানসদুহিতা নিবেদিতার সম্মুখে:

**"Be thou to India's future son,
Mistress, servant, friend in one."**

কাশী

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

কাশী রাজ্যের রাজধানী বারাণসী। ইহা পৃথিবীর সর্বাধিক প্রাচীন অথচ এখনো বর্তমান শহর। কাশীর সর্বপ্রথম উল্লেখ পাই কৌসীতকী ব্রাহ্মণে: . অত: কাশয়োহ্গ্নিনা দত্তম্, ১৩।৫।৪।১৯; শতপথব্রাহ্মণে উল্লেখ আছে: যজ্ঞং কাশীনাং ভরতঃ সাত্বতামিব; রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডে (৪০।২২) পাওয়া যায় যে, কাশী তখন একটি বিস্তীর্ণ জনপদ ছিল।

এই তো গেল কাশীর পুরাণত্বের হিসাব। কিন্তু ঐতিহাসিক বিবরণ-সঙ্কলন সম্বন্ধে পণ্ডিত-প্রবর রেভা: ডা: এম. এ. শেরিং-এর মত এই যে, সব চলিত পুস্তক যথা, 'কাশীরহস্য,' 'কাশীমাহাত্ম্য', 'কাশীখণ্ড' ইত্যাদি প্রামাণ্য ইতিহাস নহে। তিনি দুঃখের সহিত বলেন যে, হিন্দুদের ঐতিহাসিক রচনাবিষয়ে দারুণ ঔদাসীন্য দেখা যায়, কিন্তু ব্যাকরণ-রচনা-বিষয়ে তাঁহারা পৃথিবীকে আশ্চর্যান্বিত করিয়াছেন। তবে শেরিং সাহেবই বলেন, "It is certain that the city is regarded by all the Hindus as coeval with the birth of Hinduism." তিনি তাঁহার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, "কাশী বা বেনারসের পূর্ব ইতিহাস সুদূর অতীতের ঘোর তমসায় আচ্ছন্ন, হিন্দুদিগের এই পবিত্র নগর গভীর অবিরোধী পুরাতত্ত্বের বিষয়ীভূত। যখন আর্যগণ উত্তর ভারতের নানাস্থানে অতি ধীরে ধীরে আত্মপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন, বোধ হয় তখনই তাঁহাদিগের দ্বারা এই কাশী নগরীর প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকিবে।...সে যাহা হউক, ইহা আর্যদিগের 'আর্য' নাম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাদের অতি শ্রদ্ধা-ও ভক্তি-প্রদ স্থানরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। কাশীধাম আর্যের অতি প্রাচীন, পবিত্র ও মহা পুণ্যতীর্থ।" শেরিং সাহেব আরও বলেন, "এই প্রাচীন নগর 'বেনারস' বহু পুরাতত্ত্বের আধার, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় সময় সময় নানা দৈব ও রাষ্ট্রীয় দুর্ঘটনায় ইহার বহু প্রভাব ও প্রতিপত্তি অতল অতীতের কোলে কোথায় বিলীন হইয়া গিয়াছে। তবে শাক্যমুনি হইতে ইহার ঐতিহাসিক ঘটনাবলী বেশী জানিতে পারা যায়।...পঞ্চবিংশতি শতাব্দীরও পূর্বে যখন আসিরীয়া, চালদীয়া, বাবিলন, ট্রয় ও মিশর সবেমাত্র আপন আপন নবোত্থিত প্রভাব প্রকাশ করিতেছিল, যখন রোম গ্রীস প্রভৃতি তাহাদের ভ্রূণ অবস্থায় ছিল—তাহাদের নামও কেহ জানিত না—সেই প্রাচীন যুগে কাশীনগরী আপন বিদ্যা ও বৈভবের পরিচয় দিতেছিল। কাশীনগরী ভারতের কৃষ্টির অধীশ্বরীরূপে চিরদিন নিজ আধিপত্য রক্ষা করিয়া আসিতেছে। কাশী যেমন পুরাতন তেমনি চির নূতন।"

প্রাচীনকালে কাশীরাজ্যের রাজধানী বা শহর এবং কাশীতীর্থ উভয়ই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থিত ছিল। কাশীর সেই প্রাচীন রাজধানী বর্তমানের এই শহর হইতে দুই মাইল উত্তরে অবস্থিত ছিল। আমরা এক্ষণে যাহাকে কাশী বা বারাণসী অথবা বেনারস বলিয়া বুঝিয়া থাকি, ঠিক সেখানে তাহা ছিল না। আর্য গ্রন্থাদিতে আমরা কাশীরাজ্যের রাজধানী বারাণসী পাই। ইহা ব্যতীত বানারস

নামও কাশীর রাজধানী হিসাবে পাই। সেই হিসাবে আমরা Colonel Wilfero-র Asiatic Researches, Vol. XII-তে পাই, "The old cities of Benares, north of the river Baruna".—বরুণার উত্তরদিকে প্রাচীন শহর অবস্থিত ছিল। এখনও দেখিতে পাওয়া যায় বর্তমান শহর হইতে সারনাথের দিকে পথমধ্যেই প্রাচীন নগর ও গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ ইষ্টক-প্রস্তরে সমাচ্ছাদিত হইয়া আছে।

স্থানের বিশেষত্বই বলুন বা মাহাত্ম্যই বলুন, এই বরুণা এবং অসীর মধ্যবর্তী স্থানই বারাণসী নামে খ্যাত এবং আর্যগণ বারাণসীক্ষেত্রের জন্য এই অতুলনীয় স্থান নির্বাচন করিয়া ধন্য হইয়াছেন। এই স্থানটি এক অনুন্নত পার্বত্য ভূমির উপর অবস্থিত। সেই কারণে অন্যান্য স্থানের ন্যায় গঙ্গার এই তটভূমি কখনও গঙ্গাগর্ভগত হইতে পারে নাই। কাশীর দিকে গঙ্গার কখনও চড়া পড়ে নাই বা পড়িবে বলিয়া মনে হয় না। কাশীক্ষেত্রে ভূমিকম্পের তীব্রতা কখনও অনুভূত হয় নাই। এই কারণে ইহাকে তীর্থরাজ বলা হয়। ইহার এক নাম তো হইল বারাণসী। কাশীর নৃপতিবৃন্দের মধ্যে 'কাশ' নামক এক রাজা ছিলেন, তাঁহারই নাম অনুযায়ী কাশী নাম হয় এবং কথিত আছে ১০১৭ খৃষ্টাব্দে বানার নামক একজন মহাপ্রতাপান্বিত রাজা কাশীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেই হেতু ইহার নাম 'বানারস' হইয়াছে।

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী অবধি এই কাশী একটি বিস্তীর্ণ জনপদ এবং বারাণসী ইহার রাজধানী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল, তাহা চীন পরিব্রাজক ফা-হিয়ানের গ্রন্থপাঠে জানা যায়। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, এখনও বর্তমান শহর হইতে সারনাথের দিকে পথমধ্যেই প্রাচীন নগর ও গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। ফা-হিয়ানের সময় হইতে হিউ-এন-সিয়াং-এর সময়ের ভিতর এই কম-বেশী দুইশত বৎসরের মধ্যে কোন দৈব দুর্ঘটনায় বা হিন্দু-বৌদ্ধ-সংঘর্ষেই হউক বা মিহিরকুল যিনি অত্যধিক বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন তাঁহার অত্যাচারেই হউক, পুরাতন নগরের পূর্ব অংশ একেবারে ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। সেই কারণে হিউ-এন-সিয়াং নবপ্রতিষ্ঠিত নগর বা শহর দেখিয়া থাকিবেন এবং তিনি তাহারই উত্তর-পূর্ব কোণে সারনাথের স্তূপ ও সঙ্ঘারামের কথা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এখানেই আবার, Murray's Handbook of Bengal-এ পাওয়া যায় যে, জয়চাঁদ কাশীর অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহার দুর্গও রাজঘাটের নিকট ছিল। এই সকল ঐতিহাসিক ঘটনা হইতে নিঃসন্দেহেই জানা যাইতেছে যে, রাজঘাট হইতে বরুণার ধারেই, কখনো বা কিঞ্চিৎ পূর্বে এবং কখনো বা কিঞ্চিৎ পশ্চিমে রাজঘাটের নিকটেই সেই শহর অবস্থিত ছিল।

উক্ত ঘটনার দ্বিতীয় নিদর্শন এই যে, বুদ্ধদেবের মতো মহাজ্ঞানী পুরুষ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-গণের সম্মুখীন না হইয়া নির্জন পল্লীর মধ্যে কি অবস্থান করিয়াছিলেন? সুতরাং খৃঃ পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বরুণার উত্তর অংশেই কাশী-রাজ্যের রাজধানী ছিল। তখন আধুনিক শহর বিশ্বনাথের পঞ্চক্রোশী বারাণসীর কেন্দ্রস্থল নির্জন ও কেবল সাধু-সন্ন্যাসীর তপোবনস্বরূপ ছিল। আর এক প্রমাণ এই যে, James Prinsep ১৮৩০ খৃঃ অব্দে বেনারস সম্বন্ধে যে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহাতে পাওয়া যায়—কাশীর সর্বপ্রধান তীর্থ—মণিকর্ণিকার ঘাট চিরকাল জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত ছিল। কাশীর

আদিম অধিবাসী গঙ্গাপুত্রগণের মুখে তিনি নিজে শুনিয়াছিলেন। তিনি স্বচক্ষে অতি প্রাচীন বৃক্ষাদির অস্তিত্ব দেখিয়াছিলেন। কোন প্রাচীন শহরে বা গ্রামে শ্মশান মধ্যস্থলে থাকে না—মণিকর্ণিকার পার্শ্বস্থিত মহাশ্মশান হরিশ্চন্দ্র ঘাট কখনই শহরের অন্তর্গত ছিল না। শেষ প্রমাণ এই যে, ঐ Prinsep-এর পুস্তকে বানার রাজা ৩০১৭ খৃ: অব্দেও যে কাশীর অধীশ্বর ছিলেন, তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়।

ফা-হিয়ান বৌদ্ধ ব্যতীত আর সকলকেই বিধর্মী বলিতেন এবং ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, তাই বারাণসীধামে তিনি আসিলেও সেখানকার কোন কথাই উল্লেখ করেন নাই (কারণ Cambridge ইতিহাসের মতে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী হইতে গুপ্ত রাজবংশের অভ্যুত্থান এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যধর্মেরও পুনরুজ্জীবন হইয়াছিল)। হিউ-এন-সিয়াং এর বর্ণনায় জানা যায়, সে সময় কাশীধাম ৪০০০ লি অর্থাৎ ৩৩৩ ক্রোশ এবং কাশীর রাজধানী বারাণসী নগরী ১৮।১৯ লি অর্থাৎ প্রায় দেড় ক্রোশ দীর্ঘ ও ৫।৬ লি অর্থাৎ প্রায় অর্ধ ক্রোশ বিস্তৃত ছিল। দুই-একজন মাত্র বৌদ্ধধর্মানুরক্ত ছিলেন। এ সময়ে কাশীপ্রদেশে সহস্রাধিক দেবমন্দির ও ২০টি মাত্র বৌদ্ধ সজ্ঘারাম ছিল। কিন্তু তখন বারাণসীধামে একটি মাত্রও সজ্ঘারাম বা বিহার ছিল না।

হিন্দুর এই পরম মোক্ষধাম বারাণসীতে পাষাণময় উচ্চচূড়াশোভিত উপবন- ও তড়াগ-বেষ্টিত ২০টি দেবমন্দিরের অপূর্ব ভাস্করশিল্পযুক্ত মণ্ডপ ও নাটমন্দির দেখিয়া চীন পরিব্রাজক চমৎকৃত হইয়াছিলেন। সে সময়ে এখানে ৬৬ হস্ত বা ১০০ ফুট উচ্চ তাম্রময় মহেশ্বরমূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল—সেই দেবাদিদেবমূর্তি কি মহান, কি গাম্ভীর্যপূর্ণ, ঠিক যেন জীবন্ত বলিয়া মনে হইত। স্যামুয়েল বিল সাহেবের বিবরণে ইহা জানা যায়।

সারনাথের কীর্তি বিধ্বস্ত ও বিলুপ্তপ্রায় হইলেও চীন পরিব্রাজক মৃগদাব (Deer Forest) সম্বন্ধে যে উজ্জ্বল চিত্র রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা উল্লেখযোগ্য। বাস্তবিক চীন পরিব্রাজকের সময় হইতেই সারনাথের দুর্দশার সূত্রপাত। তাহার পর বৌদ্ধধর্মানুরাগী পালরাজগণের যত্নে কতকটা পূর্বকীর্তি রক্ষিত হইলেও মুসলমানহস্তে বৌদ্ধ প্রভাবের তথা হিন্দুদিগের শেষ-চিহ্ন পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়।

বরুণার উত্তর দিকে অর্থাৎ সারনাথের দিকে পথমধ্যে প্রাচীন নগর ও গৃহাদির ধ্বংসাবশিষ্ট ইষ্টক-প্রস্তরের কাহিনী ধারাবাহিকরূপে বুঝিতে হইলে গুপ্তবংশের ইতিহাস পড়িতে হয়। গুপ্তবংশ যদিও বিদেশী ছিলেন তথাপি তাঁহারা হিন্দুধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং পরম বৈষ্ণব ছিলেন। প্রতিষ্ঠাতা শ্রীগুপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথম চন্দ্রগুপ্ত (৩২০-৩৩০ খৃ:), সমুদ্রগুপ্ত (৩৩০-৩৭৫ খৃ:), দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (৩৭৫-৪১৫ খৃ:)—এই সময়ে ফা-হিয়ান (৪০১-৪১০ খৃ:) পর্যন্ত ভারতে ছিলেন)—কুমার গুপ্ত (৪১৫-৪৫৫ খৃ:), স্কন্দগুপ্ত (৪৫৫-৪৬৭ খৃ:) ইত্যাদি রাজারা ব্রাহ্মণ্যধর্মের পোষকতা করেন। পরম বৈষ্ণব গুপ্ত সম্রাটগণের উৎসাহে শত শত সৌধমালা ও দেবমূর্তি সুশোভিত হইয়াছিল। হূনগণ গুপ্তসম্রাজ্যকে চূড়ান্ত আঘাত করিয়াছিল। রাজতরঙ্গিণীর মতে মিহিরকুল অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন এবং তিনি বহু বৌদ্ধ বিহার ও স্তূপ ধ্বংস করিয়াছিলেন। ৫৩৩ খৃষ্টাব্দের কিছু পূর্বে রাজা যশোধর্মন ও মগধের রাজা বলাদিত্যের (বা নরসিংহ একই ব্যক্তি) সহিত যুদ্ধ হইয়াছিল এবং এই যুদ্ধে মিহিরকুল পরাজিত ও বন্দী হইয়াছিলেন। হর্ষবর্ধন

শিলাদিত্যের (৬০৭-৬৪৭) রাজত্বকালে হিউ-এন-সিয়াং ভারত পরিভ্রমণ করেন (৬৩০-৬৪৪ খৃঃ অব্দ)। যশোবর্ধনের একটি তাম্রফলকে দেখা যায় যে, মিহিরকুল 'স্থাণু' বা শিবের উপাসক ছিলেন। আরও দেখা যায় যে, ৬০৬ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদে কর্ণ-স্বর্ণের স্বাধীন রাজা শশাঙ্ক রাজ্যবর্ধনের হত্যাকারী এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী ছিলেন। তিনি বুদ্ধগয়ায় বোধিবৃক্ষ কাটিয়া ফেলেন এবং বুদ্ধমূর্তি স্থানান্তরিত করেন।

'সি-উ-সি' নামক একখানি বৌদ্ধগ্রন্থ স্যামুয়েল বিল (Samuel Bael) অনুবাদ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে বারাণসীর বিবরণ এইরূপ দেখা যায়—'এই রাজধানীটি লম্বায় ১৮ বা ১৯ লি এবং চওড়ায় ৫ বা ৬ লি। …(এখানকার) দেব মহেশ্বরের মূর্তিটি স্থানীয় তাম্রনির্মিত এবং উচ্চতায় প্রায় ১০০ হাত (?)।' "This Capital is about 18 or 19 li in length and 5 or 6 li in breadth.…The statue of the Deva Maheswara, made of TEAN-SHIH (Native Copper) and somewhat less than 100 cubits (?) high."

যে প্রকাণ্ড মন্দিরে অত বড় মহেশ্বর ছিলেন, সেইটিই ছোটখাটো পাহাড়বিশেষ হওয়া উচিত।

হিউ-এন-সিয়াং-এর পরে আচার্য শঙ্করও বারাণসীর সমৃদ্ধ অবস্থা দেখিয়াছিলেন—প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে আচার্য শঙ্কর ৭৮৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি কিছুকাল ভ্রমণের পর সুরশৈবলিনীর তটদেশে যজ্ঞীয় স্তম্ভসমূহে সুশোভিত পবিত্র বারাণসীক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি অসংখ্য মঠ- ও দেবালয়-পরিবেষ্টিত সেই কাশীক্ষেত্রের অপূর্ব সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, এক্ষণে সারনাথ যেস্থানে, সর্বপ্রাচীন কাশীধাম বা বারাণসী সেই স্থানে ছিল। মুসলমানদের রাজত্বকালে কাশী-নগর বরুণা নদীর দক্ষিণ তীরের নিকটেই ছিল। এক্ষণে নগরের সম্মুখভাগ মাত্র গঙ্গার তীরে।

১১৯৪ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরী বারাণসী অধিকার করেন। তিনি বড় বড় মন্দির ভাঙ্গিয়া মসজিদ ও গোরস্থানে পরিণত করেন। বাস্তবিক হিন্দুরাজগণ দীর্ঘকাল অতি যত্নে যে কাশীধাম প্রাসাদসদৃশ মন্দিরমালায় সুশোভিত করিয়াছিলেন, কুতবের আক্রমণে সেই গৌরব সমস্তই বিলুপ্ত হইয়াছিল। তাই চীন পরিব্রাজক হিউ-এন-সিয়াং যে ১০০ ফিট উচ্চ তাম্রময় মহেশ্বরদেবকে দেখিয়াছিলেন, এখন তাহার চিহ্নমাত্র নাই।

এই ধ্বংসলীলার কর্তা হইতেছেন মহম্মদ ঘোরীর সেনাপতি কুতবুদ্দিন। ইনি মুসলমান-ঔরসজাত খাঁটি মুসলমান ছিলেন না। ইনি একজন পঞ্জাবপ্রবাসী অতি নিষ্ঠাবান ক্ষত্রিয়সন্তান—নাম রামপ্রসাদ। গজনীপতি সিহাবুদ্দিন মহম্মদ ঘোরী কর্তৃক বন্দী হইয়া গোলামরূপে নিযুক্ত হন। পরে বাধ্য হইয়া মুসলমানধর্ম গ্রহণ করিয়া কুতবুদ্দিন নাম ধারণ করেন। ক্রমে প্রধান সেনাপতি হইয়া ভারতের নানা প্রদেশ জয় করিয়া সম্রাট কর্তৃক দিল্লীর শাসনকর্তা নিবাচিত হন।

কাশীর ধ্বংসলীলা যে শুধু ক্ষত্রিয়সন্তানের দ্বারা হইয়াছিল, তাহা নয়। ইহাতে ব্রাহ্মণ-সন্তানেরও যথেষ্ট হাত আছে। ইনি আমাদের খাস বাঙ্গলার ব্রাহ্মণ কালাচাঁদ রায় বা রাজীব-লোচন রায়। ইনি বারেন্দ্রব্রাহ্মণশ্রেণীভুক্ত 'একটাকিয়ার' ভাদুড়ী রাজা জগদানন্দের বংশজাত। কালাচাঁদ বাল্যকাল হইতেই বেশ বলবান, অস্ত্রচালনায় ও অশ্বারোহণে বেশ পটু ছিলেন। শ্রীপুরনিবাসী রাধামোহন লাহিড়ীর দুই কন্যার পাণিগ্রহণ করিবার পর

গৌড়রাজার অধীন ফৌজদারের কাজে নিযুক্ত হন এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও ফৌজদারের কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত করিয়াও সমাজে পুনঃপ্রবেশ করিতে না পারিয়া কালাচাঁদ ক্রোধান্ধ হইয়া উড়িষ্যা-বিজয় করেন এবং জগন্নাথবিগ্রহ দগ্ধ করিয়া পাণ্ডাদিগকে জোর করিয়া মুসলমান করিতে থাকেন। পূর্ব-ভারতে এমন খুব কম স্থানই আছে যেখানে কালাপাহাড় হিন্দুর অনিষ্ট করেন নাই। পরে তিনি সম্রাট বেলোললোদির কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া মহম্মদ ফর্মুলি নাম ধারণ করিলেন এবং এই সময় শ্রীক্ষেত্র এবং কামরূপের ন্যায় কাশীধামেরও হিন্দুধর্ম এককালে লোপ করিবার প্রয়াসে প্রভূত অত্যাচার করিয়াছিলেন।

তৎপর ঘোর দেবদ্বেষী আওরঙ্গজেব ১৬৬০ খৃঃ অব্দে প্রাচীন পবিত্র মন্দিরসহ বহু হিন্দুমন্দির বর্বরের ন্যায় ধ্বংস করিয়া সেগুলিরই উপর সেইসকল ইষ্টক-প্রস্তর দ্বারা এক একটি মসজিদ নির্মাণ করেন।

কিন্তু সম্রাট আকবরের সময়ে মানসিংহ কর্তৃক শত শত দেবালয় ও মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বিশ্বেশ্বরের প্রথম মন্দির ভাঙ্গিলেন কুতব আর দ্বিতীয় মন্দির ভাঙ্গিলেন আওরঙ্গজেব। প্রায় ১০০ শত হাতের দেব মহেশ্বর যেখানে অর্থাৎ যে মন্দিরে ছিলেন তাহার নাম ছিল 'মোক্ষলক্ষ্মীবিলাস' মন্দির। প্রিনসেপ্ সাহেব বলেন, কাশীতে মানসিংহের পূর্বে নির্মিত কোন অট্টালিকার অস্তিত্ব নাই।

বর্তমান মন্দির ১৭৬৪ খৃঃ অব্দে ইন্দোরেশ্বরী অহল্যাবাঈ-এর তৈয়ারি। ইহার উচ্চতা প্রায় ৫১ ফুট। পঞ্জাবকেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহ এই মন্দিরের চূড়াগুলি সুবর্ণমণ্ডিত করিয়া দিয়াছেন।

বিশ্বকোষের মতে শ্রীক্ষেত্রের মাদলা পঞ্জিকার হিসাবে উৎকলরাজ যযাতি কেশরী ৩৯৬ শকে (৪৭৪ খৃঃ অব্দে) ভুবনেশ্বরের বিখ্যাত শিবমন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। ভুবনেশ্বরের মন্দির বারাণসীর মন্দিরের অনুকরণে নির্মিত হয়।

বিশ্বেশ্বরের স্বর্ণমন্দির : বর্তমান মন্দিরটি চতুর্থ সংস্করণ। আদি মন্দিরটি কুতবের হস্তে, তার-পরেরটি আওরঙ্গজেবের হস্তে (১৬৬০ খৃষ্টাব্দে) ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এটি ধ্বংস হইবার পর পূজারিগণ পূর্ব মন্দিরের নিকটবর্তী একটি মন্দির সামান্য ভাবেই নির্মাণ করিয়া শতবর্ষ ধরিয়া শিবের অর্চনা করিতেছিলেন। বিশ্বনাথের মন্দিরের বিশেষত্ব এ যে, মন্দিরের নাটমন্দির বা নাট-মন্দির মধ্যস্থলে রাখিয়া দুই দিকে দুইটি মন্দির নির্মিত হইয়াছে। পঞ্জাবকেশরী ইহার চূড়াগুলি স্বর্ণমণ্ডিত করিয়া দিয়াছেন। মহারাজা মানসিংহ প্রাচীন গৌরীপট্টটি আওরঙ্গজেবের মসজিদের দ্বার হইতে উঠাইয়া যথারীতি তাহারই উপর প্রস্তরময়ী লিঙ্গমূর্তি স্থাপন করিয়াছেন।

কাশীর অন্নপূর্ণার মন্দির : কাশী এত প্রাচীন যে, ইহার বিখ্যাত মন্দিরগুলি যে কতবার কাল-প্রভাবে ভাঙ্গিয়াছে এবং আবার নূতন করিয়া গড়া হইয়াছে, তাহার কোন ইয়ত্তা নাই। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে অন্নপূর্ণার মন্দির শেষ বিধ্বস্ত হইয়াছিল এবং সামান্যরূপে মেরামত করিয়া পূজা-অর্চনা চলিতেছিল। সংবত ১৭৮২ বা ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে মায়ের অকলুষিত পবিত্র মূর্তিটি-সহ অন্নপূর্ণার মন্দির নির্মাণ করাইয়া দেন দক্ষিণী রাজা। মূর্তি এতকালের যে, ইহা জীর্ণ হইয়া গিয়াছে বলিয়া স্বর্ণাবরণে আবৃত থাকে। কাশীখণ্ডে এই অন্নপূর্ণা 'ভবানী' নামে বর্ণিত হইয়াছে। দেবী অন্নপূর্ণা কাশীর নিত্য দেবতা। দীপালীর সময় 'অন্নকূট' উৎসব দেখিবার জিনিস। (ক্রমশঃ)

আপনাকে চেনো

শ্রীউমাপদ নাথ

আর একটু ভাবো তুমি, নির্জনেতে চোখ বুজে বোসো,
এ মত্ততা শান্ত হবে।

অজস্র আবেগ নিয়ে অসংখ্য পথের
কর্দমে আছাড় খেয়ে শ্রান্ত ক্লিন্ন বিষণ্ণ জীবন—
অফুরন্ত ধোঁয়া ধুলো ঘর্ঘর আওয়াজ,
চকিত হাওয়ার মতো মানুষের বিদ্যুদ্‌-গমন
তোমার অন্তরে তোলে বিশৃঙ্খল ঝড়ের লড়াই :
উন্মত্ত অস্থির তুমি, তোমার পৃথিবী ধূমকেতু।

এবার ফিরায়ে মুখ বোসো তুমি স্নিগ্ধ শান্ত জ্যোৎস্নার আলোয়
যে-মন প্রমুক্ত তার উন্মুক্ত প্রান্তরে,
সেইখানে ছাখো সব—চেনো সব অচঞ্চল চোখে :
এই ঢেউ পার হয়ে জীবন উত্তীর্ণ হোক অন্যার্থের তটে।

সেই হলো শ্রেয়োলাভ—জীবন-নদীর তীর বাঁধা,
সে-জলে প্রশান্ত তরী দ্বন্দ্বহীন নির্ভয় সম্বেগে
আনন্দে উল্লাসে চলে ফুলফোটা চাঁদের আলোয়।

এ দ্বন্দ্ব তোমার নয় : এ বিক্ষেপ, অশান্ত প্রলাপ
এবং নিজের রক্তে প্রবৃত্তির তৃষ্ণার তর্পণ
তোমার স্বধর্ম নয় ; তুমি সত্য সূর্যোজ্জ্বল আনন্দের স্রোত।

এইখানে নির্জনেতে চোখ বোজো, আপনাকে চেনো॥

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের তৃতীয় পর্ব

শ্রীরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই আগস্ট, রাত্রি ১টার পর, কাশীপুর উদ্যানবাটীতে শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পার্থিব লীলার অবসান ঘটে। ইহার স্বল্পকাল পরেই নরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের গৃহস্থ ভক্তদিগের অর্থানুকূল্যে ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই বরাহনগরে মুন্সীদের ভাঙ্গা বাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের প্রথম পর্ব আরম্ভ হয়।

কয়েক বৎসর সেখানে থাকিবার পর ভাঙ্গা বাড়ী আরও ভাঙ্গিয়া পড়ে। সাধুভক্তদিগের সংখ্যাও বাড়িতে থাকে। সেই সময় ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে মঠ বরাহনগরের কিছু উত্তরে আলমবাজারে স্থানান্তরিত হয়। সেখানে মঠের দ্বিতীয় পর্ব শুরু।*

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ডিসেম্বর পূজনীয় স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীকে আলমবাজার মঠ হইতে এক পত্রে লেখেন—"একটা গঙ্গাতীরে স্থান না হইলে বড় সুবিধা নয়। জানি না শ্রীশ্রীগুরুদেব কবে আমাদের বাসনা পূর্ণ করিবেন।"[১]

ইহার কিছুদিন পরেই ভীষণ ভূমিকম্পে আলমবাজার মঠ-বাড়ী বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। সেখানে বাস করা আর নিরাপদ নয় মনে করিয়া গঙ্গার পশ্চিমকূলে বেলুড়ে শ্রীনীলাম্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাগানবাড়ী ভাড়া লইয়া ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারি মঠ সেখানে উঠিয়া যায়। এই স্থানেই মঠের তৃতীয় পর্ব আরম্ভ।[২]

ইতিপূর্বেও গঙ্গার পূর্বকূলে মঠের জন্য বাড়ীর সন্ধান করা হইয়াছিল। শুনা যায় কাশীপুরে ১৫নং রতনবাবু রোডে ভূকৈলাস রাজাদের বাটীসংলগ্ন জমি লীজ লইবার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। দক্ষিণেশ্বরেও জমির চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু সুবিধামত স্থান পাওয়া যায় নাই। পরে পানিহাটির স্বর্গীয় গোবিন্দকুমার চৌধুরীর বাগানবাড়ী ভাড়া লইবার কথা উঠে। কিন্তু সে বাগানবাড়ী কলিকাতা হইতে অনেক দূর, শ্রীশ্রীঠাকুরের শিষ্য ও ভক্তদিগের অতদূর যাতায়াতের অসুবিধা বিবেচনা করিয়া উক্ত প্রস্তাবও পরিত্যক্ত হয়।[৩]

বেলুড়ে যে বাগানবাড়ীতে মঠ উঠিয়া গেল, সে বাড়ী এখন আর নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়দিগের নাই। হস্তান্তরিত হইয়া পোস্তার রাজাদিগের অধিকারে আসিয়াছে। বাড়ীটির আধুনিক নাম—'শান্তিকানন' এবং বর্তমান ঠিকানা ৪৮নং লালাবাবু সায়র রোড, বর্তমান বেলুড় মঠের কিছু দক্ষিণে, পার ঘাটেরও ঠিক দক্ষিণ-পার্শ্বে। আজও বাড়ীটি রহিয়াছে, বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয় নাই। তদানীন্তন ঠাকুরঘর এবং শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী সারদাদেবী যে ঘরখানিতে বাস করিতেন তাহাও একই অবস্থায় আছে। উহাদের দক্ষিণে ছোট একখানি ঘর উঠিয়াছে মাত্র।

---

* বরাহনগর ও আলমবাজার মঠের বিশদ বিবরণ 'উদ্বোধন' চৈত্র, ১৩৭১ ও বৈশাখ, ১৩৭২ এবং জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৩ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

১ উদ্বোধন, শ্রাবণ, ১৩৭৪

২ Hi tory cf the Ramakrishna Math and Mission

(৩) স্বামি-শিষ্য-সংবাদ—শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী

মঠ স্বল্পকালের জন্য নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাড়ীতে স্থায়ী হইলেও, সেখানে যে-সকল ঘটনা ঘটে, সেগুলি বর্তমান বেলুড় মঠের কার্যসূচীর প্রারম্ভ।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই মার্চ নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়ী হইতে শশী মহারাজকে লিখিত বাবুরাম মহারাজের এক পত্রে জানা যায়—"মঠে আজকাল অনেক লোক—শরৎ, হরিভায়া, তারকদাদা, সুশীল, সুধীর, হরিপ্রসন্ন, কানাই, নন্দ, কালীকৃষ্ণ, অজয় নামে একটি নূতন লোক, গুপ্ত, আর নিত্যানন্দ—ইনিই পূর্ববঙ্গে গিয়া ৫০।৬০টি শিষ্য করিয়া আসিয়াছেন।[৪] সুতরাং মঠ তখন সাধু ও ব্রহ্মচারীতে পূর্ণ।

আলমবাজারে মঠ থাকাকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতেই সম্পন্ন হইত। বিশেষ বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হওয়ায় এবার আর তাহা হইতে পারিল না। স্বামী বিবেকানন্দের তত্ত্বাবধানে এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের শিষ্য ও ভক্তদিগের উৎসাহে জন্মতিথিপূজা ও আনুষঙ্গিক উৎসবাদি নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাড়ীতেই বিশেষ নিষ্ঠার সহিত সুসম্পন্ন হইল।

বাবুরাম মহারাজের উক্ত পত্রে আরও জানা যায় "তিথিপূজার দিন সুশীল পূজা ও সুধীর তন্ত্রধারকের কার্য করিয়াছিল। নরেন্দ্র একটি সুন্দর আরতির গান রচনা করিয়াছেন—

খণ্ডন-ভব-বন্ধন জগবন্দন বন্দি তোমায়,
নিরঞ্জন, নররূপধর, নির্গুণ গুণময় ॥
নমো নমো প্রভু বাক্যমনাতীত
মনোবচনৈকাধার,
জ্যোতির জ্যোতি উজল হৃদিকন্দর
তুমি তমোভঞ্জনহার।
ধে ধে লঙ্গ রঙ্গ ভঙ্গ, বাজে অঙ্গ সঙ্গ মৃদঙ্গ,
গাইছে ছন্দ ভকতবৃন্দ, আরতি তোমার ॥

সকলে সমবেত হয়ে আরতি করা হইয়াছিল। নরেন্দ্রনাথ মস্তকে জটা, কর্ণে কুণ্ডল, গাত্রে বিভূতি ধারণ করায় এক অপূর্ব শোভা হইয়াছিল।"

তিথিপূজা সমাপ্ত হইলে সেই দিনই শুভ প্রভাতে বিশ্ববিজয়ী স্বামীজীর আদেশে তাঁহার শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়, চল্লিশ পঞ্চাশ জন ব্রাহ্মণেতর ভক্তকে গায়ত্রী মন্ত্র পড়াইয়া উপবীত ধারণ করাইলেন। ব্রাত্যদিগকে উপবীতধারণের অধিকার দেওয়া হইল। স্বামীজী তখন সমবেত জনমণ্ডলীকে জলদ-গম্ভীর স্বরে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "দেশের সকলকে ব্রাহ্মণপদবীতে উঠিয়ে নিতে হবে।…দেশটা হীনতা, ভীরুতা, মূর্খতা, ও কাপুরুষতার পরাকাষ্ঠায় গিয়াছে। এদের তুলতে হবে। অভয়বাণী শুনাতে হবে—তোরাও আমাদের মতো মানুষ, তোদেরও আমাদের মতো সব অধিকার আছে।"[৫]

এইরূপ দুঃসাহসিক অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য সমাজে ভাঙ্গন ধরানো নয়, তমসাচ্ছন্ন জনগণের তামসিকতা দূর করার একটা উপায়-নির্ধারণ মাত্র। মানুষকে তাহার মনুষ্যত্ব-স্ফুরণের অধিকার দেওয়ার একটা কালোচিত ব্যবস্থা দান।

শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথিপূজার দিন আনন্দোৎসবেরও যথেষ্ট আয়োজন হইয়াছিল। মঠের সন্ন্যাসিবৃন্দ স্বামীজীকে মনের সাধে সাজাইয়াদিলেন। সর্বাঙ্গে বিভূতি, মাথায় জটাভার, গলায় রুদ্রাক্ষমালা, হাতে ত্রিশূল। মঠ তখন কৈলাসপুরীর শোভা ধারণ করিয়াছে। স্বামীজীও শিবভাবে ভাবিত হইয়া শ্রীরামের স্তবগান আরম্ভ করিলেন। তৎপরে স্বামীজীরই অনুরোধে কিন্নরকণ্ঠ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ

(৪) উদ্বোধন, কার্তিক, ১৩৭৪

(৫) স্বামি-শিষ্য-সংবাদ—শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী

শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রিয় গানগুলি গাহিলেন। মঠ-বাড়ী আনন্দে মুখর হইয়া উঠিল।[৬]

ভক্তভৈরব গিরিশচন্দ্র ঘোষ সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। স্বামীজী সহসা নিজ বেশভূষা খুলিয়া নিজহস্তে সেগুলি গিরিশবাবুকে পরাইয়া দিলেন। গিরিশবাবু নির্বাক নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের বিষয় কিছু বলিতে অনুরুদ্ধ হইলে, তিনি বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে শুধু বলিলেন—"দয়াময় ঠাকুরের কথা আমি আর কি বলিব? কাম-কাঞ্চনত্যাগী তোমাদের ন্যায় বালসন্ন্যাসীদের সঙ্গে তিনি যে এ অধীনকে একাসনে বসিতে অধিকার দিয়াছেন, এতেই তাঁর অপার করুণা অনুভব করি।"[৭]

জন্মতিথিপূজার আনন্দোৎসবে সেদিন মাষ্টার মহাশয়ও (পূজনীয় মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত) উপস্থিত ছিলেন। স্বামীজী তাঁহাকেও শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্বন্ধে কিছু বলিতে বলিলেন। মাষ্টার মহাশয় কিন্তু মৃদুহাস্যে নতমস্তকে নীরব হইয়াই রহিলেন। এমন সময় স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজ মুর্শিদাবাদ হইতে প্রায় দেড়মণ ওজনের দুইটি পানতুয়া লইয়া মঠে পৌছিলেন। অদ্ভুত পানতুয়া দুইটি দেখিবার কৌতূহলে অনেকেই ছুটিলেন। সকলের দেখা শেষ হইলে স্বামীজী পানতুয়া দুইটিকে ঠাকুরঘরে লইয়া যাইতে নির্দেশ দিলেন।[৮]

ইহার পরেই স্বামীজী অখণ্ডানন্দ মহারাজের আর্তত্রাণকার্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে কর্মযোগের বৈশিষ্ট্য বুঝাইয়া দিলেন। তাহার পর তিনি সুমধুর কণ্ঠে গিরিশবাবুর গানখানি বিশেষ আবেগভরে গাহিতে লাগিলেন:

"দুখিনী ব্রাহ্মণীকোলে কে শুয়েছ আলো করে।
কেরে ওরে দিগম্বর এসেছ কুটীরদ্বারে॥
মরি মরি রূপ হেরি নয়ন ফিরাতে নারি।
হৃদয়সন্তাপহারী সাধ ধরি হৃদি'পরে॥
ভূতলে অতুলমণি কে এলিরে যাদুমণি,
তাপিতা হেরে অবনী এসেছ কি সকাতরে॥
ব্যথিতে কি দিতে দেখা গোপনে এসেছ একা,
বদনে করুণামাখা, হাস কাঁদ কার তরে॥"

সেদিন মধ্যাহ্নে প্রসাদবিতরণের পর সন্ধ্যায় আনন্দোৎসব সমাপ্ত হইল।

নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাড়ীতে স্থানাভাববশতঃ পরের রবিবার দাঁয়েদের ঠাকুরবাড়ীতে সাধারণ জন্মোৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। উদ্যোগ-আয়োজন কিন্তু মঠবাড়ী হইতেই হইয়াছিল।[৯]

দাঁয়েদের ঠাকুরবাড়ী বর্তমান বেলুড় মঠের কিছু উত্তরে অবস্থিত। প্রতি বৎসর এই স্থানে বিশেষ আড়ম্বরে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের রাসোৎসব হইয়া থাকে। কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া রাসের মেলা বসে। দূর-দূরান্তর হইতেও লোকে এই মেলা দেখিতে আসে। জন্মতিথিপূজার কয়েক দিন পরেই ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের প্রথম দিকে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাড়ী হইতেই বর্তমান বেলুড় মঠের নূতন-কেনা জমিতে শ্রীশ্রীঠাকুরকে লইয়া গিয়া প্রতিষ্ঠিত করা হয়। স্বামীজী স্বয়ং তাম্রকৌটায় রক্ষিত শ্রীশ্রীঠাকুরের ভস্মাস্থি নিজ স্কন্ধে বহন করিয়া লইয়া যান। ঠাকুরই কাশীপুর উদ্যানবাটীতে স্বামীজীকে বলিয়াছিলেন—"তুই কাঁধে ক'রে আমাকে যেখানে নিয়ে যাবি, আমি সেখানেই

৬ স্বামি-শিষ্য-সংবাদ—শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী
৭ " "
৮ " "
৯ স্বামি-শিষ্য-সংবাদ—শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী

যাব ও থাকব—তা গাছতলাই কি আর কুটীরই কি।"[১০]

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা ফেব্রুআরি উক্ত জমি বায়না করিয়া ৪ঠা মার্চ ৩৯০০০৲ (উনচল্লিশ হাজার) টাকা মূল্যে ক্রয় করা হয়। মিস্ হেনরিয়েটা মুলার জমিকেনার সকল ব্যয় বহন করেন।[১১]

স্কন্ধস্থিত ভস্মাধারটি উক্ত জমির উপর লইয়া গিয়া বিস্তীর্ণ একখানি সুন্দর আসনের উপর স্থাপন করিয়া ঠাকুরের উদ্দেশে স্বামীজী ভক্তি-ভরে প্রণাম করিলেন। উপস্থিত সকলেই তখন ভক্তিনম্র চিত্তে প্রণত হইলেন। তাহার পর স্বামীজী ভস্মাধারটি যথারীতি পূজা করিয়া হোমাদি সম্পন্ন করিলেন। স্বহস্তে পায়সান্ন প্রস্তুত করিয়া ঠাকুরকে নিবেদন করিলেন। পূজা সমাপ্ত হইলে স্বামীজী সমাগত ভক্তবৃন্দকে সাদরে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিলেন—"আপনারা আজ কায়মনোবাক্যে ঠাকুরের পাদপদ্মে প্রার্থনা করুন, যেন যুগাবতার ঠাকুর আজ থেকে বহুকাল 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' এই পুণ্যক্ষেত্রে অবস্থান ক'রে ইহাকে সর্বধর্মের অপূর্ব সমন্বয়কেন্দ্র ক'রে রাখেন।"[১২]

বরাহনগর ও আলমবাজার মঠের মতো নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাড়ীতেও কয়েকজন ত্যাগী যুবক মঠে যোগ দিয়া স্বামীজীর আরব্ধ কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে অজয়হরি বন্দ্যোপাধ্যায় নীলাম্বর বাবুর উদ্যানবাটীতেই মঠে যোগদান করেন। এই স্থানেই স্বামীজী তাঁহাকে কৃপা করিয়া সন্ন্যাস দেন, তখন তাঁহার নূতন নাম হয় স্বামী স্বরূপানন্দ। স্বামী স্বরূপানন্দ যেরূপ পণ্ডিত, সেরূপ ত্যাগী ও কর্মী ছিলেন। স্বামীজী তাঁহাকে পাইয়া আনন্দে বলিয়াছিলেন—"We have made an acquisition."—আমরা আজ একটি রত্ন পাইয়াছি।[১৩]

দক্ষিণারঞ্জন গুহ ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দেই এই স্থানে আসিয়া মঠে যোগ দেন। ৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজী ইঁহাকে সন্ন্যাস প্রদান করিয়া নাম দেন স্বামী কল্যাণানন্দ।[১৪]

১৯০১ সালে স্বামীজীর আদেশে তিনি হিমালয়-কোলে কনখলে বন কাটিয়া, কুটীর বাঁধিয়া রুগ্ণ সাধুদিগের সেবাশুশ্রূষা আরম্ভ করেন। কনখলে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের বিরাট সেবাশ্রমের ভিত্তি তাঁহারই হাতে শুরু। দুই বৎসর পরে স্বামী নিশ্চয়ানন্দ তাঁহার কার্যে যোগ দেন।

স্বামী স্বরূপানন্দের দীক্ষাপ্রাপ্তির চারি দিন পূর্বে মিস্ মার্গারেট নোব্‌ল স্বামীজীর নিকট ব্রহ্মচর্য লাভ করেন। নামকরণ হয়—'নিবেদিতা'।[১৫]

স্বামী সুরেশ্বরানন্দও এই স্থানে স্বামীজীর নিকট সন্ন্যাস প্রাপ্ত হন।[১৬]

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাড়ী হইতেই রামকৃষ্ণ মিশনের বাংলা মুখপত্র 'উদ্বোধন' প্রকাশের ব্যবস্থা হয়। প্রথমে দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশের কথা উঠিলেও অর্থাভাবে তাহা কার্যে পরিণত হয় নাই। পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করাই স্থির হয়। স্বামীজী নিজেই টাকা দেন এই কাজ আরম্ভ করিবার জন্য।

---

১০ স্বামীজীর পত্রাবলী—তাং ১২-১১-'৯৮
১১ Life of Swami Vivekananda, Vol. III
১২ স্বামি-শিষ্য-সংবাদ—শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী
১৩ উদ্বোধন, বিবেকানন্দ শতবার্ষিক সংখ্যা —স্বামীজীর পদপ্রান্তে, পৃষ্ঠা ২৩৭-৩৮
১৪ ঐ
১৫ Life of Swami Vivekananda, Vol. III
১৬ ঐ

প্রায় দুইহাজার টাকার মূলধন লইয়াই পত্রিকা-প্রকাশ-কার্য আরম্ভ হয়। স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের উপর পত্রিকা পরিচালনার ভার পড়ে। স্বামীজীর আদেশে এই গুরুভার বহন করিয়া ১৩০৫ সালের ১লা মাঘ, শ্যামবাজারে রামচন্দ্র মৈত্রের লেনে গিরীন্দ্রনাথ বসাকের বাটী হইতে পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা ত্রিগুণাতীতানন্দ মহারাজ প্রকাশ করিলেন। স্বামীজীই পত্রিকাটির নামকরণ করিলেন —'উদ্বোধন'।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ১৩ই মার্চ বিশ্রামলাভের জন্য স্বামীজী দার্জিলিং যাত্রা করেন। সেইস্থানে কিছুদিন থাকিয়া একটু সুস্থ হইতে না হইতেই কলিকাতায় প্লেগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, এই সংবাদ তাঁহার নিকট পৌঁছিল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ত্বরা যে মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেইদিনই দেখা গেল তিনি বাঙ্গলা ও ইংরেজীতে প্লেগ সম্বন্ধে প্রচারপত্র লিখিতেছেন। ইহা দেখিয়া তাঁহার কোন গুরুভাই যখন জিজ্ঞাসা করিলেন—"আর্তত্রাণ-কার্যের জন্য কোথায় টাকা পাওয়া যাইবে?" স্বামীজী তৎক্ষণাৎ দৃপ্তকণ্ঠে উত্তর দিলেন—কেন? আমরা সন্ন্যাসী, আশ্রয়ের কি প্রয়োজন আমাদের? মঠের জন্য যে জমি সম্প্রতি কেনা হইয়াছে, দরকার পড়িলে উহাই বিক্রয় করিয়া দেওয়া যাইবে।" শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় তাহা আর করিতে হয় নাই। দেশ-বিদেশের লোক প্রয়োজনীয় অর্থ দিয়াছে। যুবকেরাও সেবার ভার লইয়াছে। ভগিনী নিবেদিতা তাঁহার গুরুর আদেশে এই সেবাকার্য সুষ্ঠুরূপে পরিচালনা করিয়াছিলেন। স্বামীজী নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাড়ীতে থাকিয়াই সেবাকার্যের সকল নির্দেশ দিতেন।[১৭]

এই বাগানবাড়ীতে বসিয়াই স্বামীজী—
"আচণ্ডালাপ্রতিহতরয়ো যস্য প্রেমপ্রবাহো
লোকাতীতোঽপ্যহহ ন জহৌ লোককল্যাণ-
মার্গম্।
ত্রৈলোক্যেঽপ্যপ্রতিমমহিমা জানকীপ্রাণবন্ধো
ভক্ত্যা জ্ঞানং বৃতবরবপুঃ সীতয়া যো হি রামঃ॥"
ইত্যাদি সংস্কৃত স্তোত্র, এবং
"ওঁ হ্রীং ঋতং ত্বমচলো গুণজিৎ গুণেড্যো,
নক্তন্দিবং সকরুণং তব পাদপদ্মম্।
মোহঙ্কষং বহুকৃতং ন ভজে যতোঽহম্
তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো॥"
ইত্যাদি সংস্কৃত স্তবটি রচনা করেন।[১৮]

শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্ধ্যারতির সময় বেলুড় মঠে এবং উহার শাখাপ্রশাখাসমূহে স্বরলয়সংযোগে উক্ত স্তবটি প্রতিদিন আজও গীত হয়।

মঠ নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাগানবাড়ীতে থাকাকালেই হাওড়া রামকৃষ্ণপুরে গৃহস্থ-ভক্ত নবগোপাল ঘোষের নব-নির্মিত বাটীর ঠাকুরঘরে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিষ্ঠাকল্পে স্বামীজী ও তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণ নিমন্ত্রিত হন। তিনখানি নৌকায় স্বামীজী মঠের সাধু ও ব্রহ্মচারীদিগকে সঙ্গে লইয়া রামকৃষ্ণপুরের ঘাটে উপস্থিত হইলেন। একখানি গৈরিকবস্ত্রমাত্র পরিধান করিয়া, গলদেশে খোল ঝুলাইয়া বিশ্ববরেণ্য বিবেকানন্দ নগ্নপদে সদলবলে শ্রীরামকৃষ্ণ নামকীর্তন করিতে করিতে সেই ঘাট হইতে পদব্রজে নবগোপাল বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। গৃহস্বামী মহানন্দে ও বিশেষ আদরে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন।[১৯]

ভস্মভূষিত স্বামীজী পূজার আসনে বসিয়া, সেই স্থানে শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের উপস্থিতি

১৭ Life of Swami Vivekananda, Vol. III

১৮ স্বামি-শিষ্য-সংবাদ—শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী

১৯ Life of Swami Vivekananda, Vol. III

প্রার্থনা করিয়া সাদরে ঠাকুরকে আবাহন করিলেন। তাঁহারই শিষ্য স্বামী প্রকাশানন্দজী ঠাকুরপ্রতিষ্ঠার উপযুক্ত মন্ত্রগুলি আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের মূর্তির সম্মুখে ধ্যানস্তিমিত লোচনে কিছুক্ষণ বসিয়া তাঁহার প্রণামমন্ত্র—

"ওঁ স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে।

অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ॥"

মুখে মুখে রচনা করিয়া স্বামীজী প্রাণভরে ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। উপস্থিত সকলে ভক্তিনম্রচিত্তে ঠাকুরপ্রণাম শেষ করিলে উৎসব সমাপ্ত হইল।

বরাহনগর ও আলমবাজার মঠে যেরূপ স্বাধ্যায়, তপস্যা ও পূজার্চনাদি চলিত, নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়ীতেও সেইরূপ চলিতে লাগিল। তদ্ব্যতীত স্বামীজী তাঁহার শিষ্যগণকে এখানে এমনভাবে শিক্ষা দিতে লাগিলেন, যাহাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন ও বাণী তাঁহাদিগের নিকট মূর্ত হইয়া উঠে। তাঁহার জীবনীকারেরা একস্থানে বলিয়াছেন, "He was verily a living fire of thought and soul at this time."—এই সময় স্বামীজী অধ্যাত্মচিন্তার জ্বলন্ত পাবকশিখায় পরিণত হন।[২০]

সংক্ষেপে বলা যায়—"In Nilambar Mukherjee's garden-house the days of old in Baranagore were oftentimes lived over again. The same old fire was present, the same intellectual brilliance shone forth, the same spiritual fervour was always uppermost."—নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাড়ীতে বরাহনগরের পুরাতন দিনগুলি ফিরিয়া আসিয়াছিল। সন্ন্যাসজীবনের বিপুল উৎসাহ, বিচার-বিতর্কে বুদ্ধিবৃত্তির পরাকাষ্ঠা, অধ্যাত্মচেতনার অপূর্ব উন্মেষ পুনরায় উপস্থিত হইল।[২১]

শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন ও বাণী এবং ভারতের অধ্যাত্ম-আদর্শ-প্রচারের সম্যক ব্যবস্থাও এই ভাড়া-করা মঠবাড়ী হইতেই হইয়াছিল। স্বামী নিত্যানন্দ এই সময় পূর্ববঙ্গে সফর করিয়া পঞ্চাশ-ষাট জন শিষ্য করিয়া আসিয়াছিলেন।[২২] মহাপুরুষ মহারাজও (পূজনীয় স্বামী শিবানন্দ) এই স্থান হইতেই সিংহলে গিয়া ঠাকুরের বাণী ও ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা তথায় প্রচার করিয়া আসেন।[২৩]

স্বামীজীর আদেশে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস হইতে নূতন-কেনা জমিতে মঠবাড়ী নির্মিত হইতে থাকে। পূজনীয় হরিপ্রসন্ন মহারাজ (স্বামী বিজ্ঞানানন্দ) আলমবাজার মঠে যোগদান করিয়াছিলেন; তাঁহারই তত্ত্বাবধানে নির্মাণকার্য সম্পন্ন হয়। পরে তিনি সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। তখন তাঁহার নাম হয় স্বামী বিজ্ঞানানন্দ।[২৪] বর্তমান বেলুড় মঠের বৃহদায়তন সুরম্য মন্দিরের স্বামীজীর ইচ্ছানুরূপ নক্সাও তিনিই করিয়াছিলেন।

বর্তমান মঠবাড়ী-নির্মাণের সময় ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই এপ্রিল পূজনীয়া শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী সারদাদেবীকে কলিকাতা হইতে নৌকাযোগে নীলাম্বর বাবুর বাগানবাড়ীতে আনা হয়। বৈকালে কলিকাতায় ফিরিবার পূর্বে স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর অনুরোধে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী নূতন-কেনা জমিতে পদার্পণ করিলেন। ভগিনী নিবেদিতা, ধীরামাতা ও জয়া (মিস্ ম্যাক্‌লাউড)

২০ Life of Swami Vivekananda, Vol. III

২১ Life of Swami Vivekananda, Vol. III

২২ ঐ ঐ

২৩ বাবুরাম মহারাজের পত্র—তাং ৬ই মার্চ, ১৮৯৮, উদ্বোধন, কার্ত্তিক, ১৩৭৪

২৪ শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের স্মৃতিকথা

তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া সমগ্র জমি দেখাইয়া আনেন।

বরাহনগর ও আলমবাজার মঠে যেরূপ পণ্ডিত ও মনীষিগণের শুভাগমন হইত, নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাড়ীতেও তাহার অভাব হয় নাই। তাঁহাদিগের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম-প্রচারক অনাগারিক ধর্মপালের নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি স্বামীজীকে সঙ্গে লইয়া শ্রীমতী ওলিবুলের (Mrs. Ole Bull)-এর সহিত সাক্ষাৎকার করিতে এবং মঠপরিদর্শনে আসিয়াছিলেন। শ্রীমতী ওলিবুল তখন নূতন-কেনা জমিতে যে পুরাতন কয়েকখানি ঘর ছিল, তাহাতেই থাকিতেন।

সেদিন অত্যধিক বৃষ্টি হওয়ায় পথ ও মঠের জমি বেশ কর্দমাক্ত হয়। স্বামীজী ও তাঁহার অনুচরবর্গ নগ্নপদেই চলিলেন। শ্রীধর্মপালের সে-ব্যবস্থা মনঃপুত হইল না। ফলে পথিমধ্যে কাদায় তাঁহার পা বসিয়া গেল। তিনি কোন-ক্রমেই তাঁহার পদদ্বয় আর তুলিতে পারিলেন না। অবশেষে স্বামীজী মহারাজ তাঁহার কোমর ধরিয়া টানিয়া তুলিলেন। স্বামীজীর কাঁধে ভর দিয়াই তিনি গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইলেন। অতিথি-নারায়ণ-জ্ঞানে স্বামীজী স্বয়ং শ্রীধর্মপালের পদপ্রক্ষালন করিয়া দিতে উদ্যোগী হইলে তাঁহার অনেক শিষ্য সেকার্যে বাধা দিয়া নিজে উহা সুসম্পন্ন করিলেন।[২৬]

স্বামীজীর ১২-১১-'৯৮-এর এক পত্রেও দেখা যায়—"Sri Mother is going this morning to see the new Math (Belur). I am also going there."—শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরানী আজ সকালে নূতন মঠ (বেলুড়ে) দেখিতে যাইতেছেন। আমিও সেই স্থানে যাইতেছি।[২৭]

পূর্বে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী গোলাপ-মা প্রমুখ কয়েকজন মহিলা ভক্তের সহিত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাড়ীতে কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। সেই বাড়ীর ঘাটে স্নান করিবার সময় গঙ্গাগর্ভ হইতে উত্থিত শ্রীশ্রীঠাকুরের জ্যোতির্ময় মূর্তিও তিনি কয়েকবার দেখিয়া তাঁহার সবত্র আবির্ভাব অনুভব করেন। ইহাতে অনুমিত হয়, শ্রীশ্রীঠাকুর সর্বদাই তাঁহার ভক্ত শিষ্যদিগের সন্নিকটে থাকিয়া তাঁহাদের সকল কার্যে প্রেরণা দিতেছেন।[২৮]

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জানুআরি 'মঠ' নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাড়ী হইতে নবনির্মিত বেলুড় মঠে সম্পূর্ণরূপে উঠিয়া আসে। তদবধি উহা বেলুড় মঠ নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।[২৯]

---

২৫ Life of Swami Vivekananda, Vol. III

২৬ শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী ও ভগিনী নিবেদিতা—শঙ্করীপ্রসাদ বসু—উদ্বোধন, চৈত্র, ১৩৭৩

২৭ Life of Swami Vivekananda, Vol. III

২৮ পত্রাবলী—স্বামী বিবেকানন্দ

২৯ The Life of Swami Vivekananda, Vol. III

যখন আঁধার নামে

শ্রীশান্তশীল দাশ

যখন আঁধার নামে, পথহারা ক্লান্ত দেহ মন,
এদিকে ওদিকে চাই, কে দেখাবে পথ অন্ধকারে ?
সারা মন ছেয়ে যায় কী দুঃসহ বেদনার ভারে,
কী রিক্ত, কী অসহায়, মনে হয় আমি এইখানে।

তখন তোমার আলো নেমে আসে সেই অন্ধকারে,
দীপশিখা তুলে ধরো, পাই খুঁজে সুমুখের পথ ;
মরণের দ্বার হতে ফিরে আসি জীবনের দ্বারে,--
সে আলো অমৃতক্ষরা, সে আলোকে আঁধারের ক্ষয়।

আবার আঁধার নামে, মন ভরে ওঠে হতাশায়,
তোমার করুণা জানি পাবই সে গভীর আঁধারে ;
সে করুণা পেয়েছি যে বারেবারে, তবুও সংশয়,
তবু মনে কী হতাশা, রিক্ততার ভারে মুহ্যমান।

এত পাই তবু কেন তোমা'পরে করি না নির্ভর !
কেন শুধু ভেবে মরি, কেন ভরি হতাশায় মন,
যখন আঁধার নামে, কেন মনে হয় রিক্ত আমি !
কবে পাব নির্ভরতা, কবে আলো হবে অনির্বাণ !

শরৎ-তীর্থ পানিত্রাসে

অধ্যাপক অমিয় দত্ত

ইচ্ছে ছিল না, তবু জোর ক'রে টেনে বার ক'রলো একদল বন্ধু। এমন সুন্দর ছুটির সকালটা! কোথায় ভাবছিলাম, আরাম করে শুয়ে থাকবো অনেকক্ষণ, তারপরে নতুন-কেনা বইগুলোর পাতা উল্টে যাবো ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত! কিন্তু বন্ধুরা আমার সে আশায় বাদ সাধলো। বললো—"তাড়াতাড়ি তৈরী হ'য়ে নে। হাওড়া স্টেশনে গাড়ি সকাল আটটায়।"

জিজ্ঞাসা করলাম—"গন্তব্যস্থান?"

বন্ধুরা সমস্বরে বললো—"পানিত্রাস।"

পানিত্রাস? নামটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহিত হ'য়ে উঠলাম। অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের স্মৃতি-বিজড়িত একটি স্থান পানিত্রাস। শরৎচন্দ্রের জীবনী পড়তে গিয়েই পানিত্রাস নামের সঙ্গে পরিচয়। আজ চোখে দেখবো তাকে। ছুটির সকালের সব আলস্য তাই ঝেড়ে ফেলে দিয়ে তাড়াতাড়ি তৈরী হ'য়ে বন্ধুদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম।

প্রায়ই আমরা এইভাবে বেরিয়ে পড়ি। নিম্নমধ্যবিত্ত-সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার জন্যে দূরদেশ বা বিদেশ পরিভ্রমণের ব্যাপারটা স্বপ্নের মধ্যেই সেরে নিই। কারণ অনেক দূরে যাওয়ার সাধ থাকলেও সাধ্যে কুলায় না। হাল্কা পকেটে তাই আমরা একদল বন্ধু ক'লকাতার বা বড়জোর বাংলাদেশের কাছাকাছি জায়গাগুলোয় সুযোগ পেলেই ছুটে যাই। এতে কম আনন্দ পাই না। কারণ পরমপুরুষ যে তাঁর আসনটি সবখান জুড়েই পেতে বসেছেন! আর বাংলা—আমার বাংলারও যে রূপ-বৈচিত্র্যের অন্ত নেই। এর মাঠে-প্রান্তরে, লোকালয়ে, সমুদ্রে-অরণ্যে-পর্বতে, মন্দিরে-গীর্জায়-মসজিদে—সবখানেই সেই পরমপুরুষের লীলা। এক নতুন যেন সর্বত্রই অনন্ত বিস্ময় নিয়ে অপেক্ষা ক'রে আছে আমাদের জন্যে। তাই অনেক দূরে না গিয়েও বাংলাদেশের যে-কোন একটা অজ পল্লীগ্রামের ভাঙা মন্দির বা মজা দীঘির মধ্য থেকেও অনায়াসে কত রকমের কিংবদন্তীই না আবিষ্কার করতে পারি এবং ছড়িয়ে-থাকা কত ছড়া, গল্প ও প্রবাদের মণি-মুক্তাই না আমরা অভিজ্ঞতার সংগ্রহশালায় জমা করি! এতে আনন্দ পাই আমরা প্রচুর। তাই সুদূরের আহ্বানে সাড়া দেবার সামর্থ্য না থাকলেও অদূরের আমন্ত্রণ ও আকর্ষণ উপেক্ষা করতে পারি না সহজে; আজও পারলাম না।

হৈ-হৈ ক'রতে ক'রতে আমাদের ছ'জনের দল বীর-দর্পে হাওড়া-গুমো প্যাসেঞ্জারের একটা কামরায় গোটা একটা বেঞ্চ দখল ক'রে বসলো। ছুটির দিন বলেই সম্ভবতঃ ভিড় খুব একটা বেশী নেই। আটটা নাগাদ গাড়ি ছাড়লো। বাষ্পীয় ইঞ্জিন কালো ধোঁয়া ছড়িয়ে এবং কয়লার গুঁড়ো উড়িয়ে পশ্চিম মুখে দৌড়তে লাগলো দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ ধরে! এই রেলপথে খড়্গপুর পর্যন্ত বৈদ্যুতিকী-করণের কাজ সমাপ্তপ্রায়। এখনই দু-একটা বিদ্যুৎ-চালিত লোক্যাল ট্রেন পাঁশকুড়া স্টেশন পর্যন্ত যাতায়াত করছে হাওড়া থেকে। আমরা গ্রামে যাচ্ছি; ওখানকার জীবনের গতি শহরের তুলনায় শ্লথ। বৈদ্যুতিক ট্রেনের

তুলনায় অপেক্ষাকৃত মন্থরগতিসম্পন্ন কয়লার ইঞ্জিনে টানা গাড়িতে চড়ে ধিকি-ধিকি যেতে যেতে তাই বিরক্তির বদলে কেমন যেন একটা সামঞ্জস্যের অনুভূতি মনের কোণে উঁকি দিল। গান-গল্প, হাসি-ঠাট্টা ও রাজনীতি-রসিকতার তরঙ্গে ওঠা-নামা ক'রতে ক'রতে এবং গাড়ির দোলনে দুলতে দুলতে বেশ কয়েকটা স্টেশন পেরিয়ে এলাম। রেলপথের দুদিকে নীচু ধানের জমি। কাছে-দূরে গ্রাম, নারকেল গাছের শ্যামল ছায়ায় ঢাকা। ধানের চারার সবুজ ঢেউয়ে ভেলভেটের মসৃণতা—বাউড়িয়ার পর থেকে বেশ কয়েক মাইল জুড়ে রেলপথের দক্ষিণে পড়ে-থাকা উদার গঙ্গার প্রসন্ন সান্নিধ্য—মিলের বাঁশির গমগমে আওয়াজ--স্টেশনে-স্টেশনে 'চা-গরম'-এর উদাত্ত আহ্বান এবং কবোষ্ণ সিঙাড়ার সঝাল আস্বাদ মন-প্রাণ ভরিয়ে তুললো। ঘণ্টা দুয়েক বাদে পৌঁছে গেলাম বাগনান স্টেশনে। বাগনানের গায়ে এখন শহরে হাওয়া লেগেছে। ফলে ঝটিতি পরিবর্তন ঘটে চলেছে তার চেহারার। স্কুল কলেজ, দোকান-পাট, ঘনবসতি—এমনকি টেলিগ্রাফ-টেলিফোন ইত্যাদি নিয়ে তার জমজমাট ভাবটা ট্রেনের মধ্যে বসেও বাইরে দৃষ্টি মেললে বেশ অনুভব করা যায়। পানিত্রাস এই বাগনান থানারই অন্তর্গত একটি গ্রাম। আমাদের কিন্তু নামতে হ'ল বাগনানের পরের স্টেশন দেউলটিতে। হাওড়া জেলার পশ্চিম প্রান্তের এটি শেষ রেল স্টেশন। নামটি ভারী মিষ্টি : দেউল-টি—অর্থাৎ দেবালয়টি বা মন্দিরটি। জানি না, এই নামকরণের সঙ্গে অর্থগত দিক থেকে বাস্তবের সত্যিই কোনদিন কোন সম্পর্ক ছিল কি না।

দেউলটি বেশ বড় স্টেশন। টিকিট-সংগ্রহকারীকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানতে পারলাম, আমাদের এখন উত্তরদিকে যেতে হবে মাইল দেড়েক। ওভার ব্রীজের সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা ক'রে স্টেশনের উত্তরদিকে যেখানে এসে দাঁড়ালাম সেখানে দেখলাম বাজার বসেছে রাস্তার দুধারে। তবে তেমন জমকালো নয়। বেশ কিছু সাইকেল-রিক্সাও দাঁড়িয়ে আছে। রিক্সাওলারা হাঁকছে—"পানিত্রাস যাবেন, বাবু—পানিত্রাস ?—মেল্লক যাবেন, বাবু ?"

আমরা তিনটি রিক্সায় দুজন ক'রে উঠে বসলাম। পরপর চলতে লাগলো রিক্সাগুলো। রাস্তার দুদিকে বেশ কিছু দোকান-পাট। বৈদ্যুতিক-আলোক বঞ্চিত নয় দেখলাম এই স্টেশন এলাকাটি। কিন্তু কিছু দূর এসেই হঠাৎ এই জম-জমাট ভাব শেষ। স্টেশন রোড এখানে এসে জাতীয় সড়ক বোম্বাই রোডে [এর আগের নাম ছিল কটক রোড] মিশেছে। মিশকালো ঝক্‌ঝকে বিশাল বপু এই অভিজাত সড়ক পূব-পশ্চিমে লম্বালম্বিভাবে ছুট লাগিয়েছে। আড়া-আড়িভাবে তাকে অতিক্রম করে উত্তরমুখো ছোট গড়ানে পাকা রাস্তা ধরে আমাদের রিক্সাগুলো এগিয়ে চললো। রাস্তাটার নাম শরৎচন্দ্র রোড। তার দুধারে মাঠের পর মাঠ। ঘর-বাড়ী প্রায়ই চোখে পড়ে না। কচি সবুজ ধানগাছগুলোর বুকের ওপর দস্যি ছেলের মতো বাতাস এসে ঝাঁপ খাচ্ছে। উজ্জ্বল আকাশের বুকে ভাসমান পেঁজাতুলো মেঘের রাশি। বিস্তৃত-উদার রঙীন মাঠের ওপর আলো-ছায়ার খেলা। বন্ধুদের মধ্যে একজন হঠাৎ ভরাট গলায় গান ধরলো :

"আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্র-ছায়ায়
লুকোচুরি খেলা রে ভাই, লুকোচুরি খেলা

নীল আকাশে কে ভাসালে
সাদা মেঘের ভেলা রে ভাই,
সাদা মেঘের ভেলা।"

এইভাবে পাকা রাস্তা ধরে মাইল খানেক রিক্সা বাঁদিকে ঘুরে উঁচু মাটির বাঁধের ওপর উঠলো। পাকা রাস্তার শেষ এখানেই। এইখান থেকেই যথার্থ গ্রাম আরম্ভ হয়েছে। মাঠের পর মাঠ একেবারে উধাও। গ্রামটার নাম জানলাম মেল্লক। সম্ভবতঃ 'মেলক' শব্দের পরিবর্তিত রূপ। 'মেলক'-এর অর্থ হ'ল একত্র সমাবেশ অথবা যে ঐক্য ঘটায়। অসমতল মাটির বাঁধের ওপর দিয়ে উত্তরমুখে রিক্সা নাচতে নাচতে চললো। বাঁধের ডাইনে ঘন বসতি। বাঁয়েও ঘর-বাড়ি কিছু আছে,—তবে পাতলা বুনোন, কারণ ঐদিকে বহতা নদী রূপনারায়ণের প্রবল দাপট। বাঁদিক পানে তাকালে গাছ-গাছালির ফাঁক দিয়ে রূপনারায়ণের রূপোর পাতের মতো ঝকমকে দেহটা চোখের তারায় ঝিলিক মারে।

মেল্লকের পর সামতা গ্রাম। নামটি চমৎকার। 'সমতা' থেকে এর জন্ম সম্ভব বলে মনে হয়। রাস্তার ডান ধারে শরৎচন্দ্রের স্মৃতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে 'সামতা শরৎচন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়'—এই অঞ্চলে একমাত্র মেয়েদের স্কুল। তারপর শ' দুয়েক হাত এগোলেই সামতা গ্রামের সীমা শেষ—পানিত্রাসের শুরু। পানিত্রাসের সীমানায় ঢুকে একটু এগিয়ে রিক্সাগুলো বাঁধের ওপরেই বাঁদিক ঘেঁষে একটা আশুত গাছের নীচে দাঁড়ালো। গাছটার তলা লাল সিমেন্টে বাঁধানো। নামতে হ'ল ওখানেই। ঐ গাছের গোড়া দিয়েই পশ্চিমে মাটির রাস্তা একটা নেমে গেছে। সে রাস্তায় দু'পা এগোলেই নদীর জল যাবার ছোট্ট একটি পুল। তারপরই রাস্তার বাঁদিকে একটি পুকুর এবং ডানদিকে রাঙচিতার বেড়া দিয়ে ঘেরা কারো বাস্তু-সীমানা। দৃষ্টি পশ্চিমে আর একটু ছড়ালেই কয়েকটি মাটির বাড়ী চোখে পড়ে। রিক্সাওলাদেরই একজন আমাদের সঙ্গে নিয়ে চললো। বাঁধ থেকে নেমে মিনিট খানেক হাঁটতে না হাঁটতেই আমরা উদ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে গেলাম। লালরঙ-করা ইঁটের প্রাচীরের গায়ে বসানো মস্ত বড় গেট আমাদের অভ্যর্থনা করলো। গেটের মাথা জুড়ে বোগানভেলিয়া এবং মাধবীলতা তাদের নয়ন-ভোলানো রূপ নিয়ে নিসর্গ-তোরণ রচনা করেছে। গেটের লোহার গরাদে একটা ধাতব প্লেটে লেখা আছে: 'শরৎ-স্মৃতি-মন্দির'। আমরা সবাই গেট ঠেলে ঢুকলাম।

ভেতরে অনেকখানি জায়গা জুড়ে বাগান। আম, পেয়ারা আর দোলনচাঁপার গাছ ছায়া ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কয়েক বছর আগে লাগানো বাহারে ঝাউ ও গোলাপগাছগুলো অযত্নে বর্ধিত। শুকনো পাতা, ভাঙ্গা ডাল-পালা আর আগাছা দেখলেই বোঝা যায় যে, বাগান-মার্জনার কাজ এখন নিয়মিত নয়। বাগানের মধ্যেই দোতলা একখানা বাড়ী। বেশ বড়। টালির চাল। ওপরে-নীচে দু'দিক জুড়ে বিস্তৃত বারান্দা। ঘরগুলো দক্ষিণমুখো। নীচের তলায় সিমেন্টে বাঁধানো বারান্দা আবার দুটো;—একটা উঁচু, অন্যটা নীচু। দুটো বারান্দাকে জুড়ে বাগান পর্যন্ত তরতরিয়ে পাকা সিঁড়ি নেমে এসেছে। সিঁড়িতে ওঠার মুখেই ডাইনে রয়েছে দুটো পেয়ারাগাছ। এই গাছ দুটোকে নিয়ে শরৎ-চন্দ্রের জীবনের অনেক গল্প জড়িয়ে আছে। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে গেলেই ডানদিকের নীচের বারান্দায় নজরে পড়বে কাঠের জাফরি-কাটা একটা পাখির ঘর। শরৎ-জীবনীতেও এর

উল্লেখ আছে। এখন একটা ছোট ময়ূর ঘরটার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে কেবল। আসল ঘরের দেওয়াল চুণকাম করা। প্রথম দৃষ্টিতে ধরা যায় না মাটির বাড়ী ব'লে।

আমরা দেওয়ালে হাত দিয়ে পরীক্ষা করছি এমন সময় একটি ছেলে এসে হাজির হ'ল। রিক্সাওলা তাকে ডেকে এনেছে। সেই এখন এই বাড়ীটা রক্ষণাবেক্ষণ করে। চাবি খুলে আমাদের অনেকগুলো ঘর দেখালো। শরৎ-চন্দ্রের ব্যবহৃত লাঠি, গড়গড়া, চেয়ার, টেবিল, রেডিও, বই ইত্যাদি দেখলাম। কয়েকটি আলমারিতে রুশ সাহিত্য কিছু আছে। তারপর আমরা এলাম পশ্চিমদিকের ছোট্ট একটি ঘরে। তার জান্‌লাগুলোয় ঘষা কাঁচ বসানো। শরৎচন্দ্র লিখতেন এই ঘরে বসে। ঘরটি সুন্দরভাবে সাজানো। লেখার সাজ-সরঞ্জাম সব তৈরী। দেখলেই মনে হবে, লেখক এইমাত্র যেন বাইরে গেছেন। ঘরটির পরিসর অল্প হ'লেও এর বৈশিষ্ট্য আছে। নিসর্গ-প্রকৃতি যেন তার রূপ-রস-গন্ধ নিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে এই ঘরটির জান্‌লায়-দরজায়। বিশেষ ক'রে পশ্চিমের জান্‌লার ফ্রেমে রূপনারায়ণের গোটা ছবি যেন বাঁধা। ভরা জোয়ারে তরঙ্গ-চঞ্চল রূপনারায়ণ যখন শরৎচন্দ্রের এই বাড়ীটির সীমানা ছুঁয়ে ছলো-ছলো উচ্ছলতার সঙ্গে ছুটে চলে—যখন রূপনারায়ণের আদিগন্ত বিস্তারে জল-মাটি-আকাশ একাকার হ'য়ে যায়, তখন এই বাড়ী ও বাগানকে যেন ভাসমান দ্বীপ বলে মনে হয়। এই বাড়ীতে থেকে এবং পশ্চিমের এই ঘরে বসেই শরৎচন্দ্র 'পল্লীসমাজ' লিখেছিলেন—লিখেছিলেন তাঁর শেষ জীবনের বেশ কয়েকখানি গ্রন্থ।

বাড়ীর ওপরের ঘরগুলো দেখতে পেলাম না। সেগুলো নাকি এখন অন্দর হিসেবে ব্যবহৃত হয়। শরৎচন্দ্রের এক ভাইপো মাঝে মাঝে এখানে এসে থাকেন শুনলাম। বছর চারেক আগে থাকতেন শরৎচন্দ্রের দ্বিতীয়া স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবী। তাঁর মৃত্যুর পর এই বাড়ী-ঘর সব দেখাশুনা করেন শরৎচন্দ্রের ভাইপো।

বাগান পেরিয়ে পশ্চিমের ছোট গেট দিয়ে বাইরে এলাম। সামনেই রূপনারায়ণ। এর পশ্চিম তীরের ঝাপ্‌সা গাছপালায় মেদিনীপুর জেলার সীমারেখা অস্পষ্ট। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি তার ডান দিকে বাগানের প্রাচীরের গা ঘেঁষে দুটি ছোট ছোট আকারের স্মৃতিস্তম্ভ ;—একটি শরৎচন্দ্রের, অন্যটি তাঁর ভাই স্বামী বেদানন্দের। হিরণ্ময়ী দেবীর স্মৃতি-স্তম্ভ এখনো নির্মিত না হ'লেও তাঁর জন্যে একটি স্থান নির্দিষ্ট আছে দেখলাম।

এখন দুপুর। শরৎ-স্মৃতি-মন্দির দেখা শেষ। কিন্তু মনে অনেক প্রশ্ন। উত্তর দেবার কেউ নেই—কোন ব্যবস্থা নেই। গোটা বাড়ীটা যেন কেমন এক অনাদরের নির্জনতায় ডুব দিয়েছে। অথচ এমন হওয়াটা বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ সাহিত্যিকদের বাসস্থান বা জন্মস্থান জাতির কাছে তীর্থক্ষেত্র বিশেষ। আসলে এই বাড়ীটি জাতীয় সম্পত্তি হিসেবে এখনো পরিগণিত না হওয়ার জন্যেই বোধ হয় এর গায়ে অনাদরের প্রলেপ পড়েছে। এই সব ভাবতে ভাবতে বড় গেট দিয়ে আবার বাইরে এলাম সবাই। সামনেই দেখি পাশাপাশি দুটো বড় পুকুর। বাঁধানো ঘাট তাদের। যাবার সময় পিছনে পড়েছিল বলে দৃষ্টি পড়েনি। সবাই মিলে পুকুর দুটোর মাঝের পাড় ধরে দক্ষিণ ধারে গেলাম। সেখানে নারকেল ও কলা গাছের ছায়ায় বসে তৈরী করে নিয়ে যাওয়া খাবার খেলাম সবাই। তারপর পুকুরের তর্‌তরে জল খেতে ঘাটে নামলাম। মুখে

দিয়েই দেখি—ইস্ কী নোন্‌তা! আসলে নদীর জল ঢোকে এই পুকুরে। ইতিমধ্যে আমাদের খাবারের টুকরো কিছু ঘাটে ফেলে দেওয়ায় দু-তিনটে লালচে রঙের বড় বড় মাছ এসে ঘুর ঘুর করতে লাগলো। ঘেটো রুই বোধ হয়! 'রামের সুমতি'র কার্ত্তিক-গণেশকে মনে প'ড়ে গেল।

গাছের ছায়ায় মুক্ত প্রকৃতির কোলে বিশ্রাম নিতে নিতেই দুপুর গড়িয়ে বিকেল হ'ল। এবার পানিত্রাস গ্রামটা একটু ঘুরে দেখার ইচ্ছেয় মাটির বাঁধে এসে উত্তরমুখে কয়েক কদম এগোতে না এগোতেই ব'জারে প'ড়লাম। না, শহরের মতো সমস্ত দিন এই বাজারে বিকি-কিনি হয় না। কেবল প্রতিদিন সকালেই এ জমে ওঠে। এখন শূন্য চালাগুলো বিশ্রাম নিচ্ছে। তবে মুদিখানা ও চায়ের দোকানগুলো পুরোমাত্রায় কর্তব্যরত। এখানে দেখার মতো কি আছে—এ কথা একজন দোকানীকে জিজ্ঞাসা ক'রতে তিনি ব'ললেন — "এগিয়ে যান আর একটু; স্কুল আছে, লাইব্রেরী আছে।" পায়ে পায়ে এগোলাম। বেশ ছিমছাম জায়গা। রাস্তার দুধারে দোকান কয়েকটি। তারপরই প্রকাণ্ড তিনতলা স্কুল-বাড়ী। নাম: 'পানিত্রাস হাই স্কুল'। পশ্চিম-মুখে স্কুলের সামনে বিরাট খেলার মাঠ। গ্রামাঞ্চলে এমন উন্মুক্ত পরিবেশে এত বড় ও এত সুন্দর স্কুল সচরাচর চোখে পড়ে না। মাঠে ফুটবল খেলছিল ছেলের দল।

উঁচু বাঁধ থেকে নেমে মাঠের দক্ষিণ প্রান্ত ধরে হাত পঞ্চাশেক আসতেই ডান দিকে লাইব্রেরী পেলাম। চমৎকার লাইব্রেরী। লাইব্রেরী ও স্কুলমাঠের সীমানায় দাঁড়ানো ঝাঁকড়া-মাথা তিনটে মেহগেনি গাছ সব কিছুরই শোভা বাড়িয়েছে। লাইব্রেরীটির নাম—'শরৎ-স্মৃতি-গ্রন্থাগার'। পাকা বাড়ী। বেশ লম্বা একটি ঘর। ঝকঝক্ তকতক্ করছে। আমরা সদলবলে ঢুকতেই গ্রন্থাগারিক আন্তরিকতার সঙ্গে অভ্যর্থনা ক'রলেন। চমৎকার যুবক—উৎসাহী ও কর্মঠ। তিনি সব কিছু ঘুরিয়ে দেখালেন; অনেক প্রশ্নের সাধ্যানুযায়ী জবাব দিলেন। দেখলাম লাইব্রেরীটি নিখুঁতভাবে সাজানো, পাঠকদের পড়ার জন্যে লম্বা টেবিল আছে। প্রতিদিন সকালেই খানচারেক দৈনিক পত্রিকা আসে। নামকরা সাপ্তাহিক এবং মাসিক পত্রিকারও অভাব নেই। বিকেল বেলাতেই দেখলাম ছোটবড় অনেকেই পড়াশোনা ক'রছেন। বইয়ের সংখ্যা হাজার পাঁচেক। একাধিক সুদৃশ্য কাঁচের আলমারিতে সুন্দরভাবে সব সাজানো। গ্রন্থাগারিক আমাদের শরৎচন্দ্রের লেখা চিঠিপত্রের কয়েকটি পাণ্ডুলিপি দেখালেন অধিকাংশ চিঠিই পানিত্রাসের পশ্চিম-পার্শ্ববর্তী গোবিন্দপুরগ্রামনিবাসী স্বর্গত পাঁচকড়ি মুখোপাধ্যায়কে লেখা। পাঁচকড়িবাবু শরৎচন্দ্রের দিদির শ্বশুরকুলের একজন। গোবিন্দপুরে ছিল শরৎচন্দ্রের দিদির শ্বশুরবাড়ী। তাই অনেকদিন থেকেই এই অঞ্চলের সঙ্গে শরৎচন্দ্র পরিচিত ছিলেন। তাঁর ভালো লেগেছিল এই জায়গাকে। রূপনারায়ণের কূলে ঘর বাঁধবার স্বপ্ন ও পরিকল্পনাকে তাঁর দিদি ও দিদির শ্বশুরকুলের কয়েকজনের সহায়তায় বাস্তবে রূপায়িত ক'রতে পেরেছিলেন তিনি; গড়ে তুলেছিলেন ঐ বাড়ীটি—আজ যার নাম শরৎ-স্মৃতি-মন্দির। শেষ জীবনটার বেশিরভাগ সময় শরৎচন্দ্র কাটিয়ে গেছেন এই পানিত্রাস গ্রামের বাড়ীতেই। 'পল্লীসমাজে'র অনেক চরিত্রই নাকি ভিন্ন নামে এতদঞ্চলে বর্তমান ছিল। গ্রামের অধিকাংশ মানুষের সঙ্গে

শরৎচন্দ্রের ছিল মধুর সম্পর্ক। অবশ্য সংকীর্ণ-মনা সমাজপতিদের চক্রান্তে একবার তাঁকে একঘরেও হ'তে হ'য়েছিল। নিম্নশ্রেণীর মানুষদের তিনি ছিলেন 'দাঠাকুর'—তাদের বিপদ-আপদের আশ্রয়স্থল। এই সমস্ত তথ্য আমরা প্রায় সত্তর বছর বয়স্ক এক বৃদ্ধের কাছ থেকে সংগ্রহ ক'রলাম। তিনি লাইব্রেরীতে বসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কাগজ প'ড়ছিলেন। এই বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাঁর যৌবনকালে শরৎচন্দ্রের স্নেহ-সাহচর্যলাভে নাকি ধন্য হ'য়েছিলেন।

গ্রন্থাগারিকের কাছ থেকে জানলাম, শরৎস্মৃতি-গ্রন্থাগারের বয়স মাত্র বছর বারো। কয়েকজন গ্রাম্য যুবকের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় শরৎচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার্থে এই গ্রন্থাগার ১৯৫৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল। তারপর ক্রমশঃ সরকারী আনুকূল্য লাভ ক'রে এখন এটি 'রুর‍্যাল লাইব্রেরী'তে রূপ পেয়েছে। এর উন্নতির মূলে শরৎচন্দ্রের পত্নী হিরণ্ময়ী দেবীর দান আছে অনেক। এই অঞ্চলে তিনি 'বড় মা' নামে পরিচিত ছিলেন। এই গ্রন্থাগার-সংলগ্ন একটি বিভাগের প্রতিও গ্রন্থাগারিক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রলেন। সেটি শরৎস্মৃতি-সংগ্রহশালা। একটি মিউজিয়াম গড়ার কাজে কয়েকজন উৎসাহী যুবক এগিয়ে এসেছিলেন। কাজও ক'রেছিলেন প্রচুর। বহু পুঁথি, টেরাকোটা, পুতুল, মূর্তি, শরৎচন্দ্রের ব্যবহৃত সামগ্রী ইত্যাদি সংগ্রহের মধ্যেই তার প্রমাণ আছে। কিন্তু সরকারী সাহায্য উপযুক্ত না পাওয়ায় সে উৎসাহে ভাঁটা পড়েছে। কিন্তু হাল এখনো ছাড়েননি গ্রন্থাগারের কর্মীরা। জিজ্ঞাসা করে জানলাম, এই অঞ্চলে শিক্ষিতের সংখ্যা অনেক। বর্ধিষ্ণু গ্রাম পানিত্রাস। এখানকার অধিকাংশ মানুষই চাকরিজীবী। কলকাতার সঙ্গে তাঁদের নিত্য সম্পর্ক। ফলে নগর সভ্যতার আলোকচ্ছটায় এই অঞ্চলের গ্রামীণ মানুষেরা উদ্দীপ্ত। গ্রাম্য সরলতার সঙ্গে নাগরিক সপ্রতিভতার মণি-কাঞ্চন যোগ ঘটছে ক্রমশঃ এখানকার মানব-চরিত্রে। এঁরা আর অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের অন্ধকারে ডুবে নেই। তাই শরৎচন্দ্রের তিরোধানেরও বহু পরে তাঁর স্মৃতি-পূজার জন্যে আজ এমনভাবে পানিত্রাস ও তার পাশাপাশি জায়গার মানুষ জেগে উঠেছে।

সারাদিন শরৎতীর্থ পানিত্রাসে ঘুরে পরিতৃপ্ত চিত্তে সন্ধ্যের সময় আবার আমরা দেউলটি স্টেশনে এসে পৌছলাম। কী আশ্চর্য! প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হাওড়া-গামী একটি বৈদ্যুতিক ট্রেন এসে হাজির; এবং তারপর শান্তি ও স্থৈর্যের গ্রাম-জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে বাস্তুতা-পীড়িত আমাদের মতো শহুরে মানুষগুলোকে সে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বহন করে এনে বেগবান ও জটিল ক'লকাতা শহরের বুকে আছড়ে দিল।

সমালোচনা

ভারতী নিবেদিতা: মালতী গুহ রায়। **প্রকাশক:** বাক্‌সাহিত্য, ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা ৯। পৃষ্ঠা ২১৬; মূল্য ৬·৫০ টাকা।।

ভগিনী নিবেদিতার জন্ম-শতবর্ষ-জয়ন্তী উপলক্ষে তাঁর জীবন ও সাধনা সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করবার একটি স্বর্ণসুযোগ উপস্থিত হয়েছে। ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গীণ অগ্রগতির স্থির ও শুভ পন্থার একটি সার্থক দিগ্‌দর্শন নিবেদিতা রেখে গেছেন তাঁর জীবন ও রচনাবলীতে। তাঁর জীবনের অনুস্মরণ ও কৃতির অনুধ্যান জাতিগঠনের মহান উপাদান। নিবেদিতা সম্বন্ধে আমরা যে পুনরায় চিন্তা করতে আরম্ভ করছি তার প্রমাণ—কিছুদিনের মধ্যে তাঁর বেশ কয়েকটি জীবনী প্রকাশিত হয়েছে। ইহাদের মধ্যে 'ভারতী নিবেদিতা' একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর আশীর্বাণী এবং প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীপ্রমথ বিশীর ভূমিকা বইটির একটি বিশিষ্ট সম্পদ।

লেখিকা ভগিনীর জীবনের মূল ঘটনাবলী সাল তারিখ ও ফুটনোটের দ্বারা কণ্টকিত না করে যথাসাধ্য সাবলীল ভাষায় ব্যক্ত করবার প্রয়াস করেছেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা অধিক সফল হোত যদি তিনি শব্দচয়নে, পদবিন্যাসে ও ভাবের আনুগত্যে আর একটু সাবধান হতেন। তথ্য সম্বন্ধেও ঐ একই মন্তব্য প্রযোজ্য। এ বিষয়ে অনেকগুলি ভুলের মধ্যে কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য: 'ব্রহ্মবাদিন' 'কলকাতায়' কখনও প্রকাশিত হয়নি (পৃ: ৬২), মাদ্রাজ থেকে হয়েছে; 'ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব সর্বদাই বলতেন, ভারতীয় চিন্তাধারা ভারতীয় দৈনন্দিন জীবনের সহস্র খুঁটিনাটির উপর প্রতিষ্ঠিত' (পৃ: ৭৮)। শ্রীরামকৃষ্ণের এই উক্তিটি লেখিকার কি কল্পনাপ্রসূত? 'নিবেদিতা জড়বাদী ক্যাথলিক' (পৃ: ৯০); নিবেদিতা কোন সময়েই জড়বাদী এবং ক্যাথলিক ছিলেন না। লেখিকার এই উক্তি অত্যন্ত অসঙ্গত। কেশব সেনের সহিত নিবেদিতার পরিচয় হওয়া অসম্ভব (পৃ: ২২৪), কারণ নিবেদিতার ভারতবর্ষে আসার বহু পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয়। 'ত্যাগ, ভোগ স্বামীজীর কাছে সবই সমান' (পৃ: ১৪০)। স্বামীজী সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য অত্যন্ত অশোভনীয়। 'ক্রপটকীনকে নিবেদিতা অনেক-কাল আগেই গুরুরূপে বরণ করে নিয়েছিলেন' (পৃ: ১৭৬); নিবেদিতার জীবনে স্বামীজীই তাঁর একমাত্র গুরু ছিলেন। 'যে জন সেবিছে জীব, সেবিছে ঈশ্বর, এই যে স্বামীজীর উদার বাণী' (পৃ: ১৮৩)। এই বাণী এখন এত বেশী প্রচলিত যে, লেখিকার উচিত ছিল স্বামীজীর ঠিক বাণীটি উদ্ধৃত করা—"জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।" '*Civic & National* বইখানা' (পৃ: ১৯১)। বইটির নাম '*Civic & National Ideals*'. মিশনে খানাতল্লাসীর খবরও (পৃ: ১৯৯) আমাদের জানা নেই। '*Hints on Education*' (পৃ: ২১১) বইটির নাম '*Hints on National Education in India*'. 'অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সতীশভূষণ রায় চৌধুরী' (২২৩ পৃ:); তাঁর প্রকৃত নাম শশিভূষণ রায়-চৌধুরী এবং তিনি প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কিনা বলা কঠিন। তবে এই প্রতিষ্ঠানের আদি

সভ্যদের মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন। সুতরাং 'এই দুই সমিতিরই দুই সতীশই' (পৃঃ ঐ) ভুল।

'গণেন মহারাজ ভগিনীর শেষকৃত্য হিন্দু সন্ন্যাসীর নিষ্ঠায় স্বহস্তে করলেন' (১৭১ পৃঃ)। গণেন মহারাজ সন্ন্যাসী ছিলেন না বলেই শেষকৃত্য করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।

ভুলত্রুটি সত্তেও নিবেদিতার জীবনালেখ্য অঙ্কনে লেখিকার বলিষ্ঠ প্রয়াসকে আমরা অভিনন্দন জানাই। "নিবেদিতার মহত্ত্ব, তাঁর তেজস্বিতা, তাঁর আত্মবলিদানের অসীম ক্ষমতা ও আপনহারা প্রেমের কথা যতই ছড়াবে, দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল। তাঁর কোমলতা, তাঁর ধৈর্য, প্রেম, দয়া, দান, উদারতা, সত্যনিষ্ঠা ও অনলস কর্মক্ষমতার যত বেশী প্রচার হবে, দেশের হাওয়া ততই পরিশুদ্ধ হবে (পৃ ২৭৫)।" লেখিকার এই আশা ও বিশ্বাসের সহিত আমরা সম্পূর্ণ একমত।

—আনন্দ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (শ্রীশ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিত-'গীতাভূষণ'-ভাষ্য-সমেতা) — ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্‌ভক্তিশ্রীরূপ সিদ্ধান্তী গোস্বামী মহারাজ কর্তৃক সম্পাদিত। প্রকাশক: শ্রীসতীপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, ২৯বি হাজরা রোড, কলিকাতা ২৯। তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ, মোট পৃষ্ঠা—১৪০০+১১০ (খণ্ডত্রয়ের ভূমিকা, প্রবেশিকা ইত্যাদি)। মূল্য (বোর্ড বাঁধাই) —২৭৲, প্রতিখণ্ড—৯৲।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ, সার্বভৌম ও জনপ্রিয় ধর্মগ্রন্থ। বহু ভাষায় এই গ্রন্থের অনুবাদ হইয়াছে। বহু তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষ ইহার ভাষ্য ও টীকা রচনা করিয়াছেন। গীতামাহাত্ম্যে ভগবান শ্রীবিষ্ণু স্বয়ং বলিয়াছেন:

'গীতাশ্রয়েঽহং তিষ্ঠামি গীতা মে চোত্তমং গৃহম্।
গীতাজ্ঞানমুপাশ্রিত্য ত্রীন্ লোকান্ পালয়াম্যহম্॥'

—'আমি গীতার আশ্রয়ে অবস্থান করি এবং গীতা আমার উত্তম গৃহ। গীতাজ্ঞান আশ্রয় করিয়া আমি ত্রিলোক পালন করি।'

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন: "দশবার 'গীতা গীতা' বললে যা হয় তা-ই গীতার সার। অর্থাৎ 'ত্যাগী'। হে জীব, সব ত্যাগ ক'রে ঈশ্বরের আরাধনা কর।"

গীতা-সম্বন্ধে যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি: 'উপনিষদ্ হইতে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের কুসুমরাজি চয়ন করিয়া গীতারূপ এই সুদৃশ্য মালা গ্রথিত হইয়াছে।'

সনাতন হিন্দুধর্মে দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত চিন্তাধারা বিদ্যমান। অদ্বৈত-মতে ব্রহ্ম নিরাকার, নির্বিশেষ, নির্গুণ। তিনিই নিত্য, সত্য, সনাতন; আর জগৎ অনিত্য, ইহার পারমার্থিক সত্তা নাই। জ্ঞানই মুক্তির উপায়-স্বরূপ। জ্ঞান হইলে জীব ব্রহ্মে লীন হন। দ্বৈত-মতে জগৎ মিথ্যা নয়, ইহা ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট এবং জগৎ তাঁহার লীলাক্ষেত্র। ভক্তিই মুক্তিলাভের উপায়-স্বরূপ। অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈত মতানুযায়ী গীতার ভাষ্য ও টীকা আছে।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন:

'যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং
শ্রেয়োবিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি
কুত্রচিৎ॥
নির্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্মসু।
তেষ্বনির্বিণ্ণচিত্তানাং কর্মযোগস্তু কামিনাম্॥
যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।

ন নির্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য
সিদ্ধিদঃ॥' ১১।২০।৬-৮

—'মনুষ্যগণের মঙ্গলবিধানের ইচ্ছায় আমি জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি—এই তিনটি যোগ উপদেশ করিয়াছি, ইহা ছাড়া অন্য কোন উপায় বর্ণিত হয় নাই। এই তিনটি যোগের মধ্যে বিষয়ে অনাসক্ত সন্ন্যাসিগণের পক্ষে জ্ঞানযোগ, কর্মফলে আসক্ত সকাম ব্যক্তিগণের পক্ষে কর্মযোগ এবং যিনি ভাগ্যক্রমে আমার কথায় শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়াছেন এবং বিষয়ে যাঁহার অতিশয় বৈরাগ্য ও অত্যাসক্তি নাই, তাঁহার পক্ষে ভক্তিযোগ সিদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে।'

গীতায় এই তিনটি যোগ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।

গীতাভাষ্যগুলির মধ্যে অদ্বৈত-মতানুযায়ী শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্যের ভাষ্য, বিশিষ্টাদ্বৈত-মতানুযায়ী শ্রীশ্রীরামানুজাচার্যের ভাষ্য এবং দ্বৈতমতানুযায়ী শ্রীশ্রীমধ্বাচার্যের ভাষ্য বহুলপ্রচারিত। শুদ্ধাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত মতানুযায়ী ভাষ্যগুলিও বিদ্বজ্জনসমাজে সমাদৃত হইয়া থাকে।

গৌড়ীয়গণের বেদান্তাচার্য শ্রীমদ্‌বলদেব বিদ্যাভূষণ অষ্টাদশ-অধ্যায়যুক্ত গীতা-শাস্ত্রকে তিন ষট্‌কে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম ষট্‌ক প্রথম অধ্যায় হইতে ষষ্ঠ অধ্যায় পর্যন্ত, দ্বিতীয় ষট্‌ক সপ্তম অধ্যায় হইতে দ্বাদশ অধ্যায় পর্যন্ত এবং তৃতীয় ষট্‌ক ত্রয়োদশ অধ্যায় হইতে অষ্টাদশ অধ্যায় পর্যন্ত। প্রথম ষট্‌কে (প্রথম খণ্ডে) নিষ্কাম কর্মযোগ এবং জীবের স্বরূপ ও ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায়ভূত সাধন, দ্বিতীয় ষট্‌কে (দ্বিতীয় খণ্ডে) ভক্তিযোগ, উপাস্যতত্ত্ব, শ্রীভগবানের স্বরূপ ও তৎপ্রাপ্তির উপায় এবং তৃতীয় ষট্‌কে (তৃতীয় খণ্ডে) ভক্তিমূলক জ্ঞানযোগ প্রধান-ভাবে বিবৃত।

এই গ্রন্থে মূল শ্লোক ও বাংলা প্রতিশব্দ, শ্লোকানুবাদ, শ্রীভক্তিবিনোদকৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক প্রাঞ্জল ও বিশদ ভাষা-ভাষ্য, আচার্য শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণের 'গীতাভূষণ' নামক তাত্ত্বিক বিচারপূর্ণ ভাষ্য ও ইহার প্রাঞ্জল অনুবাদ এবং সম্পাদক কর্তৃক 'অনুভূষণ' নামক সুচিন্তিত টীকা প্রদত্ত হইয়াছে। এই গীতা গ্রন্থ গৌড়ীয় ভক্তগণের নিকট তথা পণ্ডিতসমাজে পরম আদরের বস্তুরূপে গৃহীত হইবে সন্দেহ নাই।

কাগজ, ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর।

ঋষিকল্প গোবিন্দপ্রসাদ—শ্রীনৃপেন আকুলি। প্রকাশক: শ্রীশিশুরাম মণ্ডল, অমরকানন শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাদল, পোঃ—অমর-কানন, জেলা—বাঁকুড়া। পৃষ্ঠা ৯৪; মূল্য ২৲।

শ্রীশ্রীমায়ের কৃপাপ্রাপ্ত বাঁকুড়ার প্রসিদ্ধ জন-নেতা গোবিন্দপ্রসাদ সিংহ ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবে অনুপ্রাণিত। তাঁহার কর্মজীবনের অন্তরালে ধর্মজীবন ছিল বলিয়াই তাঁহার কর্মে যুগপৎ ধৈর্য, দক্ষতা, সাহস ও সহিষ্ণুতা পরিলক্ষিত হইত, তাঁহার সমগ্র জীবনে কোথাও আত্মপ্রচার ছিল না। সহজ সরল ভাষায় প্রকাশিত একজন খাঁটি দেশসেবক ও অনলস কর্মীর অনবদ্য জীবনকাহিনী পাঠ করিলে জনসাধারণ বিশেষ করিয়া যুবসমাজ উপকৃত হইবেন, সন্দেহ নাই। লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি ও সাহিত্যিক শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় পুস্তক-খানির মনোজ্ঞ ভূমিকা লিখিয়া দিয়া ইহার শোভা বর্ধন করিয়াছেন।

বৈরাগ্যমেবাভয়ম্ (পিঙ্গলা-উপাখ্যানম্) —ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার। প্রকাশক: বন্ধুদাস, ৩, অন্নদা নিয়োগী লেন, কলিকাতা ৩। পৃষ্ঠা ৬৪, মূল্য ৫০ পয়সা।

বিষয়ভোগে রোগাক্রান্ত হইবার ভয়, সৎকুলে

জাত ব্যক্তির প্রতিষ্ঠাচ্যুতির ভয়, ধনসঞ্চয়ে রাজার নিকট হইতে ভয়, মানে অপমানের ভয়, বলে শত্রুভয়, রূপে বার্ধক্যের ভয়, শাস্ত্রপাণ্ডিত্যে পরাভবের ভয়, গুণে নিন্দাভয়, দেহে সদা মৃত্যু-ভয় বিদ্যমান। সংসারে সকল বস্তুই ভয়গ্রস্ত, একমাত্র বৈরাগ্যই ভয়শূন্য।

আলোচ্য পুস্তকখানিতে বর্ণিত পিঙ্গলা-উপাখ্যানটি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও উদ্ধবের তত্ত্ববিষয়ক কথোপকথন হইতে গৃহীত। ভাগবতের মূল শ্লোকগুলি (১১।৮-২২।৪৪) অন্বয়, বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা সহ সুন্দর-ভাবে উপস্থাপিত হইয়াছে। এই অনিত্য সংসারে মানুষের মন যাহাতে ঈশ্বরের প্রতি আকৃষ্ট হয়, যাহাতে অল্প সুখ ছাড়িয়া পরম সুখলাভে আগ্রহান্বিত হয়, প্রত্যেকটি শ্লোকের 'অনুধ্যান' নামক ভাষ্যে তাহা পরিস্ফুট করিবার আন্তরিকতা দৃষ্ট হয়।

সর্বদা সঙ্গে রাখিবার উপযোগী পকেট-সাইজ পুস্তকখানি ভক্তসমাজে সমাদৃত হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

মন্ত্রার্থ-দীপিকা—স্বামী ওঁকারেশ্বরানন্দ। প্রকাশক: শ্রীমানিকলাল মুখোপাধ্যায়, ২৮ রানী হর্ষমুখী রোড, কলিকাতা ২। পৃষ্ঠা ১৫১ + ১৬; মূল্য পাঁচ টাকা।

'মননাৎ ত্রায়তে যস্মাৎ তস্মান্মন্ত্রঃ প্রকীর্তিতঃ।' মননের অদ্ভুত শক্তি ও অমিত প্রভাব প্রাচীন ঋষিগণের জীবনে অনুভূত হইয়াছিল। তাঁহারা ছিলেন মন্ত্রদ্রষ্টা। ভারতীয় ধর্মচর্যার ক্ষেত্রে মন্ত্রের প্রভাব অনস্বীকার্য। এখনো মন্ত্র-অনুধ্যান সহকারে যাঁহারা পূজাদি অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা মন্ত্রশক্তি অনুভব করেন। জপ, যজ্ঞ, পূজা প্রভৃতি ধর্মকার্যে যে-সব সংস্কৃত মন্ত্র পঠিত হয়, সেগুলির অর্থ গভীর, ব্যাপক ও হৃদয়গ্রাহী।

নিত্য ও নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপে ব্যবহৃত অতি-প্রচলিত মন্ত্রসমূহের গূঢ়ার্থ লিপিবদ্ধ করিয়া 'মন্ত্রার্থ-দীপিকা'-প্রকাশ অভিনন্দনযোগ্য। মন্ত্রগুলির বঙ্গানুবাদ প্রাঞ্জল। পৃথকভাবে শব্দার্থযুক্ত অন্বয় প্রদত্ত হওয়ায় অর্থবোধ সুখসাধ্য হইয়াছে এবং ভাবার্থপ্রকাশ দ্বারা তাৎপর্য স্পষ্টীকৃত করা হইয়াছে। ধর্মকার্যে প্রয়োজনীয় বেদোক্ত ও তন্ত্রোক্ত উভয়বিধ মন্ত্রই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বৃহন্নন্দিকেশ্বর-পুরাণোক্ত শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার সানুবাদ মন্ত্রগুলি পুস্তকখানিকে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামী গ্রন্থখানির পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। আমরা আশা করি 'মন্ত্রার্থ-দীপিকা' জনসমাজে যোগ্য সমাদর লাভ করিবে এবং বহুলপ্রচারিত হইবে।

খেয়াল খাতা—শ্রীরাজেন্দ্রকুমার মিত্র। প্রকাশক: শ্রীরবীন্দ্রকুমার মিত্র, আর. কে. পাব্লিশিং কোং, ১ গোকুল মিত্র লেন, মদন-মোহনতলা, কলিকাতা ৩। পৃষ্ঠা ১৬০; মূল্য চার টাকা।

'খেয়াল খাতা' গ্রন্থখানিতে বিশ্বকবি রবীন্দ্র-নাথ এবং শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংকলিত হইয়াছে। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীতে নূতনত্বের ছাপ আছে; প্রসঙ্গক্রমে বিখ্যাত সাহিত্যিকদের অনেক কথাই তিনি সুন্দরভাবে আলোচনা করিয়াছেন। পুস্তকখানিতে একটি সূচীপত্রের অভাব রহিয়াছে; পরবর্তী সংস্করণে বিষয়ানুসারে পরিচ্ছেদগুলি সুবিন্যস্ত হওয়াও প্রয়োজন।

আবেদন

জলপাইগুড়ি জেলার বন্যাপীড়িত অঞ্চলে রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য

বন্যাবিধ্বস্ত জলপাইগুড়ি শহরের আশ্রমপাড়া, পিলখানা, নয়া বস্তী, রেসকোর্স ও নেপালী বস্তী অঞ্চলে এবং শহরের ১৪ মাইল দূরবর্তী মণ্ডলঘাট এলাকায় ১৫,০০০ দুঃস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে রামকৃষ্ণ মিশনের ত্রাণকার্য বিপর্যয়ের অব্যবহিত পরেই আরম্ভ হইয়া বিস্তৃততর অঞ্চলে প্রসারিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে মণ্ডলঘাট অঞ্চলটিই সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত; মণ্ডলঘাটকে কেন্দ্র করিয়া নন্দনপুর গ্রামসভা, বাঁশকষ্ঠিয়া, আরজী গোয়ালবাড়ী, কচুয়া প্রভৃতি অঞ্চলে সেবাকার্য চলিতেছে। এই সব এলাকার বিপন্ন নরনারীদের দুরবস্থা অবর্ণনীয়; খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে উপযুক্ত পথ্যাদি ও চিকিৎসার প্রয়োজন মিটাইতে প্রচুর লোকবল ও অর্থ আবশ্যক। মিশনের তরফ হইতে ইতোমধ্যেই প্রায় ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা এই উপলক্ষে ব্যয়িত হইয়াছে। সহৃদয় জনসাধারণের নিকট এই সেবাকার্যে মুক্তহস্তে সাহায্যের জন্য আবেদন জানাইতেছি। সর্ববিধ সাহায্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে; প্রতিটি সাহায্যই কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে। চেক 'রামকৃষ্ণ মিশন' (**RAMAKRISHNA MISSION**) এই নামে লিখিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা :

১। রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা হাওড়া

২। অদ্বৈত আশ্রম, ৫ ডিহি এণ্টালী রোড, কলিকাতা ১৪

৩। উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৩

৪। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্ক, কলিকাতা ২৯

৫। রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পোঃ জলপাইগুড়ি

স্বামী গম্ভীরানন্দ
সাধারণ সম্পাদক
রামকৃষ্ণ মিশন

বেলুড় মঠ, হাওড়া,
১৬ই নভেম্বর, ১৯৬৮

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ শতবর্ষ জয়ন্তী

গত ১৭ই কার্তিক, ৩রা নভেম্বর রবিবার পূর্বাহ্ণ নয় ঘটিকায় খড়দহ 'মহেশপুরী'তে **শ্রীরামকৃষ্ণ-বিজ্ঞানানন্দ বোধচক্রের** সদস্য ও ভক্তগণ কর্তৃক গঠিত কমিটি দ্বারা পরিচালিত অষ্টাহব্যাপী স্বামী বিজ্ঞানানন্দ শতবর্ষ জয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী গম্ভীরানন্দ মহারাজ। ব্রহ্মচারী জ্ঞানচৈতন্য কর্তৃক শান্তিবাচনের পর উদ্বোধন-সঙ্গীত পরিবেশিত হয়।

শ্রীবলরাম ধর্মসোপানের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযতীন্দ্ররামানুজাচার্য প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় শতবর্ষ জয়ন্তী উপলক্ষে 'মহেশপুরী'র দ্বিতলে নবনির্মিত 'বিজ্ঞান মণ্ডপের দ্বার উদ্ঘাটন করেন; ১০১টি প্রদীপ প্রজ্বালিত করিয়া পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি মাননীয় ফণিভূষণ চক্রবর্তী মহাশয় পরমারাধ্য স্বামী বিজ্ঞাননানন্দজীর বিভিন্ন সময়ে গৃহীত আলোকচিত্র-সমূহের আবরণ উন্মোচন করেন। বহু সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্ত এবং ধর্মপিপাসু সজ্জনগণ এই পুণ্যানুষ্ঠানে যোগদান করেন।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য মাননীয় অতিথিবৃন্দকে সাদর অভ্যর্থনা জানান এবং সভান্তে অধ্যাপক ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী সমবেত জনগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

অষ্টাহব্যাপী উৎসবে সমাগত ভক্তবৃন্দকে প্রত্যহই হাতে হাতে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। ১০ই নভেম্বর উৎসবের শেষ দিনে সকলকে বসাইয়া খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। অপরাহ্ণে সম্মিলিত ভক্তসভায় স্বামী পুণ্যানন্দ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের স্মৃতিকথা আলোচনা করেন।

সর্বশেষে সন্ধ্যার পর শ্রীরামকৃষ্ণ-গীতি-আলেখ্য-পরিবেশনান্তে উৎসবের সমাপ্তি হয়।

শ্রীশ্রীতারকনাথজীউ ও অন্নপূর্ণাদেবীর ঠাকুরবাড়ীতে (২৬বি, বদ্রীদাস টেম্পল ষ্ট্রীট, কলিকাতা) শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের জন্ম-শতবর্ষ-পূর্তি উপলক্ষে গত ২৮শে অক্টোবর হইতে ৩রা নভেম্বর পর্যন্ত সপ্তাহব্যাপী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এতদুপলক্ষে বিশেষ-পূজা-পাঠাদি, লীলাকীর্তন, সৎপ্রসঙ্গ, ধর্মসভা, শোভাযাত্রাসহ নগরসংকীর্তন, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি সম্পন্ন হয়। জয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধন করেন স্বামী বীতশোকানন্দ। বিভিন্ন দিনের ধর্মসভায় বক্তৃতাদান ও ধর্মপ্রসঙ্গ করেন স্বামী দেবানন্দ, স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ, স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ, স্বামী তীর্থানন্দ, প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা, প্রব্রাজিকা অমৃতপ্রাণা, অধ্যাপক পাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাগীতি, কালীকীর্তন, লীলাকীর্তন, চণ্ডীর গান এবং ভক্তিমূলক গীতিমাল্য সমাগত ভক্তমণ্ডলীর আনন্দবর্ধন করে।

নিবেদিতা শতাব্দী জয়ন্তী

রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল কর্তৃক গত ২৭শে ও ২৮শে অক্টোবর নিবেদিতা শতাব্দী জয়ন্তীর সমাপ্তি-উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে উভয় দিনই নিবোদতা বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে দুইটি সভা আয়োজিত হয়।

২৭শে তারিখের সভাটি সম্পূর্ণরূপে ছাত্রীগণই পরিচালনা করে। এই দিন সহস্রাধিক ছাত্রী প্রসাদ গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্ত হয়। এই দিনই ভারতের ডাক বিভাগ নিবেদিতার স্মারক ডাক-টিকিটের শুভ উদ্বোধন করেন এই বিদ্যালয়-ভবনে। প্রথম ডাক-টিকিট গ্রহণ করেন শ্রীসারদা মঠের অধ্যক্ষা প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণা।

২৮শে অক্টোবর (ভগিনী নিবেদিতার শুভজন্মদিনে) বিকালে মহাজাতি সদনে আয়োজিত সভায় পৌরোহিত্য করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী গম্ভীরানন্দজী। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সত্যেন সেন। বক্তারূপে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য, প্রব্রাজিকা বেদপ্রাণা, অধ্যাপক হরিপদ ভারতী।

প্রধান অতিথির ভাষণে ডঃ সেন বলেন, ভারতের পুনর্জাগরণ ঘটাইতে তিনটি ক্ষেত্রে নিবেদিতার অবদান চিরস্মরণীয়—শিক্ষা, স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও বিজ্ঞান-সাধনা। ভারতের স্ত্রী-শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি যে বীজ বপন করিয়া যান তাহাই আজ বিরাট মহীরুহে পরিণত হইয়াছে। ভারতবাসীর মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগাইতে তাঁহার সাধনা ছিল অক্লান্ত।

সভাপতির ভাষণে স্বামী গম্ভীরানন্দজী বলেন, নিবেদিতা ছিলেন ত্যাগ ও সেবার মূর্ত প্রতীক —এই ত্যাগ ও সেবার ভিত্তি ছিল আধ্যাত্মিকতা। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতীয়তার পুনরুজ্জীবনে প্রেরণাদাত্রী ছিলেন নিবেদিতা, যিনি বিদেশিনী হইয়াও ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি ফিরাইয়াছেন। নিবেদিতার সেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইবার জন্য তিনি দেশবাসীকে আহ্বান জানান।

অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া দেখান, ভারতীয় সংস্কৃতির স্বরূপ উদ্ঘাটনে নিবেদিতার অবদান কত গভীর ; আমাদের পূজা-পার্বণ, জীবন-চর্যার প্রতি নিবেদিতার গভীর অনুরাগ, সেগুলির মূল সত্যকে আবিষ্কার ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিবার পরমাশ্চর্য ক্ষমতার স্বাক্ষর রহিয়াছে নিবেদিতার রচনায় ; আজ তাঁহার রচনাবলী পাঠ ও অনুধ্যান করিবার সময় আসিয়াছে।

প্রব্রাজিকা বেদপ্রাণা বলেন, যোদ্ধরূপ ও মাতৃরূপের অপূর্ব সমাবেশ ঘটিয়াছিল মহীয়সী নিবেদিতার মধ্যে। স্বামীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ভারতমাতার সেবায় তিনি নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

অধ্যাপক হরিপদ ভারতী বলেন, নিবেদিতা ছিলেন স্বামীজীর মানসদুহিতা। স্বামীজীর আদর্শ ও কর্মে উদ্বোধিত হইয়া ভারত-সেবার ব্রত তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিবেদিতা বলিয়াছেন, জগতের যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ ভাব তাহার জন্মদাত্রী ভারত, অথচ বর্তমানে আমরা তাহা ভুলিয়া গিয়া বিদেশী ভাবের ক্রীতদাসত্ব করিতেছি, ইহা লজ্জার কথা।

বিদ্যালয়ের সম্পাদিকা প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা সকলকে ধন্যবাদ জানান।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য

পশ্চিমবঙ্গে বন্যার্তসেবা :

(১) মেদিনীপুর জেলায় সবং, নন্দীগ্রাম, ভগবানপুর ও ময়না থানার ১২টি অঞ্চলে গত ২২ শে সেপ্টেম্বর হইতে ২৭ শে অক্টোবর পর্যন্ত রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক ৫৪,৫৯১ কেজি চাল ২,৭৯,৮৬৮ কেজি গম ও ২৬,৭৯৬ কেজি আটা বিতরণ করা হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত বন্যার্তদের সংখ্যা—৩৯,৬৬০।

(২) জলপাইগুড়িতে প্রলয়ঙ্কর বন্যার পর হইতেই রামকৃষ্ণ মিশন যে ত্রাণকার্য চালাইয়া যাইতেছেন, সে সম্পর্কে সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী শহরের ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের নয়াবস্তী, আশ্রমপাড়া, খাট্টালাইন, নিউ খাট্টা-লাইন, কাইয়ালাইন, পিলখানা কলোনী, পিলখানা টিকিয়াপাড়া ও রেসকোর্স এলাকায় এবং শহরের বাহিরে ১৪ মাইল দূরবর্তী মণ্ডলঘাটকে কেন্দ্র করিয়া নন্দনপুর গ্রাম-সভা, বাঁশকণ্ঠিয়া, আরজী গোবালবাড়ী, কচুয়া ও রোয়ালমারিতে সাহায্য দেওয়া হইতেছে। বন্যার অব্যবহিত পরেই স্বেচ্ছা-সেবকদের সাহায্যে ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত গবাদি-পশুর মৃতদেহ-অপসারণ হইতে শুরু করিয়া খাদ্য, বস্ত্র, কম্বল, শিশু ও রোগীদের জন্য গুঁড়াদুধ এবং ঔষধপত্র বিতরণ করিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বন্যার্তদের সেবা করিয়া চলিয়াছেন। প্রায় ১০,৮০০ ব্যক্তিকে নিয়মিত চাল, আটা, ডাল, লবণ ইত্যাদি দেওয়া হইতেছে। মিশনের মূলকেন্দ্র বেলুড় হইতে এ পর্যন্ত ১১,০০০ এগার হাজারেরও বেশী নতুন কাপড়, ৫,০০০ পাঁচ হাজারেরও বেশী নতুন কম্বল, বহু পুরাতন কাপড় ও পোশাক এবং ৩৬,০০০ পাউণ্ড গুঁড়া দুধ পাঠানো হইয়াছে। ৫০ টিন (৩·৫ কেজি করিয়া) বিস্কুট ও এক লরী শুকনো খাদ্যবস্তুও পাঠানো হইয়াছে। দুইজন ডাক্তার-সহ একটি মেডিকেল ইউনিট সংক্রামক রোগ নিবারণের জন্য টাকা ও ঔষধপত্র দিয়া পীড়িতদের চিকিৎসা করিয়া চলিয়াছেন। আপাততঃ মিশনের বিভিন্ন ত্রাণকেন্দ্রে দশজন সন্ন্যাসী স্থানীয় ও কলিকাতা হইতে প্রেরিত স্বেচ্ছাসেবকদের সহযোগিতায় সেবাকার্য পরিচালনা করিতেছেন।

গুজরাটে বন্যার্ত-সেবা—সুরাট ও ভাবনগর জেলায় রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক বন্যা-পীড়িতদের পুনর্বাসনের জন্য আরব্ধ কুটীর-নির্মাণ-কার্য এখনও চলিতেছে।

শাখাকেন্দ্রে শ্রীশ্রীদুর্গোৎসব

উদ্বোধন-কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত কেন্দ্র-গুলি ছাড়াও এই বৎসর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নিম্নলিখিত কেন্দ্রসমূহে মৃন্ময়ী প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছে :

কাঁথি, বালিয়াটী, শ্রীহট্ট।

কার্যবিবরণী

বেলঘরিয়া রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রমের ১৯৬৭-৬৮ খৃষ্টাব্দের কার্য-বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাচীন ভারতীয় গুরুকুল-প্রথায় সুপরি-চালিত এই বিদ্যার্থী আশ্রমে দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রগণ সম্পূর্ণ বিনা-ব্যয়ে এবং কিছু-সংখ্যক ছাত্র আংশিক বা পূর্ণ ব্যয় বহন করিয়া থাকিয়া বিভিন্ন কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ-শিক্ষালাভের সুযোগ পায়। বিশ্ববিদ্যালয়-প্রদত্ত শিক্ষার সঙ্গে এখানে ছাত্রগণের স্বাস্থ্যচর্চা

ও চরিত্রগঠনের সুব্যবস্থা আছে। জনসেবার অঙ্গহিসাবে ছাত্রগণ কর্তৃক একটি নৈশবিদ্যালয় পরিচালিত হয়। অধ্যয়নের সঙ্গে প্রার্থনা, পূজা, গৃহাদি পরিষ্কার, রোগিসেবা প্রভৃতি কর্মও শিক্ষার অঙ্গহিসাবে বিদ্যার্থীরা নিষ্ঠার সহিত করিয়া থাকে।

আলোচ্যবর্ষশেষে মোট ৯০ জন আশ্রমিকের মধ্যে সম্পূর্ণ বিনা-ব্যয়ে ছিল ৫৪ জন; ১৪ জন আংশিক এবং ২২ জন জন পূর্ণ ব্যয় বহন করিয়াছে।

বিদ্যার্থী আশ্রমের সকল শ্রেণীর পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক। ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে ৩ জন স্নাতকোত্তর পরীক্ষার্থী ছিল; সকলেই উত্তীর্ণ হইয়াছে, একজন ফার্স্ট ক্লাস ও ২ জন সেকেণ্ড ক্লাস পাইয়াছে। ১৯ জন ডিগ্রী-পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১৮ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে; ১৬ জন অনার্স এবং একজন ডিস্টিংশন লাভ করিয়াছে। ১৭ জন প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয়-পরীক্ষার্থীর মধ্যে সকলেই উত্তীর্ণ হইয়াছে, তন্মধ্যে ১৩ জন প্রথম বিভাগে, ৩ জন দ্বিতীয় বিভাগে এবং একজন তৃতীয় বিভাগে।

গ্রন্থাগারে বিভিন্ন বিষয়ে ৩,৬০০ খানি সুনির্বাচিত গ্রন্থ আছে। ৪টি দৈনিক সংবাদপত্র ও ১৫টি সাময়িক পত্রিকা রাখা হয়। লাইব্রেরীর 'টেক্সটবুক সেকশন'-এ ২,৬০০ খানি পাঠ্যপুস্তক আছে, ১,৯০০ খানি পুস্তক লইয়া আশ্রমের বিদ্যার্থীরা পড়াশুনা করিয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে আশ্রমে কালীপূজা ও সরস্বতীপূজা সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত এবং ২৪শে ডিসেম্বর স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্মৃতি-উৎসব পালিত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি ও অন্যান্য পুণ্য দিনগুলি শুচিসুন্দর অনুষ্ঠানসহকারে উদ্‌যাপিত হয়। স্বাধীনতা-দিবস, প্রজাতন্ত্র-দিবস প্রভৃতি যথোপযুক্ত মর্যাদাসহকারে উদ্‌যাপন করা হইয়াছে।

বিদ্যার্থী আশ্রমের আর একটি কর্মবিভাগ 'রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পপীঠ'। সরকার-অনুমোদিত এই পলিটেকনিকে সিভিল, মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং-এ তিন বৎসরের ডিপ্লোমা কোর্সে শিক্ষাদান-কার্য পরিচালিত হইতেছে। বর্তমান বৎসরে শিল্পপীঠের ছাত্রসংখ্যা ৭২০। ছাত্রগণের মধ্যে ২৭০ জন সিভিল, ৩৬০ জন মেকানিক্যাল ও ৯০ জন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষা করে।

শিল্পপীঠে একটি স্বতন্ত্র লাইব্রেরী আছে; এখানে ৪,২০০ গ্রন্থ রাখা হইয়াছে। ৫টি দৈনিক সংবাদপত্র এবং ৬টি সাময়িক পত্রিকা লওয়া হয়।

উল্লেখযোগ্য যে, শিল্পপীঠের জনৈক ছাত্র মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ফাইন্যাল ডিপ্লোমা কোর্সে আলোচ্য বর্ষে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে।

ত্রিচুর: রামকৃষ্ণ আশ্রমের ১৯৬৭-৬৮ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী আমাদের হস্তগত হইয়াছে। আলোচ্য সময়ে এই আশ্রম কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠান ও বিভাগসমূহ: (১) গুরুকুল ও অনাথাশ্রম—বালকদের জন্য, ছাত্রসংখ্যা ১১২, (২) গুরুকুল অনাথাশ্রম—বালিকাদের জন্য, ছাত্রীসংখ্যা ৮৪, (৩) বিবেকানন্দ উচ্চ বিদ্যালয়—বালকদের জন্য, ছাত্রসংখ্যা ৬৯২, (৪) শ্রীসারদা উচ্চ বিদ্যালয়—বালিকাদের জন্য, ছাত্রীসংখ্যা ৫৮০, (৫) নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়, ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৬৯২ (ছাত্র ৩৬২), (৬) শ্রীসারদা ছাত্রীনিবাস—মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রীদের জন্য, ছাত্রীসংখ্যা ৪৮, (৭) হরিজন উন্নয়নমূলক কার্য: অনুন্নত সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া শিখাইবার জন্য ৩২,৭৩২'৪৩ টাকা ব্যয় করা হয়, (৮) দাতব্য চিকিৎসালয়, বহির্বিভাগে চিকিৎসিতের সংখ্যা

২৭,৬৮০ (নূতন রোগী ১৩,৭০১), ইনডোরে ১১ জন রোগীর চিকিৎসালাভের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, চিকিৎসিতের সংখ্যা ২৭৭, (৯) নার্সারি স্কুল, (১০) গ্রন্থাগার ও পাঠাগার, পুস্তকসংখ্যা ৪,৩৬০ ; পাঠাগারে ৩টি দৈনিক, ৪টি সাপ্তাহিক ও ১০টি মাসিক পত্রিকা রাখা হয়, দৈনিক পাঠকসংখ্যা ১৮, (১১) দুঃস্থসাহায্য, (১২) পুস্তক- ও পত্রিকা-প্রকাশন। 'প্রবুদ্ধকেরলম্' মাসিক পত্রিকাটি ৫৩তম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। ৫ খানি নূতন পুস্তক প্রকাশিত এবং ৪ খানি পুরাতন পুস্তক পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

আশ্রমে দৈনিক পূজা পাঠ ভজন এবং সাময়িক উৎসবাদি সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব উপলক্ষে ছাত্রদের মধ্যে আবৃত্তি ও অন্যান্য প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয় এবং তাহাদের পুরস্কার দেওয়া হয়।

চিকাগো ধর্মমহাসভার ৭৫তম স্মৃতিবার্ষিকী

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত চিকাগো ধর্ম-মহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিত্ব করিয়াছিলেন এবং বিশ্বে হিন্দুধর্মের মর্যাদা ও আধ্যাত্মিকতা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

সেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ চিকাগো ধর্মমহা-সভার ৭৫তম স্মৃতি-বার্ষিকী উপলক্ষে গত ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮ চিকাগো বিবেকানন্দ বেদান্ত সোসাইটি কর্তৃক একটি ধর্মসম্মেলন আয়োজিত হইয়াছিল। বিশিষ্ট বক্তাগণ ইহুদী ধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, জরথুস্ত্রধর্ম, ইসলাম ও খৃষ্টধর্ম সম্বন্ধে ভাষণ দেন। স্বামী রঙ্গনাথানন্দ হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

পোর্টল্যাণ্ডে নূতন মন্দির-প্রতিষ্ঠা

পোর্টল্যাণ্ড (ওরিগন) বেদান্ত সোসাইটির নূতন মন্দিরের প্রতিষ্ঠা-উৎসব গত ২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮ সুসম্পন্ন হইয়াছে। পরদিবস সাধারণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

সেণ্ট লুই বেদান্ত সোসাইটিতে উৎসব

গত ৪ঠা অক্টোবর, ১৯৬৮, সেণ্টলুই (মিজুরী) বেদান্ত সোসাইটিতে বেদান্ত মন্দিরের সম্প্রসারিত অংশের উদ্বোধন উপলক্ষে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ৬ই অক্টোবর সাধারণ উৎসবের আয়োজন করা হইয়াছিল।

বক্তৃতা-সফর

গত ১. ১. ৬৭ হইতে ১৩. ৩. ৬৭ পর্যন্ত স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী নিম্নলিখিত বক্তৃতাসমূহ দিয়াছেন :

বিষয়	স্থান
কল্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণ	৩৮ বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীশ্রীমা	রামকৃষ্ণকথামৃত সঙ্ঘ, বেহালা
স্বামী শিবানন্দ	রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রম, বারাসত
স্বামী বিবেকানন্দ	এস্. ই. রেলওয়ে হেডকোয়ার্টারস, গার্ডেনরিচ
গীতা জয়ন্তী	হিন্দু মিশন
'শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্'	পানিহাটি স্পোর্টিং ক্লাব
সনাতন ধর্মে নরনারীর সমান অধিকার	মহাজাতি সদন
শ্রীরামকৃষ্ণ	রেলওয়ে ইন্‌স্টিট্যুট হল, শিয়ালদহ
শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দ	কসবা চিত্তরঞ্জন উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়
কর্মরহস্য	গার্ডেনরিচ এস. ই. রেলওয়ে হেড কোয়ার্টারস
স্বামী বিবেকানন্দ	রামমোহন হল
স্বামী প্রেমানন্দের স্মৃতি	রামকৃষ্ণ-প্রেমানন্দ আশ্রম, আঁটপুর
কর্মযোগী স্বামী বিবেকানন্দ	রামকৃষ্ণ পাঠচক্র, ভবানীপুর
শ্রীরামকৃষ্ণ	রামকৃষ্ণ আনন্দ আশ্রম, নাকতলা
ত্যাগ ও সেবা	অনুশীলন ভবন
প্রকৃত ভক্তের লক্ষণ	বঙ্গীয় ভাগবত সমাজ
কর্মের রহস্য	ইছাপুর
সনাতন ধর্ম	বায়গাঁও, রায়পুর, এম. পি,
ভারত ও তাহার ধর্ম	মৈত্রীসঙ্ঘ, জগদলপুর, এম. পি,
স্বামী বিবেকানন্দ	কুণ্ডাগাঁও, এম. পি.
ভগবানলাভের উপায়	রামমন্দির, কোণ্ডা, এম. পি.
আত্মবিকাশ	কোণ্ডা, জেলা—বস্তার, এম. পি.
সনাতন ধর্ম	শিবমন্দির, " "
স্বামী বিবেকানন্দ	রামকৃষ্ণ পাঠচক্র সেবাশ্রম, গান্ধী কলোনী, কলিকাতা
শ্রীরামকৃষ্ণ	রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা

স্বামী ব্রহ্মাত্মানন্দ, স্বামী প্রপন্নানন্দ ও স্বামী বিধানানন্দের দেহত্যাগ

আমরা অত্যন্ত দুঃখিতচিত্তে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের তিনজন সন্ন্যাসীর দেহত্যাগ-সংবাদ লিপিবদ্ধ করিতেছি :

স্বামী ব্রহ্মাত্মানন্দ (রামময় মহারাজ) গত ১২ই অক্টোবর বেলা ১২টা ৫ মিনিটে বেলুড় মঠে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি ঐ দিন সকালে মঠে অনুষ্ঠিত সাধুসম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন। স্নান করিবার সময় তিনি অকস্মাৎ বক্ষঃস্থলে বেদনা অনুভব করেন। তৎক্ষণাৎ ডাক্তার ডাকা হয়, কিন্তু চিকিৎসায় কিছু সুফল দেখা যায় না। আধ ঘণ্টার মধ্যেই তাঁহার দেহাবসান ঘটে। তাঁহার ৬৯ বৎসর বয়স হইয়াছিল।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন; ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে সঙ্ঘে যোগদান করেন এবং ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের নিকট হইতেই সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ করেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি বরিশাল, হবিগঞ্জ ও গড়বেতা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯৬১ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি প্রধান কেন্দ্র বেলুড়ে কর্মরত ছিলেন। এই কঠোর পরিশ্রমী সন্ন্যাসী অনাড়ম্বর জীবন-যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন।

স্বামী প্রপন্নানন্দ (শচীন মহারাজ) ৬২ বৎসর বয়সে চণ্ডীগড় আশ্রমে গত ২৬শে অক্টোবর দ্বিপ্রহরে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন। এই বৎসরের প্রথম দিকেও তিনি একবার হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হন, তখন তাঁহাকে হাসপাতালে ভরতি হইতে হইয়াছিল।

তিনি ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে সঙ্ঘভুক্ত হন; তিনি শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার নিকট হইতেই সন্ন্যাস লাভ করেন। বারাণসী সেবাশ্রম, বেলুড় মঠ ডিস্পেন্সারী, মায়াবতী আশ্রম ও দেওঘর বিদ্যা-পীঠে তিনি বিভিন্ন সময়ে কর্মী ছিলেন, শেষ কয়বৎসর ছিলেন চণ্ডীগড়ে। তিনি ছিলেন সরল, কষ্টসহিষ্ণু ও মধুরস্বভাব সন্ন্যাসী।

স্বামী বিধানানন্দ (গোপাল মহারাজ) কুইল্যাণ্ডিতে গত ২৬শে অক্টোবর সকাল ৫ টায় ৫৯ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। অনেকদিন যাবৎ তিনি অসুস্থ ছিলেন। দেহত্যাগের পূর্বদিন তিনি বুকে দারুণ ব্যথা অনুভব করিয়া অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়েন। প্রাতঃকালে সহসা তাঁহার দেহাবসান হয়।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন; ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে সঙ্ঘে যোগদান করেন এবং ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ করেন। তাঁহার সমগ্র সাধুজীবন কালিকট ও কুইল্যাণ্ডি শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে অতিবাহিত হয়। তিনি সরল ও কঠোর সন্ন্যাস-জীবন যাপন করিতেন এবং সকলের প্রিয়পাত্র ছিলেন।

এই সন্ন্যাসিত্রয়ের আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ-পাদপদ্মে শাশ্বত শান্তি লাভ করিয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

কার্যবিবরণী

বিবেকানন্দ-সোসাইটি (১৫১, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা ৬): যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারা রূপায়িত করিবার উদ্দেশ্যে উৎসাহী জনসাধারণ কর্তৃক যে-সকল সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে প্রাচীনতার দিক হইতে বিবেকানন্দ-সোসাইটির নাম সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য।

সুদীর্ঘ ৬৫ বৎসর পূর্বে ভগিনী নিবেদিতার পরিকল্পনা অনুযায়ী এই প্রতিষ্ঠানের পত্তন হইয়াছিল। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিভিন্ন স্থানে নানা অবস্থার মধ্যে সোসাইটির কার্য পরিচালিত হয়। বর্তমানে নিজস্ব নূতন ভবনে সোসাইটি স্থানান্তরিত হইয়াছে।

সোসাইটির ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

আলোচ্য বর্ষে সাপ্তাহিক ও সাময়িক ধর্মসভাগুলিতে শ্রীভগবদ্গীতা, শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্ব, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ভক্তিতত্ত্ব, স্বামীজীর জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ, শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী, শ্রীরামকৃষ্ণ-আবির্ভাব (কথকতা), সমাজ-শিক্ষা প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছিল।

অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য: শ্রীশ্রীকালীপূজা, শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব, স্বামী বিবেকানন্দের বার্ষিক উৎসব, বুদ্ধদেব ও যীশুখৃষ্টের আবির্ভাব, ভগিনী নিবেদিতার জন্মশতবার্ষিকী জয়ন্তী এবং সর্বভারতীয় সমাজ-শিক্ষা দিবস। শত শত ভক্ত এই সকল অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

গ্রন্থাগারে সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে সুনির্বাচিত ৫,৮,২৭ খানি গ্রন্থ আছে। আলোচ্য বর্ষে পঠিত পুস্তকসংখ্যা —২৭১৯। গ্রন্থাগারের শিশুবিভাগটি ছেলেদের বিশেষ আকর্ষণীয় হইয়া উঠিতেছে। বি. এ. ও এম. এ. ক্লাসের ছাত্রদের জন্য একটি টেক্সট-বুক লাইব্রেরী করিবার পরিকল্পনা করা হইয়াছে। পাঠাগারে প্রসিদ্ধ দৈনিক ও সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলি নিয়মিতভাবে লওয়া হয়।

সোসাইটির দাতব্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়ে আলোচ্য বর্ষে ১১,৪১৯ জন রোগী চিকিৎসিত হয়। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সহযোগিতায় পরিচালিত দুগ্ধবিতরণ-কেন্দ্রে প্রতিদিন ১০০ জনকে দুধ দেওয়া হইতেছে।

আলোচ্য বর্ষে অর্থাভাবের জন্য সোসাইটির ছাত্রাবাসে কয়েকটি মাত্র ছাত্র রাখা হইয়াছিল। দরিদ্র ছাত্রগণকে কিছু অর্থসাহায্যও করা হইয়াছে। ছাত্রাবাসটি যাহাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়, তজ্জন্য আমরা সহৃদয় জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

অনাবৃষ্টিজনিত পুরুলিয়ার দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলে দুর্গতদের সেবা করিবার জন্য সোসাইটির কয়েকজন বিশিষ্ট কর্মী প্রেরিত হন। এই খরাত্রাণকার্যে সোসাইটি হইতে ৫০১৲ টাকা দান করা হয়।

বিজ্ঞপ্তি

পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী সারদাদেবীর ১১৬তম শুভ-জন্মতিথি আগামী ২৭শে অগ্রহায়ণ (১২. ১২. ৬৮) বৃহস্পতিবার কৃষ্ণাসপ্তমীতে বেলুড় মঠে ও অন্যত্র বিশেষ পূজানুষ্ঠানাদি সহকারে অনুষ্ঠিত হইবে।

উদ্বোধন

দিব্য বাণী

ধ্যায়েৎ হৃদম্বুজে দেবীং তরুণারুণবিগ্রহাম্।
বরাভয়করাং শান্তাং স্মিতোৎফুল্লমুখাম্বুজাম্॥
স্থলপদ্মপ্রতীকাশপাদাম্ভোজসুশোভনাম্।
শুক্লাম্বরধরাং ধীরাং লজ্জাপটবিভূষিতাম্॥
প্রসন্নাং ধর্মকামার্থমোক্ষদাং বিশ্বমঙ্গলাম্।
স্বনাথবামভাগস্থাং ভক্তানুগ্রহকারিণীম্॥

—শ্রীশ্রীসারদাদেবীর ধ্যানমন্ত্র

বিগ্রহ তাঁর তরুণ অরুণ জিনিয়া বিভায় ঢালা,
ফুল্ল শ্রীমুখ-কমলে তাঁহার মৃদু হাসি করে খেলা ;
অতি প্রশান্ত মুরতি যে তাঁর, বরাভয় শোভে করে,
সুশোভন পদ-পঙ্কজে স্থল-পদ্মের আভা ঝরে ;
শ্বেতবসন-পরিহিতা, ধীর, লজ্জাবরণে ঢাকা,
ভকতেরে কৃপাবিতরণকারী (সদাই করুণামাখা
বিশ্বজননী), সদা প্রসন্না, যেইজন যাহা চায়
ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ তাহারে বিলান তাই ;
নিখিল-বিশ্ব-মঙ্গলকারী কল্যাণময়ী মাতা
স্বনাথ রামকৃষ্ণের বামভাগে সদা বিরাজিতা ;

—এই রূপে দেবী সারদা আমার হৃদয়-পদ্ম 'পরে
সমাসীনা—শুধু এই চিন্তায় গুটায়ে মানসটিরে
ধেয়ানে তাঁহার হইবে মগ্ন। (যখন তাঁহার ভাবে
এক হয়ে যাবে সকল ভাবনা, তাঁহারে দেখিতে পাবে।)

কথাপ্রসঙ্গে

শ্রীশ্রীমা

শ্রীশ্রীমা সকলেরই মা হইলেও সে মায়ের রূপ সর্বত্র এক নহে। স্থূলদৃষ্টি ডাকাত আমজদের নিকট তিনি অসীম স্নেহময়ী সাধারণ মানবী মা, আবার অবতারবরিষ্ঠ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের নিকট ব্রহ্মময়ী মা, 'মা আনন্দময়ী'। জীবনের স্থূলতম হইতে সূক্ষ্মতম বিকাশের প্রত্যেক স্তরেই সেখানকার ধারণাগম্য মা হইয়া তিনি প্রকাশিতা; বিকাশের সর্বোচ্চ স্তরে তিনি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরেরও জননী, 'কারণানন্দ-বিগ্রহা'। তাহারও পারে ব্রহ্মময়ী, "তুরীয়া নির্গুণা মা"।

তাঁহার প্রকাশ নির্ভর করে আমাদের চাওয়ার উপর। আমরা যেভাবে তাঁহাকে দেখিতে চাই, সেভাবেই তিনি প্রকাশিত হন। যে স্তরে থাকিয়া যে সন্তান মা বলিয়া তাঁহার নিকট যাহা চায়, তিনি তাহাকে তাহাই দেন—ভোগও দেন, আবার মোক্ষও দেন।

আমরা 'মা' নই, কাজেই তাঁহার এই সব-সন্তানের সব-চাওয়াকে পূর্ণ করার জন্য ব্যাকুলতার ধারণা করা আমাদের পক্ষে সম্ভবও নহে। মায়ের নিকট কত রকম লোক যে আসিতেন তাহার ইয়ত্তা নাই। তাঁহাদের প্রত্যেকেরই ভাব বিভিন্ন, অনেকের আবার আব্দারই বা কত। জীবনের কত রকমের দুঃখকষ্টের কথা, কত সমস্যার কথা মাকে তাঁহারা জানাইতেন। অনেকে মায়ের নিকট আধ্যাত্মিক রাজ্যে অগ্রসর হইবার পথের সন্ধান করিতে যেমন আসিতেন, তেমনি অনেকে আসিতেন সংসারের দুঃখকষ্টের কথা তাঁহাকে বলিয়া মনের জ্বালা জুড়াইতে। জনৈক সেবকের নিকট তাঁহাদের কাহারো কাহারো আচরণ কখনো একটু বাড়াবাড়ি বলিয়া, কখনো বা মায়ের পক্ষে তাহা কষ্টকর বলিয়া মনে হইত। সেবকটি মাকে একদিন সে কথা জানাইলে মা বলিলেন, "বাবা, মানুষের অন্তরের দুঃখবেদনার আর্তি যে কত, তা ছেলেমানুষ তোমরা বুঝতে পারো না; বড় হলে হয়ত বুঝবে।" তাহার পরই আসল কথাটি বলিতেছেন, "আর তুমি তো মা নও!"

আমাদের সাধারণ দৃষ্টিতে মায়ের জীবনের যেটুকু ধরা-ছোঁয়ার ভিতর আছে, তাহা এখানেই বিশালতম। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে মা যেমন বলিয়াছেন, "তাঁর ঈশ্বরত্ব আর কজন ধারণা করতে পেরেছে? তাঁর ত্যাগ দেখেই লোকে আকৃষ্ট", শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধেও তেমনি বলা যায় তাঁহার মাতৃস্নেহেই আকৃষ্ট হইয়াছে অধিকাংশ ভক্ত। শ্রীশ্রীমায়ের কথা মনে জাগিলে পটভূমিতে তাঁহার ঈশ্বরত্ব যেভাবেই ফুটিয়া উঠুক বা না উঠুক, সম্মুখে সর্বদা প্রকট হয় সেই মা, যে মায়ের স্নেহপারাবার সত্যই 'অতল, অপার', যে মায়ের কাছে 'ছেলের কোন অপরাধ হয় না', যে মা কাহারো দোষ দেখিতে পান না—অপরে দেখাইয়া দিলেও কখনো তাহা আমাদের মতো বিরক্তির দৃষ্টি লইয়া দেখেন না, তাহার গুণগুলির সহিত মিশাইয়া দেখিয়া বলেন, "আমি আর কারো দোষ দেখতে শুনতে পারিনে বাবা!"

এই মাতৃস্নেহ দিয়াই তিনি তাঁহার অনন্ত শক্তিমত্তা, বিপুল আধ্যাত্মিক তেজ, সব ঈশ্বরীয় ঐশ্বর্য আবৃত করিয়া সহজ, স্বাভাবিক ভাবে 'মা' হইয়া থাকিতেন। স্বামী প্রেমানন্দ বলিয়াছেন যে, এ বিষয়ে মায়ের শক্তি শ্রীরামকৃষ্ণ

অপেক্ষাও অধিক—"শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে দেখছি ঠাকুরের চেয়েও আধার বড়—তিনি শক্তিস্বরূপিণী কি না! তাঁর চাপবার ক্ষমতা কত! ঠাকুর চেষ্টা করেও পারতেন না, বাহিরে বেরিয়ে পড়ত।" আর, এভাবে চাপিয়া না রাখিলে যাঁহাকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব পূজা করিয়াছেন, পাশ্চাত্য হইতে ফিরিয়া যাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ নৌকা করিয়া আসিবার সময় অঞ্জলি ভরিয়া গঙ্গাজল পান করিয়াছেন, যাঁহাকে দর্শন করিবার সময় স্বামী ব্রহ্মানন্দ ভাবস্থ হইয়া পড়িতেন, ঘামিয়া উঠিতেন, সেই 'পবিত্রতা-স্বরূপিণীর', নিকট অতি দুষ্কৃতিকারীরাও সহজভাবে 'মা' বলিয়া আসিবার সাহস পাইত কোথায়? তাহা যদি না হইত, তাহা হইলে আত্মীয়গণকে লইয়া, বিশেষ করিয়া রাধুদি ও তাঁহার মাকে লইয়া তিনি 'সংসার'ই বা করিতেন কিরূপে? তাহা না হইলে রাধুদির রোগমুক্তির জন্য কোয়ালপাড়ায় জনৈক তান্ত্রিক সাধুকে ডাকাইয়া আনিয়া গলবস্ত্রে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সজলনয়নে বিপন্নভাব দেখাইয়া কিভাবে ইহা বলা সম্ভব হইত যে, তান্ত্রিক সাধুটি দয়া করিলে সব শান্তি হইবে? সর্ব-দেবদেবীস্বরূপিণী তিনি কিভাবেই বা বলিতে পারিতেন, "আমি তো সকল দেবতাকে মান্য ক'রে অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি, কিন্তু কেউ কিছু মুখ তুলে চাইছেন না!"

সব অনুভূতি, সব শক্তি, সব ঐশ্বর্য চাপিয়া রাখিয়া তিনি আমাদের কাছে একজন সাধারণ পল্লীরমণী, নিখুঁতভাবে একজন পল্লীবাসিনী 'মা' হইয়াই থাকিতেন। তাপিতের তাপ গ্রহণ করিয়া, ব্যথিতের সমব্যথী হইয়া এই মা-ই বলিয়াছেন, "তুমি তো মা নও!"—ছোট-বড়, ভাল-মন্দ সকল সন্তানের জন্য বিশ্বজননীর যে স্নেহ, তুমি তাহার কি বুঝিবে?

স্নেহপটাবৃতা অতি সাধারণ এই মা-ই জয়রামবাটীতে কালীমামাদের ঝগড়া মিটাইতেছেন, রাধুর বিবাহের জন্য চিন্তান্বিতা হইতেছেন, ভক্তদের জন্য নিজে রান্না করিতেছেন, তাহাদের উচ্ছিষ্ট স্থানও পরিষ্কার করিতেছেন। এই মা-ই ভোরে উঠিয়া কলিকাতা হইতে আগত ভক্তদের চায়ের জন্য দুধ সংগ্রহ করিতে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিতেছেন, দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের নিষেধ না মানিয়া কোন ত্যাগী সন্তানকে বেশী করিয়া খাওয়াইতেছেন, স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা যাইবার অনুমতি ও আশীর্বাদ চাহিয়া পত্র লিখিলে ভাবিয়া আকুল হইতেছেন—নরেন ছেলেমানুষ, এত দূরদেশে একা যাবে কি!

যতদূর জানা যায়, হরিশকে প্রহার করা জাতীয় দু-একটি ঘটনার সময় সাধারণের দৃষ্টির সম্মুখে তাঁহার এই আবরণ সাময়িকভাবে একটু সরিয়া গিয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বল্প কয়েকজন অতি-উন্নত আধ্যাত্মিক অনুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তির দৃষ্টি অবশ্য সর্বক্ষণই এই আবরণের পশ্চাতে ব্রহ্মময়ী, আনন্দময়ী জগন্মাতাকেই দেখিত।

তবে শ্রীশ্রীমা কি তাঁহার স্বরূপ ভুলিয়া থাকিতেন? না, ভুলিয়া থাকিতেন না, চাপিয়া রাখিতেন। যে যেভাবে তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা ও যোগ্যতা লইয়া কাছে আসিত, সে সেইভাবেই তাঁহাকে দেখিতে পাইত। বহুভাবে বহুজনকে বিভিন্ন সময়ে নিজ স্বরূপের আভাসও তিনি দিয়াছেন, কিন্তু তাহা অতি স্বাভাবিক ভঙ্গীতে, সাধারণ মা ছেলের কাছে যেমন গল্প বলেন সেইভাবেই। বলিয়াছেন যে, তিনি জগন্মাতা—"জগতে সবাই আমার

সন্তান"; তিনি যে মা-কালী, তাহা স্পষ্টভাবেই স্বমুখে বলিয়াছেন; ইঙ্গিত দিয়াছেন, তিনিই জগন্ময়াত্মিকা পরমা শক্তি—"আমি যদি রুষ্ট হই, ত্রিভুবনে তোর (রাধুর) আশ্রয় নেই।" "এর ভেতর যিনি আছেন, যদি একবার ফোঁস করেন তো ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর কারো সাধ্য নাই যে তোদের রক্ষা করে।" (শ্রীরামকৃষ্ণদেবও হৃদয়কে শ্রীশ্রীমা সম্বন্ধে একই ভাষায় সাবধান করিয়াছিলেন, 'এর ভেতর যে আছে, সে ফোঁস করলে হয়তো রক্ষা পেলেও পেতে পারিস, কিন্তু ওর ভেতর যে আছে সে ফোঁস করলে তোকে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও রক্ষা করতে পারবে না।') তিনি ও শ্রীরামকৃষ্ণ যে অভেদ, তাহাও বলিয়াছেন। আবার, তিনিই যে যুগে যুগে অবতারের সঙ্গে আসেন, তাহার ইঙ্গিতও নিজেই দিয়াছেন; রামেশ্বর হইতে ঘুরিয়া আসিয়া সীতাদেবী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিব সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "যেমনটি রেখে এসেছিলাম, ঠিক তেমনটিই আছেন।"

ঈশ্বরভাব হইতে শুরু করিয়া স্থূলতম মানুষ-ভাব পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র ভাবগুলিই শ্রীশ্রীমায়ের মধ্যে থাকিত সর্বক্ষণই পাশাপাশি। সেইজন্য যখন কোন ব্যক্তি তাঁহার সম্পূর্ণ অপরিচিত চিন্তা উত্থাপন করিতেছেন বা কোন গৃহস্থ সাধারণ সমস্যা লইয়া তাঁহার সহিত কথা কহিতেছেন, যখন স্বামী সারদানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশন-সংক্রান্ত কোন সমস্যার সমাধান নিজে না করিতে পারিয়া তাঁহার নিকট উহা উত্থাপন করিতেছেন, বা যখন কেহ অধ্যাত্মজীবন-সংক্রান্ত প্রশ্ন করিতেছেন, দেখা যাইত মা তৎক্ষণাৎ সাবলীলভাবে তাহার সমাধান ও সদুত্তরদান করিতেন। ভগিনী নিবেদিতা ইহা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, "বিরাটের সঙ্গী ও সাক্ষী হবার মহিমাকে তিনি প্রতি মুহূর্তে অসচেতনে বহন করেছেন। তার গরিমাকে পূর্ণোচ্চারিত হয়ে উঠতে দেখা যায়, যখন তিনি যে-কোন নূতন ভাব বা অনুভূতির মর্মচ্ছেদ করেন অবিলম্বে, অব্যর্থভাবে।" কিন্তু সর্বাবস্থাতেই তাঁহার একেবারে বহির্দেশে থাকিত সাধারণ মায়ের ভাবের আবরণটি, যাহা সকলেরই ধরা-ছোঁয়ার নাগালের মধ্যে এবং তাহারই স্নেহস্পর্শের বন্যায় জীবনকে আপ্লুত করিয়া ধন্য হইতে চাহিয়াছেন অতি উচ্চ ও অতি নীচ সকলেই।

আবার এই মায়ের মধ্যে, সন্তানদের জাগতিক সুখ-সুবিধা সম্পাদনের জন্য মাতৃ-সুলভ ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত সন্তানদের 'জীবনের পরম কল্যাণের' কামনা। আপাত-দৃষ্টিতে সে-মাকে আলাদা বলিয়া মনে হইলেও, আসলে তিনি একই মা, মাতৃস্নেহ-প্রবাহের সর্ববিধ প্রণালীই সর্বদা তাঁহার স্নেহধারায় পূর্ণ থাকিত। বিকাশের পার্থক্য ঘটিত সন্তানের চাওয়ার উপর, তাহার সংস্কারের উপর, তাহার গ্রহণ করিবার সামর্থ্যের উপর। একজন ভক্ত বিবাহ করিবে, তাঁহার নিকট অনুমতি লইতে আসিয়াছে, মা তাহাকে সানন্দে সম্মতি দিতেছেন; আবার কেহ সন্ন্যাসী হইবার আকাঙ্ক্ষা জানাইবামাত্র তাঁহাকে প্রাণ খুলিয়া আশীর্বাদ করিতেছেন: জীবনে এর চেয়ে কল্যাণের পথ আর কি আছে, বাবা! আবার এরূপও ঘটিয়াছে, কেহ বিবাহ করিব না বলায় তাহাকে বুঝাইয়া বিবাহ করিতে বলিতেছেন; অন্য একটি ক্ষেত্রে কিন্তু বিবাহ না করারই সমর্থন করিতেছেন। এরূপ দুটি বিপরীতভাবে তিনি কথা বলেন কেন, যাহা কল্যাণকর বলিয়া বুঝেন তাহাই তো সকলকে বলিতে পারেন—একদা ইহা জিজ্ঞাসিত হইলে মা বলিয়াছিলেন

যে, যাহার ভোগবাসনা খুব প্রবল তাহাকে 'না' বলিলে শুনিবে না, কিন্তু, যাহার শুভসংস্কার আছে, তাহাকে তিনি ত্যাগের পথে চলিতে সহায়তাই বা করিবেন না কেন? একটি যুবককে তিনি সন্ন্যাস দিবার পর মাকুদি যখন বলিয়াছিলেন, "পিসীমার যেমন কাজ, অমন সব ভাল ভাল ছেলেদের সাধু করে দিচ্ছেন! বাপ-মা কত কষ্টে মানুষ ক'রে মুখ চেয়ে আছেন, তাঁদের কত আশা! সে-সব চুরমার হয়ে গেল। এখন উনি হয় হৃষীকেশে গিয়ে ভিক্ষে করে খাবেন, আর না হয় রোগীর সেবা করবেন! বে-থা করা সেও তো একটা সংসারধর্ম!" তখন মা উত্তর দিয়াছিলেন, "মাকু, ওরা সব দেবশিশু, সংসারে ফুলের মত পবিত্র হয়ে থাকবে। এর চেয়ে সুখের আর কি আছে বল দেখি? সংসারে যে কি সুখ, তা তো সব দেখছিস।...এতদিন আমার কাছে থেকে কি দেখলি?...পবিত্র ভাবটা কি স্বপ্নেও তোদের ধারণা হয় না?"

তাঁহার নিকট আমাদের চাওয়ার গভীরতাই তাঁহার অতি সাধারণ জীবনের আবরণটিকে কতখানি পাতলা করিবে, এই আবরণের পশ্চাতে তাঁহার স্বরূপ আমাদের দৃষ্টিতে কতখানি ধরা পড়িবে তাহার একমাত্র নির্ণায়ক। তাঁহার নিকট আমরা যাহাই চাহিব, তাহাই পাইব; আমাদের তাহা পাইবার যোগ্যতা না থাকিলেও তিনি তাহা দিয়া দিবেন—তিনি যে 'মা'! জনৈকা ভক্ত রমণী একদা 'এ জীবনটা তো বৃথাই গেল' বলিয়া কাতরভাবে সজলনয়নে আক্ষেপ করিয়া স্বামী বিজ্ঞানানন্দের পা জড়াইয়া ধরিয়া অন্ততঃ মৃত্যুকালে ভগবৎ-আনন্দ পাইবার জন্য প্রার্থনা জানান; বিজ্ঞানানন্দজী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "মাকে ডাকবে। তাহলেই সব হয়ে যাবে। ঠাকুর কিন্তু বড় তুষ্টু। একেবারে ঠিক ঠিক না হলে তাঁর কৃপা হয় না। মা বড় ভাল। মাকে দেখিয়ে ঠাকুর আমায় বলেছিলেন, 'এঁকে ডাকবি।' তাতেই আমার সব হয়ে গেল।" মা নিজেই বলিয়াছেন: মা ব'লে কাছে এসে কেউ কিছু চাইলে থাকতে পারি না, যে যার যোগ্য নয় তাকেও তাই দিয়ে দিই।

কিন্তু করুণার এই দুয়ার অবারিত থাকিলেও আমরা তাঁহাকে কতটাই বা গভীর-ভাবে দেখিতে চাই, আর কতটুকুই বা চাই তাঁহার নিকটে যাইতে? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তো খেলা করিবার জন্য তাঁহার কাছে কিছু খেলনা চাই। শ্রীশ্রীমা বলিয়াছেন, "কেউ বলছে, 'এত করে প্রার্থনা জপধ্যান করছি, কিছুই হচ্ছে না।' কেউ বা সংসারে নানা অশান্তি অনটন রোগশোকের কথা লিখেছে! আর এসব শুনতে পারি না।...আমি মা হয়ে আর কি বলবো? কজন তাঁকে ঠিক ঠিক চায়? সে ব্যাকুলতা কোথায়? এত তো ভক্তি, আগ্রহ—কিন্তু সামান্য একটু ভোগ্যবস্তু পেলেই সন্তুষ্ট! বলে 'আহা, তাঁর কি দয়া!'"

সন্তানগণ যে যাহা চায় মা তাহাকে তাই দেন ঠিকই, কিন্তু একথা যেন আমরা না ভুলি, তিনি মাতৃস্নেহের আবরণ অঙ্গে জড়াইয়া আমাদেরই মত হইয়া আসিয়াছিলেন আমাদের দৃষ্টিকে স্থূলের রাজ্যে আরও জড়াইয়া রাখিবার জন্য নহে, তাহাকে চেতনার রাজ্যে উন্নীত করিবার জন্যই। আমরা যাহাই চাই না কেন, তিনি তাহা আমাদের দিলেও তাহার ভিতর দিয়াই আমাদের চাওয়াকে তাহার ঊর্ধ্বে তোলার ব্যবস্থাও করিয়া দিতেন। এখনো দেন। কিন্তু সে পথ দুঃখময়। যখন তিনিই সচ্চিদানন্দময়ী, চরাচর-জগদ্ধাত্রী, আমাদের ইচ্ছা বুদ্ধি প্রভৃতি সব কিছুই তিনি, তাঁহার

ইচ্ছামাত্রই যখন সব কিছুই হয়, তখন স্থূলের রাজ্যে খেলিবার ইচ্ছা ছাড়িয়া তাঁহার স্থূল আবরণের পশ্চাতে তাঁহার 'আনন্দামৃতবর্ষী' স্বরূপ কেননা দেখিতে চাহিব, কেননা দেখিতে চাহিব আমাদের দেহ-মন-প্রাণ-অহংকার-জোড়া, বিশ্বজোড়া তাঁহার প্রকাশ? যদি সে-চাওয়ার ইচ্ছা বা শক্তি না থাকে, তাহাই বা তাঁহার নিকট চাহিয়া লইব না কেন? কিন্তু তাঁহাকে সেভাবে দেখিতে হইলে অন্য আর কিছু চাওয়া চলিবে না। 'নির্বাসনা' চাওয়াই তাই তাঁহার নিকট শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা। মা নিজেই বলিয়াছেন: এককথায়, ভগবানের নিকট নির্বাসনা চাইতে হয়।

তাঁহার কৃপায় অস্তিত্বের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছিয়া তাঁহার স্বরূপ দেখিবার জন্য তিনি আমাদের সকলেরই হৃদয়ে যেন এই প্রার্থনা জাগাইয়া দেন—"দুয়ার খুলিয়া দাও মাতঃ! হেরি পথ আলোকচ্ছটায়!"

আমাদের মা

[কয়েকটি ঘটনা]

১

একবার ১৩২৫ সালে কয়েকজন বর্ষীয়সী মহিলা জয়রামবাটী অঞ্চল হইতে মায়ের নিকট কলিকাতায় আসেন। মা তাঁহাদিগকে কালী-ঘাট, দক্ষিণেশ্বর, পরেশনাথের মন্দির, তারপর বেলুড় মঠ দর্শন করিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। বেলুড় মঠ দেখিয়া ফিরিলে মা জানিতে চাহিলেন, 'হ্যাঁগা, তোমরা বেলুড় মঠ কি রকম দেখে এলে?' একজন মহিলা বলিলেন, 'আহা মা! কি বলব! বেলুড় মঠে কি বড় বড় গরু গো। ও-রকম বড় বড় গরু আমাদের দেশে নেই।' মা বৃদ্ধাকে বারবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'কেন, ঠাকুরঘরে যাওনি? ঠাকুরের ব্যবহৃত জিনিসপত্র সাধুরা কি পরিপাটি ক'রে সাজিয়ে যত্ন ক'রে রেখেছে, দেখোনি?' মহিলা বলিলেন, 'হ্যাঁ, দেখেছি।'

মা—ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানদের দর্শন করেছ?

মহিলা—করেছি, কত যত্ন করলেন তাঁরা। আমরা যে তোমার দেশ থেকে এসেছি।

মা—আর সেই ফুলের মতো পবিত্র ব্রহ্ম-চারীদের দেখো নি?

মহিলা—কি শ্রদ্ধা তাঁদের! আমাদের পরিবেশন ক'রে খাওয়ালেন।

মা—তারা সব কি ভাবে কত কাজ করছে, দেখেছ? আহা! তাদের দেখলেও কত পুণ্য! গঙ্গার ঘাট থেকে দক্ষিণেশ্বর দর্শন হয়, তা দেখেছ?

মহিলা—সবই দেখেছি, কিন্তু ও-রকম গরু দেখিনি।

২

একদিন সকালে গড়বেতা ও পিয়ালডোবার নিকটবর্তী একটি গ্রাম হইতে একটি যুবক আসিয়াছিল। ছেলেটি জাতিতে বাগদী। সে তাহার মামার বাড়ীতে থাকিয়া লেখাপড়া করিত। জয়রামবাটীতে মাকে দর্শন করার পর

মায়ের নিকট তাহার দীক্ষা লইবার বাসনা হয়। ঐ দিন দুপুরে মাকে ঐ বিষয় প্রার্থনা জানাইলে, যুবকটির পরিচয়াদি অবগত হইয়া শ্রীশ্রীমা দেশে বাগদী ছেলেকে দীক্ষা দিতে একটু ইতস্ততঃ ভাব দেখাইয়া বলিতেছেন, 'তোমাদের কুলগুরু আছেন তো? আর এত তাড়াতাড়িই বা কেন? আমার শরীর তত ভাল নয়। এখানে বড় ঝামেলায় আছি। না হয় কলকাতা গেলে তখন সেখানে দীক্ষা হবে।'

মা এই সকল কথা বলিতে থাকায় উক্ত যুবকটি বলিয়া উঠিল, 'হাঁ মা, বুঝতে পেরেছি। আমি বাগদীর ছেলে কিনা, তাই "বাগদীর মা" হতে একটু কিন্তু করছেন। কিন্তু সেই তেলো-ভোলার মাঠে আপনার "বাগদীর মেয়ে" হতে কিছুই বাধে নাই।' মা একটু একটু হাসিতে লাগিলেন, কিছু বলিলেন না। একটু পরে বলিলেন, 'আচ্ছা বাবা, কাল সকালে স্নান ক'রে তৈরী থেকো। ঠাকুরের পূজার পর এরা তোমাকে ডেকে আনবে।'

পরদিন ঠাকুরপূজার পর মা আমাদিগকে বলিলেন, 'ছেলেটিকে ডেকে আনো।' ঐ দিন সকালে কালী-মামা হলদি গ্রামে দোকানে গিয়াছেন, নলিনীদিও ঐ সময়ে স্নান করিতে বাহির হইয়া গিয়াছেন। উঁহারা জানিতে পারিলে হইচই করিতে পারেন—মায়ের এইরূপ আশঙ্কা ছিল। ছেলেটির দীক্ষা হইয়া গেল।

দীক্ষার পর দুপুর বেলা আরামবাগের ডাঃ প্রভাতকরবাবু হাতজোড় করিয়া আমাদিগকে বলিতেছেন, 'দাদা, বেটা বাগদীর পো যেন লাঠির জোরেই আদায় করলে গো!'

৩

কামারপুকুর হইতে পূজনীয় শিবুদা শ্রীশ্রীমায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আজ বেলা প্রায় বারটা নাগাত জয়রামবাটীতে আসিয়া মাকে প্রণাম করিলেন। কুশল প্রশ্নাদির পর শিবুদাকে বলিতেছেন, 'এত বেলা হ'ল কেন, শিবু? সকাল ক'রে না এসে এত দেরি করলি কেন? রোদে কষ্ট হল!' শিবুদা বলিতেছেন, 'রঘুবীরের শীতলার সেবা পূজা ভোগ সব সেরে আসতে দেরি হয়ে গেল, খুড়ীমা, আর ছোট বেলা—' ইত্যাদি। শ্রীশ্রীমা বলিতেছেন, 'হাত-পা ধুয়ে বরদাদের ঘরে একটু বিশ্রাম করগে।' আমরা তাঁহাকে তামাক সাজিয়া দিলাম। একটু পরেই আমরা সকলে তাঁহাকে লইয়া আহার করিতে বসিলাম।

আহারের পর শ্রীশ্রীমা বলিতেছেন, 'শিবু, যা, বরদাদের কাছেই বিশ্রাম কর। বেলা পড়লে যাবার সময় রঘুবীরের জন্যে কিছু ফল-টল বেঁধে দেব, নিয়ে যাবি।' শিবুদা বলিতেছেন, 'তা রঘুবীরের জন্য ফল যা দিবে নিয়ে যাব, তবে আজ আর যাবোনি খুড়ীমা, আজ তোমার কাছেই এখানে থাকবো, কাল সকালে যাবো।' মা বলিতেছেন, 'কি করে থাকবি? বাড়িতে রঘুবীরের, শীতলার সন্ধ্যারতি, শীতল আছে; তার কি ব্যবস্থা হবে?' শিবুদা বলিতেছেন, 'তা খুড়ীমা, সে সব সেরে এসেছি। আরতি ক'রে শীতল দিয়ে, শয়ন দিয়ে লেপ-কাঁথা ঢাকা দিয়ে তোমার কাছে এখানে থাকবো বলেই সব সেরে রেখে এসেছি। কাল সকালে গিয়ে শয়ন থেকে তুলে পূজো করবো।'

মা উহা শুনিয়া বলিতেছেন, 'সে কি রে? তোরা থাকতেই যদি রঘুবীরের শীতলার সেবা-পূজা এভাবে হয়, তবে পরে ছেলেরা কি করবে, কিভাবে হবে? শুনিস নি, আমার শ্বশুরমশায় কত শ্রদ্ধা-ভক্তি নিয়ে

রঘুবীরের সেবা-পূজা করতেন!' শিবুদা বলিতেছেন, 'তা হোক, খুড়ীমা, একদিন তো। আজ তোমার কাছে এখানে না থেকে যাবোনি।'

এই কথা বলিতে বলিতে আমাদের ঘরে আসিয়া তামাক খাইয়া একটু শুইয়া পড়িলেন। ইতিমধ্যে মা কতকগুলি ফল ও কিছু শাক-সবজি আনাজ দিয়া একটি ছোট পুঁটলি বাঁধিয়া বেলা ৩।৪টা নাগাত শিবুদাকে ডাকাইয়া আমাকে বলিতেছেন, 'এই পুঁটলিটি নিয়ে শিবুর সঙ্গে গিয়ে নদী পার হয়ে অমরপুর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এসোগে।'

মা শিবুদাকে বলিতেছেন, 'রঘুবীরকে শয়ন থেকে তুলে আবার সন্ধ্যারতি ক'রে শীতল দিগে যা। ও যা করেছিস যেন দুপুরে বিশ্রাম নেওয়া হ'ল। চিন্তা কি? দক্ষিণেশ্বরে যাবি তো? আবার দেখা হবে।'

শিবুদা আর বিশেষ আপত্তি জানাইলেন না। শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিয়া চোখ ছলছল করিতে করিতে লাঠিটি হাতে লইয়া আমার সহিত রওনা হইলেন। অমরপুর পর্যন্ত আমি শিবুদার সঙ্গে গেলাম, তিনি একটি কথাও বলিলেন না। আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পুঁটলিটি তাঁহার হাতে দিয়া ফিরিয়া আসিলাম।

আসিয়া দেখি, মা কাপড় কাচিয়া কুটনা লইয়া বসিয়াছেন। আমি হাত-পা ধুইয়া মায়ের কাছে বসিয়া আছি, এমন সময় শিবুদা পুঁটলিটি বগলে ও লাঠিটি হাতে লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন এবং পুঁটলি ও লাঠি পাশে নামাইয়া রাখিয়া কাঁদ-কাঁদ হইয়া মায়ের চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতে যাইবেন, ইত্যবসরে শিবুদার ভাব দেখিয়া মা বঁটিটি সরাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছেন।

শিবুদা সাষ্টাঙ্গ হইয়া মায়ের পায়ে মাথা রাখিয়া কাঁদিতেছেন, আর বলিতেছেন, 'মা, আমার কি হবে বলো! তোমার কাছে শুনতে চাই।' মা বলিতেছেন, 'শিবু ওঠ। তোর আবার ভাবনা কি? ঠাকুরের অত সেবা করলি! তিনি তোকে ভালবেসেছেন, তোর আর চিন্তা কি? তুই তো জীবন্মুক্ত হয়ে আছিস।'

শিবুদা বলিতেছেন, 'না, আপনি আমার সকল ভার নিন—ইহকাল ও পরকালের ভার নিন। আর আপনি যা বলেছিলেন, আপনি তাই কিনা আবার এখন বলুন।' মা যতই শিবুদার মাথায় চিবুকে হাত দিয়া শান্ত করিতেছেন তিনি ততই গদ্‌গদভাবে অশ্রু বিসর্জন করিয়া বলিতেছেন, 'বলুন, আপনি আমার সকল ভার নিয়েছেন। আর বলুন, আপনি সাক্ষাৎ মা-কালী কিনা।'

এই ব্যাপারে শ্রীশ্রীমা যেন একটু বিব্রত ও বিচলিত হইলেন, কিন্তু শিবুদার ঐ দৃঢ়ভাব ও ব্যাকুলতায় মা শিবুদার মাথায় হাত দিয়া শান্ত ও একটু গম্ভীরভাবে ধীরে ধীরে বলিলেন, 'হ্যাঁ তাই।' শিবুদা তখন হাঁটু গাড়িয়া কর-জোড়ে 'সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে…' শ্লোকটি উচ্চারণ করিয়া প্রণামান্তে উঠিয়া চোখের জল মুছিলেন।…ধীরে ধীরে পুনরায় পুঁটলিটি বগলে করিয়া লাঠিটি হাতে লইয়া শিবুদা রওনা হইবেন, এমন সময় শ্রীশ্রীমা বলিতেছেন, "পুঁটলিটি বরদাকে দাও, বরদা আবার অমরপুর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসবে।'*

---

* স্বামী ঈশানানন্দ-রচিত 'মাতৃ-সান্নিধ্যে' গ্রন্থ হইতে সংকলিত।

শ্রীসারদারামকৃষ্ণাষ্টকম্

স্বামী ধ্যানানন্দ

করুণাঘনমূর্তিধরৌ
ভবতাপহরৌ নিরবধিতৃপ্তিকরৌ
নিরুপমপরমানন্দৌ
নৌমি সারদারামকৃষ্ণৌ ॥১

সর্বেশ্বরৌ স্বতন্ত্রৌ
সর্বাশ্রয়ৌ সর্বচরাচরস্থৌ।
সমস্তকর্মসাক্ষিণৌ
শ্রয়ে সারদারামকৃষ্ণৌ ॥২

ভগবদ্‌ভক্তিদায়কৌ
ভ্রান্তিকামকর্মক্লেশনাশকৌ।
ভারূপৌ ভীতিহরৌ
ভজে সারদারামকৃষ্ণৌ ॥৩

জয়তাং ক্ষমাবিগ্রহৌ
কটাক্ষপাপিনিখিলপাপহারিণৌ।
সুকৃতিপুণ্যবিবর্ধনৌ
শিবদসারদারামকৃষ্ণৌ ॥৪

ক্বচিৎ সীতারাঘবৌ
ক্বচিদ্ রাধিকাগোপীপ্রিয়ৌ।
সারদারামকৃষ্ণৌ
পরমার্থতঃ পরমং জ্যোতিরেকম্ ॥৫

চিরতাপিতদীনজনে
কৃপয়া প্রাপ্তচরণাশ্রয়ণে।
অভাজনে ময়ি নিতরাং
প্রসীদতাং সারদারামকৃষ্ণৌ ॥৬

ঈড়ে মঙ্গললীলৌ
কালাবাধিতসুখোপাস্যরূপৌ।
অগণিতশুভগুণাকরৌ
বরদসারদারামকৃষ্ণৌ ॥৭

সুচারুচরণপঙ্কজে
সুরনরবিনম্রভাবপরিশীলিতে।
যাচে পরমপাবনৌ
রতিং সারদারামকৃষ্ণৌ ॥৮

আর্যাষ্টকমিদং পুণ্যং ভক্তাভীষ্টপ্রদায়কম্।
পঠ্যতাং গীয়তাং নিত্যং সর্বৈঃ শ্রদ্ধাসমন্বিতৈঃ ॥

আমাদের শিক্ষাদর্শ

স্বামী তেজসানন্দ

বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ আমরা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি—সমাজ, অর্থনীতি, শিক্ষা ও রাজনীতির ক্ষেত্রে একটি প্রচণ্ড অসন্তোষ-বহ্নি বিভিন্ন ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। গভীর পরিতাপের বিষয় যে, এই অসন্তোষ-বহ্নি স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে খুবই ভয়ঙ্কর রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, যাহার ফলে দেশের শান্তিপূর্ণ সামগ্রিক উন্নতি গুরুতরভাবে ব্যাহত হইতেছে। দেখিতে পাওয়া যায়—প্রায় প্রতিদিনই দেশের কোথাও না কোথাও হরতাল, কর্মবিরতি প্রভৃতির একটা না একটা লাগিয়াই রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে সাধারণ লোক হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির জীবনের প্রতিক্ষেত্রে ইহার প্রভাব বিস্তার লাভ করিয়াছে। বলা বাহুল্য, যে-শিক্ষিত যুব-সম্প্রদায়ের উপর ভারতের ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিবার গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত, তাহারাই এই সকল আত্মঘাতী ঘটনা-পরম্পরার আবর্তে পড়িয়া প্রকৃত আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইতেছে এবং তাহাদের নিজেদের ব্যক্তিগত কল্যাণ তথা দেশের সমষ্টিগত কল্যাণের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে।

ইহা অনস্বীকার্য যে, স্বাধীনতালাভের পর হইতে সুদীর্ঘ একুশ বৎসরের মধ্যে ভারতের কর্ণধারগণের কতিপয় উন্নয়ন-মূলক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সত্ত্বেও শিক্ষাক্ষেত্রে দেশ বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। শিক্ষাজগতে যে তাণ্ডবলীলা চলিতেছে, ইহার প্রকৃত কারণ নির্ধারণ করিতে না পারিলে দেশের ভবিষ্যৎ যে আরও অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িবে তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। সাময়িকভাবে কতিপয় প্রতিকারমূলক নিয়মকানুন করিয়া এই ব্যাধির প্রকোপ হইতে দেশকে রক্ষা করা সম্ভব নহে। অগ্নি-উদ্গীরণকারী আগ্নেয়গিরিকে বারিসিঞ্চনে নির্বাপিত করার প্রয়াস বাতুলতামাত্র।

এই অসন্তোষ ও উচ্ছৃঙ্খলতার প্রকৃত কারণ যাহাই হউক, রাজনীতিক্ষেত্রে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা যে শিক্ষাজগতে বিষময় আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। ইহা আমাদের তিক্ত অভিজ্ঞতা যে, স্কুল-কলেজের রীতিনীতি ও শৃঙ্খলা চূর্ণ করিয়া ছাত্রবৃন্দ মাঝে মাঝে বিশ্ববিদ্যালয় ও তদন্তর্গত শিক্ষায়তনসমূহকে বীভৎসতা ও অরাজকতার লীলা-নিকেতন করিয়া তোলে। ইহা শুধু পশ্চিমবঙ্গের চতুঃসীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশেও ছাত্র-আন্দোলন এবং অবাঞ্ছিত কার্যকলাপ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সর্বোপরি যাঁহাদের উপর বিদ্যার্থিগণের প্রকৃত শিক্ষা ও নৈতিক চরিত্র গঠনের দায়িত্ব নির্ভর করে, সেই শিক্ষকগণের কাহারও কাহারও অশোভন আচরণ ছাত্রসমাজের নিকট প্রকট হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলিয়াছেন,—"যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ। স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে॥" —অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা যাহা আচরণ করিয়া থাকেন, প্রাকৃত লোকসকলও তাহাই অনুসরণ করিয়া থাকে। সেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা প্রমাণ বলিয়া স্থির করেন, সাধারণ লোক তাহাকে প্রমাণ বলিয়া অনুসরণ করিয়া থাকে। খুবই দুঃখের বিষয়,—

যাঁহারা সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদেরও সন্তান-সন্ততি দলবদ্ধ হইয়া অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া এই কণ্টকাকীর্ণ বিপদসঙ্কুল পথে পদক্ষেপ করিতে শুরু করিয়াছে। যাহারা এখন বিদ্যার্থী তাহারাই যে অদূর ভবিষ্যতে দায়িত্বশীল নাগরিক হইবে এবং তাহাদের উপরই যে মাতৃভূমির অগণিত অশিক্ষিত ও নিপীড়িত জনগণের নিরক্ষরতা ও কুসংস্কার বিদূরিত করিবার ভার রহিয়াছে, তাহা উত্তেজনার বশে তাহারা সম্পূর্ণ ভুলিতে বসিয়াছে।

ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, দেশময় বর্তমান যে শিক্ষা-পদ্ধতি প্রবর্তিত রহিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে নূতন ছাঁচে ঢালিয়া গড়িতে হইবে। রাধাকৃষ্ণন কমিশন (১৯৪৫-৪৯), মুদালিয়ার কমিশন (১৯৫২-৫৩), ১৯৫৯ সালের ৬ই নভেম্বর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে তদানীন্তন রেক্টর ডঃ ত্রিগুণা সেন (বর্তমান কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী) কর্তৃক আহূত শিক্ষাবিদগণের সম্মেলন, ১৯৬১ সালে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন দ্বারা গঠিত কমিটি ও অন্যান্য ক্ষুদ্র-বৃহৎ সম্মেলন এই শিক্ষাসংস্কার-সাধনের ও বহুমুখী সমস্যাসমাধানের জন্য বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। সেই প্রসঙ্গে তাঁহারা ইহাও দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়াছেন যে, ছাত্র ও শিক্ষকগণকে রাজনীতি হইতে সম্পূর্ণরূপে দূরে থাকিতে হইবে। ভারতসরকারের ভূতপূর্ব শিক্ষামন্ত্রী ডঃ শ্রীমালী স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন—এই শিক্ষাসংকট পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, একদিকে যেমন পিতামাতা তাঁহাদের সন্তানগণকে সংযত জীবন যাপন করাইতে অসমর্থ, অপরদিকে শিক্ষকগণও তাঁহাদের সমুন্নত চরিত্র ও সুসংযত জীবন দিয়া ছাত্রগণের শ্রদ্ধা, প্রীতি ও ভালবাসা আকর্ষণ করিতে অপারগ। অধিকন্তু, শিক্ষকগণের অনেকের অবাঞ্ছিত আচরণ প্রকারান্তরে ছাত্রগণকেও ঐভাবে প্রণোদিত করিতেছে। আর এই বিশৃঙ্খলার সুযোগ গ্রহণ করিয়া তথাকথিত রাজনৈতিক দল স্ব স্ব স্বার্থসিদ্ধির জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে! যে-সকল শিক্ষাবিদ্ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছিলেন যে, শিক্ষকগণ কোন রাজনীতি-সংস্থার সভ্য হইতে পারিবেন না এবং বিদ্যায়তনের বিদ্যার্থিবৃন্দের নিকট প্ররোচনামূলক কোন রাজনীতিবিষয়ক আলোচনাও করিবেন না। বরং তাঁহারা ছাত্রগণকে বিপথগামী হইতে দেখিলে ব্যক্তিগতভাবে ও সমবেতভাবে তাহার প্রতিবিধান করিতে সচেষ্ট হইবেন। কারণ, ছাত্রদের কল্যাণ তাঁহাদেরই শিক্ষা ও আচরণের উপর নির্ভর করে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গত সমাবর্তন-উৎসব উপলক্ষে জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহোদয়ও সুস্পষ্টভাবে ঠিক এই কথাই দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়াছেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সকল চিন্তাশীল ব্যক্তির সময়োপযোগী সাবধান-বাণী ও নির্দেশসমূহ শিক্ষকমণ্ডলীর হৃদয়ে আশানুরূপ রেখাপাত করিতে সমর্থ হয় নাই। তাহার ফলও হইয়াছে বিষময়। এই সম্পর্কে পূর্বোক্ত বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন দ্বারা গঠিত কমিটির বিবরণী (Report on the standards of University Education) আংশিকভাবে নিম্নে প্রদত্ত হইল। বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, ভারতের বর্তমান অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ে সুদূরপ্রসারী অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে সামগ্রিক উন্নতিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা হয় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। উপরি-উক্ত কমিটির মূল বক্তব্য এই

যে, বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি শক্তিশালী জীবন্ত শিক্ষাক্ষেত্রে পরিণত করিতে হইলে ইহাকে আদর্শ শিক্ষক ও আদর্শ ছাত্র গড়িয়া তুলিতে হইবে, যাহাতে তাহারা দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে নিবিড় পরিচয় লাভ করিয়া সর্বসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা দূর করিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে পারে। তবেই বাস্তবিকপক্ষে সমাজকে সজীব ও গতিশীল রাখা সম্ভব হইবে। কারণ, পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সম্বন্ধ না রাখিয়া শিক্ষালাভ করিলে তাহারা সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে এবং তাহার ফলে তাহারা প্রকৃত দায়িত্বশীল নাগরিক হইয়া উঠিতে পারিবে না।

বর্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠ মনীষী ও স্বদেশ-প্রেমিক স্বামী বিবেকানন্দ ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতীয় জীবন যে কিরূপ বিপর্যস্ত হইয়াছিল, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া জন্মভূমির গৌরব-পুনরুদ্ধারকল্পে বর্তমান প্রগতিশীল জগতের সঙ্গে তাল রাখিয়া শিক্ষায়তনগুলিকে গড়িয়া তুলিবার যে পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার সারগর্ভ বাণী ও রচনা হইতে কতকটা অনুধাবন করা যাইতে পারে। তিনি বলিয়াছেন: ভারতীয় আদর্শকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শিক্ষার সংমিশ্রণে যে সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিবে তাহাই বর্তমান ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের সহায়ক হইবে। চাই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সঙ্গে বেদান্ত, আর মূলমন্ত্র ব্রহ্মচর্য, শ্রদ্ধা ও আত্মপ্রত্যয়। মানুষের ভিতর যে পূর্ণত্ব প্রথম হইতেই বিদ্যমান তাহারই বিকাশসাধনকে বলে শিক্ষা। সুতরাং উপদেষ্টার কর্তব্য কেবল পথ হইতে বাধাবিঘ্নগুলি সরাইয়া দেওয়া। যদি শিক্ষা বলিতে কতকগুলি বিষয় জানা মাত্র বুঝায়, তবে লাইব্রেরীগুলি তো জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাধু, অভিধানসমূহই তো ঋষি। সুতরাং আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত যে, আমাদের আধ্যাত্মিক ও লৌকিক সর্বপ্রকার শিক্ষা আমাদের নিজেদের হাতে লইতে হইবে এবং যতদূর সম্ভব জাতীয়ভাবে ঐ শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে। শিক্ষাটি সংস্কারে পরিণত হইয়া ধমনীগত হইলে তবে তাহাকে শিক্ষা বলে। যে বিদ্যার উন্মেষে ইতরসাধারণকে জীবন-সংগ্রামে সমর্থ করিতে পারা যায় না, যাহাতে মানুষের চরিত্রবল, নিঃস্বার্থপরতা ও সিংহসাহসিকতা বৃদ্ধি পায় না, তাহাকে প্রকৃত শিক্ষা নামে অভিহিত করা চলে না।

স্বামীজী আরও বলিয়াছেন: যে-কোন উপদেশ দুর্বলতা শিক্ষা দেয় তাহাতে আমার বিশেষ আপত্তি। নরনারী, বালকবালিকা যখন দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা পাইতেছে, আমি তাহাদিগকে এই একই প্রশ্ন করিয়া থাকি—তোমরা কি বল পাইতেছ? কারণ, আমি জানি সত্যই একমাত্র বল প্রদান করে। আমি জানি সত্যই একমাত্র প্রাণপ্রদ, সত্যের দিকে না গেলে কিছুতেই বীর্যলাভ হইবে না, আর বীর না হইলেও সত্যে যাওয়া যাইবে না। শিক্ষা বলিতে বুঝায় মানুষকে এমনভাবে গঠিত করা যাহাতে তাহার ইচ্ছা সদ্বিষয়ে ধাবিত ও সুসিদ্ধ হয়।

স্বামীজী বলিতেন: যদি জাতীয় জীবনকে অব্যাহত রাখিতে চাও, তবে তোমাদিগকে ধর্মরক্ষায় সচেষ্ট হইতে হইবে। এক হস্তে দৃঢ়-ভাবে ধর্মকে ধরিয়া, অপর হস্ত প্রসারিত করিয়া অন্যান্য জাতির নিকট যাহা শিক্ষা করিবার তাহা শিক্ষা কর। কিন্তু মনে রাখিও, সেই-গুলিকে জাতীয় জীবনের মূল আদর্শের অনুগত রাখিতে হইবে—তবেই ভবিষ্যৎ ভারত অপূর্ব

মহিমামণ্ডিত হইয়া আবির্ভূত হইবে। ভূয়োদর্শী স্বামীজী ইহাও প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, যে-জাতির মধ্যে জনসাধারণের ভিতর বিদ্যাবুদ্ধি যত পরিমাণে প্রসারিত, সে-জাতি তত পরিমাণে উন্নত। যদি পুনরায় আমাদিগকে উঠিতে হয়, উঠিতে হইবে ঐ পথ ধরিয়া অর্থাৎ সাধারণ জনগণের মধ্যে বিদ্যা প্রচার করিয়া। তিনি আরও বলিয়াছেন: বেদান্তের অমোঘ মন্ত্রবলে এদের জাগাব। 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'—এই অভয়বাণী শোনাইতেই আমার জন্ম। আমার বিশ্বাস যে, যদি কেহ হতশ্রী, বিগতভাগ্য, লুপ্তবুদ্ধি, পরপদদলিত, চিরবুভুক্ষিত ভারতবাসীকে প্রাণের সহিত ভালবাসে, তবে ভারত আবার জাগিবে। যখন শত শত মহাপ্রাণ নরনারী সকল বিলাস-ভোগ সুখেচ্ছা বিসর্জন করিয়া কায়মনোবাক্যে দারিদ্র্য ও মূর্খতার ঘূর্ণাবর্তে উত্তরোত্তর নিমজ্জমান কোটি কোটি স্বদেশীয় নরনারীর কল্যাণ কামনা করিবে, তখন ভারত জাগিবে। তিনি বলিয়াছেন—আমি তোমাদের নিকট গরীব, অজ্ঞ, অত্যাচার-পীড়িতদের জন্য এই সহানুভূতি, এই প্রাণপণ চেষ্টা দায়স্বরূপ অর্পণ করিতেছি—তোমরা এই ত্রিশকোটি ভারতবাসীর উদ্ধারের জন্য ব্রত গ্রহণ কর—যাহারা দিন দিন ডুবিতেছে।

প্রত্যেক জাতির একটা না একটা বিশেষ ঝোঁক আছে। প্রত্যেক জাতিরই এক বিশেষ জীবনোদ্দেশ্য থাকে, প্রত্যেক জাতিকেই সমগ্র মানবজাতির জীবনকে সর্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য কোন এক ব্রতবিশেষ পালন করিতে হয়; নিজ নিজ জীবনোদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করিয়া প্রত্যেক জাতিকেই সেই সেই ব্রত উদ্‌যাপন করিতে হয়। রাজনৈতিক বা সামরিক শ্রেষ্ঠতা কোনকালে আমাদের জাতীয় জীবনোদ্দেশ্য নহে—কখনও ছিল না, আর কখনও হইবেও না। তবে আমাদের অন্য জাতীয় জীবনোদ্দেশ্য আছে। তাহা এই—সমগ্র জাতির আধ্যাত্মিক শক্তি একত্রীভূত করিয়া যেন এক বিদ্যুদাধারে রক্ষা করা এবং যখনই সুযোগ উপস্থিত হয়, তখনই সেই শক্তির বন্যায় সমগ্র জগৎকে প্লাবিত করা।

আমাদের বর্তমান বিদ্যালয়গুলি কেবল পরীক্ষা-সংঘরূপে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে ভারতের কৃষ্টি বিশেষভাবে প্রকটিত করিতে হইবে এবং যাবতীয় শিক্ষায়তনগুলিই উহার প্রসারণের যন্ত্রস্বরূপ হইবে। স্বামী বিবেকানন্দ আদর্শবাদী হইয়াও বাস্তববাদী ছিলেন, তাই তিনি ভারতের লুপ্ত-গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন এবং জাতীয় আদর্শে বিদ্যায়তনগুলি গড়িয়া তুলিবার নির্দেশ দিয়াছেন। কিন্তু এখন প্রশ্ন এই—বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ও তদন্তর্গত শিক্ষা-কেন্দ্রসমূহ এই গুরুদায়িত্ব বহন করিতেছে কি? শিক্ষকগণ সবুজপ্রাণ যুবকগণের প্রকৃত শিক্ষার জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন কি? যাঁহারা সমাজের ও জাতীয় জীবনের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, তাঁহারা স্ব স্ব স্বার্থ বিসর্জন দিয়া দেশের জনগণের শিক্ষাব্যবস্থার জন্য ব্রতী হইয়াছেন কি?

যে-সকল ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া বাহির হইবে, তাহারা ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য ও অবদান এবং শিল্প, দর্শন ও বিজ্ঞানাদির ক্ষেত্রে ভারত কিরূপ উন্নতি সাধন করিয়াছিল তাহার সহিত সুপরিচিত থাকিবে। ইহা তখনই সম্ভব যখন তাহাদের শিক্ষিতব্য বিষয়ের মধ্যে এই সকল বিষয় আবশ্যিক পাঠ্যরূপে পরিগণিত হইবে। বস্তুতঃ ভারতের বর্তমান শিক্ষায় সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচিত হইবার বিশেষ

কোন ব্যবস্থা নাই। উন্নতিকামী ভারতে শিক্ষার্থীকে তিনটি জিনিস বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে: প্রথমতঃ, তাহারা যেন দেশবাসীর জীবনের সুখ-দুঃখের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সহানুভূতিসম্পন্ন হয় এবং নিজদিগকে উচ্চ-শিক্ষিত মনে করিয়া সকলের নিকট হইতে তাহাদিগকে পৃথক করিয়া না রাখে। দ্বিতীয়তঃ, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কর্তব্য হইবে—চিরাচরিত প্রথায় চালিত মৃতপ্রায় সমাজকে আধুনিক উন্নতিশীল করিয়া তোলা। তৃতীয়তঃ, বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিশেষ কর্তব্য হইবে—চারিপার্শ্বের সমস্যাসমূহ অনুধাবন ও অনুসন্ধান করিয়া তাহার একটি বাস্তব সমাধান খুঁজিয়া বাহির করা।

ইহা ভুলিলে চলিবে না যে, প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয় একটি সর্বজনীন শিক্ষাকেন্দ্র এবং ইহার জ্ঞানাহরণের ক্ষেত্র সীমিত নহে। জ্ঞানার্জনের প্রয়োজনে পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ—এইরূপ কোন ভেদ থাকিবে না। বিশ্ববিদ্যালয় এমন কিছু প্রবর্তন করিবে না যাহাতে সমগ্র জগতের বিদগ্ধ সমাজ ও বিজ্ঞানীদের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। পরন্তু বিশ্বের সর্বস্থান হইতে জ্ঞান আহরন করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে সকলকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে।

ভগিনী নিবেদিতার শিক্ষাদর্শও তদীয় আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষারই অনুবর্তী ছিল। নিবেদিতা আজীবন অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিয়া এবং দেশ-দেশান্তরের বিভিন্ন শিক্ষাপদ্ধতির সঙ্গে পরিচিতা হইয়া যে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন, ভারতীয় শিক্ষাবেদীমূলে তাহা সম্পূর্ণ উৎসর্গ করিয়া উহার সার্থক রূপায়ণ করিয়াছিলেন। নিবেদিতা তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ 'Hints on National Education in India'-গ্রন্থে লিখিয়াছেন: কেবল শুষ্ক পুঁথিগত বিদ্যা ও ঘটনাপুঞ্জ দ্বারা বুদ্ধিকে ভারাক্রান্ত করাকেই শিক্ষা নামে অভিহিত করা চলে না। শিক্ষা বলিতে প্রাণদ তথা জীবন্ত ভাবরাশিকেই বুঝায়, যাহা বালক-বালিকার মন, বুদ্ধি, হৃদয় ও ইচ্ছাশক্তিকে বিকশিত ও পরিমার্জিত করে। তিনি আবার বলিতেছেন—যে-সত্য লাভ করিলে আমাদের জীবনকে সরস ও আনন্দময় করিয়া তোলা সম্ভব, সেই সত্যনিষ্ঠা ও সাবলীল চিন্তাশীলতা যে পর্যন্ত আমাদের শিক্ষার মূলমন্ত্র হইয়া না দাঁড়ায়, ততদিন আমাদের হৃদয় ও বুদ্ধির দ্বার কোন মহৎ কার্য ও উচ্চচিন্তার দিকে উন্মুক্ত হইবে না।

নিবেদিতার পরিকল্পিত শিক্ষার পূর্ণ পরিণতি সেবায় ও আত্মত্যাগে। তাই তিনি লিখিয়াছেন—আত্মত্যাগই প্রকৃত বীরহৃদয়ের চিরন্তন সঙ্গীত ও শাশ্বত প্রেরণা। ইহাই মানুষকে এক নিমিষে অসীমের সঙ্গে অভিন্ন করিয়া দেয়। বলা বাহুল্য, যে-জাতি সর্বসাধারণের মধ্য হইতে এমনি করিয়া হৃদয়বান নিঃস্বার্থ প্রেমিক গড়িয়া তুলিতে পারে, সে-জাতির উন্নতি অনিবার্য, তাহার শিক্ষা সার্থক। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সর্বসাধারণের শিক্ষা কেবল এক শুভ কামনা বা কল্পনায় সীমাবদ্ধ না থাকিয়া নিজের একটা মহান কর্তব্য-রূপে, দায়রূপে যে-দিন স্বেচ্ছায় গৃহীত হইবে, সেই দিন প্রকৃত শিক্ষাব্রত-উদ্‌যাপন সম্ভব হইবে। জীবনের উচ্চচিন্তার দ্বার রুদ্ধ করা নরহত্যা অপেক্ষাও গুরুতর অপরাধ। তাই নিঃশেষে নিজেকে বিলাইয়া দিয়া জনসাধারণের শিক্ষায় আত্মোৎসর্গ করাই সকলের প্রধান কর্তব্য।

নিবেদিতার মতে শিক্ষা কেবল জাতীয়তা-বোধকেই জাগাইবে না, পরন্তু উহা জাতি-গঠনমূলকও হইবে। জাতীয়তাবোধকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষা আরম্ভ হইলেই দেশকে অন্তর দিয়া ভালবাসা ও সেবা করা সম্ভব। তাই তিনি শিক্ষার প্রথম সোপানে আন্তর্জাতিকতাকে বড় একটা উচ্চ আসন দেন নাই। কারণ, তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, স্বদেশপ্রীতির ভিত্তি-ভূমিতে দৃঢ় হইয়া দাঁড়াইতে না পারিলে বা দেশের সংস্কৃতি ও আদর্শকে শ্রদ্ধা করিতে না শিখিলে, প্রথম হইতেই শুধু আন্তর্জাতিকতার দৃষ্টিভঙ্গীতে সব দেখিতে শুরু করিলে উহা দ্বারা স্বদেশের প্রতি আন্তরিক প্রীতি জাগিবে না—দেশবাসীরও কল্যাণ সাধিত হইবে না, বরং জাতীয়তাবোধের ভিত্তি শিথিল হইয়া যাইবে। জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন স্বাভাবিকভাবে অভিজ্ঞতার পরিধি বিস্তার লাভ করিবে, অন্তরের দেবতা যখন জাগ্রত হইবেন, তখন বিশ্বের দিকে হৃদয় স্বতই উন্মুখ হইয়া উঠিবে, পুঁথি-পুস্তকের ভিতর দিয়া আন্তর্জাতিকতা শিখাইবার আর প্রয়োজন হইবে না।

বৃক্ষের শাখা-পল্লবের বিচিত্র বিস্তার ভিতরের প্রাণশক্তিকে অবলম্বন করিয়াই হইয়া থাকে। মানবজীবনেও এই নৈসর্গিক নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় না। শিক্ষাবিষয়ে স্বীয় মন-বুদ্ধিকে স্বদেশী ভাবধারায় পরিপুষ্ট না করিয়া যেখানে প্রথম হইতেই বিদেশী আদর্শে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা হয়, সেখানে অপরিচিত গৃহে পথে-কুড়াইয়া-পাওয়া বালকের শিক্ষার মতোই হইয়া থাকে তাহার জীবন। সেখানে কৃতজ্ঞতা থাকিতে পারে, উপকারীকে কর্তব্যবোধে সেবা করিবার প্রবৃত্তিও জাগিয়া উঠিতে পারে, কিন্তু সেখানে স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমের প্রেরণার যে একান্ত অভাব তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ নিজের জীবন-ভিত্তি দৃঢ় হইলেই বিদেশী শিক্ষা অঙ্গের ভূষণ হইয়া দাঁড়ায় এবং বিদেশী সভ্যতা ও সংস্কৃতির উৎকৃষ্ট ভাব-সম্পদ গ্রহণ করিয়া মানুষ তখন উদারভাবাপন্ন হইতে সমর্থ হয়। দেশের সার্বভৌম আদর্শ ধর্ম ও দর্শন, যাহা আমাদের সমাজগঠনের অফুরন্ত উপাদান, তাহার প্রতি শ্রদ্ধাহীন হওয়ার ফলেই আমাদের নৈতিক ও সামাজিক জীবন এতটা নিম্নস্তরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধেও নিবেদিতার আদর্শ তাঁহার গুরু স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শের অনুরূপ। ভারতের কোমলপ্রাণ নারীজাতির অজ্ঞতা ও দুর্বলতা-দর্শনে নিবেদিতা ব্যথিতা হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন যে, একটা জাতিকে যদি বাঁচিতে হয়, তবে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের সমবেত শিক্ষা ও শক্তির সাহায্যেই তাহা সম্ভব হইবে। তাই তিনি ক্ষুব্ধচিত্তে বলিয়াছেন—অজ্ঞতা ও কুসংস্কারে নিমগ্ন, বিধি-নিষেধের নির্মম কশাঘাতে জর্জরিত যে মাতৃজাতি যুগযুগান্তর ধরিয়া মৃতকল্প হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, যেখানে প্রাণের স্পন্দন ক্ষীণ ও স্তব্ধীভূত হইয়া গিয়াছে, সেই মাতৃজাতির প্রকৃত শিক্ষার ব্যবস্থা না হইলে ভারতমাতার রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত হইবে না। লাঞ্ছনামলিন নারীজাতিকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া আমরা যেদিন তাহাকে গৌরবাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিব, সেইদিন ভারতমাতার শত-শতাব্দীর অজ্ঞান-অবগুণ্ঠন উন্মোচিত হইবে, প্রভাত-সূর্যের বিমল কিরণে মাতৃমন্দির উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে, জাগরণের উষাদীপ্তি উজ্জ্বল হইবে। তখনই সুজলা সুফলা এই ভারতমাতার বিশাল প্রাঙ্গণে আবার সহস্র নারীকণ্ঠে সেই উদাত্ত ঋকমন্ত্র ও শৌর্য-বীর্য-গাথা ধ্বনিত হইবে। রত্নপ্রসবিনী

ভারতমাতার গর্ভে আবার ঘোষা ও বাক্, অম্বলা ও ইন্দ্রাণী, মৈত্রেয়ী, সীতা, সাবিত্রী, পদ্মিনী ও রানী ভবানীর আবির্ভাব হইবে। বলা বাহুল্য নিবেদিতা এরূপ স্ত্রী-শিক্ষার প্রবর্তন করিতে চাহিয়াছিলেন, যাহার সাহায্যে আমাদের মাতৃজাতি একদিকে যেমন পবিত্র, সংযত, নিঃস্বার্থ ও ধর্মপরায়ণা হইবে, অপরদিকে তেমনি সমাজ- ও রাষ্ট্রপরিচালনায় কুশলতা অর্জন করিয়া জাতীয় জীবনের পুষ্টিবিধান করিতে সমর্থ হইবে, লক্ষ্যভ্রষ্ট জাতিকে পুনরায় কেন্দ্রস্থ, আত্মস্থ ও জীবন্ত করিয়া তুলিতে পারিবে।

শিক্ষাজগতে আজ যে বিশৃঙ্খলা ও জটিল সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, তাহার সমাধান পূর্বোল্লিখিত চিন্তাশীল মনীষিবর্গের জ্ঞানগর্ভ উপদেশের বাস্তব রূপায়ণের উপর বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। তাঁহাদের মূল্যবান অভিজ্ঞতা, অকুণ্ঠ সাধনা, স্বাধীন উদার মত, স্বদেশপ্রাণতা ও জাতীয়তাবোধই ভারতের জীবনপথের প্রকৃত পাথেয়। যে-দিন উহা যুব-সম্প্রদায়ের জীবন নূতন ছাঁচে গড়িয়া তুলিবার প্রকৃষ্ট উপাদানরূপে গৃহীত হইবে, সেইদিন প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত যুব-সম্প্রদায়ের সমবেত প্রচেষ্টায় দেশের দূষিত আবহাওয়া অনাবিল ও পবিত্র হইবে—শিক্ষাজগতে শান্তি ও শৃঙ্খলা পুনঃ ফিরিয়া আসিবে।—'শিবাঃ সন্তু নঃ পন্থানঃ'।

নিবেদিতা

(গান)

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সরকার

উর্মিমুখর বিপুল সিন্ধু লঙ্ঘিয়া কুতুহলে,
কে তুমি তাপসী সঁপিলে জীবন সন্ন্যাসী-পদতলে।
ত্যাগের মন্ত্রে লইলে দীক্ষা ভোগের দানবে দলি,
নরদেবতার চরণে দানিলে হৃদয়ের অঞ্জলি।
জাতির গর্ব, কুলের গর্ব, সকল গর্ব ছাড়ি,
বিশ্বের বুকে ফুটিয়া উঠিলে তুমি যে বিশ্বনারী।
ওগো তপোময়ী ভারত-ভগিনী জনগণ-বন্দিতা,
সন্ন্যাসী বীর বিবেকানন্দ-নন্দিনী নিবেদিতা।

বল-দর্পিত, ধন-গর্বিত, পশ্চিম পৃথিবীর,
উন্মাদনার কলরোল মাঝে চিত্ত রাখিয়া স্থির,

শুনি ভয়ার্ত চির-নির্জিত আর্তের ক্রন্দন,
ত্যজিলে হেলায় জন্মভূমির সুকঠিন বন্ধন।
ব্যথিতের ব্যথা বহ্নির জ্বালা জ্বলিয়া উঠিল প্রাণে,
মাতিলে মত্ত সিংহীর মত মুক্তির অভিযানে।
ওগো তেজোময়ী ভারত-ভগিনী জনগণ-বন্দিতা,
সন্ন্যাসী বীর বিবেকানন্দ-নন্দিনী নিবেদিতা।

গুরুর চরণে আত্মগরিমা নিঃশেষে করি দান,
ভারতমাতার চরণের তলে অর্পিলে নিজ প্রাণ।
বিদেশ তোমার স্বদেশ হইল পরকে করিলে ভাই,
লক্ষ জনের বক্ষের মাঝে লইলে আপন ঠাঁই।
শিববোধে জীবসেবায় মাতিলে ভুলি ভেদাভেদজ্ঞান,
মানুষের মাঝে লভিলে নিত্য সত্যের সন্ধান।
ওগো সেবাময়ী ভারত-ভগিনী জনগণ-বন্দিতা,
সন্ন্যাসী বীর বিবেকানন্দ-নন্দিনী নিবেদিতা।

রামকৃষ্ণের ধ্যান-নিমগ্না চিত্ত আত্মহারা,
লভিলে খৃষ্ট শিব-শঙ্কর বুদ্ধের জ্ঞানধারা।
নূতন যুগের গার্গী তুমি গো মৈত্রেয়ী মহীয়সী,
ধর্মে ও ধ্যানে, প্রজ্ঞা ও প্রেমে কল্যাণী গরীয়সী।
তব ধমনীর রক্তধারায় বাজে ওঁকার গান,
অন্তরে রাজে নিত্য শুদ্ধ জাগ্রত ভগবান।
ওগো ধ্যানময়ী ভারত-ভগিনী জনগণ-বন্দিতা,
সন্ন্যাসী বীর বিবেকানন্দ-নন্দিনী নিবেদিতা॥

শ্রীশ্রীরাজামহারাজের পুণ্য স্মৃতিকথা

স্বামী জ্ঞানদানন্দ

তখন বিপ্লবী যুগ। বঙ্গভঙ্গ হইয়াছে, চারিদিকে রাখীবন্ধন ও অরন্ধনের ছড়াছড়ি। অগ্নিমন্ত্রের পূজারী ক্ষুদিরাম, কানাই, সত্যেন প্রমুখ শহীদগণ ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। আমার তখন কৈশোরকাল। বুদ্ধির উন্মেষের সহিত দেশমাতৃকার সেবা ও আত্মমুক্তির প্রেরণার উদয় হইতেছে। অনুরাগের প্রথম ঝড়ে হিতাহিত জাগ্রত হয় নাই। বাড়ীতে এক নাগা সন্ন্যাসী উপস্থিত। তিনি কৌপীন পরিয়া দিবারাত্র ধুনির পার্শ্বে বসিয়া ধ্যান করেন। মাঝে মাঝে গঞ্জিকার দরকার হয়। আমিও কৌপীন পরিয়া গায়ে ভস্ম মাখিয়া তাঁহার পার্শ্বের আসন লইলাম। কখনো তাঁহাকে গঞ্জিকা-সেবনে পরিতৃপ্ত করিতাম, কখনো তাঁহার ধুনি জ্বালিবার কাষ্ঠ-সংগ্রহে যাইতাম। এইভাবে ২।৩ দিন অতীত হইল—খুলিল না চিত্তের দুয়ার! মনে হইল সব ছেলেখেলা!!

অতঃপর সন্ত্রাসবাদীদের খাতায় নাম লিখাইলাম। অভিভাবকেরা আমাকে মেজদার কর্মস্থল শিলচরে পাঠাইলেন। নূতন পরিবেশে একটি গুপ্ত সমিতি গঠন করিলাম। আমাদিগকে প্রেরণা দিত দুইখানি পুস্তক—'ভারতে বিবেকানন্দ' ও 'গীতা'। গোয়েন্দাদের তীব্র দৃষ্টি এড়ানো কঠিন হইল। অগত্যা স্বামী নিগমানন্দের খোঁজ করিয়া দেখিয়া ফিরিয়া আসিলাম। পরে অরুণাচলে স্বামী দয়ানন্দের বাৎসরিক উৎসবে 'প্রাণ গৌর নিত্যানন্দ' বলিয়া খুব নাচিলাম, তথাপি হৃদয় মরুভূমিই রহিয়া গেল।

১৯১৪ সালের বন্যা। শিলচরের বিস্তৃত এলাকা জলপ্লাবনে বিপন্ন। বহু লোকের প্রাণহানিও হইতেছে। রামকৃষ্ণ মিশন হইতে সেবাকেন্দ্র খুলিয়াছে। স্বামী ভূমানন্দের নেতৃত্বে অশোক মহারাজ, দেবেন মহারাজ, নগেন ব্রহ্মচারী প্রভৃতি অনেক কর্মী সাধুরা সেবা করিতেছেন। আমরা সাধুদর্শনমানসে ও কর্মপদ্ধতি জানিতে সেবাকেন্দ্রে যাতায়াত করিতে লাগিলাম। স্বামী ভূমানন্দ বিপ্লববাদী যুবকদের সহিত সাধুদের ঘনিষ্ঠতা করিতে নিষেধ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন। কিন্তু আমরা সাধুদের নিকট হইতে 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' নিষ্কাম কর্মে জীবনের ইঙ্গিত ও গন্তব্য পথের সন্ধান পাইলাম। দিনের পর দিন অযাচিত সেবাকার্যে তাঁহাদের সাহায্য করিতে লাগিলাম। রামকৃষ্ণ মিশন রাজনীতির বাহিরে বলিয়া আমরা তখনই সঙ্ঘের অঙ্গ হইতে পারিলাম না।

আমরা শিলচরে ক্ষুদ্রাকারে শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিলাম। মুষ্টিভিক্ষা-লব্ধ আয় হইতে বাড়ীভাড়া প্রভৃতি খরচ চলিত। ক্রমে তহবিলে কিছু অর্থ জমিলে একটি ছাত্রাবাস ও লাইব্রেরী স্থাপিত হইল। এই সময় ঘুরিতে ঘুরিতে ব্রহ্মচারী ধ্রুবচৈতন্যজী [পরে স্বামী বাসুদেবানন্দ] শিলচরে আসিয়া আমাদের আশ্রমে প্রায় এক মাস অবস্থান করেন। ঐ কালে তাঁহার আলোচনাদি শুনিয়া শিলচরবাসীরা শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর মহিমা বিশেষভাবে অনুভব করিল। ঐ ভাবে আমাদের আশ্রমের ভিত্তি দৃঢ়তর করিয়া ধ্রুবচৈতন্যজী ফিরিলেন।

পর বৎসর স্বামীজীর শিষ্য ব্রহ্মচারী জ্ঞান মহারাজ ও শ্রীশ্রীমার প্রিয় সন্তান ভক্তপ্রবর ইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য মহাশয়ের শিলচরে শুভাগমন হইল। তাঁহাদের পূতসঙ্গের ফলও অবিলম্বে ফলিল। আশ্রমবাসীদের অনেকে জয়রামবাটী যাইয়া শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য হইলেন এবং কেহ বেলুড় মঠে যাইয়া পূজ্যপাদ রাজা মহারাজের, কেহ পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের কৃপাপ্রাপ্ত হইলেন। ইহাদের মধ্যে সুরেশ এবং গিরীন্দ্রও (পরবর্তীকালে স্বামী অমরানন্দ ও স্বামী প্রেমঘনানন্দ) ছিল।

অতঃপর আমি ব্রহ্মচারী নগেন ও সুরেশের সহিত পত্রালাপ শুরু করিয়া তাহাদের নির্দেশমত ১৯২১ সনের সরস্বতীপূজার পরদিন বহু দিনের ঈপ্সিত বেলুড় মঠে পৌঁছিলাম। তখন শ্রীশ্রীঠাকুরের পার্ষদদের মধ্যে পূজ্যপাদ রাজা মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ, শরৎ মহারাজ, গঙ্গাধর মহারাজ, কালী মহারাজ, হরি মহারাজ, খোকা মহারাজ এবং হরিপ্রসন্ন মহারাজ স্থূল শরীরে ছিলেন। মহাপুরুষ মহারাজ কৃপা করিয়া আমাকে মঠে থাকিতে অনুমতি দিলেন।

তখন মঠের ম্যানেজার নগেন ব্রহ্মচারী ও মাখন মহারাজ (স্বামী অমলানন্দ)। নিয়মিত জপ ধ্যান পড়াশুনা ছাড়া মঠে আমাদের কাজ ছিল—মঠবাড়ী ঝাড়ু দিয়া পরিষ্কার রাখা, গোশালা সাফ্ করা, খড় কাটা, গরুর জাব দেওয়া, কয়লার গুঁড়া দিয়া গুল পাকানো, ফুল বাগান ও সবজি বাগান কোদাল দিয়া কোপানো, গঙ্গা হইতে জল তুলিয়া আনা, কুটনো কোটা ইত্যাদি। এসব ছিল তপস্যারই অঙ্গ। আহার ছিল অধিকাংশ দিনই ভাত, ডাল ও মিষ্টি কুমড়ার তরকারী। কিন্তু মনে হইত কি সুস্বাদু, যেন অমৃত! গাত্রাবরণ ছিল একটি ফতুয়া ও একখানা বোম্বাই চাদর—শীত ও গ্রীষ্মে সমান। শয়ন ছিল মঠের যত্র তত্র—ইহাতেও কোনই দুঃখবোধ হইত না। ইহা শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদদের সান্নিধ্যেরই মহিমা। মনে হইত আনন্দধামে বাস করিতেছি।

১৯২১ সালে শিবরাত্রির পরে শ্রীশ্রীরাজা মহারাজ কাশী হইতে বেলুড় মঠে আসিতেছেন, খবর আসিল। প্রতিদিন প্রতিক্ষণ আমরা পূজ্যপাদ মহারাজের পুণ্য দর্শনের আগ্রহে শুভ মুহূর্তের প্রতীক্ষায় রহিলাম, বাড়ী ঘর দুয়ার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইল। ফুল বাগিচা সবজি বাগান সুন্দর রূপ ধারণ করিল। মনে হইল যেন শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার আয়োজন হইতেছে। মহারাজের আগমনের দিন তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিতে অনেক সাধু হাওড়া স্টেশনে গেলেন। রাজা মহারাজ সেই গাড়ীতেই আসিতেছেন কিনা লিলুয়া স্টেশন হইতে জানিয়া আসিতে আমার উপর আদেশ হইল। আমি প্রাণপণে ছুটিতে ছুটিতে লিলুয়া স্টেশনে পৌঁছিবামাত্র দেখিলাম ২।৩ জন গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী গাড়ী হইতে নামিলেন। তাঁহাদিগকে সশ্রদ্ধ প্রণাম করিয়া রাজা মহারাজের নাম উচ্চারণ করিতেই একজন বলিলেন—ঐ দেখ, পূজনীয় রাজা মহারাজ platform-এ নেমেছেন, তুমি দৌড়ে গিয়ে প্রণাম ক'রে এসো এবং মঠ হ'তে খবর নিতে এসেছ বলতে ভুলো না। মহারাজকে এই প্রথম দর্শন করিলাম এবং সাগ্রহে প্রণাম করিয়া মঠের খবর নিবেদন করিলাম। তিনি গাড়ীতে উঠিয়া পড়িলেন।

আমি মঠে খবর দিতে দ্রুতগতিতে ছুটিয়া বেলুড় বাজার পার হইয়াছি মাত্র। হঠাৎ দেখিলাম একখানা private car আমার নিকট থামিল, রাজা মহারাজ বসিয়া আছেন। তিনি ভিতর হইতে বলিতেছেন, "এই ছেলেটি কি মঠের ব্রহ্মচারী?" সেবকদের মধ্যে একজন

আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ওহে, তুমি কি মঠের ব্রহ্মচারী?" আমি বলিলাম—"আজ্ঞে হাঁ, এইমাত্র আপনাদের সঙ্গে লিলুয়ায় আমার দেখা হইয়াছিল।" মহারাজ আদেশ করিলেন—"ছেলেটিকে গাড়ীতে তুলে নাও।" কিন্তু গাড়ীতে স্থানাভাব থাকায় আমার উঠা হইল না। আমি মহারাজকে বলিলাম, "মঠ তো অতি নিকটেই, আসিয়াই পড়িয়াছি। আপনার দর্শন-অপেক্ষায় সকলে আছেন।" মহারাজ প্রসন্ন হইয়া গাড়ী চালাইতে বলিলেন। এই অযাচিত স্নেহের স্মৃতি জীবনসন্ধ্যায় এখনও অনাবিল শান্তি ও আনন্দ দান করিতেছে।

তখন আমি মঠে ঠাকুরপূজার যোগাড় দিতাম। একদিন একটি সুন্দর ম্যাগনোলিয়া ফুল একটি ছোট ডালে ফুটিয়া আছে দেখিয়া ঐ ডালটিসহ ভাঙিয়া ফুলটি হাতে তুলিয়াছি—ঠিক সেই সময় আমার পিছন হইতে রাজা মহারাজ আগাইয়া আসিতেছেন। আমি ভয়ে 'ন যযৌ ন তস্থৌ'। আমার অবস্থা দেখিয়া তিনি মুচকি হাসিয়া বলিলেন, "ফুলসমেত ডাল ভাঙলে?" আমি বলিলাম, "ডালসমেত ফুলটি শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরে সাজাইয়া দিব।" তিনি বললেন, "এই ডালটি এতটুকু বড় হ'তে এক বৎসর লেগেছে, ভবিষ্যতে ফুল অতি সন্তর্পণে তুলবি। ফুলের সাথে পাতা দিয়ে ফুলদানে ভরতি ক'রে জল দিয়ে বসিয়ে দিবি। গাছও রক্ষা পাবে, প্রভুরও সেবা হবে।"

অন্য দিনের কথা। গোলাপগাছ হইতে গোলাপ তুলিবার সময় রাজা মহারাজ আসিয়া হাজির! তিনি বলিলেন, "দেখ, পাতার আড়ালে যে-সব ফুল ফুটে আছে, সেইগুলি শুধু তুলবি, এতে বাগানের সৌন্দর্য নষ্ট হয় না।"

১৯২২ সাল। মহাপুরুষজীর ইচ্ছায় রাজা মহারাজ আমাদিগকে ব্রহ্মচর্য-দীক্ষা দিলেন। তখন পূজনীয় কালী মহারাজ (স্বামী অভেদানন্দ) মঠে আছেন, তিনি বলিলেন, "ব্রহ্মচারীরা গ্রামে গিয়ে ভিক্ষা কর, তারপর রান্না করে খাও।" রাজা মহারাজ শুনিয়া বলিলেন—"আমার ছেলেরা ভিক্ষা করতে পারবে না। আমি তাদের রোজ ৫৲ টাকা ভিক্ষা দিব। তাহা দ্বারা ভাঁড়ার থেকে জিনিস নিয়ে রান্না ক'রে ঠাকুরকে ভোগ দিয়ে খাবে।" আমরা তাহাই করিলাম। পূজ্যপাদ মহারাজগণ (ঠাকুরের সন্তানগণ) আমাদের রান্না করা ঠাকুরের প্রসাদ কিয়দংশ নিত্য গ্রহণ করিতেন। একদিন শ্রীশ্রীমহাবীরকে সাজাইয়া রামনাম কীর্তনও করা হইয়াছিল।

ইহার পর কিছু দিন গত হইল আমি রাজা মহারাজের নিকট দীক্ষা প্রার্থনা করিলাম। তিনি কিছুক্ষণ আমাকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "আমি তোমার গুরু নই, মহাপুরুষজী তোমার গুরু। তিনি তোমাকে দীক্ষা দিবেন।" অথচ সেই সময় মহাপুরুষ মহারাজ দীক্ষা দিতে চাইতেন না।

কথাপ্রসঙ্গে একদিন মহারাজ তাঁহার এক গুরুভাইকে বলিতেছেন, "তোমরা মঠের কাজ কর্ম কর, আমি সব ছেড়ে দিচ্ছি।" ঐ সময় আমি নিকটেই ছিলাম। ইহার কয়েক দিন পর মহারাজ মন্দিরে যাইতেছেন, পবতবাবু দীক্ষাপ্রার্থী হইয়া তাঁহার পিছু পিছু যাইতেছেন। মহারাজ তাঁহাকে বলিলেন, "প্রথমে মঠের ছেলেদের দীক্ষা দিব, তাহার পর তোমার হবে।" আমি সিঁড়িতে ছিলাম, আমাকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "যারা দীক্ষা চায়, তাদের সব ডেকে আন, আজ দীক্ষা দিব।" আমি সিঁড়ির নীচেই বরদানন্দ স্বামীকে দেখিয়া বলিলাম, "মহারাজ আজ দীক্ষা দিবেন, সকলকে ডাকিতে বলিতেছেন।"

তিনি শুনিয়া বলিলেন, "অমন কথা তো তিনি (মহারাজ) কখনও বলেন না! তবে কি তিনি শরীরত্যাগ করবেন!" একদিন কথাচ্ছলে মহারাজ তাঁহার গুরুভাইকে বলিতেছিলেন, "আমি সব ছেড়ে দিচ্ছি, তোমরা সব বুঝে নাও।" এই দিন কয়েকজনের দীক্ষা হয়। ইহারই ৩৪ দিন পর মহারাজ বলরাম-মন্দিরে যাইলেন এবং অসুস্থ হইয়া কয়েক দিন রোগ শয্যায় থাকিয়া শরীরত্যাগ করিলেন। বলরাম-মন্দিরেও কয়েক জনের দীক্ষা হইয়াছিল।

এক রবিবার বেলা ৩টার সময় মহারাজ সেবকদিগকে লইয়া গোয়াল পুকুরে ছিপ দিয়া মাছ ধরিতে গিয়াছেন। আমি দেখিয়া আসিয়া গঙ্গার ধারে নাগলিঙ্গম্ ফুলগাছের নীচে দাঁড়াইয়া আছি। মহাপুরুষ মহারাজ তাঁহার ঘরের জানালায় দাঁড়াইয়া আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "রাজা মহারাজ কোথায়?" আমি বলিলাম, "তিনি পুকুরে ছিপ দিয়া মাছ ধরিতে গিয়াছেন, দেখিয়া আসিলাম।" তাহাতে মহারাজ বলিলেন "যা, বলে আয়— আজ রবিবার অনেক বাহিরের লোক আসবে। ডেকে নিয়ে আয়।" আমি বলিলাম, "আমার ভয় করে।" তিনি শুধু বলিলেন, "আমার নাম ক'রে বলবি। ভয় কিসের?" আমি গিয়া রাজা মহারাজের নিকট মহাপুরুষ মহারাজের কথা বলিতেই তিনি ছিপ ফেলিয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া আসিলেন। তাঁহাদের গুরুভাইদের মধ্যে কি অসাধারণ ভালবাসার সম্বন্ধ ছিল!

একদিন মহারাজ এক গুরুভাইকে বলিতেছেন, "দেখ, এইসব ছেলেরা বাপমায়ের ভালবাসা ত্যাগ ক'রে এখানে এসেছে, এরা সবাই ভাল ছেলে। আমাদের এদের ভালবাসতে হবে, ভালবাসতে হবে, ভালবাসতে হবে।" তিনবার এই কথা কয়টি বলিলেন, আমি তখন সেই স্থানে উপস্থিত ছিলাম।

মহারাজের জন্মতিথি উৎসব। সকাল হইতে মঠে সব সাধুরা আসিতেছেন। ঐ দিন বশীবাবু তিনখানা ছবি তুলিলেন। একটি— স্নানের সময়, তেল মাখিয়া কাপড়খানা বুকে বাঁধিয়া বসিয়া আছেন। অন্যটি—ইজিচেয়ারে বসিয়া তামাক খাইতেছেন। তৃতীয়টি—নীচে আমতলায় চেয়ারে উপবিষ্ট অবস্থায়।

স্নানের পর দেবেনদা মহারাজকে একটি ফুলের মুকুট পরাইলেন। ভাল ফুলের মালা গলায় দিলেন, ফুলের পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিলেন। মহারাজকে দেখিতে ঠিক যেন একটি প্রতিমার মতো বোধ হইতেছিল। ঐ উৎসবে মঠপ্রাঙ্গণ ভরতি ভক্তগণ প্রসাদ পাইয়াছিলেন। প্রচুর মাছ ও পানতুয়ার ব্যবস্থা হইয়াছিল। মহা আনন্দের মধ্য দিয়া এই উৎসব সম্পন্ন হইয়াছিল।

গুরুবংশের প্রতি মহারাজের অগাধ ভালবাসা ও কর্তব্যজ্ঞান ছিল। একবার শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি উৎসবে রামলালদাদার দুই মেয়ে ও ঠাকুরের বিশেষ পরিচিতা রমণী নাম্নী মহিলা দ্বিতলে ঠাকুরঘরের দক্ষিণ দিকের বারান্দায় বসিয়া প্রসাদ খাইতেছিলেন। ঠাকুরমন্দিরের বারান্দায় বসিয়া খাওয়া মঠের নিয়মবিরুদ্ধ বলিয়া অপরিচিতা ভদ্রমহিলাদিগকে আমি নীচে গিয়া আহার করিতে অনুরোধ করি। তাঁহারা ইহাতে উপেক্ষার মৃদুমন্দ হাসি হাসিতে লাগিলেন। আমি এই সংবাদ ঈশ্বর মহারাজকে জানাইলাম। তিনি উপরে আসিয়া বিনয় করিয়া তাঁহাদের অনেক অনুরোধ করিলেন, কিন্তু কিছুই ফল হইল না। তখন একটু কর্কশস্বরে বলিলেন, "যান, নীচে গিয়া প্রসাদ খান।" তাঁহারা ইহাতে অপমান বোধ করিয়া মঠ ত্যাগ করিয়া তখনই

দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া গেলেন। ক্রমে কিছুক্ষণের মধ্যেই এই সংবাদ মহারাজের কর্ণগোচর হইল। তিনি এত মর্মাহত হইলেন যেন তাঁহার বুকে শেল বিদ্ধ হইয়াছে! তৎক্ষণাৎ ঈশ্বর মহারাজের ডাক পড়িল। তাঁহাকে মহারাজ বলিলেন, "তুমি যে অন্যায় করেছ, তাহার প্রায়শ্চিত্তও গুরুতর! এখনই সকল রকম প্রসাদ লইয়া দক্ষিণেশ্বরে যাও, যদি তাঁহারা তোমায় ক্ষমা ক'রে প্রসাদ গ্রহণ করেন, তবে মঠে ফিরিবে, নতুবা···অন্যত্র চলিয়া যাইবে।" তাঁহারা ক্ষমা করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিলেন এবং মহারাজকে একখানা পত্র দিলেন। পরদিন তাঁহাদের পুনরায় মঠে নিমন্ত্রণ করা হইল এবং ঈশ্বর মহারাজকে পরিবেশন করিয়া খাওয়াইতে হইল। বিদায়কালে মহারাজ প্রত্যেককে একখানা করিয়া কাপড় দিলেন।

মহারাজের মন সর্বদাই উচ্চভূমিতে থাকিত। নিম্নভূমিতে থাকাকালে তিনি তাঁহার অন্তরঙ্গদের সহিত নানারূপ রসিকতা করিতেন। রামলালদাদা রাধার বিরহ ও বৃন্দাসখীর পদাবলী কীর্তন করিতেন। মহারাজ তাহা লইয়া আনন্দে থাকিতেন। আহারের পর রামলালদাদার বিশ্রামের সময় মহারাজ তাঁহার সেবকদের রামলালদাদার পদসেবা করিতে পাঠাইতেন। একদিন মহারাজের ইঙ্গিতে সেবকগণ রামলালদাদার এমন শক্ত (কঠিন) ভাবে পদসেবা করিল (পা টিপল) যে, দাদাকে 'ত্রাহি, ত্রাহি' ডাক ছাড়িতে হইল। মহারাজ উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"তোমরা এ কি করছ? দাদাকে ছেড়ে দাও, তিনি ঘুমুবেন যে!"

পূজনীয় হরিপ্রসন্ন মহারাজ প্রত্যূষে নিদ্রাত্যাগ করিয়াই গঙ্গাদর্শন ও প্রণাম করিতেন। একদিন জনৈক ব্রহ্মচারীকে মহারাজ নির্দেশ দিলেন, "প্রত্যূষে হরিপ্রসন্নের শয্যাত্যাগের পূর্বে তার দরজার সম্মুখে পিছন ফিরে দাঁড়াগে যা।" ব্রহ্মচারী আপত্তি করা সত্ত্বেও মহারাজের আদেশ তাহাকে পালন করিতে হইল। দরজা খুলিয়াই হরিপ্রসন্ন মহারাজ 'হা রাম, হা রাম' বলিয়া পুনরায় শয্যায় শুইয়া-পড়িলেন। মহারাজ কি হইয়াছে দেখিতে আসিবার ভান করায় হরিপ্রসন্ন মহারাজ উত্তর দিলেন—"এসবই আপনার কাজ।" মহারাজ উত্তর করিলেন—"আজকালকার ছেলেরা এইরূপই!"

পূজনীয় শুকুল মহারাজের সঙ্ঘগুরুর প্রতি ভক্তি ছিল অসাধারণ। একবার ঢাকা মঠে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িলেন, সকলেই অনুরোধ করিতে লাগিল—আপনি বেলুড় মঠে যান। তিনি শুধু বলিলেন, "রাজা মহারাজ আমাকে ঢাকায় পাঠাইয়াছেন, তাঁহার আদেশ না পাইলে কি করিয়া যাই?" পরে মহারাজের আদেশ পাইয়া তিনি বেলুড় মঠে আসিয়াছিলেন। সেখানেও তাঁহার স্বাস্থ্যের উন্নতি না হওয়ায় তাঁহাকে কাশী সেবাশ্রমে পাঠানো হইল। কাশীতেই তাঁহার দেহত্যাগ হয়। রাজা মহারাজ বলিতেন—"শুকুল মহারাজ মহাপুরুষ, তাঁহার কাছে যাও, তিনি তোমাদিগকে উপদেশ দিবেন।"

কৃষ্ণলাল মহারাজ ও কয়েকজন ব্রহ্মচারী ঢাকা মঠে থাকিতেন। সেখানকার একজন সহকারী কর্মী গৃহস্থ-ভক্ত সাধুদের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিয়াছিলেন, "এঁরা তেমন কাজ করেন না, বেশ খান দান থাকেন।" ইহা মহারাজের কর্ণগোচর হইতেই তিনি সাধুদের মঠে ফিরিতে আদেশ দিলেন এবং ঢাকা মঠের যে সকল কর্মী সাধু মঠে ছিলেন, তাঁহাদিগকেও ঢাকা যাইতে নিষেধ করিলেন। ইহার ফলে ভক্ত ভদ্রলোককে মহারাজের নিকট বহু অনুনয় বিনয় ও ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইয়াছিল। সাধুদের দুঃখ-কষ্টের প্রতি মহারাজের গভীর দৃষ্টি ছিল।

ঔপনিষদিক শিক্ষায় প্রকৃতির ভূমিকা

ডক্টর আশা দাশ

উপনিষদ্ শব্দ উপ + নি পূর্বক সদ্ ধাতু হইতে ক্বিপ্ প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন। উপ অর্থ সামীপ্য, নি = নিশ্চয়, সদ্ = প্রাপ্তি। যে বিদ্যা দ্বারা মুমুক্ষুগণ নিশ্চিতরূপে ব্রহ্মলাভ করেন তাহাই উপনিষদ্। ইহার আক্ষরিক অর্থ—কাছে বসা অর্থাৎ গুরুর নিকট অধ্যাত্ম-চর্চার জন্য শিষ্যের বিশেষ বিনীতভাবে অবস্থান। ব্রহ্মবিদ্যাই উপনিষদের প্রধান উপজীব্য। ইহাকে বিদ্যাবিশেষের সারাংশ বা রহস্য-বিদ্যাও বলা হয়। হৃদয়-গুহায় নিগূঢ়রূপে তাহার অবস্থান এবং গুরু-উপদেশেই তাহা লভ্য।

কিশোর-প্রাণই বিদ্যাচর্চার উপযোগী। সংসারের মধ্যে অবস্থান করিলে তাহারা স্বভাবের পথে চলিতে পারে না। সংসারে নানা প্রকার লোকের সংস্রবে, নানা চিন্তা-ধারার সংঘাতে কিশোর-প্রাণ অকারণে চঞ্চল হইয়া উঠিতে বাধ্য হয়। কিশোর-বয়সে মানুষের যে বৃত্তিসমূহ সুপ্ত থাকিবার কথা তাহারা অসময়ে জাগ্রত হইয়া শক্তির অপব্যয় ঘটায় জীবনীশক্তিকে অযথা খর্ব করে। এইজন্য কৈশোরে গুরুগৃহবাস ও ব্রহ্মচর্যব্রত আবশ্যক। কৈশোর হইতেছে মনুষ্যত্বের নবোদ্গমের প্রথম পাদ। এই বয়সে গুরুগৃহে বাসের ফলে শিক্ষার্থী বিনয়ী কষ্টসহিষ্ণু ও প্রশান্তমনা হয়। জীবন সরল ও স্বাভাবিকভাবে গড়িয়া উঠে। প্রশান্তচিত্তে তদ্গতভাবে শাস্ত্র-অধ্যয়ন, স্থিরচিত্ততা, আত্মসংযম ও অধ্যয়নরূপ তপস্যার একান্ত প্রয়োজন। এইজন্য প্রাচীন ভারতে মাতাপিতারা দৈনন্দিন জীবনসংগ্রামের ক্ষেত্র সংসার হইতে নূতন কিশলয়গুলিকে দূর তপোবনের শান্তি ও প্রসন্নতার মধ্যে রাখিয়া তাহাদের অধ্যাত্ম-জীবন গড়িয়া তুলিতেন।

কাহাকে ব্রহ্মবিদ্যা দিতে হইবে? মুণ্ডকোপনিষদে বলা হইয়াছে—

তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্
প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়।
যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং
প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্।
১।২।১৩

যথাবিধি সমীপাগত, প্রশান্তমনা, সংযতেন্দ্রিয় শিষ্যকে ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরু ব্রহ্মবিদ্যা যথাযথ উপদেশ দিতেন। বিদ্যা-অর্জনের জন্য উপনয়নের পর গুরুগৃহবাস ও ব্রহ্মচর্যব্রতের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া বলা হইয়াছে—ব্রহ্মচর্যই যজ্ঞ, জ্ঞাতা, ইষ্ট এবং এষণা। আবার ব্রহ্মচর্য সত্রায়ণ, মৌন, অনশকায়ন, অরণ্যায়নও (ছান্দোগ্যোপনিষৎ, অষ্টমাধ্যায়, পঞ্চম খণ্ড)।

ব্রহ্মচর্য বিদ্যার্থিগণের অবশ্যপালনীয় ব্রত। একদা ভরদ্বাজতনয় সুকেশ, শিবিপুত্র সত্যকাম, গর্গগোত্রীয় সৌর্যায়ণী, অশ্বলতনয় কৌসল্য, ভৃগুবংশীয় বৈদর্ভি ও কত্যতনয় কবন্ধী প্রমুখ প্রসিদ্ধবংশীয় জ্ঞানার্থীরা পরব্রহ্মের স্বরূপ জানিবার জন্য সমিধহস্তে ঋষি পিপ্পলাদের কাছে আগমন করেন। আচার্য তাঁহাদের বলিলেন—'বৎসগণ, তোমরা ব্রহ্মচর্য গ্রহণ করিয়া আস্তিক্যবুদ্ধি সহকারে এক বৎসর বাস কর। বৎসরান্তে নিজ নিজ অনুসন্ধিৎ-সানুসারে প্রশ্ন করিও। তোমাদের জিজ্ঞাস্য

বিষয় আমার জানা থাকিলে অবশ্যই বলিব।' জ্ঞানার্থীদের হস্তের যজ্ঞকাষ্ঠ বা সমিধকে এখানে প্রতীকরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা বলা হইতেছে: (১) যজ্ঞকাষ্ঠবাহী শিষ্য গুরুর সেবা করিতে কৃতসঙ্কল্প, (২) সে পবিত্র যজ্ঞাগ্নি রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সুতরাং যজ্ঞের সমিধ আহরণ ও যজ্ঞাগ্নি রক্ষা করা শিষ্যের অন্যতম পবিত্র কর্তব্য। শিষ্যেরা সমিধভার মস্তকে বহন করিয়া ঋষির আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিতেন এবং পবিত্র যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বালিত রাখিতেন। উপকোশলের কাহিনীতে আছে—দ্বাদশবর্ষ তিনি গুরুর আশ্রমে অগ্নির পরিচর্যা করেন। দ্বাদশবর্ষ-অন্তে গুরু সত্যকাম তাঁহার শিষ্যদের একে একে আশীর্বাদ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি প্রদান করেন। বাকি রহিল শুধু উপকোশল। গুরু উপকোশলকে কিছুই না বলিয়া বিদেশ যাত্রা করিলেন। উপকোশল মনের দুঃখে আশ্রমে অনশন করিয়া পড়িয়া রহিল। ত্রি-অগ্নি—গার্হপত্যাগ্নি, দক্ষিণাগ্নি ও আহবনীয়াগ্নি বলিলেন—"উপকোশল এত দিন অতি নিপুণভাবে আমাদের সেবা করিয়াছে, আজ আমরাই তাহাকে শিক্ষা দিব"। ত্রি-অগ্নি আবির্ভূত হইয়া একে একে উপকোশলকে আত্মবিদ্যা প্রদান করিলেন। প্রশ্ন আসে—গুরু উপকোশলকে সমাবর্তন করাইলেন না কেন? সত্যকাম বুঝিয়াছিলেন উপকোশলের শিক্ষা এখনও সমাপ্ত হয় নাই। দ্বাদশবর্ষ যে অগ্নির সেবা সে করিয়া চলিয়াছে তাহার ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ সে এখনও উপলব্ধি করে নাই। তবে গুরু মৌখিক উপদেশ দিয়া সেই স্বরূপ বুঝাইয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু গুরু সত্যকামের জীবনের অভিজ্ঞতা—জ্ঞান বাহির হইতে আরোপ করা যায় না, তাহা মানুষের অন্তরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জাগ্রত হয়। আচার্য সে জাগরণের পথে সহায়ক মাত্র! উপকোশলের অন্তরেও যথাসময়ে জ্ঞান জাগ্রত হইল। ইতোমধ্যে গুরু প্রত্যাবর্তন করিলেন। তিনি দেখিলেন উপকোশলের মুখমণ্ডল ব্রহ্মবিদের ন্যায়। জিজ্ঞাসা করিলেন—"বৎস, কে তোমাকে শিক্ষা দিয়াছে?" শিষ্য বলিলেন—"কে আর শিক্ষা দিবে? তবে এই যে অগ্নি, এর ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ।"

—"বুঝিয়াছি, অগ্নিরাই তোমাকে শিক্ষা দিয়াছে।" গুরু বুঝিলেন উপকোশলের অগ্নি-পরিচর্যা এতদিনে সার্থক হইয়াছে। তিনি শিষ্যকে লোকোত্তর সত্য সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিলেন।

সত্যকাম ও উপকোশল বুদ্ধির সঙ্গে কাজের সংযোগ সাধন করিয়াছিলেন। ইঁহারা যন্ত্রের ন্যায় গোচারণ করেন নাই, কাষ্ঠও আহরণ করেন নাই। কাজকে তাঁহারা উন্মেষশালিনী বুদ্ধির সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া ধীশক্তির বিকাশ সাধন করিয়াছিলেন।

বৃহদারণ্যকের অন্তর্গত জনকসভায় যাজ্ঞবল্ক্য এবং ছান্দোগ্য উপনিষদের সত্যকাম কাহিনী হইতে জানা যায় গুরুর গোধন-রক্ষা শিষ্যের অবশ্যকর্তব্য ছিল। যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার শিষ্যদের জনকসভা হইতে সহস্র গাভী লইয়া যাইতে আদেশ করেন। বিদ্যার্থীর সামগ্রিক বিকাশের পথে গোচারণের মূল্য কতখানি তাহা বিচার করিতে হইবে। বিদ্যার্থীরা যন্ত্রের ন্যায় গোচারণ করিতেন না। জাবাল সত্যকাম-কাহিনী তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। গুরু সত্যকামকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াই গোচারণকাজে নিযুক্ত করেন। সত্যকামের জীবনে গোচারণ হইল তাঁহার জ্ঞানার্জনের মাধ্যম। যেমন বুনিয়াদী শিক্ষায় একটি craft বা শিল্পকর্মকে

মাধ্যম করিয়া শিক্ষাকার্য পরিচালনা করা হয়। সত্যকামের দীক্ষা শিক্ষা পরীক্ষা সব কিছুর মাধ্যম হইল গোচারণ। গোচারণের মাঠেই তিনি লাভ করিয়াছিলেন ব্রহ্মজ্ঞান। যেদিন জাবাল সত্যকাম ব্রাহ্মণ গোতমের শিষ্যরূপে গৃহীত হইলেন সেদিনই গুরু তাঁহাকে বলিলেন—"সত্যকাম, আমার চারি শত দুর্বল গাভী আছে। তুমি তাহাদের পরিচর্যার ভার গ্রহণ কর।" সত্যকাম ঋষির চরণে প্রণত হইয়া বলিলেন—"তথাস্তু ভগবন্, এই চারিশত গাভী যতদিন সহস্রসংখ্যক না হয় ততদিন আমি আর আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিব না।"

কিশোর সত্যকাম গোযূথ লইয়া চলিয়াছেন—তপোবনের পথে পথে, অরণ্যের ঘন জঙ্গলে আর উন্মুক্ত মাঠে ময়দানে। সপ্তাহ—মাস—বৎসর—ক্রমে বহু বৎসর অতীত হইল। গাভীর দল হৃষ্টপুষ্ট, সবল হইল। সহস্র সংখ্যাও পূর্ণ হইল। একদিন গোযূথের একটি বৃষ মনুষ্যকণ্ঠে সত্যকামকে বলিল—"সত্যকাম, তোমার গুরুগৃহে প্রত্যাবর্তনের দিন আগত। আজ আমি তোমাকে কিঞ্চিৎ ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিব।" সত্যকাম বলিলেন—"বলুন ভগবন্।"—"ব্রহ্ম হইলেন চতুষ্কল। আমি প্রথম কলা বা পাদের বিষয়ে বলিতেছি। প্রথম পাদের চারিটি দিক—উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম লইয়া ব্রহ্ম হইলেন প্রকাশবান। যিনি প্রকাশবান ব্রহ্মকে জানেন তিনি নিজেও প্রকাশবান হইয়া থাকেন।"

পরের দিন সন্ধ্যা আগত। সত্যকাম গোযূথের সেবা সমাপ্ত করিয়া অগ্নি প্রজ্বালিত করিলেন, বসিলেন পূর্বাস্য হইয়া। অগ্নি বলিলেন—"সত্যকাম, ব্রহ্মের দ্বিতীয় পাদেরও চারিটি অঙ্গ—পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, দ্যুলোক আর সমুদ্র। এই চারিপাদ লইয়া ব্রহ্ম হইলেন অনন্তবান। যিনি অনন্তবান ব্রহ্মকে জানেন তিনি এই লোকেই অনন্তবান হইয়া থাকেন।"

পরের দিন প্রাতঃকালে আবার সত্যকামের পথ চলা শুরু হইল। এইবার বিপুল বিস্তৃত অরণ্যানীর বুক হইতে একটি হংস উড়িয়া আসিয়া মানুষী ভাষায় বলিল—"বৎস সত্যকাম, আমি তোমাকে ব্রহ্মের তৃতীয় পাদ বিষয়ে বলিব। অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র, আর বিদ্যুৎ—এই চতুরঙ্গসমষ্টিযুক্ত ব্রহ্ম হইলেন জ্যোতিষ্মান। যিনি জ্যোতিষ্মান ব্রহ্মকে জানেন তিনি নিজেও জ্যোতির্ময় হইয়া থাকেন।"

আবার সত্যকামের পথ চলা শুরু হইল। চলিয়াছেন ঘন অরণ্যের পথ দিয়া। পথে পথে প্রকৃতির শান্ত ছন্দ আর সৌন্দর্য প্রসারিত। কোন বৃক্ষান্তরাল হইতে একটি ডাহুক পাখী ডাকিয়া বলিল—"সত্যকাম, আমি তোমাকে চতুষ্কল ব্রহ্মের শেষ পাদ শিক্ষা দিব। চক্ষু, শ্রোত্র, মন আর প্রাণ—এই চতুরঙ্গ-সম্মিলিত ব্রহ্ম হইলেন আয়তনবান। আয়তনবান ব্রহ্ম যাঁর অধিগত হয়, তিনি ইহলোকেই সব আয়তন জয় করেন।"

এইভাবে চতুষ্কল ব্রহ্ম সত্যকামের অধিগত হইল। এইবার তিনি গুরুগৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন, সঙ্গে সহস্র গোযূথ—হৃষ্টপুষ্ট, বলিষ্ঠ। গুরু দেখিলেন শিষ্যের আনন শান্ত স্নিগ্ধ, মুখে ব্রহ্মজ্যোতি। বলিলেন—"বৎস, তোমার চক্ষুতে জ্ঞানের দীপ্ত শিখা। কে দিল এই জ্ঞান?"

—"ভগবন্, গোচারণ-মাঠে বৃষ, অগ্নি, হংস ও ডাহুক আমাকে ব্রহ্মজ্ঞান দান করিয়াছেন। তবে আপনি আমার একমাত্র গুরু।"

সত্যকামের এই কাহিনী প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার একটি অপূর্ব নিদর্শন। যাহা নিতান্ত আবশ্যক, পুঁথির পাতায় কেবল সে-সব মুখস্থ করিয়া সত্যকামের শিক্ষা সমাপ্ত হয় নাই। তিনি জ্ঞান লাভ করিয়াছেন গোচারণের

মাঠে—প্রকৃতির উদার নিকেতনে। পল্লীর পথে প্রান্তরে, নদীর তীরে তীরে, অরণ্যের নিবিড় নিস্তব্ধতায় যেখানে নানা রস, নানা রূপ, নানা গন্ধ, বিচিত্র গতি ও গীতি, প্রশান্তি ও প্রফুল্লতা প্রসারিত হইয়া আছে, যেখানে প্রকৃতি পরম প্রীতি ও স্নেহে মানুষকে বাহুবেষ্টনে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, সত্যকামের শিক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে প্রকৃতির সেই মাতৃক্রোড়ে। প্রকৃতি একাধারে সত্যকামের ধাত্রী আবার আচার্যাও। প্রকৃতির সঙ্গে সত্যকামের সংবেদনশীল কিশোর চিত্তের প্রত্যক্ষ সংযোগের ফলে তিনি ব্রহ্মকে অর্থাৎ পরম সত্যকে উপলব্ধি করিয়াছেন। তিনি যে জ্ঞান আহরণ করিয়াছেন মানুষীকণ্ঠে, পশুপক্ষী ও অগ্নির মাধ্যমে প্রকৃতিই তাহা দান করিয়াছে। পশুপক্ষী ও অগ্নি ইহারা প্রকৃতিরই অঙ্গ। মহাশূন্যে সদা ভ্রাম্যমাণ, বাতাসে সঞ্চরমান, আকাশে দীপ্তিমান এবং জীবধাত্রী ধরিত্রীর মূক হৃদয় হইতে উত্থিত যে-জ্ঞান, প্রকৃতির শিশু সত্যকাম তাহাই আহরণ করিয়াছেন। প্রকৃতির কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলিয়াছেন :—

And beauty born of murmuring sound
Shall pass into her face.

প্রকৃতির পত্রমর্মরধ্বনি, তাহার প্রসারিত সৌন্দর্য প্রকৃতিদুহিতা লুসির অঙ্গে অঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। উপনিষদে সত্যকামের অন্তশ্চেতনার প্রসারণ ও অনায়াস উর্ধ্বায়নও ঘটিয়াছে প্রকৃতির নিগূঢ় সান্নিধ্যে ও সাহচর্যে

শিক্ষাব্রতী রুশোও মনে করিয়াছেন, যে বিরাট বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে মানুষের জন্ম, সেই বিশ্বপ্রকৃতি হইতে বঞ্চিত হইলে মানুষের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকে। প্রকৃতি যাহা সৃষ্টি করে তাহা সত্য, শুভ ও সুন্দর; মানুষের স্পর্শেই তাহা বিকারপ্রাপ্ত হয়। রুশোর শিক্ষানীতির মূলকথা :

Everything is good as it comes from the hands of the Author of Nature, but everything degenerates in the hands of man.

Payne, Rousseau's Emile, p 60

শিক্ষকতাড়িত, পুস্তকভারজর্জরিত আনন্দহীন শিক্ষাব্যবস্থার তিনি ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। তাঁহার Emile র শিক্ষাও শুরু হইয়াছিল প্রকৃতির মুক্ত প্রান্তরে। Emileকে সাহায্য করার জন্য গ্রাম্য পরিবেশে ছিলেন শিশুমনস্তত্ত্বে অভিজ্ঞ স্নেহশীল শিক্ষক। আর সত্যকাম কেবল প্রকৃতির সাহচর্যেই জ্ঞানার্জন করিয়াছেন। প্রকৃতির সঙ্গে Emile-র সংযোগ প্রয়োজনের আর সত্যকামের সংযোগ একাত্ম বোধের। শিক্ষাজীবনে Emile সমাজজীবন হইতে বঞ্চিত, একক। সত্যকামের সরল কর্মময় জীবনই তাহার শিক্ষার ভিত্তি, কারণ উপনিষদ-যুগের বিদ্যার্থী-সমাজ জীবনের মঙ্গলময় কর্ম ও চিন্তার সঙ্গে নিজেকে ঘনিষ্ঠ করিয়া লইতেন। ঋষির তপোবন শিক্ষক ও ছাত্রের সম্মিলিত সাধনার আনন্দনিকেতন। আকাশ সেখানে অবারিত, পশুপক্ষী মানুষের সঙ্গে স্নেহের বন্ধনে ঘনিষ্ঠ, তরুলতা শ্যামস্নিগ্ধ আশ্রয়প্রদ। গোচারণের বিস্তৃত মাঠ, অরণ্যের গাছপালা, লতাগুল্ম, উদার আকাশ, মুক্ত বায়ু, নদী, ঝরনা—ইহাদের সংস্রবকে বাদ দিয়া চতুষ্কল ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনা নীরস লাগিতে পারে। উপনিষদের যুগে আচার্যগণ তাঁহাদের শিষ্যদের নিরানন্দ পরিবেশে সাধনায় পরিচালিত করেন নাই। উপনিষদের ভাবধারায় পুষ্ট রবীন্দ্রনাথও আন্তরিকভাবে প্রকৃতির শিক্ষাকেই গ্রহণীয় মনে করিয়াছেন। লিখিয়াছেন—

"অগ্নি, বায়ু, জল, স্থল, বিশ্বকে বিশ্বাত্মা দ্বারা সহজে পরিপূর্ণ করিয়া দেখিতে শেখাই যথার্থ শিক্ষা। বালকদের হৃদয় যখন সজীব এবং সমুদয় ইন্দ্রিয়শক্তি যখন সতেজ তখনই তাহাদিগকে মেঘ ও রৌদ্রের লীলাভূমি অবারিত আকাশের তলে খেলা করিতে দাও, তাহাদিগকে ভূমার আলিঙ্গন হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিও না।" (শিক্ষা, শিক্ষাসমস্যা)

এই প্রসঙ্গে ঈশোপনিষদের ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের জীবনকাহিনীও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মুক্ত আকাশের অবারিত সূর্যালোকের মধ্যে যিনি লাভ করিয়াছিলেন তাঁহার অন্তর বাণী। বেদবিদ্যাবর্জিত যাজ্ঞবল্ক্য অন্যমনস্ক হইয়া পথ চলিতেছেন। নিম্নে উচ্চাবচ ভূমি আকাশ মধ্যাহ্ন-মার্তণ্ডের খরবহ্নি। যাজ্ঞবল্ক্যের কোন দিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র নাই। তিনি ভাবিতেছেন বেদজ্ঞানহীনের জীবন পশুতুল্য হীন আর ঘৃণ্য। এমন সময় যাজ্ঞবল্ক্য ঊর্ধ্বনেত্রে আকাশমণ্ডলে দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন সকল জ্যোতির অধীশ্বর স্বয়ং প্রকাশমান সবিতাকে। তাঁহার মনে হইল প্রভাতে ঋগ্বেদের সঙ্গে তাঁহার আকাশে আবির্ভাব, মধ্যাহ্নে যজুর্বেদে অধিষ্ঠান আবার সায়ংকালে সামবেদে অবস্থান। সুতরাং সূর্যের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আচার্য আর কে হইবেন? ঊর্ধ্বনেত্রে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন—'হে জগৎ-পোষক সূর্য, জ্যোতির্ময় হিরণ্যপাত্রের দ্বারা সত্যব্রহ্মের প্রাপ্তি-পথ আবৃত, তুমি তাহা অপনীত কর। তোমার রশ্মিজাল বিদূরিত কর, তীব্র তেজ সঙ্কুচিত কর—আমি তোমার মঙ্গলময় স্বরূপ প্রত্যক্ষ করি :

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে ॥
* * * * ব্যূহ রশ্মীন্।
সমূহ তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে
পশ্যামি ॥

—ঈশোপনিষৎ, ১৫-১৬

"নিজের ব্যক্তিত্ব ভুলে গিয়ে স্বরূপত্ব বুঝতে চেষ্টা কর।"

—শ্রীশ্রীমা

শ্রীশ্রীবিজ্ঞানানন্দ মহারাজের উপদেশ

অধ্যাপক সুবর্ণকমল রায়

আজকাল চারিদিকে তাকাইলে মনে হয় কোথায় যেন গলদ ঢুকিয়াছে। উন্নতির শত শত তালিকা-প্রস্তুতি এবং তাহার সম্পাদনের চেষ্টার মধ্যে আসল সুরটি যেন আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি। মহাপুরুষগণ যে দিব্য সুরের তার প্রতি কাজের মধ্যে গাঁথিয়া দিয়া যান, তাহাকে আমরা অবহেলা করি বাহ্যিক চাকচিক্যের উগ্র প্রাচুর্যে। ভারতের চিরন্তন মহান আদর্শকে পুনর্জাগ্রত না করিলে হিংসা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা ও মিথ্যার আবর্তনে বিজ্ঞানের শত শত চাঞ্চল্যকর উন্নতি অতল জলে ডুবিয়া যাইবে। সেই ভাবটি হইতেছে সকলের অন্তরাত্মা ভগবানের উপর আন্তরিক বিশ্বাস, প্রতি কাজে তাঁহার আশীর্বাদ প্রার্থনা এবং তাঁহার স্মরণ-মনন করা।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম লীলাসহচর স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের চতুর্থ অধ্যক্ষ ছিলেন। এবার তাঁহার শতবর্ষপূর্তি-বৎসর। তাঁহার জীবন ও বাণী অনুধাবন করিলে আমরা জীবনপথে চলার প্রচুর আলোক পাইব। আধ্যাত্মিক ও কর্ম-জীবনে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে হইলে কিভাবে জীবন যাপন করিতে হয়, সে সম্বন্ধে তিনি বহু কথা বলিয়াছেন। তাহারই কিছু এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

তিনি বলিতেন, "বিশ্বাসই ধর্মজীবনের ভিত্তি। খুব বিশ্বাস চাই, ধৈর্য চাই, ভরসা চাই, ক্রমে সব হয়ে যাবে। এই বিশ্বাসের জোরে অধ্যবসায় সহকারে সরল প্রাণে মা'র কাছে চিত্তশুদ্ধির জন্য প্রার্থনা করবে। তিনি সব ঠিক ক'রে দেবেন।" অন্যত্র বলিয়াছেন, "শুধু চাই বিশ্বাস।" পরে সুর করিয়া চারিবার বলিলেন, "বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহু দূর।"

মন সম্বন্ধে বলিতেন, "মানুষের চিন্তাশক্তির কেন্দ্র হচ্ছে মন—আর ইন্দ্রিয় যেন মনেরই চাকর। দেখা, শোনা, বোঝা ইত্যাদি সব মনের দ্বারাই হয়ে থাকে। দেখতে পাওয়া যায়, যার মন যত পরিষ্কার সে তত ভাল বোঝে···যে মন যত শুদ্ধ হয়, সে মন অন্যের চিন্তাধারা ভাল ধরতে পারে।·· কেবল দরকার মন শুদ্ধ করা।" বলিয়াছেন, "মনকে পবিত্র কর। ক্রমে আর সব ঠিক হয়ে যাবে। মন পবিত্রতায় প্রতিষ্ঠিত হলে ভূমানন্দের আস্বাদ পাবে। সে-আনন্দের তুলনা নাই। মন যখন কুচিন্তা দ্বারা অধিকৃত হয় তখন ইঁদুর বেড়ালের মুখে পড়লে যেমন হয় ঠিক তেমনি ধারা হতাশ ও নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়ে। তা কেন হতে দেবে? সে সময় সিংহবিক্রম প্রকাশ ক'রে কুচিন্তার হাত থেকে মুক্ত হবে।··· মনে ক'রে নিও তুমি মন থেকে আলাদা। মনে আনন্দ দুঃখ যে-ভাবই থাকুক না কেন তুমি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করবে না।" একজন ভক্তকে বলিলেন, "সে কি কথা! আপনার মন আপনার বশে থাকবে না? এ কি একটা কথা হলো? মনকে আপনার উপরে উঠতে দেবেন কেন! জানেন তো 'গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব তিনের দয়া হল। একের দয়া বিনে জীব ছারখারে গেল॥' মনের দয়া হল না, তাই সব নষ্ট।" আবার তিনি বলিয়াছেন, "মনকে

ঠারে ঠোরে বোঝালে সে তো নিজেকে নিজেই ঠকানো হল।"

নৈতিক জীবন সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, "পবিত্রতা, সত্যপরায়ণতা ও সততার উপর জীবন গঠন করবে। আর চাই বিশ্বাস। এই ধরে থাকলে মানুষ যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন তার তৃপ্তি থাকবে। এই হল ধর্মজীবনের লক্ষণ—সর্বাবস্থায় তৃপ্তি।" অন্য প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "সত্যপথে থাকবে, আর কারো অনিষ্ট করবে না, তা হলেই ভগবান কোলে টেনে নেবেন।···সত্য-স্বরূপ ভগবানকে লাভ করতে হলে সম্পূর্ণরূপে সত্যকথা বলতে হবে, সত্য আচরণ করতে হবে, আর সরল হতে হবে।··· অনিষ্টকর বিষাক্ত খাবার শরীর নষ্ট করে, সে জন্য যে ক'রেই হোক আমরা শরীরকে উত্তম খাদ্য জুগিয়ে থাকি; তেমনি মনকে পবিত্র চিন্তা, সৎ বুদ্ধি ও সদালোচনা দ্বারা পুষ্ট করতে হবে, কুচিন্তা বা কুসঙ্গরূপ খাদ্য মনকে দেওয়া হবে না।" অন্যত্র বলিয়াছেন, "ছেলে হল না ব'লে বংশ লোপ পেয়ে গেল—এভাবে যে দেখে সে বড়ই স্থূল দৃষ্টিতে দেখে। যথার্থ ছেলেপিলে হল মহৎ শুদ্ধ উদার চিন্তারাশি, আর শুভ কর্ম। ···সেই পবিত্র ভাবরাশিই হল প্রকৃত সন্তান।" আবার বলিয়াছেন, "কামক্রোধাদির দমন না হলে ঈশ্বরকে পাওয়া যেতেই পারে না।··· যে-মুহূর্তে রিপু বশীভূত হয়ে যাবে সেই মুহূর্তেই তাঁকে পাওয়া যাবে।" অন্য প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "কর্তব্য হচ্ছে—সৎ জীবন যাপন কর, পবিত্র জীবন যাপন কর, স্বার্থহীন জীবন যাপন কর এবং সর্বোপরি সেবকের জীবন যাপন কর।" ···"স্বাধীন সেই, যে ইন্দ্রিয়-গুলিকে জয় করেছে; পরাধীন—যে ইন্দ্রিয়ের দাস।···ব্রহ্মচর্যপালন, নির্লোভ হওয়া, আর দান পরিগ্রহ না করা—এই গুণী জীবনের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন।" ·· "ক্রোধাদি রিপু দমন করতে হলে ঠাকুরকে স্মরণ করতে হয়, তা হলে মন থেকে ওসব হীনভাব চলে যাবে।" তিনি নেতার সংজ্ঞা দিয়াছেন এইরূপ—· "প্রত্যেক ভারতবাসীকে নেতা হওয়ার উপযুক্ত হতে হবে অর্থাৎ চরিত্রবান, স্বার্থত্যাগী, পবিত্রাত্মা, উদারচেতা; আর ভালবাসতে হবে দেশের লোকদের।"

ধ্যান-জপ সম্বন্ধে তাঁহার কথা—"প্রত্যহ নিয়মিতভাবে ধ্যান-জপ অভ্যাস করা বিশেষ দরকার। তাহাতে ক্রমে ক্রমে মন স্থির হয়। মন নিবিষ্ট না হলেও নিয়মিতভাবে সকাল-সন্ধ্যায় জপ ক'রে যাবে। ধ্যান ঠিক ঠিক না হলেও জপ-ধ্যান কখনও ছাড়তে নেই। নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই। ক্রমে সব হবে। মন সব সময় স্থির হয় না সত্য, কিন্তু স্থির হয় তো? পনর মিনিটে এক মিনিটের জন্যও তো মন স্থির হয়? তাতেই হবে।" ধ্যান-জপের সময় সম্বন্ধে বলিয়াছেন "কেন? সময়ের জন্য ভাবনা কি? রাস্তায় রাস্তায় চলতে চলতেও জপ ধ্যান করা যেতে পারে। তাঁর স্মরণ-মনন নিয়ে কথা। সর্বদা তাঁর দিকে যাতে মন পড়ে থাকে, তার জন্য চেষ্টা করা উচিত।" তিনি নিঃসঙ্গতার উপর জোর দিতেন: "সর্বদা যথাসম্ভব একা থাকতে হয়—মনে মনে নিঃসঙ্গ হয়ে থাকা। পরের উপকার যতটা সম্ভব করা উচিত, কিন্তু ঢাক পিটিয়ে নয়। বাকী সময় নির্জনে থাকা চাই। এইভাবে ধীরে ধীরে মন স্থির হয়।"

কিভাবে প্রার্থনা করিতে হয়, সে সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "ভগবানের কাছে টাকাকড়ি তুচ্ছ জিনিস কি চাইবে? তাঁর কাছে প্রার্থনা

করবে যেন তিনি পবিত্র ও নিঃস্বার্থ হওয়ার জন্য, সত্যলাভের জন্য শক্তি দেন। সমস্ত জগতের জন্য সচ্চিন্তা প্রবাহিত করবে। সকলকার মঙ্গল হোক—এটি রোজ প্রার্থনা করা উচিত। ঠাকুরকে মনে মনে অন্তরের সহিত ডাকবে। আর তাঁর চরণে নিজের জীবন উৎসর্গ ক'রে দেবে। তা হলেই সব হবে। আমাদের যাতে মঙ্গল হয় তিনি তা বিধান করবেন।" শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করবে: "ঠাকুর, আমি তোমার শরণাগত, তোমার আশ্রিত। আমার হাত ধরে থেকো, আমায় ভুলে যেয়ো না। শেষের দিন যখন চারদিক অন্ধকার দেখব সেদিন তুমি এসে হাত ধ'রো। দেখো, সেদিন যেন ভুলে যেয়ো না।"

"প্রকৃত শান্তিলাভ করতে হলে ত্যাগ চাই—আত্মসংশোধন চাই—এই হল সনাতন সত্য। তা আধ্যাত্মিক জীবনেই বলুন বা রাজনৈতিক জীবনেই বলুন—স্বার্থত্যাগের জন্য প্রস্তুত না থাকলে কোন কার্যেই সফলতা আশা করা সুদূরপরাহত। বাস্তবিকপক্ষে এই জগৎ বিরাট স্বার্থত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত।"

"ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য যে জীবন, সে তো মৃত্যুতুল্য। আর যে মৃত্যুদ্বারা বহুর কল্যাণ হয়, তা-ই প্রকৃত জীবন। নিজের শরীর ও পরিজনবর্গকে কেন্দ্র করে যে স্বার্থপরতা গড়ে ওঠে—তাতে জগতের কোন কল্যাণ হয় না। যে যত মহান, তার অহং তত বিরাট।"

—স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

কাশী

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

প্রাচীন কৃত্তিবাসেশ্বরের মন্দির ধ্বংস করিয়া তাহারই উপাদানে আলমগির মসজিদ নির্মিত হইয়াছে। পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের চক্ষে এই অংশগুলির মূল্য অত্যন্ত অধিক ; সেই অবিকৃত স্তম্ভ ও উপাদানসকল অনেকের মতে বৌদ্ধ স্থাপত্যের অতি উজ্জ্বল আদর্শ।

বৃদ্ধকালেশ্বরের মন্দির সম্বন্ধে পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন, "ইহার গঠন দেখিয়া মন্দিরটিকে অত্যন্ত প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। অনেকের মতে এক্ষণে কাশীতে যতগুলি শিবালয় আছে, তন্মধ্যে বৃদ্ধকালেশ্বরের মন্দিরই সর্বাপেক্ষা পুরাতন। ইহার নিকটে একটি কুণ্ড আছে। এই কুণ্ডের জল বহুবিধরোগনাশক বলিয়া খ্যাত।

সারনাথ বা সারঙ্গনাথ: পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, "সারনাথের কীর্তি বিধ্বস্ত ও বিলুপ্তপ্রায় হইলেও চীন পরিব্রাজক মৃগদাব দর্শন করিয়া যে উজ্জ্বল চিত্র রাখিয়া গিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য।"—ইহার তাৎপর্য এই যে, তিনি বারাণসীর উত্তরপূর্বাংশে বরুণার পশ্চিমকূলে অশোকনির্মিত একটি বৌদ্ধস্তূপ এবং তাহারই সম্মুখে একটি পাষাণস্তম্ভ দেখিয়াছিলেন। "এই স্তম্ভ কাচের মতো স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল, মধ্যভাগ তুষারচিক্কণ, এই স্তম্ভগাত্রে বুদ্ধের প্রতিবিম্বপাত হয়।" তিনি বরুণানদীর উত্তরপূর্বে প্রায় এক ক্রোশ পথ আসিয়া মৃগদাবের সঙ্ঘারাম পাইয়াছিলেন। এই সঙ্ঘারাম ৮ মহলে বিভক্ত ও চারিদিকে সমুচ্চপ্রাচীর-পরিবেষ্টিত। ইহার বারাণ্ডা অপূর্ব শিল্পনৈপুণ্যমণ্ডিত। এখানে সে সময়ে ১৫০০ বৌদ্ধাচার্য বাস করিতেন। ইহার মধ্যেই ২০০ ফিট উচ্চ একটি বিহার। ইহার ভিত্তি প্রস্তর-নির্মিত...চারিদিকে প্রায় শতাধিক গবাক্ষ ও প্রত্যেক গবাক্ষমধ্যে এক-একটি স্বর্ণময়ী বুদ্ধমূর্তি।...

তখনকার বারাণসী ও মৃগদাবের বর্ণনা পাঠ করিলে মনে হয়, হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম কেমন পাশাপাশি আপন গৌরব রক্ষা করিতেছিল। বর্তমানকালে বারাণসী সেই পূর্বতন হিন্দু-গৌরবরক্ষায় কথঞ্চিৎ সমর্থ হইলেও মৃগদাবে (সারনাথ) বৌদ্ধক্ষেত্রের সেই পূর্বসমৃদ্ধির কিছুই নাই।

সারনাথ স্তূপ যেখানে, সেখান হইতেই বৌদ্ধধর্মের প্রধান ধর্মচক্র পরিচালিত হইয়াছিল। এই অঞ্চলটি বেশ নির্জন এবং তরুরাজিমধ্যে 'সারনাথেশ্বর' শিবমন্দির ছিল। এই মন্দিরটি অতি প্রাচীন। কেহ কেহ বলেন, এই 'সারনাথ' ও সুলতান মামুদ-বিধ্বস্ত 'সোমনাথ'-লিঙ্গ একই সময়ে প্রতিষ্ঠিত। এই সারনাথ বা সারঙ্গনাথের মন্দিরের নিকটে একটি হ্রদ ছিল। এই হ্রদের পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহ বুদ্ধদেবের বহু পূর্বে 'ঋষিপত্তন' বা 'ঈশিপত্তন' বলিয়া পরিচিত ছিল। সেই অতীত যুগে ইহা 'মৃগদাব'-উপবন বলিয়াও বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল।

কাশীর দুর্গাবাড়ী কাশীতীর্থের একপ্রান্তে অসী-সঙ্গম-সমীপে বারাণসীর দক্ষিণ সীমায় অবস্থিত। প্রাতঃস্মরণীয়া রানীভবানী কর্তৃক এই বর্তমান দুর্গামন্দির নির্মিত হইয়াছে।

শঙ্কর মঠও কাশীর প্রাচীন স্থানগুলির অন্যতম। অসী গঙ্গার একটি উপনদী বলিয়া

পরিচিত ; স্নানবিধি হিসাবে যাত্রিগণের পঞ্চতীর্থে স্নান বিধেয়—যথা, অসীসঙ্গমতীর্থে, দশাশ্বমেধ-ঘাটে, বরুণাসঙ্গমে, পঞ্চগঙ্গায় এবং সর্বশেষে মণিকর্ণিকাঘাটে স্নান।

মানমন্দিরঘাট: পূর্বে বলা হইয়াছে যে, ধ্বংসলীলার পর প্রিন্সেপ সাহেবের মতে কাশীতে রাজা মানসিংহের পূর্বে নির্মিত কোন অট্টালিকার অস্তিত্ব নাই। এই রাজা মানসিংহ শত শত দেবালয়ের সহিত এখানে নিজ নামে 'মানমন্দির' নামক প্রাসাদ নির্মাণ করিলেও সম্রাট মহম্মদ শাহের রাজত্বকালেই উক্ত মানমন্দিরে জয়-পুরাধিপ সবাই জয়সিংহ কর্তৃক সুপ্রসিদ্ধ বেধালয় (observatory) প্রতিষ্ঠিত হয়। মন্মথনাথের 'কাশীধামে' এই মানমন্দিরের জয়প্রকাশ রামচন্দ্রসম্রাট প্রভৃতি যন্ত্রের বিবরণ আছে। জয়সিংহের কীর্তিকলাপ যাহা আছে সবই যেন অদ্ভুত। এক্ষণে বলাবাহুল্য, 'মান' অর্থে গ্রহনক্ষত্রাদির গতির পরিমাণ মাত্র। পঞ্চগঙ্গাঘাটের উপর বিন্দুমাধবের প্রাচীন মন্দির ছিল। শুনিতে পাওয়া যায়, এই মন্দিরটি পূর্বে প্রায় সকল মন্দির অপেক্ষা উচ্চ ছিল। সুতরাং ইহার প্রস্তর-নির্মিত বিচিত্র ধ্বজাস্তম্ভটিও অসাধারণ উচ্চ ছিল। ঔরঙ্গজেব হিন্দু মন্দিরের এত উচ্চতা দেখিয়া তাহা খর্ব করিবার জন্য এই ধ্বজা-স্তম্ভটি চূর্ণ করিয়া অত্যুচ্চ মিনারেটদ্বয়-শোভিত মসজিদে পরিণত করেন। কিন্তু সেই মিনারেট হিন্দুদের নিকট 'বেণীমাধবের ধ্বজা' বা 'মাধোজীকা ধ্বজা' নামে খ্যাত। উত্তরপ্রান্তস্থিত প্রস্তরনির্মিত প্রহ্লাদঘাটই বারাণসীর শেষ ঘাট। ইহা হইতে উত্তরদিকে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই রেলসেতু ও রাজঘাট। এই রাজঘাটের উত্তরদিকে রাজা 'বাণার' দুর্গ ও রাজভবন প্রতিষ্ঠিত ছিল। ১০১৮ খৃঃ অব্দে মহম্মদ গজনভি রাজা বাণারকে পরাস্ত করিয়া নিহত করেন।

কাশীধাম জগতের যেমন আদি নগরী, তেমনি ইহার শিক্ষাপীঠও অতি প্রাচীন। সনাতন ধর্মশাস্ত্র সাহিত্য ও শিল্পাদি বেদানুগত সকল বিদ্যারই মূলভিত্তি সেই আদিযুগে কাশীতেই প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এখনও বেদাদি সনাতন শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা উপলক্ষে ভারতের চারি প্রান্ত হইতে শত শত বিদ্যার্থী ও অধ্যাপক আসিয়া কাশী বিদ্যাপীঠকে সুশোভিত ও অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। কাশীতে সংস্কৃত সাহিত্য, শাস্ত্রসমূহ, মায় আয়ুর্বেদ, জ্যোতিষাদির পুরা-কাল হইতে চর্চা ছিল। এমনকি একশত বৎসর পূর্বেও প্রায় দেড় হাজার বিদ্যার্থী কাশীতে বেদাদি নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন।

শেরিং সাহেবের মতে যে-কাশী "is coeval with Hinduism", সেখানে তেমনি ইহার সব রকম সম্প্রদায়মণ্ডলীর পর্বমেলা ও উৎসবাদি আজিও অনুষ্ঠিত হয়। পৃথিবীর সব প্রধান ধর্মাবলম্বীদেরই কাশীতে দেখা যায়। হিন্দুদের শৈব, শাক্তাদি বিভিন্ন সম্প্রদায়, বৌদ্ধ, জৈন, কবীরপন্থী, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি ধর্মাবলম্বি-গণও কাশীতে রহিয়াছেন। প্রাচীন বৈদিক সাগ্নিক ব্রাহ্মণ হইতে আজ পর্যন্ত যতপ্রকার ঈশ্বরোপাসনা জগতে প্রবর্তিত হইয়াছে, তাহা সবই কাশীতে এখনও জীবন্ত রহিয়াছে—ইহা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না।

বিশ্বজননী শ্রীশ্রীসারদাদেবী

স্বামী জীবানন্দ

আবির্ভাব-তত্ত্ব

নির্গুণ ব্রহ্ম স্বকীয় মায়ায় ঈশ্বররূপে প্রতিভাত। ঈশ্বরের দুটি ভাব—পরা প্রকৃতি ও অপরা প্রকৃতি। পরা প্রকৃতির দ্বারা ঈশ্বর সমস্ত জীবের অন্তরস্থিত জ্ঞাতা এবং অপরা প্রকৃতির সাহায্যে তিনি অনন্তক্রিয়াশক্তিরূপে প্রকাশিত। শিব প্রকৃতির সাক্ষী বা দ্রষ্টা, আর শক্তি নিয়ত-ক্রিয়াশীলতা; আবার নারায়ণ ও লক্ষ্মী ব্রহ্মের আনন্দময় সত্তার প্রতিভাসক।

পরমকারুণিক ঈশ্বরই ধর্মস্থাপন ও লোক-কল্যাণের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। সর্বানুস্যূতা ব্রহ্মরূপিণী আদ্যাশক্তি মহামায়াও তখন তাঁর লীলাসহায়িকা হয়ে আসেন। সশক্তিক ভগবানই যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী যুগধর্ম প্রবর্তন করেন। তাই দেখা যায়, নরলীলায় পরম পুরুষ শ্রীভগবানের সহিত পরমা প্রকৃতি শ্রীভগবতীর আবির্ভাব—শ্রীরাম-চন্দ্রের সহিত শ্রীসীতাদেবী, শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধা, শ্রীবুদ্ধের সহিত শ্রীযশোধরা এবং শ্রীচৈতন্যের সহিত শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার আগমন। শক্তি ছাড়া অবতারের দিব্য কার্যকলাপ অসম্ভব।

সশক্তিক ভগবান যখন যে-পরিবেশে নর-লীলায় অবতীর্ণ হন, তখন সাধারণ মানুষের মতোই তাঁরা সেই পরিবেশকে স্বীকার ক'রে নিয়ে মনুষ্যবৎ লীলা করেন। রাজগৃহে বা দরিদ্রের ঘরে যখন যেভাবে তাঁদের আবির্ভাব ঘটে, তদনুযায়ীই তাঁদের লীলা চলে। সাধারণ মানুষেরা বিলুপ্ত-জ্ঞানস্বভাব, তাই তাদের জ্ঞান থাকে না, তাদের নিত্যত্ব-শুদ্ধত্ব-বুদ্ধত্ব সম্বন্ধে তারা সচেতন নয়। কিন্তু শ্রীভগবান ও তাঁর শক্তি ধূলির ধরণীতে অবতীর্ণ হ'লেও তাঁদের জ্ঞান অবিলুপ্ত থাকে। নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত তাঁরা যুগ-কল্যাণে তাঁদের আবির্ভাব সম্বন্ধে সদা সচেতন। সাধারণ মানুষের মতো জীবন যাপন করলেও তাঁদের প্রতিটি কর্ম ও চিন্তার মধ্যে থাকে লোককল্যাণচিকীর্ষা ও দিব্যভাব, যা স্থূল দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। ভগবৎকৃপায় যাঁদের দৃষ্টি খুলে যায়, তাঁরাই তাঁদের নরলীলার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করেন এবং তাঁদের জানতে পারেন।

লীলাবতরণ

শ্রীশ্রীসারদাদেবীর রূপ ধারণ ক'রে আদ্যা-শক্তি অবতীর্ণা হয়ে এবং অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরাম-কৃষ্ণের লীলাসঙ্গিনীরূপে তাঁর লীলার পূর্তি বিধান ক'রে সমগ্র বিশ্বকে এক নব অভ্যুদয়ের পথে উন্নীত করেছেন। তাই স্বামী অভেদানন্দজী মাতৃস্তোত্রে প্রণতি নিবেদন করেছেন:

'প্রকৃতিং পরমামভয়াং বরদাং
নররূপধরাং জনতাপহরাম্।
শরণাগতসেবকতোষকরীং
প্রণমামি পরাং জননীং জগতাম্॥'

শ্রীভগবানের শ্রীরামকৃষ্ণরূপে লীলাবতরণ পৃথিবীর ইতিহাসে যুগান্তকারী ঘটনা। তাঁর আবির্ভাবে জগতের অধ্যাত্ম-রাজ্যের সর্বস্তরের অভ্যুত্থান ও সর্বধর্ম-সমন্বয় জগদ্বাসীকে মহৎ ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করেছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহস্রকোটি মণিদীপ্ত আধ্যাত্মিক মন্দিরে পৃথিবীর সকল মানুষের মহামিলনের স্থান। তাঁর

জীবনে আধ্যাত্মিকতার অনন্ত সুরলহরী ; যে-কোন একটি সুরে জীবনবীণায় তার বেঁধে নিতে পারলে জীবন মধুময় হয়। তঁার অত্যাশ্চর্য সাধনায় বিশ্বের মহাশক্তির উদ্বোধন হয়েছে, সেই প্রসঙ্গে স্বামী সারদানন্দজীর উক্তি স্মরণীয় :

'যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্যাবির্ভাবে·· শক্তিপূজা ভারতে আবার বিশেষ সজীব হইয়া উঠিয়াছে।···শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্যময় জীবন ভিন্ন জগৎ আর কোথায়, কোন্ যুগে, কোন অবতারপুরুষের জীবনেই বা নারী-প্রতীকে শক্তিপূজার ঐরূপ জলন্ত উচ্চাদর্শ দেখিয়াছে ?'

যেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাদেবীকে জগজ্জননী-জ্ঞানে মহাবিদ্যা-ষোড়শীরূপে পূজা করেছেন, সেই দিনই জেগেছে এ যুগের কুল-কুণ্ডলিনী শক্তি—জগতে মাতৃভাবপ্রতিষ্ঠার জন্য। মাতৃভাবের প্রতিষ্ঠার জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁকে রেখে গিয়েছিলেন। মূর্তিমতী বিদ্যারূপিণী মানবীর দেহাবলম্বনে ঈশ্বরীর উপাসনাপূর্বক শ্রীশ্রীঠাকুরের সাধনার পরিসমাপ্তি আর শ্রীশ্রীসারদাদেবীর শুদ্ধ দেহ ও মনের আধারে যুগধর্মপালনী মহাশক্তি শ্রীশ্রীমায়ের জীবন-আরম্ভ।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী যে স্বয়ং আদ্যাশক্তি তা তাঁর নিজের কথায়, শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীতে ও তাঁর লীলাপার্ষদগণের উক্তিতে পরিস্ফুট। এইসব উক্তি থেকে আমরা জানতে পারি যে, শ্রীশ্রীমা মহাশক্তি কালী, জ্যান্ত দুর্গা, জ্ঞানদায়িনী সরস্বতী, বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী, মুক্তিদাত্রী মহামায়া।

ভারতীয় নারীত্বের রূপ ও শ্রীশ্রীমা

ভারতীয় নারীত্বের প্রধানতঃ তিনটি রূপ : দুহিতা, জায়া, জননী। এই তিনটি রূপই শ্রীশ্রীমায়ের জীবনে অনবদ্যভাবে পরিস্ফুট। যাঁদের পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব স্বীকার ক'রে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব, সেই পুণ্যশ্লোক রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্যামাসুন্দরী দেবীর সেবা-পরায়ণা কন্যারূপে তিনি অতুলনীয় সেবা করেছেন এবং তাঁদের প্রগাঢ় স্নেহের অধিকারিণী হয়েছেন। জায়ারূপে তিনি অবতারবরিষ্ঠের সেবারতা ও চিরানুবর্তিনী এবং দেবমানবের যথার্থ সহধর্মিণী। শ্রীরামকৃষ্ণে সম্পূর্ণ আত্মবিলুপ্তিতে তাঁর সহধর্মিণীত্বের পরাকাষ্ঠা। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর দিব্য ভাবের সম্বন্ধ, এ বিষয়ে তিনি বিশ্ব-ইতিহাসে অনন্যা। শ্রীশ্রীমায়ের সাধনা ও তপস্যা লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল, আর সেই সাধনার প্রবাহ ছিল অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো। মর্ত্যে অবতীর্ণা দেবীর স্বেচ্ছাকৃত দুঃখবরণ ও তপস্যা তাঁর দেবীত্বেরই মহিমময় প্রকাশ।

শ্রীশ্রীসারদাদেবীর ভগিনীরূপের চিত্রখানিও অনিন্দ্যসুন্দর। ভগিনীরূপে তিনি জননীর স্নেহ দিয়ে ভাইদের মানুষ করেছেন। তাঁদের সংসারের শত ঝামেলার মধ্যে তাঁর কূটস্থবৎ অবস্থান এই শিক্ষা দেয় যে, আধ্যাত্মিকতায় উন্নত হতে পারলে জাগতিক দুঃখদারিদ্র্য ও অশান্তির মধ্যেও মানুষ স্ব-স্বরূপ থেকে বিচ্যুত না হয়ে সদা আনন্দে থাকতে পারে।

শ্রীশ্রীমা ত্যাগ ও সেবার প্রতিমূর্তি, সংসারের মধ্যে থেকেও আদর্শ সন্ন্যাসিনী। তাঁর পুণ্য জীবন অনুধ্যানে সন্ন্যাস সম্বন্ধে সর্বোচ্চ ধারণা হয়। ভারতে সুপ্রাচীন বৈদিক যুগে যে-সব ব্রহ্মবাদিনী মহীয়সী মহিলার আবির্ভাব হয়েছিল, শ্রীশ্রীমা ছিলেন তাঁদের মতনই ব্রহ্মজ্ঞা। তাঁর সান্নিধ্য ছিল এক বিস্ময়কর শক্তির উৎস।

শ্রীশ্রীমায়ের আধ্যাত্মিক শক্তি সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের সাধ্য কি যে ধারণা করে!

তাই যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন :

'মা-ঠাকরুন কি বস্তু বুঝতে পারনি, এখনও কেহই পার না, ক্রমে পারবে। ...শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না। আমাদের দেশ সকলের অধম কেন, শক্তিহীন কেন ?— শক্তির অবমাননা সেখানে ব'লে। মা-ঠাকুরানী ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন, তাঁকে অবলম্বন ক'রে আবার সব গার্গী মৈত্রেয়ী জগতে জন্মাবে।'

হিন্দুসংস্কৃতির পূর্ণ রূপ ও ভারতীয় নারীর পূর্ণ আদর্শ সমগ্রভাবে শ্রীশ্রীমায়ের মধ্যে রূপায়িত। একাধারে কর্ম জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়, পাতিব্রত্য ও মাতৃত্বের পরাকাষ্ঠা, মানবতা ও দেবীত্বের চরম বিকাশ, সরলতা, দৃঢ়তা, ত্যাগ ও সেবার অপার্থিব সমাবেশ জগৎ আর কখনও প্রত্যক্ষ করেনি। শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে ভগিনী নিবেদিতার যথার্থ উক্তি : 'নারীর আদর্শ সম্বন্ধে সারদাদেবীই শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ কথা।'

সঙ্ঘজননী

শ্রীশ্রীমা সঙ্ঘজননী। তিনি সেই শক্তি যে শক্তি সমস্ত রামকৃষ্ণসঙ্ঘের উৎসাহদাত্রী ও ও পরিচালিকা। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে তবে আমেরিকা যাত্রা করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাপ্রয়াণের পর ত্যাগী ভক্ত সন্তানদের জন্য তিনি প্রার্থনা ক'রতেন, যেন তাঁদের থাকবার আশ্রয় এবং মোটাভাত ও মোটাকাপড়ের অভাব না হয়। সেই প্রার্থনার ফলেই শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন গড়ে ওঠে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের সমস্ত কাজ 'ঠাকুরেরই কাজ'—ভগবদ্বুদ্ধিতে কর্ম করার এই পথনির্দেশ অধ্যাত্ম-জীবন-গঠনের জন্য তাঁর প্রধানতম উপদেশ। সঙ্ঘজননীরূপে তিনি অনেক জটিল সমস্যার সহজ সরল সমাধান দিয়েছেন। মহাশক্তি মা সঙ্ঘকে পালন করছেন, রক্ষা করছেন, লোককল্যাণে তার যুগোপযোগী বিস্তৃতি ঘটাচ্ছেন। তাঁর স্নেহভালবাসায় সঙ্ঘ ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ।

শ্রীশ্রীমায়ের বিশ্ব-মাতৃত্ব

মাতৃভাব-বিকাশের দিক দিয়ে জগতের ইতিহাসে শ্রীশ্রীমা অতুলনীয়া। একটি সন্তানের জননী না হয়েও সমস্ত পৃথিবীর মানুষ তাঁর সন্তান। কোটি কোটি নরনারীর হৃদয়-সিংহাসনে তিনি সমাসীনা ও পূজিতা। তাঁর মাতৃত্ব দেশ-কালের সীমা অতিক্রম করেছে। তাঁর মাতৃত্বে জাতি নেই, বর্ণ নেই, স্ত্রী-পুরুষ-ভেদ নেই, দরিদ্র ধনবান, স্বদেশী বিদেশী, পাপী পুণ্যবানের পার্থক্য নেই! ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ আর খুনী ডাকাত সেখানে সবাই সমান। তিনি সকলের মা, জন্ম-জন্মান্তরের মা, চিরকালের মা। তাঁর মধ্যে লক্ষ কোটি মায়ের স্নেহভালবাসা জমাট-বাঁধা। অসীম ধৈর্য, অপার্থিব করুণা, সেবা, ক্ষমা, অদোষদর্শন আর সম্পূর্ণ অভিমান-রাহিত্যের দ্বারা তাঁর মাতৃত্ব অপূর্বমাধুর্য-মণ্ডিত।

শ্রীশ্রীমায়ের মাতৃভাব এমন স্বাভাবিক ছিল যে, অনেক ভক্ত নরনারী দেখতেন তাঁর চাল-চলনে, কথা বলার ভঙ্গীতে, এমনকি মুখাকৃতিতে পর্যন্ত স্বীয় জননীর ছায়া ও ছবি ফুটে উঠেছে! মাতৃহারা তাঁকে পেয়ে মাতৃশোক ভুলে যেত, কেউ বা অনুভব ক'রত গর্ভধারিণীর স্নেহের টান অপেক্ষা শ্রীশ্রীমায়ের আকর্ষণ অধিক।

যাঁরাই তাঁর শ্রীচরণতলে উপনীত হয়ে অল্প সময়ের জন্যও তাঁর সান্নিধ্যে অবস্থানের সুযোগ পেতেন, তাঁদের মন আধ্যাত্মিকতার উচ্চস্তরে উঠে যেত, তাঁদের সামনে সত্য উদ্ঘাটিত হত, অভূতপূর্ব আনন্দ ও দিব্যভাবে পূর্ণ হয়ে ফিরে যেতেন তাঁরা। খাওয়ানো, আদর-আপ্যায়ন,

সেবা-শুশ্রূষা ও উপদেশপ্রদানের মাধ্যমে তাঁর মাতৃস্নেহ প্রকাশ পেত। এ বিষয়ে ভক্তদের লিখিত শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে পুণ্যস্মৃতি-কাহিনীসমূহ থেকে অনেক কিছু জানতে পারা যায়। তাঁরা বলেছেন, শ্রীশ্রীমায়ের কৃপাকটাক্ষে ভক্তিমুক্তি ব্রহ্মজ্ঞান সবই লাভ হয়।

শ্রীশ্রীমা সর্বদাই সকলকে দিয়েছেন আশা ও অভয়ের বাণী। কী অদ্ভুত হৃদয়মুগ্ধকারী স্নিগ্ধ শান্তিপূর্ণ আধ্যাত্মিকতার মহাসমুদ্র ছিলেন তিনি —পুঞ্জিত মালিন্য ও দারুণ দুষ্কৃতি ধুয়ে মুছে নির্মল শুদ্ধ ক'রে দিতেন আপামর সকলকে! সর্বদা আনন্দপ্রদায়িনী ও পবিত্রতাসম্পাদয়িত্রী পরমা জননীর জীবন ছিল নীরব প্রার্থনার মতো। শাশ্বত মাতৃসত্তার বিকশিত রূপ শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ছিল মহাব্রত। তাঁর দৈনন্দিন প্রতিটি কর্মে ও আচরণে প্রকাশিত হ'ত ভাগবত দৃষ্টি।

ভারত সমস্ত দানের মধ্যে পারমার্থিক দানকেই শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকে। এই অধ্যাত্ম-সম্পদ শ্রীশ্রীমা সহস্র সহস্র তৃষিত নরনারীকে, এমনকি অনধিকারীকেও অকাতরে ঢেলে দিয়েছেন। যে একবার মা ব'লে ডেকে তাঁর কাছে এসেছে, দুষ্কৃতকারী হলেও তাকে তিনি কৃপা করেছেন।

একখানি পত্রে শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে স্বামী প্রেমানন্দজী যা লিখেছেন, তা আমাদের ধ্যানের বিষয় হয়ে আছে:

'শ্রীশ্রীমাকে কে বুঝেছে? কে বুঝতে পারে? তোমরা সীতা, সাবিত্রী, বিষ্ণুপ্রিয়াজী, শ্রীমতী রাধারানী— এঁদের কথা শুনেছ। মা যে এঁদের চেয়েও কত উঁচুতে উঠে বসে আছেন। ঐশ্বর্যের লেশ নেই। ··এ কী মহাশক্তি !!! জয় মা! জয় মা !! জয় শক্তিময়ী মা! দেখছ না কত লোক সব ছুটে আসছে! যে-বিষ নিজেরা হজম করতে পাচ্ছিনে —সব মায়ের কাছে চালান দিচ্ছি! মা সব কোলে তুলে নিচ্ছেন! অনন্ত শক্তি, অপার করুণা! জয় মা! অদ্ভুত! অদ্ভুত !! সকলকে আশ্রয় দিচ্ছেন···আর সব হজম হয়ে যাচ্ছে! মা! মা! জয় মা !!'

আর একখানি পত্রে আছে: 'শ্রীশ্রীমা মানুষ-দেহধারিণী হলেও তাঁর অপ্রাকৃত ভাগবতী তনু। জীবের কল্যাণের জন্য মনুষ্যবৎ লীলা করছেন।'

শ্রীশ্রীমায়ের মাতৃত্ব এমনই ছিল যে, পশুপাখি ইতরপ্রাণীকেও তিনি আপনার সন্তান বোধ করতেন। সকলের উপর ছিল তাঁর মাতৃত্বের অধিকার। একবার তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল: 'তুমি না হয় আমাদের মা, কিন্তু সকলের মা কি ক'রে? তুমি কি এই সব পশুপাখি, কীটপতঙ্গ এদেরও মা?' শ্রীশ্রীমা স্থিরকণ্ঠে উত্তর দিয়েছিলেন: 'ওদের মায়ের ভিতর দিয়ে আমি ওদেরও মা, এজন্যে ওরা এভাবেই আমার স্নেহযত্ন পেয়েছে।'

আদ্যাশক্তির পূর্ণবিকাশ ক্ষমারূপা তপস্বিনী শ্রীশ্রীমায়ের দোষদৃষ্টিরহিত জীবনে বিশ্বমাতৃত্বের স্বতঃস্ফূর্ত অমিয়ধারা পতিতপাবনী গঙ্গার মতো বসুধাতলকে পবিত্র করেছে।

শ্রীশ্রীমায়ের উপদেশ

শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণীর মধ্যে পার্থক্য ছিল না। নানা দেশের, নানা বয়সের ও নানা অবস্থার নরনারী তাঁর কাছে যেতেন, তাঁর উপদেশ শুনে প্রাণে শান্তি পেতেন, সদ্ভাবে নিজেদের জীবন গঠন করতে দৃঢ়সঙ্কল্প হতেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অমৃতময়ী বাণীর মতোই তাঁর উপদেশ অত্যন্ত সহজ সরল প্রাণস্পর্শী।

একটি উপদেশ: 'সর্বদা কাজ করতে হয়। কাজে দেহ মন ভাল থাকে।··· কর্ম করতে করতে কর্মের বন্ধন কেটে যায়, তবে

নিষ্কাম ভাব আসে।' এ যেন ভগবদ্গীতার বাণী !

এক জনের প্রশ্ন : 'কি ক'রে ভগবান লাভ হয় ?' শ্রীশ্রীমায়ের উত্তর : 'শুধু তাঁর কৃপাতে হয়। তবে জপ ধ্যান করতে হয়। তাতে মনের ময়লা কাটে। পূজা, জপধ্যান—এ সব করতে হয়। যেমন ফুল নাড়তে নাড়তে ঘ্রাণ বের হয়, চন্দন ঘষতে ঘষতে গন্ধ বের হয়, তেমনি ভগবৎ-তত্ত্ব আলোচনা করতে করতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়। নির্বাসনা যদি হতে পার তো এক্ষুণি হয়।'

এই রকম সব অমূল্য উপদেশ মণিমুক্তার মতো 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' গ্রন্থে ছড়িয়ে আছে। বর্তমান আদর্শ-সংঘাতের যুগে শ্রীশ্রীমায়ের উপদেশ জীবনপথের অব্যর্থ দিশারী।

'দেবীং প্রসন্নাং প্রণতার্তিহন্ত্রীং
যোগীন্দ্রপূজ্যাং যুগধর্মপাত্রীম্।
তাং সারদাং ভক্তিবিজ্ঞানদাত্রীং
দয়াস্বরূপাং প্রণমামি নিত্যম্॥'

উৎসর্গ

শ্রীকানাইলাল সামন্ত

প্রভাতে সবার সাথে
সারিয়া নাওয়া
ডালি হাতে আঙিনাতে
হ'ল না যাওয়া।
সাথী যত কোলাহলে
গেল চলি' দলে দলে,
আমি হেরি পলে পলে—
সজল চাওয়া।

অবিরল কলকল
সেজে নটিনী
গেল চলি' বাধা দলি'
যত তটিনী।
আমি করি অবধান
কেঁদে মরে মরুপ্রাণ,
গাহিয়া চলার গান—
হ'ল না যাওয়া।

ভগিনী নিবেদিতা ও ভারতীয় নারী

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

ভারতবর্ষের যাহা যাহা ভগিনী নিবেদিতার গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিল তাহাদের অন্যতম হইল ভারতীয় নারীর জীবন ও চরিত্র। ভারতবর্ষের বেদ পুরাণ ইতিহাস ও সাহিত্যে ভারতীয় নারীর বহুতর গৌরবময় পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে এবং ভারত-সংস্কৃতিতে নারীর স্থান প্রত্যেক ভারতবাসীর সুপরিচিত। কিন্তু একজন বিদেশিনী মহিলা বিদেশী শাসকদের ভারত সম্বন্ধে অপপ্রচারের ব্যূহ ভেদ করিয়া, নিজের চোখে ভারতকে দেখিয়া, নিজের জ্ঞান বুদ্ধি বিচার দিয়া ভারতকে যাচাই করিয়া ভারতের অন্তঃপুর-বর্তিনীদের যথার্থ স্বরূপ এমন নির্ভুল ভাবে আবিষ্কার করিবেন এবং গাঢ় হৃদয়াবেগ সহ এমন নির্ভীক ভাবে প্রচার করিবেন, ইহা সত্যই অকল্পনীয় ব্যাপার, বিশেষতঃ বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে—যখন ব্রিটিশরাজ নিরাতঙ্ক দম্ভে ভারতের বুক চাপিয়া বসিয়া আছে। পাশ্চাত্যে নারীর স্বাধীনতা, শিক্ষা, স্বাবলম্বন, কর্মশক্তি প্রভৃতির কথা পড়িয়া, শুনিয়া ও ও কিছুটা দেখিয়া আমরা যখন তুলনায় আমাদের মাতা ভগিনী কন্যাদের শিক্ষাভাব, ভীরুতা, কোমলতা ও কুসংস্কারের কথা ভাবিয়া সরমে মরিয়া যাইতেছিলাম এবং যথাশীঘ্র সম্ভব তাঁহাদিগকে ঘর হইতে বাহিরে টানিয়া আনিয়া পাশ্চাত্য নারীর অনুকরণে তাঁহাদিগকে ঢালিয়া সাজাইতে সচেষ্ট ছিলাম, সেই সময়ে আইরিশ কন্যা মার্গারেট নোব্‌ল আমাদিগকে শুনাইলেন, "হাজার হাজার বৎসরের সরলতা ও সহিষ্ণুতা ভারতীয় নারীচরিত্রে কেন্দ্রীভূত। ভারতীয় নারীর ধৈর্য এবং কল্পনাশক্তিই ভারতের জাতীয়তাকে গঠিত করিয়াছে এবং করিবে। ভারতীয় নারীর জীবন ভারতের মৃত্তিকা হইতে উদ্ভূত একটি মনোরম কবিতা বিশেষ। পাশ্চাত্য সমাজ কয়েক শতাব্দীর মধ্যে যে সংহতি এবং একতা হারাইয়াছে, ভারতে তাহা এখনও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, প্রধানতঃ এই দেশের নারীর জন্য।"

নিবেদিতা ভারতীয় নারীকে বিভিন্ন পরিবেষ্টনীতে পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। প্রত্যেক ক্ষেত্রে তিনি আমাদের নারীর পট-ভূমিকা দেখিতে পাইয়াছিলেন আমাদের দেশের ধর্ম, দর্শন, নীতি, কাব্য এবং শিল্পকলার যুগযুগসঞ্চিত মহান ঐতিহ্যে—ভারতীয় নারীর আশা, আকাঙ্ক্ষা, হৃদয়াবেগ, কর্তব্যবুদ্ধি, সেবা-পরায়ণতা, মৃদুতা, মমতা, আদর্শনিষ্ঠা, স্বার্থ-ত্যাগ, ধর্মনিষ্ঠা—সকলই দাঁড়াইয়া আছে এই ঐতিহ্যের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর। এমনকি আমাদের সমালোচনায় যাহা নিছক স্ত্রী-আচার এবং কুসংস্কার, নিবেদিতার বিশ্লেষণী দৃষ্টি উহার পশ্চাতে একটি কল্যাণময় ঐতিহাসিক সত্তা দেখিতে পাইয়াছিল। ভগিনী নিবেদিতা তাঁহার নানা রচনার মধ্যে ভারতীয় নারীকে যেভাবে সমর্থন ও বন্দনা করিয়াছেন তাহাতে কাহারও কাহারও পক্ষে তাঁহাকে ভারতনারী সম্বন্ধে একটা অন্ধ মোহ পোষণকারিণী বলিয়া ভাবা বিচিত্র নয়। কিন্তু নিবেদিতার শিক্ষা, দীক্ষা এবং মানসিক গঠনের সহিত যাঁহারা পরিচিত তাঁহারা কখনও এ ভুল করিতে পারেন না। তাঁহারা ভারতীয় নারীর

অনুধ্যানে এই বিদেশিনীর চিন্তাধারাকে গভীর মনোযোগের সহিত অনুশীলন করিবেন। এই বিদেশিনী আমাদিগের হৃদয়ে আমাদের মাতা ভগিনী কন্যা বধূদের প্রতি একটি নূতন শ্রদ্ধা, প্রীতি ও সম্মান জাগাইয়া দিয়াছেন।

হিন্দুরমণীকে গঙ্গার ঘাটে দাঁড়াইয়া গঙ্গাকে নমস্কার, গঙ্গাজলস্পর্শ আবার গঙ্গায় নামিয়া গভীর প্রীতিভরে ভগবানের নাম বা স্তব করিতে করিতে স্নানরতা দেখিয়া ভগিনী নিবেদিতার মুগ্ধতার সীমা ছিল না।

ব্রিটিশ রাজত্বের সময় শত শত বিদেশী পর্যটক হিন্দুদের বিশেষ বিশেষ পর্বাহে গঙ্গা বা অন্য কোনও পুণ্য নদী বা পুষ্করিণীতে স্নান-ব্যাপারটিকে একটি নিছক কুসংস্কার ছাড়া অন্য কিছু ভাবিতে পারেন নাই। বিদেশীদের লেখা বই বা পত্রিকাদিতে হিন্দুদের নদী-স্নানরূপ ধর্মকৃত্যের কতই না বক্রোক্তি ও সমালোচনা ছাপা হইয়াছে এবং এখনও ছাপা হইতেছে। বিদেশী পর্যটক বা পণ্ডিতদের কে হিন্দুদের এই নদী-ভক্তির সার্থকতা বুঝিবার চেষ্টা করেন? কিন্তু ভগিনী নিবেদিতা করিয়াছিলেন। তাঁহার 'The Web of Indian Life' গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে তিনি গঙ্গা যমুনা এবং হিন্দুর দৃষ্টিতে পবিত্র অন্যান্য নদীগুলির সহিত ভারতীয় সভ্যতার গভীর সম্বন্ধের তথ্য আলোচনা করিয়াছেন। এই নদীগুলিকে একটি ব্যক্তিত্ব দিয়া দেবতা বলিয়া ভাবার পশ্চাতে নিবেদিতার মতে হিন্দুদের কোনও জাতীয় দুর্বলতা বা কুসংস্কার তো নাই-ই, বরং আছে বিশ্বপ্রকৃতির সহিত হিন্দুজাতির একটি স্বাভাবিক অনাবিল সংযোগের প্রেরণা এবং হিন্দুমনের প্রকৃতিগত অধ্যাত্ম-দৃষ্টি।

"আমরা (পাশ্চাত্যদেশবাসী) প্রাচীন গ্রীক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে আজ বহু দূরে সরিয়া আসিয়াছি বলিয়াই আমাদের হিন্দুদের রীতিনীতি বুঝিতে এত কষ্ট হয়। প্রাচীন গ্রীসে আকাশ, জল, পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র প্রভৃতি প্রকৃতির নানা বস্তু ও শক্তির সহিত কত দেবদেবীর আবির্ভাব এবং ক্রিয়াকলাপের কাহিনী প্রচলিত ছিল। এইগুলি যদি আমরা স্মরণ করি তাহা হইলে হিন্দুজাতির নদী এবং গৃহের প্রতি প্রীতিকেও সহজেই ধারণা করিতে পারিব।

"হিন্দুদের একটি চলিত কথা—'সন্ধ্যাবন্দন না করিয়া আহার করা যায় না, স্নান না করিয়া পূজা করা চলে না' নারীরা বিশেষ ভাবে পালন করেন। সেইজন্য তাঁহাদের দিন আরম্ভ হয় প্রত্যূষে নদীতে স্নান করিয়া। ভোরের অন্ধকারে তাঁহারা সঙ্গিনীদের সহ নদীর ঘাটে উপস্থিত হন। এই স্নান তাঁহাদের নিকট শুধু একটি শারীরকৃত্য নয়, ইহা একটি মানসকৃত্যও বটে। দেহের শুদ্ধির সঙ্গে মনের নির্মলতা-সম্পাদনও তাঁহাদের স্নানের লক্ষ্য।"
—(The Web of Indian Life)

ভারতরমণী ভিক্ষুক বা সাধু-ফকিরকে ভিক্ষাদান করিতেছেন, সংসারের শত কাজের মধ্যেও ইহা তাঁহার একটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য—নিবেদিতা ভারতের গৃহে গৃহে এই ঘটনাটির মধ্যে ভারতীয় সমাজের একটি আশ্চর্য মমতা ও সংহতি লক্ষ্য করিয়াছেন। তিনি আর্থনীতিকের শাণিত শস্ত্র লইয়া এই ভিক্ষাদান প্রথাকে তছনছ করিয়া কাটিতে চাহেন নাই।

"গৃহস্থের অঙ্গিনায় ভিক্ষুক আসিয়া দাঁড়াইল। মুখে তাহার ভগবানের নাম, হয়তো বা সে একটি ভজনগান করিতেছে। তাহার গানের শব্দ শুনিয়া গৃহস্বামিনী তাহার আগমন

জানিতে পারিলেন এবং তাহার ভিক্ষাপাত্রে নিজের সাধ্যানুযায়ী কিছু দিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ভিখারীর কোনও দাবী নাই। অভাব তাহার কম। সামান্য কিছু খাদ্য, যৎ-সামান্য পরিচ্ছদ এবং একটু আশ্রয় পাইলেই তাহার চলিয়া যায়। তাহাতেই সে তুষ্ট। আমরা পাশ্চাত্যে ক্যাণ্ট ও স্পিনোজা প্রভৃতি মনীষীদের মধ্যে যে বিষয়সম্পত্তির উপর একটি বিরাগ লক্ষ্য করি, ভারতে উহা সহজেই একটি বাস্তব রিক্ততার রূপ পরিগ্রহ করে। ভারতের ভিখারীদের মধ্যে অনেকে ধর্ম ও দর্শনের উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত। একমুঠা চালের বিনিময়ে ভারতের বধূ-কন্যারা ইহাদের মুখ হইতে অমূল্য তত্ত্বকথা শুনিতে পান। এই ভিখারীদের গানের মাধ্যমে উচ্চভাবে অনু-প্রাণিত লোকসঙ্গীতের সৃষ্টি হইয়াছে।

"পাশ্চাত্যের অনেক শহরে দরিদ্রদের জন্য দানশালা আছে সত্য, এবং উহাদের সাহায্যে সমাজের বঞ্চিতদের জীবনধারণের ব্যবস্থা হয় সত্য কিন্তু এই প্রথার মধ্যে একটি নির্মম যান্ত্রিকতা সুস্পষ্ট, যাহা ভারতের ভিক্ষাদান-প্রণালীর মধ্যে নাই। ভারতীয় রীতির মধ্যে একটি হৃদয়ের স্পর্শ ও মানুষের প্রতি সম্ভ্রম-বোধ দেখিতে পাওয়া যায়।" (The Web of Indian Life)

ভারতের নারীর মাতৃমূর্তি নিবেদিতাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। ভগিনী নিবেদিতার মতে সমগ্র খ্রীষ্টান ধর্ম-সংস্কৃতির সাহিত্য ও চিত্রকলায় যীশুজননী মেরীর যে পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে, উহা প্রাচ্যদেশের জননীরই চরিত্র। ভারতে সন্তান ও মাতার মধ্যে যে নিঃস্বার্থ আকর্ষণ স্নেহ-মমতা শ্রদ্ধা-ভক্তি ও কর্তব্যবুদ্ধি স্বভাবতই বিকাশ লাভ করে তাহার তুলনা নাই। নিবেদিতা বলেন, শিল্পী র‍্যাফেলের অঙ্কিত সিষ্টীন গির্জার যে প্রসিদ্ধ ম্যাডোনার কথা আমরা বলিয়া থাকি তাহা বাম বাহুতে শিশুকে ধরিয়া ঘোমটা পরা সাধারণ বেশভূষায় দণ্ডায়মানা হিন্দুতরুণী মাতার পবিত্র স্নেহময়ী মূর্তির কাছে দাঁড়াইতে পারে না। প্রতীচ্যে মাতৃত্বের প্রসঙ্গে অনেক সময়ে উল্লেখ করা হয় নিজের ছানাগুলিকে আগলাইয়া রাখিতে তৎপর মুরগীর স্বভাবের সঙ্গে। ভারতে মাতৃত্বের তুলনা জগৎ-প্রসবিনী ভগবতীর উদার স্নেহ ও কল্যাণকামনার সহিত। ভারতে সন্তান যত বড়ই হউক, মাতার কাছে সে চিরকালই শিশু। নিবেদিতার মতে ইহা মানুষকে দুর্বল করে না, বরং তাহাকে একটি মহান আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত করে। সেক্‌স্‌পীয়ারের হ্যামলেট নাটকে হ্যামলেট তাঁহার জননীর অপরাধের কঠোর সমালোচনা ও নিন্দা করিয়াছেন। নিবেদিতা বলেন, ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে স্বীয় গর্ভধারিণীর এরূপ সমালোচনা অচিন্তনীয়।

১৮৯৮ সালে কলিকাতায় প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয়। নিবেদিতা এই সময়ে উত্তর কলিকাতার পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া কিভাবে এই রোগ-পীড়িতদের সেবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার জীবনীপাঠকের অবিদিত নয়। এই সময়কার একটি ঘটনা তাঁহার হৃদয়ে গভীর দাগ রাখিয়াছিল। কলিকাতার বস্তীতে একটি দরিদ্র শ্রমিকের মাটির বাসায় একটি ৮।৯ বৎসরের বালক প্লেগে আক্রান্ত। উঠানে বিছানায় তাহাকে শোয়ানো হইয়াছে। ছোঁয়াচ-বিস্তারের আশঙ্কায় কাহাকেও তাহার কাছে আসিতে দেওয়া হইতেছে না, কিন্তু একটি নারী নিষেধ না মানিয়া বার বার ছেলেটিকে দেখিয়া যাইতেছে। ভগিনী নিবেদিতা বিরক্ত হইয়াছেন, কিন্তু হঠাৎ অপর একটি স্ত্রীলোকের

কণ্ঠস্বর তাঁহার কানে আসিল—"ও যে ছেলেটির মা।" গরম কাল। রোগীকে বাতাস করিবার প্রয়োজন ছিল। নিবেদিতা দেখিলেন, ছেলেটির মাথার পিছনে একটি জায়গা আছে, যেখানে বসিয়া ছোঁয়াচ বাঁচাইয়া বাতাস করা চলে। তিনি তখন ঐ নারীকে ঐ কোণটিতে তাহার পীড়িত সন্তানকে বাতাস করিতে বসাইয়া দিলেন। জননীর মুখে কী পরিতৃপ্তি! ছেলেটি মাঝে মাঝে প্রলাপের ঘোরে বলিয়া উঠিতেছে, 'মা, মা, মা, মাতাজী।' ছেলেটি বেশীক্ষণ বাঁচে নাই। তাহার মায়ের দৃষ্টি তাহার উপর নিবদ্ধ, সে তাহার মায়ের স্মৃতি মনে লইয়া মা মা বলিয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। নিবেদিতা লিখিয়াছেন,—হিন্দুজাতির লক্ষ লক্ষ লোক জননীর প্রতি এই ভালবাসা দিয়া গঠিত। গভীর বেদনা ও আঘাতের ক্ষণে পাশ্চাত্যে মানুষের কণ্ঠ হয়তো কোনও প্রার্থনা বা শপথ স্ফুট বা অর্ধস্ফুট ভাবে উচ্চারণ করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু ভারতীয়দের মুখ হইতে অনুরূপ সময়ে নিঃসৃত হয়—'মা, মা, মাগো'।"

মায়ের প্রতি এই অনুরাগ ও ভক্তিই হিন্দু-মনে পরমেশ্বরের বিশ্বপ্রসারী মাতৃভাবে সমুন্নীত। নিবেদিতা লিখিয়াছেন, "এমনি একটি উদ্বেল ভালবাসা যাহা কখনও আমাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে না, এমন একটি আশীর্বাদ যাহা চিরকাল আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকে, এমন একটি সান্নিধ্য যাহা হইতে আমরা কখনও দূরে যাইতে পারি না, এমন একটি হৃদয় যেখানে আমাদের অবিচ্ছিন্ন নিরাপত্তা. অগাধ মাধুর্য, অচ্ছেদ্য বন্ধন, অমলিন চিরশুভ্র শুচিতা—ইহাই হিন্দুর মাতৃমহিমা।" (The Web of Indian Life)

হিন্দু নারীর ভগবানকে শিশুকৃষ্ণ গোপাল-রূপে উপাসনা ভগিনী নিবেদিতাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। এই উপাসনার মাধ্যমে হিন্দুনারী তাঁহার হৃদয়কে কত সরস, উদার এবং পবিত্র করিতে পারেন, তাহা নিবেদিতা তাঁহার বিশ্লেষণী দৃষ্টি দ্বারা দেখিতে পাইয়াছিলেন। তেমনি জগজ্জননীকে আদরিণী কন্যা হৈমবতী উমারূপে পূজার্চনার ভাবের পশ্চাতে নিবেদিতা আবিষ্কার করিয়াছিলেন হিন্দুজাতির একটি সুগভীর আধ্যাত্মিক প্রয়াস। নিবেদিতা দেখিতে পাইয়াছিলেন—ভগবানকে বাৎসল্য-ভাবে পূজার্চনা দ্বারা হিন্দু রমণী নিজেকে ভগবানের মাতৃত্বপদে স্থাপন করেন। এই অনুধ্যান স্বভাবতই তাঁহাকে বহুতর ক্ষুদ্রতা, আসক্তি ও আবিলতা হইতে মুক্ত করে।

ভগিনী নিবেদিতার মনে প্রশ্ন জাগিয়াছিল, ভারতে নারী মাতৃত্বের এই মহামর্যাদা লাভ করিয়াছেন কোন্ তপস্যা দ্বারা? ইহার উত্তরও তিনি খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন হিন্দুবিবাহের ঐকান্তিক অচ্ছেদ্যতার মধ্যে। নিবেদিতা লিখিতেছেন—"হিন্দুরমণীর পতিভক্তির মূলে রহিয়াছে পবিত্রতা ও একনিষ্ঠা। হিন্দু-সন্তানের পক্ষে যদি অনুমান করা সম্ভবপর হইত যে, তাহার মা স্বামীর ঔদাস্য, নিষ্ঠুরতা বা আরও গুরুতর কোনও কারণবশতঃ তাঁহার প্রতি এক মুহূর্তের জন্যও আনুগত্য ত্যাগ করিয়াছেন, তাহা হইলে তাহার মাতৃভক্তির মহান আদর্শ একটি জীবন্ত আদর্শরূপে বজায় থাকিত না। হিন্দুর দৃষ্টিতে বিধবার পুনরায় বিবাহ করা মানে তাঁহার চরিত্রের শৈথিল্য। বালবিধবাদের পক্ষেও ইহা প্রযোজ্য।"

বিবাহের প্রতি হিন্দু সমাজের যাহা প্রাচীন ব্যবস্থা তাহার ভিতরকার নিগূঢ় মর্ম নিবেদিতা কী পরিষ্কারভাবে ধরিতে পারিয়াছিলেন ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয়। হিন্দু নারীকে পাতিব্রত্যের আদর্শ রক্ষা করিতে গিয়া কখনও

কখনও একটি যুক্তিহীন নিষ্ঠুরতা, প্রবঞ্চনা ও অমানুষিক স্বার্থপরতা দ্বারা নিষ্পিষ্ট হইতে হয়, অস্বীকার করিবার উপায় নাই—কিন্তু জাতির মহত্তর কল্যাণের জন্য তাঁহার এই আত্মত্যাগের একটি বৃহৎ সার্থকতা আছে। হিন্দুপত্নীর সংযম ও তপস্যা দ্বারাই হিন্দু জননী উদ্ভূতা হইয়াছেন। আর হিন্দু জননীর মহাশক্তি সমগ্র হিন্দুজাতিকে উজ্জীবিত রাখিয়াছে ও রাখিবে।

ভারতবর্ষে আধ্যাত্মিক সত্য লাভের জন্য ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাসব্রত উদ্‌যাপনের যে সুমহান আদর্শ প্রচলিত রহিয়াছে, তাহার মূল—নিবেদিতার মতে হিন্দুরমণীর অত্যুন্নত শুচিতা এবং সর্বাবগাহী পবিত্র মাতৃভাব। ভারতবর্ষে নারীকে জৈবিক মোহের ঊর্ধ্বে একটি শুভ্র অতীন্দ্রিয় পবিত্রতার আলোকে উপলব্ধি করা হইয়াছে বলিয়া নরনারীর সাধারণ আকর্ষণকে কাটাইয়া জীবনের সর্বোত্তম অভীপ্সা আত্মজ্ঞানের জন্য মানুষ এখানে সর্বত্যাগ করিতে উৎসাহিত হয়। যে সমাজে নারী শুধু রক্তমাংসের নারী, কেবল বিলাস-ব্যসনের সহচরী সে-সমাজে ত্যাগের আদর্শ বিকশিত হইতে পারে না।

ভারতীয় নারীর বধূমূর্তি ভগিনী নিবেদিতাকে কম আকৃষ্ট করে নাই। পাশ্চাত্যে কোনও কোনও মহিলা গভীর ধর্মভাবের প্রেরণায় যেমন গির্জার ব্রতধারিণীর জীবন গ্রহণ করেন ভগিনী নিবেদিতার দৃষ্টিতে ভারতীয় কন্যাও হৃদয়ে অনুরূপ একটি পবিত্র ব্রতগ্রহণের সঙ্কল্প লইয়াই স্বামীর গৃহে প্রবেশ করেন। বিদ্যালয়ের লেখা-পড়ার উপর বেশী নির্ভর না করিয়া হিন্দু বধূর শিক্ষা দীক্ষা এমন নিখুঁত কি করিয়া হইল ইহা ভাবিয়া নিবেদিতা বিস্মিত হইয়াছিলেন। হিন্দু-বধূর নম্রতা, সেবাপরায়ণতা, সহিষ্ণুতা, ধৈর্য, লজ্জাশীলতা তাঁহার চরিত্রের অনবদ্য ভূষণ। একটি বৃহৎ পরিবারে নানা বয়সের নানা সম্বন্ধের নূতন আত্মীয় পরিজনের মধ্যে ঢুকিয়া সকলের প্রতি শ্রদ্ধা, স্নেহ, প্রীতি অনুভব করিয়া, সকলের দাবী মিটাইয়া, সকলকে সন্তুষ্ট করিয়া হিন্দু-তরুণীকে বধূত্ব লাভ করিতে হয়। ইহা মুখের কথা নয়। নিবেদিতা বলেন, পাশ্চাত্যে বধূর জীবন হিন্দুবধূর তুলনায় অত্যন্ত লঘু। ভারতীয় সংস্কৃতিতে সতী, সীতা, সাবিত্রীর চরিত্র ও আদর্শ যে সমুজ্জ্বলতা লাভ করিয়াছে, নিবেদিতা তাহা পূর্ণভাবে সমাদর করিতে পারিয়াছিলেন। হিন্দুনারীর পাতিব্রত্য ভগিনী নিবেদিতা বহুতর পাশ্চাত্য সমালোচকের আত্মম্ভরিতা লইয়া বিচার করেন নাই। তিনি ইহার মধ্যে একটি গভীর আধ্যাত্মিক শক্তি দেখিতে পাইয়াছিলেন। নিবেদিতা লিখিয়াছেন—"হিন্দুবধূ জিজ্ঞাসা করেন, কে তোমার ইতর সমানাধিকারের দাবী তুলিতে চায় যখন ঐ তথাকথিত তুল্যতার পরিবর্তে পূজা করিবার অনির্বচনীয় আনন্দ রহিয়াছে হাতের মুঠার মধ্যে ?"

হিন্দুমাতা ও বধূর ন্যায় হিন্দু ভগিনীর মূর্তিও নিবেদিতাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ার অনুষ্ঠানটি তিনি পরম প্রীতির চোখে দেখিতেন। হিন্দু পরিবারে দেবর ও ভ্রাতৃজায়া এবং শ্বশ্রূ বা শ্বশ্রূমাতা ও বধূর সম্পর্ক কত সুন্দর হইতে পারে তাহাও তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন। কোনও তরুণী বালবিধবা হইয়া পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসিলে যে ঘটনাপরম্পরা তাহার জীবনকে নিয়মিত করে, তাহা নিজের চোখে পর্যবেক্ষণ করিবার সুযোগ ভগিনী নিবেদিতার হইয়াছিল। তিনি লিখিয়াছেন—"কোনও বালিকা সদ্য-বিধবা হইয়া পিত্রালয়ে যদি প্রত্যাবর্তন করে, তাহা হইলে এই ঘটনায় হিন্দু পরিবারের ইতিহাসে সৃষ্ট হয় একটি অতুলনীয় মুহূর্ত। ঐ দুর্ভাগ্যবতীর প্রতি অসীম স্নেহ ও মমত

বর্ধিত হইতে থাকে। বৈধব্যের কঠোর নিয়মগুলি এই বালবিধবার পক্ষে কিভাবে হ্রাস করা যায় তাহা লইয়া অনেক যুক্তিতর্ক চলিতে থাকে। বালবিধবাটি হয়তো নিয়মের শৈথিল্য করিতে রাজী নয়, কিন্তু জনক-জননী এবং শ্বশুর ও শ্বশ্রূমাতা পীড়াপীড়ি করিতে থাকেন। কখনও কখনও সমগ্র পরিবারই হয়তো বালবিধবাটির কৃচ্ছ্রতার অনুসরণ করিবে। একটি ক্ষেত্রে জানি অল্পবয়স্কা কন্যা বিধবা হওয়াতে পিতা তাহাকে বলিলেন, "আমার তো সংসার থেকে অবসর নেওয়ার সময়ই হয়েছে, এখন মা, তুমি ও আমি একসঙ্গে সংসারের বিলাসবাসন ত্যাগ কোরব।"...

"বৎসরের পর বৎসর গড়াইয়া চলে। স্বেচ্ছায় বরণ করা সংযম বিধবার জীবনকে মহান, গভীর ও সমুন্নত করিয়া তুলে। অথচ সে-জীবনে সরলতা ও উন্মুক্ততার সীমা নাই। সে-জীবনে যে-শক্তির বিকাশ হয় তাহা শুধু একটি গ্রামে নয়, সমগ্র জাতিতে সংক্রামিত হয়।"

ভগিনী নিবেদিতা ভারতীয় নারীর ধর্মনিষ্ঠা, পুণ্যশীলতা এবং ভগবদ্‌ভক্তির প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইয়াছিলেন শ্রীমা সারদাদেবীর এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বহু মহিলা-ভক্তের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়া। ভারতীয় নারীকে শিক্ষা দিবার সময় আমরা যেন তাঁহার ধর্মকেন্দ্রিক চরিত্রবৃত্তিকে ব্যাহত না করি, নিবেদিতা তাঁহার গুরু বিবেকানন্দের ন্যায় বার বার এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন।

ইংলণ্ডে একটি বক্তৃতায় নিবেদিতা বলিয়াছিলেন, "পৃথিবীতে হিন্দু গার্হস্থ্যজীবনের মাধুর্য অতুলনীয়। ভারতীয় নারীর লক্ষ্য অন্ধ অনুরাগ নয়, ত্যাগদীপ্ত নিঃস্বার্থ প্রেম। এই আদর্শকে বজায় রাখিয়া আমি হিন্দুরমণীকে আধুনিক পাশ্চাত্য কার্যকরী শিক্ষা দিতে চাই।"

বোম্বাইতে একটি মহিলাসভায় নিবেদিতা বলিয়াছিলেন,—"হে ভগিনীগণ, আপনাদের প্রতি আমার অনুরোধ, আপনারা পাশ্চাত্য সাহিত্যের পরিবর্তে মহিমময় প্রাচ্য সাহিত্যের চর্চা করুন। আপনাদের পারিবারিক জীবনের যে সরলতা ও গাম্ভীর্য তাহা যেন কখনও ক্ষুণ্ণ করিবেন না। পাশ্চাত্যের ভোগবিলাস ও আড়ম্বর যেন আপনাদিগকে কক্ষচ্যুত না করে।"

মাদ্রাজের একটি মহিলাসম্মেলনে নিবেদিতা বলিয়াছিলেন,—"আমার গুরুদেব স্বামী বিবেকানন্দের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ভারতের ভবিষ্যৎ দেশের পুরুষগণের অপেক্ষা নারীর উপরই অধিক নির্ভর করিতেছে। * * * ভারতীয় মাতা ও বধূ, আপনাদের একথা স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে না যে, শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ ও শঙ্করাচার্য তাঁহাদের জননীর নিকট কত অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে সংখ্যাতীত নারী তপস্বিনীর মতো নীরব শান্ত জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। এই সকল নারীর দ্বারাই ধর্মের সংরক্ষণ ও সমৃদ্ধি ঘটিয়াছে।"

ভারতীয় নারীর সমস্যা ও শিক্ষা বিষয়ে ভগিনী নিবেদিতা গভীরভাবে চিন্তা করিতেন। তাঁহার The Web of Indian Life গ্রন্থে তিনি ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়াছেন—"যখন এ দেশের নারী যে মৃত্তিকাতে তাঁহারা বাস করেন তাহার সহিত সম্পর্কিত করিয়া নিজদিগকে দেখিতে পাইবেন, যে অতীত হইতে তাঁহারা উদ্ভূত হইয়াছেন সেই অতীতের পরিপ্রেক্ষিতে আপনাদিগকে যথার্থ চিনিতে পারিবেন, নিজেদের জাতির বিপুল প্রয়োজনগুলি সম্বন্ধে যখন তাঁহারা অবহিত হইবেন, যখন ভারতীয় নারীর বিরাট মাতৃহৃদয় জাগিয়া উঠিবে শুধু পরিবার, গৃহ এবং গ্রামের জন্য নয়, সমগ্র মাতৃভূমির জন্য, সমগ্র জাতির জন্য এবং তাঁহার মন উন্মুখ হইবে বাস্তব সেবার দ্বারা হৃদয়ের সেই জাগরণের পরিচয় দিতে—তখনই কেবল ভারতীয় নারীর ভবিষ্যৎ স্বকীয় মহত্ত্বে জাতির নিকট উদ্ভাসিত হইবে, তখনই যথার্থ শিক্ষার আদর্শ রূপায়িত হইবে এবং তখনই ভারতবর্ষের প্রকৃত জাতীয় আদর্শ স্থির প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে।"

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

বিজ্ঞানভিক্ষু

সঙ্ঘজীবন

১

"আজকাল আর স্বপ্ন দেখিনে, এখন দেখি যেন তিনি স্বয়ং প্রকাশিত হয়ে আছেন, তাই চুপচাপ পড়ে থাকি।" "সেদিন দেখলাম যে, আমি নীচের blue আকাশ থেকে ঐ উপরের blue দিঙ্‌মণ্ডল পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়ে আছি।"—এই ছিলেন সন্ন্যাসী বিজ্ঞানানন্দ—ঈশ্বরকে সর্বভূতে বা নিজেকে সর্বভূতে যাঁহারা প্রত্যক্ষ করেন, তাঁহাদেরই একজন। এদিকে নিঃসঙ্গভাবে থাকিতে ভালবাসিতেন, সন্ন্যাসজীবনের অধিকাংশ কালই সেভাবে তিনি অতিবাহিত করিয়াছেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাই তাঁহাকে প্রচ্ছন্ন ব্রহ্মজ্ঞানী বলিতেন—"হরিপ্রসন্ন হচ্ছে গুপ্ত ব্রহ্মজ্ঞানী।" "তিনি ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ, বাস্তলাভ করে বসে আছেন। ব্রহ্মজ্ঞান তাঁর মুঠোর ভেতর; আত্মস্থ হয়ে আণ্ডিল হয়ে রয়েছেন। ওঁকে চেনা বড় মুস্কিল। উনি কাউকে বড় একটা ধরা দিতে চান না।" ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ছাড়া আর কেহ ব্রহ্মজ্ঞানীকে চিনিতে পারেন না। তবে নিজের দর্শনাদির কথা বিজ্ঞানানন্দ শেষ জীবনে কিছু কিছু যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার আধ্যাত্মিক অনুভূতির গভীরতা ও ব্যাপকতার কিছুটা আভাস পাওয়া যায়: "(কালীঘাটে) আমায় মন্দিরের ভিতর নিয়ে গেল। খুব ভাল করে দর্শন ও স্পর্শন করলাম। তারপর যখন মাকে প্রদক্ষিণ করছি, মা কৃপা করে দর্শন দিলেন। কুলকুণ্ডলিনী গড় গড় করে উঠে একেবারে সহস্রার আলো করে দিলে।" "(সারনাথে) দাঁড়িয়ে অবাক বিস্ময়ে ঐ মূর্তিটি (বুদ্ধের) দেখতে দেখতে আমার এক অলৌকিক দর্শন হয়েছিল। ··একেবারে নিরাকার জ্যোতিঃসমুদ্র! ধীরে ধীরে সমস্ত জগৎব্রহ্মাণ্ড অন্তর্হিত হয়ে যাচ্ছিল। আমি যেন একটি বিন্দুর মতন ঐ জ্যোতিঃসমুদ্রের কিনারায় দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে সেই আনন্দ-জ্যোতিঃ দর্শন করছি। ·· নিমেষে নিখিল বিশ্ব অদৃশ্য হয়ে এক শুদ্ধ চেতনসমুদ্রে বিলীন হয়ে গেল।"

সারনাথে এই উপলব্ধির দিনই তিনি ঐ 'শুদ্ধ চেতনসমুদ্র' হইতেই "বুদ্ধদেবের একটি অতি কমনীয় ও নমনীয় রূপ" ভাসিয়া উঠিতে দেখিয়াছিলেন। ঈশ্বরের নিরাকার স্বরূপই নয়, তাঁহার বহুবিধ সাকার রূপও প্রত্যক্ষ করার কথা তিনি বিভিন্ন সময়ে বলিয়াছেন; আর নিজ উপলব্ধির ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া সর্বভাবময় শ্রীরামকৃষ্ণের কথারই পুনরুক্তিতে সমন্বয় সাধন করিয়াছেন সেগুলির—"ভগবান হলেন সৎ-চিৎ-আনন্দ-স্বরূপ। তাঁর রূপ অনন্ত, নাম বহু। যে যেমন ভক্ত, তার ভাব অনুযায়ী তার মনে সেইপ্রকারের প্রতিবিম্ব পড়ে। কেউ দেখছে কালীরূপ, কেউ রাম, কেউ কৃষ্ণ শিব ইত্যাদি। মন যেমন, তেমনি ধারণা; প্রথমে ছায়াবোধ, তার পরে তত্ত্বের অনুভূতি।" ঈশ্বরকে শুধু বিবিধ সাকার ও নিরাকার ভাবেই নয়, বিশ্বের সব কিছুর ভিতরেই তিনি দেখিতে পাইতেন: "(তীর্থে) কেমন আর দেখলুম! একই ব্যাপার। তিনিই সর্বত্র আছেন ,···অন্তরে

বাহিরে তিনিই," এবং ঈশ্বরকে সেভাবে ধারণা করার চেষ্টা করিতেও বলিতেন, "পৃথিবী সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র আকাশ বায়ু প্রভৃতি হ'তে আরম্ভ করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী পর্যন্ত সর্বত্রই চৈতন্য ওতপ্রোতভাবে বর্তমান।" "এই যে মেজেতে মাদুরখানা পড়ে আছে তার পশ্চাতেও ঈশ্বরের সত্তার উপলব্ধি হওয়া উচিত।"

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার অন্যান্য সন্ন্যাসিসন্তানগণের মতো তাঁহাকেও এই-জাতীয় সব উপলব্ধিগুলিরই পূর্বাভাস দিয়া গিয়াছিলেন। সন্ন্যাসজীবনে সঙ্ঘের কাজ ও প্রয়াগক্ষেত্রে দীর্ঘকাল বাসকালে কঠোর তপস্যার দ্বারা ইহাতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইবার পর স্বামী বিজ্ঞানানন্দ জীবনের শেষভাগে শ্রীরামকৃষ্ণেরই আদেশে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন সাধনালব্ধ ফল জনকল্যাণে বিলাইয়া দিতে—বহু স্থানে ভ্রমণ করিয়া দীক্ষা ও উপদেশদানের মাধ্যমে। স্বামী বিবেকানন্দ একদিন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "ঠাকুর তোমার আধারে একটু ভালরকম আস্তানা করে নিয়ে বসেছেন—আমি প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি।" স্বামী শিবানন্দের দেহত্যাগের পর এই আধারটিতে শ্রীরামকৃষ্ণের করুণার ভাবটি বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়—"তাঁর (স্বামী শিবানন্দের) শেষজীবনে তিনি যেন করুণার অবতার হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁকে দেখে আমার যেন চোখ খুলে গেল। মনে হত—হ্যাঁ, ঠিক এমনিটিই তো হওয়া চাই! জীবোদ্ধারের জন্য তিনি তিল তিল করে দেহপাত করে গেলেন।…শ্রীশ্রীঠাকুরই তাঁর শরীর আশ্রয় করে জীবকে ত্রাণ করেছেন। মহাপুরুষজীর সেই ভাবটিই আমার ভিতর ঢুকে গেছে।" "কেন জানি না, মহাপুরুষ মহারাজের শরীর যাবার পর হতেই যেন মনের ভাব একেবারে বদলে গেছে। এখন মনে হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার এতটুকু শক্তি বা একবিন্দু রক্ত শরীরে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত যে কেউ আসবে তাকেই ঠাকুরের নাম দিয়ে দেবো।" "ঠাকুরের যেমন আদেশ হবে তাই তো আমাদের করতে হবে!"

বেলুড় মঠে নূতন মন্দির নির্মাণ ও উহাতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে প্রতিষ্ঠিত করিবার পর বিজ্ঞানানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট তাঁহার কাজ হইতে 'ছুটি' চাহিয়া লইয়াছিলেন, নিজেকে দায়মুক্ত ভাবিয়াছিলেন—"এবার আমার কাজ শেষ হল। স্বামীজী আমার উপর যে কাজের ভার দিয়েছিলেন, সে ভার আমার মাথা থেকে নেমে গেল।"

২

হরিপ্রসন্ন মহারাজ (স্বামী বিজ্ঞানানন্দ) শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে যোগদান করেন ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে বা কিছু পরে। বাল্যে পিতৃবিয়োগ ঘটায় এবং তিনিই জ্যেষ্ঠ সন্তান হওয়ায় ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় পাশ করিবার পর কিছুকাল চাকরি করিয়া তিনি মায়ের ভরণপোষণ এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতার শিক্ষার সুব্যবস্থা করিয়া দিবার পর সঙ্ঘে যোগদান করিয়াছিলেন।

সঙ্ঘে যোগদানের পূর্বেও গুরুভ্রাতাগণের মধ্যে কয়েকজনের সহিত তাঁহার সংস্পর্শ হইয়াছিল। স্বামী শিবানন্দ, অভেদানন্দ ও প্রেমানন্দের সহিত যথাক্রমে পাটনা, গাজীপুর ও এটোয়াতে থাকাকালীন তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। স্বামী অভেদানন্দ কিছুকাল তাঁহার অতিথিরূপে ছিলেন। স্বামী প্রেমানন্দ অসুস্থ কালীকৃষ্ণ মহারাজকে (স্বামী বিরজানন্দ) লইয়া মাস খানেক তাঁহার নিকট অবস্থান করিয়াছিলেন। এটোয়াতে স্বামী সুবোধানন্দের সহিত সাক্ষাৎকালে মঠের আর্থিক অবস্থার কথা জানিতে পারিয়া তখন হইতে নিয়মিতভাবে তিনি মঠে

মাসিক ষাট টাকা করিয়া পাঠাইয়া দিতেন।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য হইতে ফিরিবার পর যখন ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন হরিপ্রসন্ন মহারাজকেও সঙ্গে ডাকিয়া লন। এই ভ্রমণকালে তিনি রাজপুতানার প্রাচীন মন্দিরসমূহ একসঙ্গে পর্যবেক্ষণ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবী মন্দিরের স্থাপত্য সম্বন্ধে বিজ্ঞানানন্দের সহিত আলোচনা করেন এবং মন্দিরটি কিরূপ করিতে হইবে সে বিষয়ে নিজের ইচ্ছা তাঁহাকে জানান। ফিরিয়া আসিবার পর হরিপ্রসন্ন মহারাজ স্বামীজীর ইচ্ছানুরূপ ভাবী শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের নকসা প্রস্তুত করেন; এবিষয়ে তিনি তদানীন্তন মিঃ গুইথার নামক স্থাপত্যবিদের পরামর্শও গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বামীজী নকসাটি দেখিয়া খুশী হইয়া বলিয়াছিলেন, "এ মন্দির নিশ্চয় হবে, তবে আমি না-ও দেখে যেতে পারি।"

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে মঠ আলমবাজার হইতে নীলাম্বর বাবুর বাগানবাড়ীতে উঠিয়া আসিয়াছিল। বেলুড় মঠের জমি কেনা হয় ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মার্চ। সেখানে মঠবাড়ী-নির্মাণের সমস্ত ভার স্বামীজী হরিপ্রসন্ন মহারাজকে দেন। জমির ম্যাপ, বাড়ীর প্ল্যান, এষ্টিমেট প্রভৃতি সবই তাঁহাকে একা করিতে হইত, নির্মাণকার্যের তদারক তো বটেই। তাঁহার নীরব একনিষ্ঠ কর্মতৎপরতায় শীঘ্রই মঠবাড়ী, ঠাকুরঘর প্রভৃতি নির্মিত হইলে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর স্বামীজী মঠ প্রতিষ্ঠা করিলেন। মঠবাড়ীর সম্মুখের পোস্তার নির্মাণকার্য তখনও চলিতেছে।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ৯ই মে হরিপ্রসন্ন মহারাজ সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। স্বামীজী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "আমরা যাহা করিয়াছি তাহাই কর, ঠাকুরের কাছে সন্ন্যাস নাও।" স্বামীজীর কথামত তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্মুখে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া বিজ্ঞানানন্দ নামে পরিচিত হইলেন। নামটি তিনি নিজে গ্রহণ করিয়াছিলেন, না স্বামীজী দিয়াছিলেন, তাহা সঠিক জানা যায় না।

মঠের কার্য শেষ হইবার পর স্বামীজীর আদেশে বিজ্ঞানানন্দ ১৯০০ খৃষ্টাব্দে শরৎকালে তীর্থরাজ প্রয়াগধামে যাইয়া বাস করিতে থাকেন। প্রথমে এলাহাবাদের মুঠীগঞ্জ অঞ্চলে তাঁহার বন্ধু মহেন্দ্রনাথ ওদেদারের অতিথি হইয়া উঠেন। কিছুদিন পর কয়েকজন যুবকের অনুরোধে তাহাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত গুডসশেড রোডের উপর 'ব্রহ্মবাদিন ক্লাব'-এ বাস করিতে থাকেন। এখানেই তিনি দীর্ঘ দশ বৎসর কাল অতিবাহিত করিয়াছেন। ক্লাবটি ছিল একটি বাড়ীর দোতলার উপর—দুইখানি মাত্র ছোট ঘর (৮´×৮´ এবং ৮´×১২´)। জলের কলও ছিল না। রান্না করা, বাসনমাজা, পাশের বাড়ী হইতে জল আনা প্রভৃতি সবই তিনি একাই করিতেন। দুটি ষ্টোভ একসঙ্গে জালিয়া একটিতে ভাত ও অপরটিতে একটিমাত্র তরকারি রান্না করিতেন। বছর তিনেক পরে জল আর আনিতে হইত না, বাড়ীতেই জলের লাইন আনা হয়। পূর্বাহ্ণের বাকী সময় জপ ধ্যান অধ্যয়নাদিতে কাটিত। অপরাহ্ণ ধ্যান করিয়াই কাটাইতেন। সন্ধ্যার পর ক্লাবে সমাগত যুবক ও ভক্তদের লইয়া গীতা ক্লাস করিতেন। এইকালেই কোন সময়ে তিনি পণ্ডিত ভগবৎ দত্তের নিকট বেদাধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এই ভাবে দীর্ঘ দশ বৎসর কঠোরতা, তিতিক্ষা ও নিঃসঙ্গতার মধ্যে তিনি এখানে তপস্যার জীবন যাপন করেন।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদে স্বামী মঠ স্থাপনের জন্য মুঠীগঞ্জে একটি ছোট বাড়ী ও বাড়ীটির সম্মুখের রাস্তার অপর দিকে একখণ্ড

জমি ক্রয় করা হয়। বাড়ীটি দোতলা অবস্থাতেই ক্রয় করা হইয়াছিল, কিন্তু দোতলায় ফাটল দেখা যাওয়ায় দোতলাটি ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। তদবধি উহা একতলাই আছে। এই বৎসর অক্টোবর মাসে বিজ্ঞানানন্দ মঠবাড়ীতে উঠিয়া আসেন। জমিটিতে পরে দাতব্য চিকিৎসালয় নির্মিত হয়। পরে মঠের সংলগ্ন জমি আরো কিছু কিনিয়া কার্যের বিস্তারও করা হইয়াছে। মঠবাড়ীতে আসিবার পরও তাঁহার জীবন পূর্ববৎ তপস্যাতেই কাটিত। নির্দিষ্ট সময়ে বহু ব্যক্তি এখানে আসিয়া তাঁহার সঙ্গ ও উপদেশ লাভে ধন্য হইয়াছেন।

স্বামীজীর বিশেষ ইচ্ছা ছিল বিজ্ঞানানন্দ এলাহাবাদে থাকিয়া ঠাকুরের ভাব প্রচার করেন। সেজন্য তাঁহাকে 'এলাহাবাদের ধর্ম-যাজক' বলিতেন। স্বামীজীর এই ইচ্ছাটিকে আদেশরূপে গ্রহণ করিয়া তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এলাহাবাদে কাটাইয়াছেন। মাঝে মাঝে ঠাকুর-স্বামীজীর কাজের জন্য বিভিন্ন স্থানে তাঁহাকে যাইতে হইয়াছে; কর্মসমাপনান্তে আবার তিনি এলাহাবাদে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে তিনি কনখলে যান সেখানকার গৃহনির্মাণাদির জন্য। গৃহনির্মাণ উপলক্ষে তিনি কাশী সেবাশ্রমেও গিয়াছিলেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে স্বামী ব্রহ্মানন্দের আহ্বানে বেলুড় মঠে আসেন স্বামীজীর মন্দির নির্মাণের জন্য।

এলাহাবাদে থাকাকালীন বিভিন্ন সময়ে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ কয়েকখানি পুস্তকও রচনা করিয়া গিয়াছেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে 'পরমহংস-চরিত' নামে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী-সম্বলিত একখানি হিন্দী পুস্তক রচনা করিয়া প্রকাশ করেন। পরে তাঁহার রচিত আরো কয়েকখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে: বাংলায়—'জলসরবরাহের কারখানা' (দুই খণ্ড); সংস্কৃত হইতে বাংলায় অনুবাদ—'সূর্যসিদ্ধান্ত' (হিন্দুগণিত ও জ্যোতিষের বিখ্যাত গ্রন্থ); সংস্কৃত হইতে ইংরেজী অনুবাদ—'বৃহজ্জাতকম্', 'দেবীভাগবতম্' (তিন খণ্ড), 'নারদ-পঞ্চরাত্রম্' এবং 'বাল্মীকি রামায়ণ'। রামায়ণের অনুবাদে তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল; তিনি বলিতেন, "যখন আমি রামায়ণ লিখতে বসি তখন জগৎ ভুল হয়ে যায়। সামনেই রাম, লক্ষ্মণ, সীতা ও মহাবীরজীকে প্রত্যক্ষ দর্শন করি। শেষ জীবনটা রাম নাম করেই কাটিয়ে দেবো।" করিয়াছিলেনও তাহাই—দেহত্যাগের বারদিন পূর্ব পর্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় একরকম শুইয়া-শুইয়াই রামায়ণের অনুবাদ করিয়াছিলেন। পুস্তকটি শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই, লঙ্কা-কাণ্ডের ৭ম সর্গের কতকাংশ পর্যন্ত হইয়াছে।

রামায়ণের মধ্যে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের ও শ্রীশ্রীমায়ের ছবি দিয়াছিলেন; শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী 'যে রাম, যে কৃষ্ণ, সেই-ই এ শরীরে রামকৃষ্ণ' কথাটি তাঁহার চিত্তে চিরমুদ্রিত ছিল।

৩

জীবনের শেষাংশে তাঁহাকে দাক্ষিণাত্য, সৌরাষ্ট্র, পেশোয়ার, সিংহল, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে যাইতে হইয়াছিল। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে তিনি কাঞ্চী, মাদুরা, ত্রিবান্দ্রম, কন্যাকুমারী, রামেশ্বর এবং বাঙ্গালোর, উটকামণ্ড ও মহীশূর গিয়াছিলেন। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি চিত্রকূট ও দ্বারকাধাম দর্শন করিয়া রাজকোট ও বোম্বাই আশ্রমে গমন করেন। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে তিনি দিল্লী ও লাহোর, পেশোয়ার ও ল্যাণ্ডিকোটালে যান। শিলং ভ্রমণ করেন এই বৎসরই।

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে স্বামী শিবানন্দ মহারাজের দেহত্যাগের পর স্বামী বিজ্ঞানানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ

মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষপদে বৃত হন। স্বামী শিবানন্দ যে চলিয়া যাইতেছেন, তাহা তিনি টের পাইয়াছিলেন এবং সেজন্য তাঁহার দেহত্যাগের প্রাক্কালে বেলুড় মঠে আসিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিয়া যান।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে তিনি ভুবনেশ্বর গমন করেন। এই বৎসরই তিনি দিনাজপুর, তমলুক, কামারপুকুর, জয়রামবাটী, কানপুর (এখানে ২৭শে অক্টোবর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের ভিত্তিস্থাপন করেন), ঢাকা, বরিশাল ও পাটনা গমন করেন। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে ঘাটশিলা ও জামসেদপুর যান। এই বৎসরই তিনি রেঙ্গুন গিয়াছিলেন।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষপদে বৃত হন।

৪

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জানুআরি শুক্রবার দিন তিনি বেলুড় মঠে নবনির্মিত মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

স্বামীজীর ইচ্ছামত স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মন্দিরের নক্সা পূর্বেই করিয়া রাখিয়াছিলেন। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে এই মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন স্বামী শিবানন্দ। পরে মন্দিরের স্থান একটু পরিবর্তিত হওয়ায় ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে জন্মাষ্টমীর দিন বিজ্ঞানানন্দজী ভিত্তিপ্রস্তরটিকে নবনির্দিষ্ট স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ১০ মার্চ মন্দিরের নির্মাণকার্য আরম্ভ হয়। মন্দিরটি যেখানে নির্মিত হইয়াছে, সে স্থানটি স্বামীজী বিজ্ঞানানন্দকে দেখাইয়াই গিয়াছিলেন—"স্বামীজী মহারাজ একদিন বেড়াতে বেড়াতে আমায় বলেছিলেন—'এখানে ঠাকুরের মন্দির হবে।' যে স্থানে এখন মন্দিরের নির্মাণকার্য আরম্ভ হয়েছে, ঠিক ঐ স্থানটিই তিনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন।"

নির্মাণকার্য শেষ হইতে অনেক দেরী হইতেছিল। বিজ্ঞানানন্দজী এদিকে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট ফিরিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। যাইবার পূর্বে শ্রীশ্রীঠাকুরকে নবনির্মিত মন্দিরে বসাইয়া যাইতে হইবে। তাই নির্মাণকার্যে যত দেরী হইতেছিল ততই তিনি যেন অধীর হইয়া পড়িতেছিলেন। এক দিন বেলুড় মঠে ট্রাষ্টীদের নিকট বলিয়াই ফেলিলেন, "তোমরা বাপু বড্ড দেরী কর···আর দেরী কোরো না।··· সবাই একে একে চলে গেলেন। তাই বলছি, যত শীঘ্র পার কাজটি শেষ করে নাও। দেরী কোরো না।" তাঁহার ইঙ্গিত সকলে বুঝিলেন। সেই দিনই তিনি মন্দির-প্রতিষ্ঠার দিন ধার্য করেন।

নাটমন্দিরের নির্মাণকার্য কিছু বাকী থাকিলেও কোনওরূপে গর্ভমন্দিরের নির্মাণকার্য ইহারই মধ্যে শেষ করা হইল।

প্রতিষ্ঠার দুইদিন পূর্বে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ এলাহাবাদ হইতে বেলুড় মঠে আসিয়া পৌছান। প্রতিষ্ঠার দিন প্রত্যুষে মঠবাড়ীর দোতলা হইতে নীচে নামিয়া আসিলেন। পুরাতন মন্দিরের সিঁড়ির ঠিক নীচেই গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল। পুরাতন মন্দির হইতে 'আত্মারামের কৌটা'টি (শ্রীরামকৃষ্ণের দেহাবশেষ যাহাতে রক্ষিত ও নিত্য পূজিত হইতেছিল) আনিয়া তাঁহার হাতে দেওয়া হইলে তিনি উহা লইয়া গাড়ীতে উঠিলেন। পুরাতন মন্দির হইতে নূতন মন্দির পর্যন্ত সমগ্র পথটি লাল শালু দিয়া ঢাকা ছিল। তাহার উপর দিয়া গাড়ী ধীরে ধীরে চলিল। সাধু-ভক্তগণের কীর্তনদল 'এসেছে নতুন মানুষ দেখবি যদি আয় চলে'—এই গানটি গাহিতে গাহিতে পিছনে চলিল। যেন আনন্দের বন্যা আসিল। নতুন মন্দিরের সিঁড়ির নীচে গাড়ী পৌছিলে বিজ্ঞানানন্দজী 'আত্মারামের কৌটা'

লইয়া গর্ভমন্দিরে প্রবেশ করিলেন এবং বেদীতে স্থাপন করিয়া যথারীতি পূজা, ভোগনিবেদন ও আরাত্রিকান্তে নিজগৃহে ফিরিয়া গেলেন। কীর্তনকারীরা মহানন্দে ভজন গাহিতে গাহিতে মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া আসিল।

পরে শ্রীমূর্তির পূজাদিতে প্রায় সারাদিনই অতিবাহিত হইল; বিকালে যথানিয়মে মন্দিরচূড়া হইতে মাটি পর্যন্ত বস্ত্র বিলম্বিত করা হয়। মন্দিরের সম্মুখের প্রাঙ্গণে একটি অস্থায়ী চালা করিয়া যজ্ঞমণ্ডপ করা হইয়াছিল। সেখানে কয়েকটি পৃথক যজ্ঞকুণ্ডে কাশী হইতে আগত পণ্ডিতগণ ঐ দিন (২।৩ দিন পূর্ব হইতেই) যজ্ঞাদি করিতেছিলেন। এত ফুল আসিয়াছিল যে, মন্দিরের নীচের ঘরটির সম্মুখভাগের সবটাই উহাতে ভরিয়া গিয়াছিল। প্রসাদের আয়োজনও হইয়াছিল প্রচুর; মন্দিরের সহিত মঠের ভোগরান্নার চালাটিকে সংযুক্ত করা যে পথটি (সরু লম্বা ঘর) ছিল, তাহার দুইদিকই মিষ্টান্নে ভরিয়া গিয়াছিল। সারাদিনই আনন্দ জমাট বাঁধিয়া ছিল। আবালবৃদ্ধবনিতা, সাধু, ভক্ত যেই-ই সেদিন মঠে গিয়াছেন, এই আনন্দের ভাগ হইতে কেহই বঞ্চিত হন নাই।

মন্দির কোথায় হইবে, সে স্থানটি যেদিন স্বামীজী স্বামী বিজ্ঞানানন্দকে দেখাইয়া দেন, সেদিন স্বামীজী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "মন্দির আমি দেখব তো?" বিজ্ঞান মহারাজ উত্তর দেন, "হ্যাঁ, মহারাজ, আপনি দেখে যাবেন।" শুনিয়া একটু চুপ করিয়া থাকিয়া স্বামীজী বলিয়াছিলেন, "হ্যাঁ, আমি দেখব। উপর থেকে দেখব!"

মন্দির-প্রতিষ্ঠার দিন নীচে নামিবার পূর্বে ঘরে বসিয়া বিজ্ঞানানন্দ আবেগভরে সেবককে বলিলেন, "মন্দিরে ঠাকুরকে বসিয়ে বলব, 'স্বামীজী, আপনারই প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর আপনার পরিকল্পিত মন্দিরে বসেছেন। আপনি বলেছিলেন ওপর হতে দেখবেন। তাই দেখুন। ঠাকুর আজ নূতন মন্দিরে বসেছেন।' আর একটি কথাও জানাব ঠাকুরকে!"

সেদিন আহারান্তে সেবক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি ঠাকুর ও স্বামীজীকে যা বলবেন বলেছিলেন, তা বলেছেন?" বিজ্ঞানানন্দজী উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, বলেছি। স্বামীজীকে বললাম, 'স্বামীজী, আপনি উপর থেকে দেখবেন বলেছিলেন। আজ দেখুন আপনারই প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর নূতন মন্দিরে বসেছেন। তখন আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম, স্বামীজী, রাখাল মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ, শরৎ মহারাজ, হরি মহারাজ, গঙ্গাধর মহারাজ প্রভৃতি সকলেই দাঁড়িয়ে দেখছেন।" শুনিয়া সেবক কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিল। পরে জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুরকে কি যে জানাবেন বলেছিলেন?" বিজ্ঞান মহারাজ বলিলেন, "হ্যাঁ, তাও বলেছি। তবে তা কাউকে বলছি না।" কাউকে বলেনও নাই। তবে অনুমান করা যায়, শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে ফিরিয়া যাইবার জন্য 'ছুটি' চাহিয়াছিলেন। এই দিনই মন্দিরপ্রতিষ্ঠার পর বলিয়াছিলেন, "এবার আমার কাজ শেষ হল। স্বামীজী আমার উপর যে কাজের ভার দিয়েছিলেন, সে ভার আজ আমার মাথা থেকে নেমে গেল।" এরপর আর একবার মাত্র বেলুড় মঠে আসিয়াছিলেন, ঐ বৎসর শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসবের সময়। উৎসবের পরদিন সকালে সমবেত সন্ন্যাসীদের লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "এবার বাপু তোমরা আর একজন প্রেসিডেন্ট করে নাও। আমার শরীরের যা অবস্থা, তাতে আর আসা হয়ে উঠবে না।" যাইবার দিন, ৮ই মার্চ, হাওড়া স্টেশনে ট্রেনের কামরায় বসিয়া বলিলেন, "আর আসছি না।" পরে তাঁহার

স্বভাবসুলভ ভাবে কথাটা একটু হাল্কা করিয়া বলিলেন, "লঙ্কাকাণ্ড শেষ না করে আর আসছি না।" কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "রামায়ণ লেখার সময় আমি খুব inspiration পাই।"

আর আসেনও নাই। তাঁহার শরীর নানাবিধ ব্যাধিতে খুবই দুর্বল ছিল। প্রয়াগে ফিরিবার পর দিন দিন শরীর আরো অসুস্থ হইতে থাকে। কিন্তু ডাক্তার ডাকাইয়া চিকিৎসাও করিতে দিলেন না, কাহাকেও সেবা করিতে দিলেন না। এরূপ তিনি বরাবরই করিয়াছেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে তিনি রক্তামাশয়ে দীর্ঘকাল ভুগিয়াছিলেন, কিন্তু কাহারও সেবা গ্রহণ না করিয়া নিজকক্ষে একাকী থাকিতেন। কেহ আসিলে অঙ্গুলি-নির্দেশে কথা কহিতে নিষেধ করিয়া পরমুহূর্তেই চলিয়া যাইতে বলিতেন। খাওয়া প্রায় বন্ধ ছিল; ঘরে কুজায় জল থাকিত, নিজেই গড়াইয়া লইয়া খাইতেন। শেষ বয়সে তাঁহার পা ফুলিয়া গিয়াছিল; ঐ অবস্থায় একবার বেলুড় মঠে আসিলে জনৈক সাধু একজন বড় ডাক্তার ডাকিয়া দেখাইবার কথা বলেন। তাহাতে বিজ্ঞানানন্দ বলেন, "আমার ডাক্তারের ওপর মোটেই বিশ্বাস নাই।" সাধুটি বলিলেন, "খুব ভাল ডাক্তার,—কে ডাকা হইবে।" বিজ্ঞানানন্দ বলেন, "তাঁর চেয়ে বড় ডাক্তার আছে?" সাধুটি বলিলেন, "নীলরতন বাবু আছেন, যদি বলেন তাঁহাকেই ডাকা হইবে।" বিজ্ঞানানন্দ আবার প্রশ্ন করেন, "তাঁর চেয়ে বড় ডাক্তার নাই?" সাধুটি উত্তর দিলেন, "না, এখানে তাঁর চেয়ে বড় ডাক্তার আর নাই।" বিজ্ঞানানন্দজী বলিলেন, "আছেন, ঠাকুর; তাঁরই চিকিৎসাধীনে আছি।"

বিনা চিকিৎসায়, বিনা সেবায় শরীর ক্রমশঃ ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল। সেই অবস্থাতেই চেয়ারে বসিয়া কাজকর্মের নির্দেশও দিতেন। ৯ই এপ্রিল হইতে কিন্তু শয্যা গ্রহণ করিতে হইল। ১৩ই এপ্রিল পর্যন্ত শুইয়া শুইয়াই রামায়ণের অনুবাদ করিয়াছেন। সেবকের কাতর অনুরোধে এই সময় একজন হোমিও-প্যাথি ডাক্তারকে ডাকিবার সম্মতি দেন। ডাক্তার দেখিয়া বলিলেন যে বেরিবেরি হইয়াছে। তখন আহারাদি বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, কেবল জল পান করিতেন। ২৫শে এপ্রিল (১৯৩৮) সোমবার অপরাহ্ণ ৩টা ২০ মিনিটের সময় তিনি লীলাসংবরণ করিলেন।

পরদিন তাঁহার পূতদেহ ত্রিবেণীসঙ্গমে সলিল-সমাধি দেওয়া হইল। এই ত্রিবেণীসঙ্গমেই এক-দিন স্নানকালে ত্রিবেণী মাতা তাঁহাকে দেখা দিয়াছিলেন—বালিকাবেশে জল হইতে মাথা তুলিয়া হাতে করিয়া তিনটি বেণী তাঁহাকে দেখাইয়া হাসিয়া আবার জলের মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছিলেন। (ক্রমশঃ)

সমালোচনা

Yogi Sri Krishnaprem—Dilip Kumar Roy. প্রকাশক: ভারতীয় বিদ্যা ভবন, চৌপটি, বম্বে-৭; মূল্য ১৫৲; পৃষ্ঠা ২৬১+২৪।

শ্রীদিলীপকুমার রায় বাংলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট নাম। ইহার প্রায় সর্বক্ষেত্রে তাঁহার অবাধ বিচরণ। এতদতিরিক্ত তিনি মরমিয়া সাধক, প্রখ্যাত গায়ক ও সংগীত-বিজ্ঞানী। আলোচ্য গ্রন্থে যোগী শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের জীবনের একটি অনবদ্য ছবি তিনি পাঠকদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। এখানে তিনি কৃষ্ণপ্রেমের সম্পূর্ণ জীবনী লিখিবার প্রয়াস করেননি, কৃষ্ণপ্রেমের একনিষ্ঠ গুরুভক্তি, অপূর্ব ইষ্টপ্রীতি এবং ভারতীয় সংস্কৃতির উপর স্থির প্রত্যয়ের মনোরম কাহিনী তাঁহার নিজস্ব শৈলীতে বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের পূর্ব নাম ছিল রোনাল্ড নিকসন। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা-সমাপনান্তে তিনি লখ্‌নৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিতে থাকেন এবং এইখানেই তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের সূচনা হয়। তিনি সম্মান ও অর্থের প্রলোভন ত্যাগ করিয়া প্রথমে বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরী গ্রহণ করেন। পরে ঐ পদও ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া হিমালয়ের আলমোড়া শহর থেকে ২০ মাইল দূরে মিরটোলাতে আশ্রম স্থাপন করিয়া সেইখানেই আজীবন সাধন-ভজনে কালাতিপাত করেন। পুস্তকটিতে কৃষ্ণ-প্রেমের যেমন মনোজ্ঞ বর্ণনা আছে সেই সঙ্গে তাঁহার গুরু যশোদা মার কথাও নিপুণভাবে লেখক বলিয়াছেন। যশোদা মার বাল্য-জীবনের একটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ এই বইটিতে আছে। তাঁহার বাল্যকালে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাকে কুমারী-পূজা করিয়া-ছিলেন, যদিও ঐ পূজা তথাকথিত আনুষ্ঠানিক ভাবে স্বামীজী করেননি (পৃ: ৯০)। গ্রন্থকার তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের উপর কৃষ্ণপ্রেমের দান অকপটে স্বীকার করিয়াছেন।

এই গ্রন্থে দিলীপকুমার দেখাইয়াছেন কী গভীর শ্রদ্ধা কৃষ্ণপ্রেম আধ্যাত্মিক সত্যের উপর পোষণ করিতেন! এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণপ্রেমের একটি উক্তি বিশেষ স্মরণীয়: "অনেকে সুন্দর কবিতা ও জটিল দার্শনিক বিচারের সহিত অপরোক্ষ আধ্যাত্মিক অনুভবকে এক করিয়া ফেলে। বৌদ্ধিক ধারণা পরিবর্তনশীল (কিন্তু আত্মানুভূতি স্থির।) (পৃ: ২২)।" সেকুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতা সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের উক্তি সত্যই প্রণিধানযোগ্য: "ভারতবর্ষের পক্ষে এবং অপরের পক্ষেও এটি বেদনাদায়ক হইবে, যদি হিন্দু জীবন ও সমাজের পুনর্গঠন কখনও সেকুলারিজম ভিত্তিক হয়। পণ্ডিত জহরলাল যেমন বলেন ধর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার; কিন্তু উহা কখনও সম্ভব নয়, যেমন প্রজার সহিত রাজার ব্যক্তিগত সম্পর্ক হওয়া অসম্ভব (পৃ: ১৩৬)।"

'যোগী শ্রীকৃষ্ণপ্রেম' বইটি ধর্মীয় সাহিত্যে একটি আকর্ষণীয় সংযোগ। উহা পাঠ করিলে আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও ভারতীয় জীবনবাদের উপর পাঠকের শ্রদ্ধা নিঃসংশয়ে দৃঢ় ও বর্ধিত হইবে। —আনন্দ

জগতের ধর্মগুরু—দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রকাশক: স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নরেন্দ্রপুর, চব্বিশ পরগণা। পৃষ্ঠা ১৬৮+২০; মূল্য: ৩'২৫।

বিবেকানন্দ জন্মশতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থরূপে

এটির প্রথম সংস্করণ অতি দ্রুত নিঃশেষিত হবার পর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটি যে সুপ্রচারিত হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। অধুনা তৈল-তণ্ডুল-ইন্ধনের চাপে এবং দূষিত সামাজিক ও রাজনৈতিক আবহাওয়ার ফলে আমরা অন্নময় সত্তার অতিরিক্ত অস্তিত্ব সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে পড়েছি। ধর্ম, দর্শন, নৈতিক আদর্শ—এ সব ব্যাপার আজকাল প্রায়ই উপহাসের দ্বারা অভ্যর্থিত হয়। আমাদের সাম্প্রতিক শিক্ষানীতি অনেক কর্মঠ ও 'এফিসিয়েণ্ট' কর্মচারী তৈরি করলেও যথার্থ মানুষ তৈরি করতে পারছে না। এই অধ্যাত্মসংকটমুহূর্তে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষ ছাত্র ও তরুণদের মানসিক বৃত্তির পুনর্গঠনের জন্য এই পুস্তকে যে পনের জন মহত্তম আচার্য ও ধর্মগুরুর জীবনাদর্শ আলোচনা করেছেন, সে আলোচনা শুধু তরুণদেরই নয়, বয়োধর্মনির্বিশেষে সমস্ত পাঠকের মানসিক ভোজ্যরূপে পরম আদরণীয় হবে। পৌরাণিক যুগের শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ, ঐতিহাসিক যুগের মহাবীর ও বুদ্ধদেব, পরবর্তীকালে শঙ্করাচার্য ও রামানুজ, মধ্যযুগে নানক ও শ্রীচৈতন্য, আধুনিক যুগে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা সারদামণি এবং স্বামী বিবেকানন্দের জীবন, সাধনা ও বাণী এই পুস্তকে অত্যন্ত নিপুণভাবে অথচ সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। বহির্ভারতের সাধকের কথাও (কনফুসিয়াস, যীশুখ্রীষ্ট, জরথুশত্র, হজরত মোহাম্মদ) যাবতীয় তথ্যসহ এই গ্রন্থে স্থান পাওয়াতে এটি বিশ্বসাধনার স্মারকগ্রন্থে পর্যবসিত হয়েছে। বিভিন্ন লেখক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, অধ্যাপক, ধর্মজগতের আচার্যস্থানীয় ব্যক্তিরা এর বিভিন্ন প্রবন্ধ রচনা করেছেন। প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন লেখকের দ্বারা রচিত হলেও মূলতঃ একই উৎস থেকে জন্মলাভ করেছে। সেটি হচ্ছে মানুষের চিরকল্যাণবোধে অটুট বিশ্বাস। ধর্মগুরুদের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা, সাধনা, আদর্শ ও নীতি—যা মানবসমাজকে নিত্যই কল্যাণের দিকে নিয়ে চলেছে, লেখকেরা পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে সেই কথাগুলি ধর্মগুরুদের জীবনাদর্শ থেকে সংগ্রহ করে দিয়েছেন। কিন্তু তথ্যের গুরুভার ও গুরুতর নৈতিক উপদেশ গ্রন্থটির রম্যগুণকে কোথাও আচ্ছন্ন করেনি—এটি এর বড় গুণ। মানবজীবন বলতে শুধু প্রাণধারণের জৈব প্রেরণাকেই বোঝায় না—মানুষ হিসেবে মানুষের অন্তরে নিত্যই যে জিজ্ঞাসার হোমাগ্নি দীপ্যমান, ভারত ও ভারতের বাইরের ধর্মগুরু ও সাধকেরা সেই পবিত্র আলোকশিখাকে অন্তর-প্রদীপরূপে ব্যবহার করেছেন এবং ব্যর্থ হতাশ মানুষের নির্বাপিত প্রদীপটিকে আবার জ্বালিয়ে দিয়েছেন। দুর্জ্ঞেয় তিমিরাক্ত সমুদ্রের বুকে এঁরা যে আলোকস্তম্ভ স্থাপন করে গেছেন, এই পুস্তকে তারই রশ্মিচ্ছটা বিচ্ছুরিত হয়েছে। ইতিহাস, তত্ত্ববিদ্যা এবং মানসিক ঐতিহ্য-ব্যাখ্যানে ও আত্মার ক্ষুধানিবারণে এ গ্রন্থ শুধু তরুণ পাঠার্থীদেরই নয়, জীবনযুদ্ধে হতাশ যোদ্ধাদেরও হৃদয়ে নতুন বল সঞ্চার করবে। আত্মহনন মানুষের ধর্ম নয়, মৃত্যুঞ্জয়ত্বই মনুষ্যত্বের শেষ নিদান। সে পরম সত্যকে আমরা মাঝে মাঝে ভুলে যাই; তখন এই ধরনের গ্রন্থের আবশ্যক হয়। এই পুস্তক প্রকাশ করে নরেন্দ্রপুর আশ্রম কর্তৃপক্ষ সমগ্র জাতিকেই ঋণী করেছেন। গ্রন্থটির অঙ্গসজ্জাও অতি মনোরম—কর্তৃপক্ষ সেদিকেও অতি সতর্ক। পুস্তকটি ঘরে ঘরে স্থান পাবে বলে আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস।

—শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব

বেলুড় মঠ: গত ২৭শে অগ্রহায়ণ (১২. ১২. ৬৮) বৃহস্পতিবার পুণ্য কৃষ্ণাসপ্তমীতে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী সারদাদেবীর শুভ-জন্মতিথি উপলক্ষে বেলুড় মঠে সারা দিন ধরিয়া আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

প্রত্যুষে শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরে মঙ্গলারতি, বৈদিক মন্ত্র আবৃত্তি এবং তৎপরে ভজন, বিশেষ পূজা, হোমাদি ও শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরেও বিশেষ পূজাদি অনুষ্ঠিত হয় এবং নাটমন্দিরে বেলা ৯টা হইতে ১০টা 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' পাঠ হয়। বেলা ১০টা হইতে ১২টা কালীকীর্তন হইয়াছিল।

অপরাহ্নে আয়োজিত ধর্মসভায় স্বামী গম্ভীরানন্দজী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীতামসরঞ্জন রায় এবং সভাপতি মহারাজ শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য জীবন ও বাণী অবলম্বনে সুচিন্তিত মনোজ্ঞ ভাষণ দেন।

সারাদিন বহু ভক্ত নরনারী বেলুড় মঠে সমবেত হইয়াছিলেন। ভক্তগণকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়; বর্তমান পরিস্থিতিতে বসাইয়া অন্নপ্রসাদ দেওয়া সম্ভব হয় নাই।

শ্রীশ্রীমায়ের বাটী: কলিকাতা বাগবাজার পল্লীর যে বাড়ীতে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জীবনের শেষ একাদশ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল, পুণ্যস্মৃতি-বিজড়িত সেই ভবনে শ্রীশ্রীমায়ের শুভ ১১৬তম জন্মোৎসব গত ২৭শে অগ্রহায়ণ (১২.১২.৬৮) বৃহস্পতিবার বিশেষ অনুষ্ঠান-সূচী সহায়ে মহা উৎসাহ ও আনন্দের সহিত অনুষ্ঠিত হয়।

মঙ্গলারতি, ষোড়শোপচার পূজা, হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, ভজন, জীবনী আলোচনা প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল।

বেলা ১০টা হইতে ১১টা শ্রীশ্রীমায়ের কথা-পাঠ এবং সন্ধ্যারতির পর শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য জীবনী আলোচিত হয়; জীবনী আলোচনা করেন স্বামী সৎস্বরূপানন্দ। প্রায় তিন সহস্র ভক্ত শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীপাদপদ্মে ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করেন। সকলকেই হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। সারাদিন বিবিধ অনুষ্ঠানে ও ভক্তসমাগমে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী আনন্দ-মুখরিত থাকে। সন্ধ্যারতির পরে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত বহু ভক্তের সমাগম হয়। রাত্রেও ভজন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য

মেদিনীপুরে বন্যার্তসেবা: গত ২৮শে অক্টোবর হইতে ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক ৩৩,৯৫০ কেজি চাল ও ২,৭৯,১৪৭ কেজি গম সবং, নন্দীগ্রাম, ভগবানপুর ও ময়না থানার ১২টি অঞ্চলে বন্যাপীড়িত জনগণের মধ্যে বিতরণ করা হইয়াছে। সাহায্য প্রাপ্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা—৪১,৫৩০।

উত্তরবঙ্গে বন্যার্তসেবা: গত ৫ই অক্টোবর প্রলয়ঙ্কর বন্যার দিন হইতে ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত মিশন কর্তৃক জলপাইগুড়ি শহরের ১৯ নং ওয়ার্ডে, মণ্ডলঘাটের ৯ নং অঞ্চলে এবং কাঠামবাড়ী অঞ্চলে বন্যাবিধ্বস্ত জনগণের মধ্যে ৪৩,২২৭ কেজি চাল, ৪৯,০৫১ কেজি আটা, ১,০৮৫ কেজি ডাল, ৩,০০০ কেজি বার্লি এবং ১,৬৮১ কেজি

গুঁড়া দুধ বিতরণ করা হইয়াছে। সাহায্য-প্রাপ্ত বন্যার্তদের সংখ্যা—১৩,৯০০।

ইহা ছাড়া ৬,৯৩৬ খানি ধুতি ও শাড়ী, ৩,৭৬৪ খানি তুলার কম্বল, ৯০টি ফতুয়া এবং ৯০০ খানি পুরাতন বস্ত্রাদি বিতরিত হইয়াছে।

সুরাটে বন্যার্তসেবা: সুরাট জেলায় ১১টি গ্রামে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক বন্যা-পীড়িতদের পুনর্বাসনের জন্য পূর্বে-জমানো কংক্রিটের থাম প্রভৃতি দিয়া প্রায় ২,০০০ কুটির নির্মাণ করা হইয়াছে।

কার্যবিবরণী

কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ১৯৬৬-৬৭ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য জন্মভূমি ও বাল্যলীলাস্থল শ্রীধাম কামারপুকুর পল্লীতে মঠ-মিশনের কেন্দ্র হওয়ায় পল্লীবাসী নরনারী ও পার্শ্ববর্তী গ্রাম্য জনসাধারণের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতেছে।

মঠ কেন্দ্রে শ্রীমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের নিত্য পূজাপাঠ ভজনাদি, শাস্ত্রালোচনা, ধর্মপ্রসঙ্গ ও সাময়িক উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব এবং শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা, কালীপূজা প্রভৃতিও সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

মিশন শাখা কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষায়তন, চিকিৎসালয় প্রভৃতি: (১) প্রি-বেসিক (নার্সারি) স্কুল, তিন হইতে পাঁচ বৎসরের শিশুরা এখানে লেখাপড়া শেখে; (২) জুনিয়র বেসিক স্কুল, ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৪৪৪ (ছাত্র—২৯৭); (৩) সিনিয়র বেসিক স্কুল, প্রথম ও দ্বিতীয় ইউনিটে ছাত্রসংখ্যা যথাক্রমে ৭২ ও ৭৪; (৪) বহুমুখী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ছাত্রসংখ্যা ১৭৬; সাহিত্য বিজ্ঞান ও কৃষি—তিনটি বিভাগেই পরীক্ষাফল বিশেষ সন্তোষজনক; (৫) প্রাথমিক বৃত্তিমূলক শিক্ষাকেন্দ্র, এখানে কাঠের কাজ এবং ফিটিং, টার্নিং, ওয়েল্ডিং প্রভৃতি ভোকেশনাল ট্রেনিং তিন বৎসরে দেওয়া হয়, ছাত্রসংখ্যা ৮১; (৬) ছাত্রাবাস, ছাত্রসংখ্যা ১২৫; (৭) গ্রন্থাগার ও পাঠাগার (Area Library), পুস্তকসংখ্যা ৪,৬৪৫, ৪টি দৈনিক, ৩৬টি মাসিক পত্রিকা লওয়া হয়, দৈনিক পাঠকসংখ্যা ৪০, শিশুদের জন্যও একটি লাইব্রেরী করা হইয়াছে; (৮) অডিওভিসুয়াল মোবাইল ইউনিট, গ্রামে গ্রামে ৬০টি ডকুমেণ্টারি ও ভক্তিমূলক চলচ্চিত্র দেখানো হইয়াছে; (৯) স্কুল-কাম-কমিউনিটি সেণ্টার (নৈশ বিদ্যালয়, বয়স্কদের জন্য), ছাত্রসংখ্যা ২৫; (১০) সংস্কৃত চতুষ্পাঠী, ছাত্রসংখ্যা ১৭; (১১) হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়, আলোচ্য বর্ষে চিকিৎসিতের সংখ্যা ১৫,২৯০।

কনখল সেবাশ্রমের ৬৭তম বর্ষের (এপ্রিল, '৬৭—মার্চ, '৬৮) কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতিষ্ঠাসময় হইতে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া এই সেবাশ্রম আর্ত-নারায়ণের সেবা করিয়া আসিতেছে। এখানে আধুনিক চিকিৎসার ব্যবস্থা-সম্পন্ন একটি হাসপাতাল এবং একটি আউটডোর ডিসপেনসারী পরিচালিত হয়। হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত তপঃক্ষেত্র-সমূহের সাধুসন্তগণও এখানে পীড়িত অবস্থায় সুচিকিৎসা লাভ করেন।

হাসপাতালে ৪৭টি শয্যা আছে। আলোচ্য বর্ষে অন্তর্বিভাগে ১,৪১৮ জন রোগী চিকিৎসিত হয়, তাহাদের মধ্যে নূতন রোগীর সংখ্যা ১,৪২২। ২৩০টি অস্ত্রচিকিৎসা করা হয়।

বহির্বিভাগে চিকিৎসিতের সংখ্যা ১,৭৩,০১০ (নূতন রোগী ৩৫,১৪৪); অস্ত্র-

চিকিৎসা ১,৬৪৯, দন্তচিকিৎসা ২০৯, চক্ষু এবং কর্ণ-নাসিকা- ও গলরোগের চিকিৎসা ৩,৪০৫। আউটডোরে গড়ে দৈনিক ৫০০ জন রোগী চিকিৎসালাভ করে।

ল্যাবরেটরিতে ৬,৪৮৭ টি নমুনা পরীক্ষিত হয়। ইলেকট্রোথেরাপি বিভাগে চিকিৎসিতের সংখ্যা ৪৩৮। ৭৬০টি এক্স-রে তোলা হয়।

গ্রন্থাগারের পুস্তকসংখ্যা ৪,৩৫৪। ৫টি দৈনিক এবং ৪৭টি সাময়িক পত্রিকা লওয়া হয়।

মন্দিরে নিয়মিত পূজা, পাঠ এবং একাদশীতে রামনামসংকীর্তন হয়। আলোচ্য বর্ষে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব এবং অন্যান্য পুণ্যতিথি পালন করা হইয়াছিল। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে হিন্দী, ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতা-ও আবৃত্তি-প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়; স্কুল-কলেজের প্রায় ৮০০ জন ছাত্র-ছাত্রী ইহাতে অংশ গ্রহণ করে।

বোম্বাই : রামকৃষ্ণ মিশন ও আশ্রমের (খারে (Khar) অবস্থিত) ১৯৬৫-৬৬ ও ১৯৬৬-৬৭ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এই কেন্দ্রের কার্যধারা প্রধানতঃ চার ভাগে বিভক্ত: (১) আধ্যাত্মিক ও সংস্কৃতিমূলক, (২) শিক্ষাবিষয়ক, (৩) চিকিৎসা-সম্বন্ধীয়, (৪) জনহিতকর ও সেবামূলক।

মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠিত। আশ্রমে দৈনিক পূজা ও উপাসনাদি অনুষ্ঠিত হয় এবং অবতার ও মহাপুরুষগণের জন্মতিথি ও শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হয়। আশ্রমে ও আশ্রমের বাহিরে নিয়মিত ধর্মবিষয়ক বক্তৃতা ও ক্লাসের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে।

আশ্রমে কলেজের ছেলেদের জন্য একটি ছাত্রাবাস পরিচালিত হয়। আলোচ্য দুই বর্ষে ৮০ এবং ৭৮ জন ছাত্র ছিল। গ্রন্থাগারে ১৩ হাজারের উপর পুস্তক আছে, পাঠাগারে ১৩০টি পত্র-পত্রিকা লওয়া হয়। আলোচ্য বর্ষদ্বয়ে গ্রন্থাগার হইতে যথাক্রমে ৬,৯৬১ ও ৬,৬৬৫ খানি পুস্তক পড়িতে দেওয়া হইয়াছিল।

দাতব্য চিকিৎসালয়ে অ্যালোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক ও আয়ুর্বেদিক মতে চিকিৎসা-ব্যবস্থা আছে; অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ চিকিৎসা করেন। সার্জিক্যাল, প্যাথলজিক্যাল, রেডিওলজিক্যাল প্রভৃতি বিভাগগুলি সুপরিচালিত। আলোচ্য বর্ষদ্বয়ে যথাক্রমে ২,৭৩,৩৯৬ ও ২,৪৫,০১৪ জন রোগী বিনা-ব্যয়ে চিকিৎসা লাভ করে।

মঠ ও মিশনের বোম্বাই কেন্দ্র দীর্ঘ ৪৪ বৎসর যাবৎ বোম্বাই নগরে ও মহারাষ্ট্র প্রদেশে বিভিন্ন স্থানে জাতিধর্মনির্বিশেষে জনসাধারণের অকুণ্ঠ সেবা করিয়া আসিতেছে।

ছাত্রগণের কৃতিত্ব

মাদ্রাজ : বিবেকানন্দ কলেজের চার জন ছাত্র ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে গৃহীত বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষায় এম. এ. সংস্কৃতে, বি. এসসি. রসায়নে, বি.এ. দর্শনশাস্ত্রে এবং বি.কম-এ প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে।

বেলঘরিয়া : রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পপীঠ-এর দুইজন ছাত্র এবার ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ডিপ্লোমা পরীক্ষায় সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে ১ম ও ২য় স্থান অধিকার করিয়াছে।

যুব শিক্ষাকেন্দ্রের ভিত্তি-স্থাপন

রাঁচি : (মোরাবাদী) রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ২১শে নভেম্বর স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ যুব শিক্ষাকেন্দ্রের ভিত্তি-স্থাপন করিয়াছেন।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

নববারাকপুর: বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদের মাসিক অধিবেশনে গত ২৮শে জুলাই স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের যুগাবতারত্ব সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন। সভায় পৌরোহিত্য করেন পরিষদের সভাপতি ডঃ মহেন্দ্রচন্দ্র মালাকার।

দিনহাটা: শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সঙ্ঘের উদ্যোগে গত ২৫শে ও ২৬শে অক্টোবর সন্ধ্যায় স্থানীয় চওড়াহাট কালীবাড়ীতে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতার জন্মশতবার্ষিকী উৎসব পালিত হয়। স্বামী বিজ্ঞানানন্দের জন্মশতবার্ষিক উৎসবে সভাপতিত্ব করেন দিনহাটা উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত রেবতীরঞ্জন ভৌমিক। প্রধান অতিথি-রূপে উপস্থিত ছিলেন স্বামী পরশিবানন্দ ও স্বামী প্রাণবাত্মানন্দ। সভান্তে বিজ্ঞানানন্দ-গীতি-আলেখ্য পরিবেশিত হয়। লোকমাতা নিবেদিতার জন্মশতবার্ষিকী পূর্তি উৎসবে সভাপতিত্ব করেন নিগমানন্দ সারস্বত মঠের অধ্যক্ষ স্বামী সিদ্ধানন্দ সরস্বতী। ভাষণ দেন অধ্যাপক সুধাংশুশেখর কর, শ্রীহৃষীকেশ সাহা, প্রধান অতিথি স্বামী পরশিবানন্দ ও স্বামী প্রাণবাত্মানন্দ। সভান্তে বিবেকানন্দ লীলাগীতি অনুষ্ঠিত হয়।

উত্তরবঙ্গ বন্যাত্রাণের জন্য সঙ্ঘের পক্ষ হইতে কিছু অর্থসাহায্য করা হইয়াছে।

ভ্রম-সংশোধন

উদ্বোধনের গত অগ্রহায়ণ সংখ্যায় ৬২৫ পৃঃ, ২ কঃ, ১৭ লাইনে 'আওরঙ্গজেবের' স্থলে 'মুসলমানদের', এবং ঐ কলমে ২৬-২৭ লাইনে '১৭৮২ বা ১৭৮৫' স্থলে '১৭৮০ বা ১৭২৫' পড়িবেন।

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ২৭শে পৌষ, (১১.১.১৯৬৯) শনিবার কৃষ্ণাসপ্তমীতে পরমপূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজের শুভ ১০৭তম জন্মতিথি বেলুড় মঠে ও অন্যত্র উদ্‌যাপিত হইবে।